শ্যামল গঙ্গোপাধ্যায়

কুবেরের বিষয় আশয়

১

বাঁ হাতখানা মেলে ধরল কুবের। প্যান্ট-শার্ট পরনে লোকটি ইংরাজি একটা নাম বলল কীসের। বার কয়েক শুনলে তবে মনে থাকে। কুবের বুঝতে পারেনি দেখে লোকটি বলল, 'পেশেন্টকে নির্জলা সত্যি বললে শক্ খেতে পারে—তাই টিবি হলে প্রথমে বলি কক্স ইনফেকশান।'

বেশ ভোরের ট্রেন, লোক নেই বলতে একেবারে নেই। ছুটন্ত চৌকো জানালায় সবুজ ধান শুধু। কামরার মেঝেতে আঁশটে গন্ধ, জল। রাত থাকতে মাছ বোঝাই দিয়ে কলকাতা ছুটেছিল। এখন ফিরছে।

'ভয়ের কিছু নয়—ড্রাই একজিমা। ধৈর্য ধরে ট্রিটমেন্ট করতে হবে।'

আরও কঠিন কিছু বললে কুবের অবাক হত না। কিছুদিন ধরেই ভয়ে ভয়ে আছে। হাতের আঙুলে কালচে এসব দাগ কোনো সহজ ব্যাপার নয়। কুঠ হবে না তো? হলে বোধহয় আস্তে আস্তে দাগের জায়গায় ব্যথা হয়, চামড়া ফাটে—শেষে ফুলুনি শুরু।

গলিতে খেলুড়ে-ছেলেমেয়েদের দু-একজনের হাঁটুতে কী আরও নীচে জিনিসটা দেখেছে। মাখন-মাখানো পোড়া কালো টোস্ট। ঘা শুকোয়, আবার ক-দিন অন্তর ব্যাগব্যাগ করে পেকে ওঠে। সেও এক রকমের একজিমা। তবে কুবেরেরটা শুকনো।

'অল্পদিন আগে পড়ছিলাম—'

কুবের কিছুই শুনতে পেল না এর পর। সব-শুনছি ভাবে তাকিয়ে থাকল। চোখ পোড়াচ্ছে। সকাল হতে না হতে বেরিয়ে এসেছে।

ফাঁকা কামরায় দেশলাই চেয়েছিল লোকটি—তা থেকে এতদূর গজালি। নাইন্টিন থার্টিফোরের ম্যাট্রিক, ফট্টিটুর এমবি। সরকারি হেলথ সেন্টারের ডাক্তার। মাস পয়লা—নিজের, স্টাফেদের মাইনে আনতে কলকাতা গিয়েছিল।

কুবের এতক্ষণ সবই লোকটির মুখে শুনেছে। আপত্তি করেনি, অন্য দিকে তাকিয়ে থাকেনি। বছর কয়েক হল, ডাক্তার পেলেই ভেতরটা দেখিয়ে নেওয়ার জোর ইচ্ছে হয় তার। এমনিতে কুবের দুর্বল না, দুপুরে ঘন্টা তিনেক ঘুমিয়ে বিকেলে পাঞ্জাবি গায়ে বেরোলে নিদেনপক্ষে
মফস্সলের হিরো লাগে তাকে। তবে, ইদানীং মুঠো বাগিয়ে আগের সেই জোর আর পায় না ঘুঁষিতে।

লোকটি তার হাতখানা হাতে নিল, 'সেদিনই একটা লেখা পড়ছিলাম— গোটা দুই কেসও দেখেছি—'

একদলা চাপ মতো কী একটা বুকের ভেতর থেকে লাফিয়ে মাথায় উঠে এল কুবেরের। লোকটা এখন যা ইচ্ছে বলতে পারে। বছর চারেক আগেই যদি সাবধান হত! পাড়ার ডাক্তার একটা

প্রেসক্রিপশনও করেছিল। বড়ো মুসুরির দানা—রংও সেইরকম—ট্যাবলেটগুলো ক-দিন খেয়েছিল কুবের। কিন্তু এমন ব্যথা শুরু হল বুকে—শেষে খাওয়াই ছেড়ে দিতে হল।

'খুব পুরোনো ভিডি থাকলে গাঁটে গাঁটে কালো ছোপ ধরতে শুরু করে—কদমপুরে এক মেছুনিকে দেখেছিলাম—'

পাঞ্জাবির হাতা কনুই পার করে দিয়ে হাতখানা ঘুরিয়ে ধরল কুবের, 'পাড়ার ডাক্তার বলেছিল এক্সটার্নাল ডারমাটাইটিজ—'

'হতে পারে সব স্কিন ডিজিজই এক্সটার্নাল। পা দেখি।'

খানিক দেখে লোকটি বলল, 'বুড়ো আঙুল দুটোই কালো হতে আরম্ভ করেছে।'

কুবের জানে। গরমকালে পায়ের আঙুল কেমন তেলেভাজা বেগুনি হয়ে যায়। শীতকালে ছাল ওঠে। এসপ্ল্যানেডে পায়খানা পেলেও গা এতখানি শিরশির করে না। দু-হাতে লোকটার হাত জড়িয়ে ধরার ইচ্ছে হচ্ছিল। ভালো কিছুর শুরু হলেই মাঝামাঝি এসে ফি-বার কুবেরকে আগাগোড়া ভেঙে ফের কাঁচামাটি করতে হয়। অনেক কষ্টে নিজেকে বাগে রাখল কুবের, 'ধরুন যদি ওয়ার্স্ট কিছুই হয়ে থাকে—'

'লং ট্রিটমেন্ট লাগবে। কাজকর্ম সেরে আসুন না সেন্টারে। এখানকার হাসপাতাল দেখে যাবেন।'

কুবেরও কদমপুর যাচ্ছে। আজ বছরখানেকই যায়। এই প্রথম আলাপ হল কদমপুর হেলথ সেন্টারের ডাক্তারের সঙ্গে। লোকটা চুয়াল্লিশ-পঁয়তাল্লিশ হবে। এরা মরলে কাগজে লেখে অকাল বিয়োগ। মোটা রোজগারের আশায় ডাক্তারি পড়েছিল। সুবিধে হয়নি বলে বাঁধা-মাইনের চাকরি নিয়েছে। ডাক্তার যখন কদমপুরে সবাই চেনে। তার সঙ্গে কথাবার্তার পর এবারে লোকটা আপারহ্যান্ড পেয়েছে। পোজের মাথায় শুধু ধেনো মাঠ দেখে যাচ্ছে।

রুদ্রনগরে এক মিনিটও দাঁড়াল না ট্রেনটা। সরু পিয়াসলে ডবল লাইন বসছে বলে অনেকটা পথ হামা টেনে এগোতে হয়েছে। এদিকে ইলেকট্রিক ট্রেন চলবে আর কিছুদিন বাদে। তারই তোড়জোড়।

সকালের ডাউন লোকালগুলোর মধ্যে এটা মিড ট্রেন। সময়মত স্টেশনে আসতে কুবের দুটো বাস বদলে রিকশায় এসেছে বাকিটুকু। টিফিন কেনার ভাঙানির ঝামেলা এড়াতে বুলু কাল রাতেই মাপা খুচরো পাঞ্জাবির ইনসাইড পকেটে রেখে দিয়েছিল। আটানব্বই পয়সাতেও কুবের কদমপুর যাতায়াত করতে পারে—আবার সারাটা পথ ট্যাক্সি দাবড়ে শেষ নোটখানাও উড়িয়ে দিতে পারে।

ডাক্তারের কাছে পয়লা আলাপেই এতখানি মন খোলা ঠিক হয়নি। ভাবিয়া করিয়ো কাজ—করিয়া ভাবিয়ো না। উঃ! চিরটাকাল কুবের প্রথমে করে ফেলে—তারপর ভেবে মরে আর পোড়ে।

কোথায় যাচ্ছে বলার পর লোকটা ঘুরিয়ে ফিরিয়ে জানতে চাইল, কেন যাচ্ছে?

কুবের একবারে বলতে পারেনি সবটা। বাড়ি-ঘর বিষয়-আশয় হলে লোকে যেমন যেমন বিনয় করে

খানিক ভেঙে খানিক চেপে বলে— তেমন ধারায় বলল, 'স্টেশনের ধারাধারি এট্টুখানি জমি রাখবার ইচ্ছে আছে। সামান্য—'

এসব ভাব আগে জানত না। রাখবার মানে কেনার। ইচ্ছা আছে মানে কেনা কমপ্লিট। রেলে যাতায়াত, পুরোনো দলিল পেড়ে দর নিয়ে কোস্তাকুস্তি, সাফ কোবালা লেখানোর জন্যে রেজিস্ট্রি অফিসে মুহুরিদের মাদুর-বিছানো খাটে বসে এমন দু-চারখানা কথা কুবেরের রগে বসে গেছে। তবে, ওইটুকু বিনয়ের জন্যে যে পরিমাণ সম্পত্তি থাকা দরকার তার সিকির সিকিও কুবেরের এখনও হয়নি।

মন্দের ভালো, ঠিক কোন দাগ কিনেছে—কিংবা আর কোন কোন দাগ কিনবে সেটুকু আর ভাঙেনি। প্যাকেট এগিয়ে দিতে লোকটা নিজের পকেট থেকে একটা রক্তশূন্য সিগারেট বের করল, 'দেশলাইটা দিন বরং—'

হাতের সিগারেটের আগুন এগিয়ে দিতে লোকটা বলল, 'সুবিধে পাইনে, দেশলাইটাই দিন।'

খারাপ অসুখ থাকলে আগুন ছোঁয়াচে হয়ে যাওয়ার কথা কোনোদিন শোনেনি কুবের। দেশলাই দিল, ফেরত নিল—পকেটে রাখল।

'তা আপনি সেই শালকে থেকে এত দূরে এই কদমপুরে?'

লোকটাকে কুবের অনেক কিছু বলতে পারত। মুক্ত বায়ু, জায়গাটা নির্জন, ইলেকট্রিক ট্রেন চালু হলে আধঘন্টায় শেয়ালদা। কিন্তু, সব কথাই পেছনে লেজ ফেলে যায়—তা ধরে নতুন নতুন কথা পাততে বসবে লোকটা।

'চলে এলাম আপনাদের কদমপুরে—'

দু-নম্বর লাইন দিয়ে ট্রেন ইন করল। প্ল্যাটফর্ম ছাড়িয়ে রাস্তায় ওঠার আগে লোকটা তার নাম বলল, বিমল মজুমদার। কুবেরও তার নাম বলল।

তারপর রাস্তায় পড়ে কুবের বিমলের পাশাপাশি হাঁটতে লাগল। মানকচু, বুনোশিম ডালায় চাপিয়ে ব্যাপারীরা বাজারে চলেছে। সাইকেলভ্যানে তাড়ির কলসি—ফুলতলা দিয়ে বাস আসছে ধুলো উড়িয়ে, বিড়েপাকানো পুঁইশাকে ছাদ ভর্তি।

'দেখুন, ছোটোবেলায় খুব একটা ট্র্যাজিক,' একটু থামতেই হল কুবেরকে, এত ভিড়ে কিছু বলা যায় না, 'স্যাড এক্সপিরিয়েন্স—ঘটনা বলতে পারেন—'

বিমল ডাক্তার রাস্তার লোকের নমস্কারে নমস্কার করল, 'আসুন না সময় করে—সকালে বিকেলে ওয়ার্ডে থাকি।'

ইরিগেশনের কাটা খালের পাড় ধরে এক মেছুনি রাস্তায় উঠে এল। হাতে একটা পোলো। রাত থাকতে বসিয়েছিল। কলকাতার এত কাছে জলের মাছ, মাঠের ধান, ফাঁদপাতা পাখির মিষ্টি মাংস—দাম কম না হলেও জায়গারটা জায়গায় বসে খাওয়ার সুখ, আরাম, স্বাদের কথা ভাবলেই কুবেরের

মনে হয় খাঁটি শেকড়ের কায়দায় সরাসরি মাটি থেকে সে নিজে নিজেই রস টেনে নিচ্ছে। অথচ—

সকালের রোদে হাতের চেটো উপুড় করে কালো দাগগুলো আবার দেখল। ব্যথা নেই, চুলকোয় না—তবে, আগের চেয়ে আরও বেশি জায়গা নিয়ে ছড়িয়ে পড়েছে।

'ট্রপিকালে দেখাতে পারেন।'

'একটা সময়-টময় আছে তো—গেলেই কি দেখবে?'

'বোধ হয় সোম আর বুধ'—হাঁটতে হাঁটতেই বিমল বলল, 'তবে, ওখানে লাইন দিয়ে দেখালে, কতকগুলো ওষুধ একেবারে খাঁটি পাওয়া যাবে —পয়সাও লাগে না—কিন্তু'—ডেলি-প্যাসেঞ্জারের দল সাইকেলে স্টেশনে ছুটেছে। তার ভেতরেও হাঁটা না থামিয়ে বিমলের মুখে তাকিয়ে থাকল কুবের।

'নার্ভাস ব্রেকডাউন না-হয় শেষে। স্কিন ডিজিজের, তাছাড়া অন্য সব অসুখের রুগী এত আসে—আর এক-একখানা যা স্যাম্পেল, বীভৎস। এদের সঙ্গে লাইন দিয়ে কী ওষুধ নিতে পারবেন?'

বিমল ডাক্তার দাঁড়িয়ে পড়েছে। সে যাবে হেলথ সেন্টারে, কুবের যাবে নয়ানদের বাড়ি। চারদিক জলে, মাটিতে, ধানে আগাগোড়া রসস্থ হয়ে আছে। সামনে তেমন কোনো বাধা নেই—সবই সহজ হয়ে যাওয়ার জোগাড়। এসব মাঠ বুলুকে নিয়ে ক-মাস আগেও দেখে গেছে কুবের। কীভাবে কিনবে, কী দিয়ে কিনবে—কার জায়গা? কিছুই জানত না তখন। রোজ মনে হত, টানাটানির মধ্যে এভাবে ট্রেন-বাস-ট্রাম করে পয়সাগুলো জলেই যাচ্ছে। যখন সব হয়ে আসছে—ঠিক তখনই—

'আপনি আছেন তো? নয়ানবাবুর বাড়ি কাজ সেরেই যাচ্ছি—'

বাঁ পায়ের বুড়ো আঙুলে বিষম হোঁচট খেল কুবের। আঙুলটার নীচে অনেকদিনের কড়া। মোষের তলপেটের চামড়া হলে কোলাপুরি স্যান্ডেল টেকসই হয়। গর্দানের হলে ছিঁড়বেই। কেনার সময় দোকানদার এরকমই বলেছিল। স্যান্ডেলটা এত টেকসই যে কিছুতেই ছিঁড়ছে না। ব্যথায় পা চেপে ধরে বসে পড়েছিল কুবের। উঠতে গিয়ে দেখল, দু-তিনশো ফুট জুড়ে খালপাড় বিকটভাবে তাকিয়ে আছে। আশপাশের লোকেরা ইচ্ছা মতো মাটি কেটে নেওয়ায় এই দশা।

এখন সকাল। আটটাও বাজেনি বোধহয়। ভোরের ডিউটিতে সিএল মেরে আজ কদমপুরে এসেছে কুবের। প্রায়ই আসে। ট্রেনের সময় এখন মুখস্থ। ফার্স্ট ট্রেন ভোর চারটে পঞ্চান্নয়, সেকেন্ড ছ-টা কুড়িতে, থার্ড আটটা পঁয়ত্রিশে। সরু পিয়াসলে মাঝে মাঝে মোবাইল চেক বসে। রুদ্রনগরে অ্যানাটোন মলমের ফেরিওয়ালা ওঠে।

এই খাল দিয়ে একদিন কলকাতার ময়লা জল আরও তিন চার স্টেশন পরে নদীতে গিয়ে পড়ত। ময়লার গলিতে সে নদীর বুক বুজে গিয়ে খালের এই দশা। নতুন নতুন বিয়েনে ভরাট ধানের গোছে ঢাকা পড়ায় নতুন কাটা খাল হঠাৎ নজরে আসে না। সেগুলো দিয়ে ইরিগেশনের ইঞ্জিনিয়াররা মাঝে মাঝে স্পিডবোটে ছুটে যায়। মাঠ দিয়ে রেলের ওভারব্রিজের নীচে অন্ধকারে ঢোকে, ইন্সপেকসন।

এই পুরোনো খালের জল মাইলখানেক ধরে বহুকাল আটকে আছে। কচুরিপানায় ফেঁপে উঠেছে—মাঝে মাঝে শোলের ঝাঁক পরিষ্কার আলোয় দেখা যায়।

কুবের খোঁড়াতে খোঁড়াতে খালপাড়ে উঠে এল। উনিশশো সাতাশের জেলা জরিপের নকশায় জায়গাটা দেখেছে। মথুর আমিন দিয়ে মাপানো হয়েছে। চুয়ান্নর রিভাইজড সেটেলমেন্টের হিসেবের সঙ্গে মিলে গেছে।

মৌজা মেদনমল্ল, থানা কদমপুর, জেলা চব্বিশ পরগনা। সার্ভেয়ার রায়মশায় খালপাড় বলেন না—বলেন, এনব্যাংকমেন্ট। ফিতে ফেলে দেখেছেন, চওড়ায় সত্তর ফুট। আরও দশফুট ছিল। সেটুকু সোলগোহালিয়া, নড়িদানার লোকজন কেটে নিয়ে গেছে। কী মাটি! শক্ত লোহা। জল পড়লে দাঁড়ায় না। খালি পায়ে হাঁটলে গোড়ালি ব্যথা করে। বেঁটে বেঁটে বাবলার ঝাড়, সাপের গর্ত, একাদশীর বিকেলে এলে সবে ফেলে-যাওয়া লম্বা লম্বা ফ্যাকাসে খোলস দেখা যায়—হ্যাজাকবাতির ম্যান্টেলের চেয়েও নিভাঁজ, ফটফটে সাদা।

নয়ান বলেছিল, এসব জায়গার দাম এত চড়বে জানলে কত জমি আমরা জলের দরে ধরে রাখতে পারতাম। কী ছিল এসব জায়গা। আমাদের বারান্দা থেকে সালতি চড়ে এদিকে আসতাম। করপোরেশন ময়লা ছেড়ে ছেড়ে নিকাশের পথ সব বুজিয়ে ফেলল। নয়ানের বাবা কান্তবাবু বলেন, বাংলা তেত্রিশ সনে বিদ্যেধরী পিয়ালিও বুজে গেল। সেই থেকে বিশ-বাইশ বছর একনাগাড়ে সারা তল্লাট জুড়ে ছিল বড়ো বড়ো হোগলার বন। তবে, মাছের সুখ কিছু গেছে। দলকে দল জাওলা পেতে, ঘুনি বসিয়ে, আলো-পোলোয় শাল-শোল, বান-বোয়াল ধরে শেষ করতে পারেনি। পাম্প বসিয়ে জল টেনে নেওয়ার পর আট-দশবছর চাষ হচ্ছে একটু-আধটু—একেবারে নোনামাটি।

ট্রেন লাইনের ওপারে ইলেকট্রিক এসেছে। বাজার, ডিমের কারি, হোটেল, গম-ভাঙানোর কল—সন্ধেবেলা আলোর জ্বরে ঝাঁ-ঝাঁ করে। এদিকটায় পোস্টে চড়ে তার এসেছে—কিন্তু আলো আসেনি। ইলেকট্রিক ট্রেন চালু হলেই আন্ডারগ্রাউন্ড কানেকসন দেবে। সকালবেলার রোদে লাইনের দু-ধারই একরকম দেখাচ্ছে।

নয়ানদের বাড়ি যেতে বিঘে তিনেকের এক ডোবা। না পুকুর না ডাঙা। শালি জমি—মাস দুই আগে কাদা করে ভাগচাষিরা বীজতলা করেছিল। এখন মোটা মোটা ধানের গোছে জায়গাটা সবুজ হয়ে আছে। কুবের দর করেছিল। পালেদের জায়গা, পয়সার অভাব নেই—দাম আরও চড়লে ছাড়বে।

জলের দর কথাটা শুনলে কুবেরের বড়ো দুঃখ হয়। ইস তখন যদি বয়স্ক থাকতাম—হাতে টাকা থাকত! এক একদিন ট্রেনে বসে দু-পাশের মাঠ দেখে মনে হয়, সাইজমতো বিরাট একলপ্তে অনেকটা জমি গালগল্পের জলের দরে পাওয়া যেত যদি, এদানী ব্রহ্মোত্তর দেয় না কেউ। তাহলে একেবারে কলবাড়ি করে তুলত। ভদ্রাসন, পুকুর, ফলের বাগান, সম্বচ্ছরের ধান-ফলানোর মাঠ সব—সব একসঙ্গে হয়ে যেত!

কলকাতায় বাসে-ট্রামে ঠাসাঠাসি, ফালি ফালি ঘর, শীতকালে সন্ধে হতেই ময়লা-ভর্তি চাপ চাপ ধোঁয়ার দলা অতিকায় বাদুড় হয়ে ট্রামের তারে ঝোলে। তখন চোখ জ্বলে, নিশ্বাস টানা যায় না। আত্মঘাতী হওয়ারও ভালো জায়গা নেই। পুরোনো আলিপুর, এদিক-সেদিক দু-চারজন বাপকেলে সম্পত্তি আগলাচ্ছে। রোজ সকালে পঞ্চাশ লক্ষ লোকের জিনিসপত্রের আন্ডারগ্রাউন্ড দিয়ে গঙ্গাযাত্রা। এত লোক দিনের মধ্যে কতবার জল সারে। ভাগ্যিস ওপরটা রাস্তাঘাট দিয়ে মোড়া—দোকানপসার আলো দিয়ে সাজানো।

বারান্দায় অ্যালসেশিয়ান আর চেঁচাল না। কুবের পাতা চেয়ারে বসতেই নয়ান বেরিয়ে এল, 'কতক্ষণ এসেছেন?'

'এই তো।' কুবের এর বেশি একবারে বলতে পারল না। বিমল লোকটা সকালবেলা আঙুল দেখে কী কী বলল তা নয়ানকে বলা যাবে না। বিমল এখানকার ডাক্তার। তার আঙুলে যদি কিছু না হয়েও থাকে—তবু, কিছু হয়েছে—এমন সন্দেহের কথা বিমলকে বলা ঠিক হবে না। ডাক্তারের মুখে রোগের কথা লোকে নিশ্বাস করবেই—তা যদি বানানোও হয়। বিশ্বাসী চাকর, ডাক্তার, ঠিকাদার, রেডিয়ো মেকানিক, প্লাম্বারই খুঁজে পাওয়া কঠিন। তবে কুকুররা এখনও বিশ্বাসী।

নয়ান দালাল না, দারুণ গেরস্থও নয়। মোটা মাইনের অবস্থাপন্ন বাবার বড়ো ছেলে। প্রায় কলবাড়ির মতো বাড়ি। পেছনে ধানি-জমি, ফলের বাগান, পুকুর, বিরাট উঠোন, বসবার বারান্দার সামনে অনেকখানি জায়গা জুড়ে নানা ফুলের বাগান। কোমর-উঁচু দেওয়ালে সবটা ঘেরা।

নয়ান রায় কুবেরকে দাদা ডাকে। এই অল্প বয়সেই অনেকেই তার কাছে শলা-পরামর্শ নিতে আসে। রায়তি স্বত্ব, না-দাবি, হ্যান্ডনোট, মর্টগেজ, বেনামদার—সবই নয়ান খানিক খানিক বোঝে। এখানকার খেলাধুলোর পান্ডা, লাইব্রেরির ফাউন্ডারমেম্বার, হুজ্জত-হ্যাঁপায় নাইট গার্ড, দুপুরবেলা রেলের অফিসে একটা চাকরিয়ো করে—ছুটিছাটায় পুরী-ঘাটশিলা-যশিডি ছোটে।

বউটি আদর্শ সহধর্মিণী। একদিন জমিজায়গার ব্যাপারে সারাদিন ছুটোছুটি গেল। নয়ান তাকে সন্ধেয় ট্রেন ধরার আগে খেয়ে যেতে বলল। বউটি ভাত দিল। কী সুন্দর গোছাল—যত্ন করে তাকে ভেতরের বারান্দায় বসে স্বামী-স্ত্রীতে খাওয়াল।

'বলরাম এসেছিল। আপনি ছাব্বিশের ওপর কিছুতেই উঠবেন না। চেপে থাকবেন।'

'থাকতে থাকতে যাতায়াতেই যে গুচ্ছের পয়সা বেরিয়ে যাচ্ছে -'

'জমিজায়গা করতে গেলে ওটুকু বেরোবেই। আগে বেশ খানিকটা নিয়ে বাড়িঘর করে বসে যান আপনারা—তারপর ধীরে-সুস্থে দেখে-শুনে কিনবেন। হুটোপাটা করেছেন কী দর চড়বে—'

'দর কি আমি চড়াই নয়ান! চড়ায় রেল—'

'মানে?'

‘আসবার সময় রোজই দেখি রুদ্রনগরে ইলেকট্রিক টেনের ওভারহেড তার টেনে নিয়ে যাচ্ছে— লাইনের দু-পাশে জরিপ হচ্ছে। সরু পিয়াসলে নতুন ব্রিজের গার্ডার মাথা তুলে দাঁড়ানো। এসব কী আর তোমাদের বলরাম, বুবন ওদের চোখে পড়েনি?

‘পড়ুকগে। আপনি চেপে থাকুন। নিজে হেঁটে এসে ও জমি আপনাকে লিখে দিয়ে যাবে। আগ্রহ দেখিয়েছেন তো কী মরেছেন।’

মরবারই কথা। এ তল্লাটে বিঘেটাক জমির যা দর তা দিয়ে কাঠা দূরে থাক—কলকাতার আশেপাশে ছটাকখানেক জায়গাও কেনা যাবে না। সস্তাই বলা যায়। কিন্তু মুশকিল অন্যদিকে। ডাঙা জমি নয়—শালি জমি সব। এ-বছরও চাষ দিয়েছে। শুটকো শুটকো ধান হয় অনেক কষ্টে। জল দাঁড়ায় না। উঁচু করে আল দিয়ে জল বেঁধে রাখতে হয়। ফি বছর আল সরতে সরতে কার জমি যে কোথায় তা আর জেলা জরিপের নকশা দেখে বোঝার উপায় নেই। তার ওপর মনোমত সাইজের জমি পাওয়াও কঠিন। কোনোটা ছিটকানো পায়েস—কোনোটা অষ্টাবক্র। মাপেই বারো কাঠা তেরো ছটাক—তাতে বড়ি শুকোতে দেওয়া যায়। পুকুর কেটে জায়গা ভরাট করে সেখানে আর বাড়িঘর তোলার জায়গা থাকে না। থাকলেও, সামান্য জমি—তাহলে আর ট্রেনে এতখানি আসা কেন? কলকাতায় থাকাই ভালো। তাই কুবেরের মুখে জায়গার কথা শুনে আরও চার-পাঁচজন তার সঙ্গে এখানে এসেছে। বাঁকাচোরা জায়গাগুলো সবাই মিলে এক লপ্তে কিনে পরে সাইজমতো ভাগ করে নেওয়ার কথা হয়েছে।

কিন্তু নেওয়া আর হয়ে উঠছে না। বলরাম, ভুবন ওরা বড়ো ভোগা দিচ্ছে। আর ওদেরই বা দোষ কী! দালালের কান ভাঙানিতে কার না মনটা দপদপ করে। দেব দিচ্ছি করেও বলরাম, ভুবন দিচ্ছে না।

‘ওই ছাব্বিশের দরেই দেবেখন। দেখবেন—’

নয়ানের সঙ্গে তর্কে গেল না কুবের। এমন কোনো দায় নেই নয়ানের যে কুবেরকে তার জমি কিনিয়েই দিতে হবে। নয়ান না থাকলে এখানে তার জায়গা কেনা সহজ হত না।

‘বলরাম দোকান আগলাতে গেছে। ভাইপোটাকে বসিয়েই আসবে। এখন তো ভর সকালবেলা—জোর বাজার—’

‘আমি বরং ঘুরে আসি—তোমাদের এখানকার ডাক্তারের সঙ্গে আলাপ হল।’

‘যেতে বলেছে?’

‘বলছিল—’

‘যান। তবে, দেরি করবেন না। বলরাম এসে পড়বে—’

‘রিকশা নিয়ে নিচ্ছি একটা।’

‘কোথায় জায়গা কিনলেন, কোথায় কিনবেন—কাদের জমি—পষ্টাপষ্টি কিছু বলবেন না কিন্তু। ওরাই ঘা দিয়ে দর চড়ায়।’

দর কথাটায় কুবেরের মাথার মধ্যে প্রায়ই বড়ো বড়ো গুণ ভাগ হয়ে যায়। নাইন্টিন টোয়েন্টিফোরে বালিগঞ্জ গার্ডেনের কাঠা ছিল চারশো। এখন? ভাবাই যায় না, ক-গুণ বেড়েছে। তখন যদি খানিকটা কষ্ট করে ধরে দেওয়া যেত। কিন্তু তার উপায় ছিল না। চব্বিশ সনের বেশ পরে কুবেরের জন্ম।

'না না আমি কিছু বলছি নে—'

নয়ান পরিষ্কার বলে দিয়েছে অনেকবার—'কারও সঙ্গে আগ বাড়িয়ে কথা বলবেন না। ভালোমানুষি এখানকার অনেকে বোঝে না। নিজের গ্র্যাভিটি নিয়ে থাকবেন।'

আগ বাড়িয়ে কিছু বলাও বিপদ। কুবের তা এখন হাড়ে হাড়ে জানে। কী কুক্ষণে যে টিকিট কাটার কাউন্টারের লোকটির সঙ্গে কথা বলেছিল। খুঁচিয়ে খুঁচিয়ে অনেক জিনিস কুবেরের মুখ দিয়ে শুনেছে; তখন সে কদমপুরে প্রথম প্রথম আসছে। তারপর দেখা গেল সিগন্যালের লোক, ক্রুম্যান, মায় ঘন্টিওয়ালা—সবার খোঁজেই সস্তায় জমি আছে—অর্থাৎ দালালির গুড়ে সবারই লোভ।

বাস আসছে দেখে রিকশাওয়ালা মাঠে নামল কুবেরকে নিয়ে। নস্করদের ইটের পাঁজায় ধোঁয়া বেরোচ্ছে। বাতিল খোলাগুলো ধানি-জমির মাঝে মাঝে বর্ষার জলে এক একটি দিঘি হয়ে আছে। ইজারাদারের লোক ছুটির দিনে ছিপফেলার পাস ছাড়ে। পঞ্চাশ ষাট বছরের সব গর্ত—এবড়ো-খেবড়ো। তিরিশ সের এক মনের সব মাছ দিঘি তোলপাড় করে রাজত্ব করে বেড়াচ্ছে। নয়ানের জ্যাঠাবাবু বড়ো ভেলার সঙ্গে সাতশো গজ নাইলন কর্ড বেঁধে কামার দিয়ে গড়ানো ম্যাগনাম সাইজ বঁড়শিতে বেড়াল গেঁথে ছেড়ে দিল চড়কের রাতে। পুরো আটচল্লিশ ঘন্টা ভেলাটাকে মাঝদিঘিতে টানাটানি করে মাছটা একেবারে মাটিতে গিয়ে শুয়ে থাকল। কর্ড ধরে কিছুতেই তোলা গেল না। শেষে রাগে রাগে জ্যাঠাবাবু নিজেই কেটে দিল।

নয়ান বলেছিল, 'ওসব মাছ বঁড়শি গেলায় চোস্ত। মুখ একেবারে স্টিল হয়ে গেছে।'

সন্ধেবেলা ইটখোলার গর্তগুলো দেখে কুবেরের বড়ো কষ্ট হয় আজকাল। খাবলা খাবলা মাটি তুলে নিয়ে যাওয়ার পর খন্দগুলোর আর সদ্গতি হয়নি—পিণ্ডি দেয়নি কেউ। ইটখোলা যে বানিয়েছিল, কাজ ফুরোতে কবে সে কেটে পড়েছে।

একটা বোড়াসাপ রিকশার চাকা বাঁচিয়ে খালে নেমে গেল। বিমল ডাক্তার ওয়ার্ডের বাইরে অর্ধেক বয়সের এক ছোকরার সঙ্গে মাঠে দাঁড়িয়ে। তেল-চপচপে ছোলা ছুঁড়ে ছুঁড়ে গালে দিচ্ছে। কুবেরকে দেখে এগিয়ে এল, 'ভেতরে বসুন—আসছি।'

সেন্টারে ঢোকার মুখে কুবের একখানা পুরোনো মোটর দেখেছে এইমাত্র। সামনের বাঁ চাকাটি পাংচার করে গাড়িটি বিকল। পেছনের সিটে হেলান দিয়ে ঘাড়ে-গর্দানে দুই মক্কেল তাড়ির কলসি ফাঁক করছে। বাইরে দাঁড়ানো একটা লোকের চোখে গগলস্। বোধহয় ড্রাইভার। তারও হাতে একটি পকেট কলসি।

কুবেরকে এক ছোকরা ভেতরে বসাল। বাইরে ডাক্তারের সঙ্গে আড্ডাধারী ছোকরাটিকে চেনা-চেনা

লেগেছে কুবেরের। সে-ই ভেতরে এল, ‘সাবধানে বসবেন। চাদ্দিকে ইনফেকসাস সব রোগ—’

কুবের চিনতে পেরেছে। মহা ফোক্কড়। নাম বিকাশ বোস। পেকে একেবারে খয়ের। অল্প বয়সেই বিয়ে-থা করে বাপের সম্পত্তি আগলাচ্ছে। স্টেশনে আলাপ হয়েছিল। অতটুকু ছেলের তিন তিনটে পোনা প্ল্যাটফর্মেই বাপের কাছে পয়সা চাইতে এসেছিল। কুবেরের সঙ্গে প্রথম আলাপেই বলেছিল, ‘আপনি শালকের কুবের সাধুখাঁ না? আপনাকে আমি চিনি।’

স্মার্ট কথাবার্তা—জগতের সব বোঝে এমন ঢঙের মুরুব্বিয়ানা হাঁটা-চলায়। সংক্রামক রোগের কথা বলল কেন? এমন কাছাখোলা হওয়ার জন্যে নিজেকেই দু-বেলা দুষছে কুবের। আপনাকে আমি চিনি বললে কুবেরের হাত-পা ঠান্ডা হয়ে যায়। অথচ সে ফেরারি নয়।

ডাক্তার এল খানিক পরে। একেবারে ওয়ার্ডে নিয়ে বসাল। লাইন দিয়ে রুগীর দল। টিকিট দেখতে দেখতেই কথা চালাল। কুবের অনেকটা অবশ হয়ে পড়েছে। তার কী কোনো অসুখ হবে। কিংবা হয়েছে। ধরতে দেরি হয়ে গেছে বলে। হয়তো আর সারবে না।

ট্রেনের মতো এখানেও আপারহ্যান্ড নিল ডাক্তারটা। দু-চারবার আঙুল এগিয়ে দিয়ে গুটিয়ে নিতে হল কুবেরের। কনক্লুশনে পৌঁছে গেছে—এভাবে কিছুই দেখল না। ডাক্তারকে নিজে থেকেই আবার আসবার কথা বলে কুবের রিকশায় বসল।

বিকাশ ফোক্কড় গেটেই ছিল, ‘একী উঠলেন?’

‘হ্যাঁ, আজ আসি—’ একেবারে সিনেমার বিদায় নিয়ে ফেলল কুবের। ফেরার মুখে সেই গগলস্ধারী, বিকল মোটর—পিচের লম্বা ফিতে, সাইকেল রিকশার ছায়া সামনে সামনে ছুটেছে।

‘জমিজমা কদ্দুর?’ পাকা খয়ের তার পেছন ছাড়েনি।

‘কোথায় আর হচ্ছে—’ রিকশা থেকেই ছুড়ে দিল কুবের।

কী একটা অন্ধকার-জ্বর এই সকালবেলার সব কিছু কালো করে দিচ্ছে। ঠিক এইভাবে ধানের কচি পাতায় লক্ষ্মী পোকা উঠে আসে। আগেভাগে কিচ্ছু জানা যায় না। বলরাম হয়তো একা বসে আছে। হেলথ সেন্টারে না এলেই ভালো ছিল। কত লোকে অমন ঘুরে যাওয়ার নেমন্তন্ন করে থাকে। তা বলে সব জায়গায় সবাই যায়?

সত্যি বলরাম-ভুবনদের দাগটার পুরো কোবালা রেজিস্ট্রি হয়ে গেলে কুবের আর এসবে জড়াবে না। আসলে দাগ দুটো। জেলা জরিপে ১৩১৬ আর ১৩৭১। নতুন সেটেলমেন্টে ২০০৮ আর ২০১৯। মোট জমি একশো চব্বিশ শতক। তিন বিঘে পনেরো কাঠা দশ ছটাক। সার্ভেয়ার রায়মশায়ের হিসেবে আরও আটত্রিশ স্কোয়ার ফুট। মৌজা—মেদনমল্ল। তৌজি নং তিনশো উনিশ। কুবেরের সব মুখস্থ। এখন সে আগাগোড়া ভুলতে চায়।

নয়ানদের বাঁধানো বারান্দার কিনারে বলরাম বসে, নয়ান চেয়ারে। কুবের বারান্দায় উঠতেই উঠতেই বলল, 'ডাক্তারটি কেবল আড্ডা মারে দেখলাম—তাও আবার আধখানা বয়সের এক ছোকরার সঙ্গে—ওই তোমাদের বিকাশ বোস ছেলেটা—'

'কিছু না, কিছু না—রুগীদের কাছে পয়সাও নেয় শুনেছি। জুটেছে আর ওই এক ফোক্কড়।'

'আমাকে যেতে বলে খানিক বসিয়ে রাখল শুধু—'

'পাওয়ার দেখালে আর কী! যাওয়াই ঠিক হয়নি আপনার।'

কুবের আজ কিছুকাল কদমপুরে যাতায়াত করে। এখানকার লোকজন, জায়গাজমি, ধানের ফলন, পঞ্চায়েত ইলেকশন—সব কিছুর খানিক খানিক জেনেছে। অথচ একেবারে ঘরবাড়ি করে বসতে না পানায় সব কিছুর সঙ্গে পুরোপুরি জড়াতেও পারছে না নিজেকে। সেই সালকে থেকে এত দূর আসে দু-তিন ঘন্টার জন্যে। আবার ছুটে গিয়ে ট্রেন ধরতে হয় তাকে—আবার কলকাতা, ট্রাম-বাস-অফিস—কত কী।

'বলরামদা আর ভোগা দিও না ভদ্রলোককে। তোমাদের এখানে আসবেন, তোমার খুড়োর দরেই জমিটা ছেড়ে দাও।'

বলরাম খানিক হেসে বলল, 'আমি কী করব বলুন, লোকেই তো দর বাড়িয়ে দেয়, আমি তো বাড়াইনি—'

কথাটা সত্যি। যার জমি সে তো হপ্তায় হপ্তায় দর চড়াতে পারে না। লোকজন এসেই চড়ায়। ফি ছুটির দিন কত লোক এসে, খালপাড় ধরে জায়গা দেখতে দেখতে যায়। দর-দাম শুনলে কার না মনটা দপদপ করে।

তবু ভাই কিছুটা লাভ না-হয় ছেড়ে দাও। দু-চারশো টাকা, আমি এখানে এলে অন্য দিক থেকে পুষিয়ে দেব তোমায়।'

'বাজার যা বলে তাই দেবেন—'

এই এক কাল। খুবই ন্যায্য কথা। কিন্তু বাজারে যে রোজ ব্যাং লাফাচ্ছে। কুবেরের ভারী অস্বস্তি লাগল। রোজই আসে প্রায়—এসেই শুধু জমি কেনার দরদস্তুর, দাগ-নম্বর কিংবা না-দাবি লেখানো—এসব নিয়েই কথা চলে। নয়ানের নিজেরও তো জীবন আছে।

আজ আর কথা বাড়াল না কুবের। বলরাম উঠি-উঠি করছিল। এখন ভর সকালবেলা—জোর বাজার

বসেছে।

নয়ান ভেতর থেকে চা-বিস্কুট নিয়ে এল। বলরামও ট্যাংট্যাং করতে করতে রাস্তায় গিয়ে উঠল। কুবেরের মাথায় এখন খাল-পাড়ের মাঠখানা দুলছে। অন্য কেউ কেনার আগে তাকে সবটা কিনে ফেলতেই হবে। জায়গার নকশা পাওয়া এক ঝকমারি। আপত্তি ওঠায় মৌজা-কে-মৌজার নকশাই বাতিল। ডিএলআর অফিসে একতলায় সিঁড়ির নীচে একজন মুহুরি সেই বাতিল নকশা বেশি টাকায় ঝাড়ে। নকশা পেলেও সাবেক আর হাল দাগ মেলানো বাকি থাকে। সব শেষে চাই খাজনার হাল দাখিলে। খাতন, দাখিলে—কোনো জায়গাতেই কুবের সব শরিকের নাম পায়নি। সর্বত্র লেখা বলরাম গং, ভুবন গং, সূর্যোধন গং। অর্থাৎ দিগর। সব জমিই শরিকানি। অতএব দিগর থাকবেই। কিন্তু সেই দিগরের মধ্যে কে কে লুকিয়ে আছে বের করে কার সাধ্য। যে জানে, পয়সা না খসালে সেও মুখ খুলবে না।

ক-মাস আগে নয়ানই তাকে ডাঙায় তুলে এনেছিল। না হলে আজও বোধ হয় কুবের মেদনমল্ল মৌজার দাগ নম্বরে জল খেয়ে বেড়াত। এত দিন হাবুডুবু খেয়ে তার ফুলে ঢোল হয়ে যাওয়ার কথা। সারাটা দেশ এমন দাগ নম্বর দিয়ে খুঁটে খুঁটে তোলা যায়, ভাবলেই পায়ের নীচে মাটি খুলে যাচ্ছে মনে হয়।

'আপনার ক-ঘর বসে গেলে দেখবেন রাস্তা আপনা-আপনি ভালো হয়ে গেছে। আলোও এসে যাবে বছর খানেকের ভেতর।'

'তা আসবে। কিন্তু, বলরাম আর ক-দিন ভোগাবে বলতে পারো?

'হয়ে এল। আপনার ফের কেটে যাওয়ার মুখে।'

'কাটলেই ভালো—'

'অতটা মুষড়ে পড়বেন না। জায়গাটা কেমন দেখতে হবে তো। বাবা আপনাকে গোড়াতেই ডিসকারেজ করেছিলেন—এদিকে না আসতেই বলেছিলেন।'

তা ঠিক। প্রথম দিনই নয়ানের বাবা পইপই করে বারণ করেছিলেন—'এদিকে আসবেন না। লোকজন সব মামলাবাজ, তাড়ি খেয়ে গজল্লা বাধাবে রাত-দুপুরে—শেষে তিষ্ঠোতে পারবেন না।'

তা সে অসুবিধে কোথায় নেই। কান্তবাবু এখন কুবেরকে তুমি বলেন। একসময় হাজার বিঘের লোনা ভেড়ি জমা নেওয়া ছিল। রাখতে পারেননি। বাঁধ কেটে জল বেরিয়ে গিয়ে সেখানে এখন ধান হয়। ফসল তোলার পর কলাই মটর ফেলে দেন সেখানে। মাস গেলে মোটা টাকার সরকারি মাইনে। পুরু চশমা লাগিয়ে মাঝে মাঝে কুবেরের কাগজপত্রও দেখে দেন। সে সময় তাঁর কাছে নানান দরের চাষি আসে। কেউ চায় পুকুর জমা, কেউ সুপুরি-নারকেল গাছ, কেউ আবার ধান তোলার পর সেখানকার মাটি খুবলে ইঁদুরের গর্ত থেকে চোরাই ধান তুলে নেওয়ার আর্জি নিয়ে আসে। কুবের একদিন কথা বলতে বলতে দেখেছে কান্তবাবুর শার্টের কলারের ভেতর 'মৃণাল' ছাপ রয়েছে। এসব শার্ট ধর্মতলায়

তিন টাকা সাড়ে তিন টাকায় ফুটপাতে গুচ্ছের বিকোচ্ছে।

'আজ উঠি নয়ান। ন-টা আটত্রিশের ট্রেনটা ধরতে পারলে সকাল-সকাল পৌঁছোনো যাবে।'

'তাড়া কীসের? খাওয়া-দাওয়া করে দুপুরের ট্রেনে যাবেন। নয়তো বাস তো আছেই।'

'আছে ঠিকই।' কিন্তু দু-দিকের ধানখেত ঘুরে বাস যখন এগোয়, তখন নির্জন পিচের রাস্তায় টায়ার থেকে একটানা বিজবিজ বিজবিজ শব্দ হতে থাকে। তার হাত থেকে নিস্তার নেই। চলতেই থাকবে। কুবের একদম সহ্য করতে পারে না। এর চেয়ে ট্রেন ভালো। আধঘন্টা চল্লিশ মিনিটে শেয়ালদা।

'নাঃ! উঠি আজ। কাল বোধহয় কয়লাঘাটে ফোন করতে পারি তোমায়। অন্য দাগগুলোর খতেন পেয়ে গেলে শরিকানি বুঝে নেব তোমার কাছ থেকে।'

'আমি কি পারব! সবাইকে চিনিও না—' নয়ান হেসে ফেলেছে। হিন্দু আইনের পর ভাইয়ের সঙ্গে বোনেরও সমান অংশ। আট বছরের মেয়ে বিয়ে হয়ে ভিনগাঁয়ে চলে গেছে সেই কবে। বত্রিশ বছরের কালে কোলে বাচ্চা নিয়ে এসে টিপ-ছাপ দিতে এলে কে চিনবে তাকে—কে শনাক্ত করবে—কে বলবে এই সেই আট বছরের বৃহস্পতি দাসী জওজে ভদ্রেশ্বর নস্কর, সাকিন নাটাগাছি। অন্ধিসন্ধির কোথায় কোন বড়ো ফাঁক থেকে গেল, কুবের তা আজকাল বোঝে।

নয়ানের পরের ভাই ভোম্বল বহরিডাঙা রেজিস্ট্রি অফিসে বলরামের খুড়োর অংশ কোবালার দিন কুবেরের সঙ্গে শনাক্ত করতে গিয়েছিল। কুবেরকে ন-ছটাক চৌদ্দ তিল জমি তিন দিয়ে ভাগ করে মুখে মুখে দুই দিয়ে গুণ করতে দেখে ভোম্বল বলেছিল, 'আপনি পাগল হয়ে যাবেন—এত হিসেব, দর—এসব দিয়ে হবে কী! কলকাতায় এর চেয়ে ভালো থাকেন না?'

আচমকা এ-কথার কোনো উত্তর দিতে পারেনি কুবের। সত্যিই কি একটুখানি ভালো থাকবার জায়গা বানাতে গিয়ে সে আগাগোড়া বিষয়ে ডুবে যাচ্ছে।

'না-হয় তোমার বাবাকে দেখাব। শনিবার আসছেন তো তিনি—'

'বসুন না আপনি। এখনও পনেরো মিনিট দেরি ট্রেনের। সরু পিয়াসলে থেকে ন-টার গাড়ি আসবে।'

ফিরে বসতে গিয়ে নিজের হাতখানাই আগে চোখে পড়ল কুবেরের। আঙুলের খানিকটা খানিকটা কালো হয়ে আছে। পায়ের গোড়ালিও কালটি মেরে যাচ্ছে। দেখামাত্র আর বসে থাকতে পারল না। সোজা হয়ে দাঁড়াল।

'বসুন তো আপনি। ভালো পেঁপে হয়েছে। ভোম্বলকে কাটতে বলি—'

অথচ এরা যদি কোনোদিন শোনে কুবের সাধুখাঁর হাতের কালো কালো দাগগুলো খারাপ অসুখের, তা হলে কী আর বাড়ির কাপে চা দেবে, প্লেটে পেঁপে! কুবের মনে মনে স্থির করল, আমার কোনো খারাপ অসুখ হয়নি। হওয়ার কথা নয়। থাকলে তো অনেক আগেই ধরা পড়ত।

এক্ষুনি যদি জানা যেত, তার ঠিক কী হয়েছে আঙুলে। ভিটামিন ডেফিসিয়েন্সি, ভেজাল তেলের

আফটার এফেক্ট কিংবা নিদেনপক্ষে চামড়া খারাপ হয়েছে।—এমন একটা রায় এখনই জানতে পারলে কুবের বেঁচে যেত।

অ্যালসেশিয়ান ঘুমোচ্ছে। দূরে পাঁচ রাস্তায় জোঁকার বাস এসে দাঁড়াল। পেছনের সিঁড়ি বেয়ে কনডাক্টর কুমড়ো নামাচ্ছে। সামনের কাঁচা রাস্তা দিয়ে পুরো একটা সাপুড়ে পরিবার মৈত্রী আবাদের দিকে চলে গেল। কিছুদিন পরেই ধেনো কেউটে ধরার সময়। এরপর সেই যে গর্তে ঢুকবে—ফাল্গুন-চোতের ফুরফুরে হাওয়া দেওয়ার আগে আর বাইরেই আসবে না। বসন্তকালে হাওয়া খেয়ে খেয়ে চন্দ্রবোড়া তো ফুলে ফুলে ওঠে—তখন চলাফেরার গতিকও মন্দ। নয়ানের মুখে শোনা, বাড়ির ঝি যশোদা নাকি গত অঘ্রানে গোরুর খড় কুঁচোতে গিয়ে একটা আস্ত গোখরো বঁটিতে কুঁচিয়ে ফেলেছিল। খড়-কোটার বঁটি কালচে রক্তে সড়সড়ে হয়ে গিয়েছিল। যশোদা নাকি তাতে ভ্রূক্ষেপও করেনি, দিব্যি ঘাটলায় গিয়ে সাবানে হাত ধুয়ে গোয়ালে ধোঁয়া দিয়ে এসেছে।

আজই বিকেল-বিকেল শিবপুরের টি ডি মুখার্জিকে আঙুলগুলো একবার দেখাতে হবে। পেঁপে খেয়ে জল খাওয়া গেল না। সিগারেট ধরিয়ে কুবের বেরিয়ে পড়ল। নয়ান বারান্দা থেকেই বলল, 'এদিককার খবর আপনাকে ফোনে অফিসে জানাব।'

'দশটার পর ফোন কোরো।'

ট্রেনে জানলার ধারে বসল কুবের। আজও একটা সিএল গেল। এ বছর সব সুদ্ধ ন-দিন ক্যাজুয়াল লিভ নিতে হয়েছে তার। আজকাল বুলু স্পষ্টই বলে, 'তোমার কদমপুরের পাট কবে চুকবে বলতে পারো?'

কুবের তাড়াতাড়িই মেটাতে চায়। কিন্তু মিটছে না। তার ওপর সাত আটজনের জমি কিনিয়ে ভাগ করে দেওয়ার ভার রয়েছে। কেনাই শেষ হল না এতদিনে। সরু পিয়াসলে আজ স্পেশাল চেক। কালো কোট, লাল টাই, চেকারদের হাতে ফাইন করার বই। পকেট থেকে মান্থলি বের করে সইয়ের জায়গায় সই করল কুবের। বয়েস লিখল বত্রিশ। তার এখনও বত্রিশ হয়নি ঠিক—মাস চারেক বাকি। ভাঙা হিসেব লিখতে কার ভালো লাগে।

গোড়ায় কুবের একাই এসেছিল এদিকে। তখন তার সঙ্গে থাকত বুলু। দুজনের কী শখ! একবার নস্করদের বড়ো ছেলে জমি দেখাবে বলে দুজনকে মে মাসের ভর-দুপুরে খড়খড়ে শালি জমির ওপর দিয়ে আধ ক্রোশ হাঁটিয়ে নিয়ে গিয়েছিল। আস্তে আস্তে তার সঙ্গে এখন সাত আটজন একই জায়গায় একলপ্তে জমি কিনেছে। দর শুনে চোখ একেবারে চকচক করে। লোভ। কিন্তু পষ্টাপষ্টি ভাবতে গিয়ে কুবেরের কষ্ট হয়। লোভ কেন? সবাই বেশ খানিকটা জায়গা নিয়ে বাস করতে চায়।

রুদ্রনগরে এক মুড়িওয়ালা ওঠে রোজ। লংকা নেই, আদা নেই, তেল নেই—তবু মুড়িওয়ালা। কয়েকটি টিনের কৌটো, নুন আর কালচে খানিকটা আমের আচার। তাই সে দশ পয়সা করে বেচে। লোকটাকে পেলে হত।

চলতি ট্রেনেই হাতল ধরে একটা লোক উঠে এল, ‘কী রে সকালে যাওয়া হয়েছিল?’ গৌরবে আহ্বান। কুবের বুঝল অভিমানের কথা, ‘মিড ট্রেনে। আপনি কোত্থেকে?’

‘কদমপুর থেকেই। আমি আবার কোথায় যাব?’

কুবের তাকিয়ে আছে দেখে বলল, ‘ছিলাম পিছন দিকে—মাছের গন্ধে কে বসতে পারে। পালটে যেটায় উঠলাম, সেটায় এক বৈরিগি পয়সার জন্যে হরদম গাইছে—

‘পড়ুয়া আমার জগাই মাধাই

তাহে গৌর আমার হেডমাস্টার—’

মাঝখানে থামিয়ে দিল কুবের, ‘আপনিও তো বৈরিগির আলখাল্লা ধরেছেন। আপনাকে দেখে কেউ যদি কামরা পালটায়?’

থতমত খেয়ে গেল ব্রজদা, তারপর ঝপাং করে বলে দিল, ‘তুই যেমন কদমপুরে আমার বাড়ির রাস্তা মাড়াসনে—কেমন তো?’

‘না না, আমি যাই না হাতে সময় থাকে না বলে। নয়ানদের বাড়ি কথাবার্তা বলে প্রায়ই দৌড়ে ট্রেন ধরতে হয়—’

‘বুঝি রে বুঝি সব—’, তারপর নিজেই মাথা দুলিয়ে হাসল, সঙ্গে গুন গুন করে গাইল—শেষে আসন করে বসে ঝোলা থেকে প্রুফ নিয়ে ডট পেন বের করে ব্রজদা তাতে ডুবে গেল।

কুবের অনেক কিছু বলতে পারত। কোনোটাই জোরালো শোনাবে না বলে চুপ করে গেল। ব্রজ প্রুফ থেকে মাথা না তুলে একবার শুধু বলল, ‘কতদূর এগোলি?’

‘বলুন কতখানি পেছোলাম!’

একবার মুখ তুলল ব্রজদা, ‘কেন? বেশ তো এগিয়ে গেছিস। একটু-আধটু যা খবর পাই—’

‘রাগ কোরো না ব্রজদা। তুমি তো জায়গাজমি ছেড়ে এসেছ তাই এর মর্ম বোঝো না। এক ছটাক কিনতে গেলে ন-মাসের ধাক্কা—কোবো জমি পরিষ্কার পাবে না, শতেক শরিকানি—তারপর মর্টগেজ এখন সাফ কোবালা। নতুন কল হয়েছে এগ্রিমেন্ট। কোথায় যে পেছনের তারিখ দিয়ে চুক্তি করে রাখবে তার ঠিক নেই। কিনেও শান্তি নেই—শেষে মামলার শত হাত জলে—’

‘থামবি—’, দাবড়ির মতো চেঁচাল ব্রজদা, ‘ঠাকুরঝিতে নেমে যাচ্ছি। তোর সঙ্গে মেশা যায় না—কী হয়ে গেছিস ক-মাসে। কী সব বললি তড়বড় করে এতক্ষণ! নে সর—এক নম্বরে ইন করল আজ—’

গাড়ি থামতেই ব্রজদা লাফিয়ে নামল, ‘তোর বউদিকে না তুই অম্বলের ওষুধ দিয়ে আসবি বলেছিলি?’

‘ও! কালই দিয়ে আসব। আজকাল কেমন আছেন বউদি—হাঁটা চলা?’

‘সারা দিন হাঁটছে। আমি তো বাড়ি পালটেছি—সেখানে না হেঁটে উপায় নেই। বড়ো বড়ো ঘর—বিরাট ইঁদারা, এক মাইল নীচে জল—পাতাল থেকে আসে, সত্যি বলছি।’

‘মিথ্যেও বলো তাহলে?’

‘কখনো?’

‘মাঝে মাঝে। মানে কখনো কখনো—’

‘কোথায়? কবে দেখালি? এই দেখ চুপ করে আছে বাবু। বল না’, শেষে আপনাআপনিই বলল, ‘আমি তো ফকির—’

‘ফকির না কচু!’ রাগাবার জন্যই কুবের বলল। কিন্তু কোবো ফল হল না।

‘তাড়াতাড়ি বলে ফেল এইবেলা। ডাউন দিয়েছে—’

‘তুমি বলো, আর সভাসমিতি করো না?’

‘কোথায় দেখলে?’

‘দেখিনি, শুনেছি। কদমপুর বাজারের মাঠে আজকাল সন্ধের দিকে সভা করে তুমি গান গাও, গীতা বিক্কিরি করো।—সত্যি কী না?’

‘সে তো সার্ভিস—’

‘বউদিকেও নিয়ে যাও বলে—’

‘যায়। যাবে না কেন? সারা দিন বাইরে থাকি—আমার সঙ্গে যেতে পেলে খুব ভালোবাসে—একদিন তুই এসে কলকাতায় নিয়ে যাবি?’

‘খুব। কোথায় যাবেন?’ ট্রেন ছেড়ে দিয়েছে। ব্রজদা চেঁচিয়ে বলল, ‘মাথা ভেতরে নে। ইলেকট্রিকের পোস্টে লেগে যাবে—’

মাথা ভেতরে এনে জায়গায় বসে ব্রজ ফকিরকে আর দেখা গেল না। পায়ে নাগরা, ওপরে রাঙানো আলখাল্লা, পরনে লুঙির মতো রাঙানো ধুতি, মাথায় বাবরি, কাঁধে ঝোলা—সামনে আড়াল না পড়লে এসব দেখা যেত।

ঝোলায় কী আছে কুবের জানে। গুচ্ছের প্রুফ। রুদ্রনগরে কে ভাঙা প্রেসে শুধু লন্ড্রির বিলই ছেপে বেরোয়। মান্ধাতা আমলের তিন কেস টাইপ আছে। ব্রজদা নিজেই বলেছিল। সেখানে ট্রেডল মেশিনে আজ পাঁচ বছর ধরে ছাপা হচ্ছে ব্রজ ফকিরের বাবার আত্মজীবনী। লেখক—ব্রজ ফকির। বিষয় বাবা। ভদ্রলোক বছর ছিল। গোড়ার দিককার ছাপা হলদে হয়ে গেছে। আজও পুরো লেখা বই হয়ে বেরুলো না। ব্রজদা শেষ করে উঠতে পারেনি।

খুব বেশি দিন আগের কথা নয়—দেড় দু-বছর হবে। নারায়ণ পুজো করতে এসে একদিন

বিকেলবেলা ঠাকুরমশাই বলল, 'ভাটিখানার ওদিকে সিরিটি ছাড়িয়ে একখানা একতলা বাড়ি আছে পাঁচ কাঠা জমির ওপর। নেবেন?'

কোত্থেকে নেবে কুবের। অল্পদিন হল স্যান্ডেল ছেড়ে গ্লেজকিটের পাম্প-সু ধরেছে। চামড়ার বাইরে পায়ের মাংস আরামি লোকের কায়দায় ফুলে থাকে খানিক। কোঁচা পকেটেও রাখে, কোমরেও গোঁজে। খুব বেশি একখানা হারকিউলিস নয়তো হাতটানা রিকশা কিনতে পারে।

ঠাকুরমশাই কুবেরের ভারী গাল দেখে হয়তো মালদার পার্টি ঠাওরেছে তাকে, 'জলের দরে কুবেরবাবু—জলের দর। আমার সম্বন্ধীর বাড়ি বাদিপোতা—সেখান থেকে খানিকটা ভেতরে—'

বুলু দাঁড়িয়েছিল সামনে। বুলুর বড়ো বাড়ির শখ। শখ মেটানোর মতো টাকা কুবেরের নেই। তবু কিনব বলে বাড়ি দেখতে যাচ্ছি—এই নামে নামে দুজনে আধখানা কলকাতা ঘুরে আসা যাবে। ঢালাই ব্রিজ পেরোবার সময় বুলু হাত তুলে গঙ্গা প্রণামও সারবে। ফাইন—

তিন চারদিনের ভেতর এক বেস্পতিবার ভোরের ডিউটি সেরে বেলাবেলি খেয়ে নিল কুবের। তারপর বুলু বিয়ের জরদ রঙের বেনারসিখানা পরল, কুবের পাম্প সু-র সঙ্গে আটচল্লিশ বহরের ধুতি।

আদিগঙ্গার ওপর কংক্রিটের ঢালাই ব্রিজ পার হয়ে বাঁ হাতে ভাটিখানার পথ। তারপর সিরিটি। খানিক দূর রিকশাসাইকেল এগোনোর পর কুবেররা এমন জায়গায় এসে হাজির হল, যেখানে আর কলকাতা নেই। শুধু খোয়ার রাস্তা। মাঝে মাঝে হোগলা বন—খানিকটা ডাঙা জমি, একটা রঙের কারখানা—তারপর চার পাঁচখানা ইটের স্ট্রাকচার। বাড়ি বলা মুশকিল। একখানা শুধু ইটের পর ইট সাজিয়েই বানানো—ভেতরে কোবো মশলা নেই—ঝড় উঠলে পাছে উড়ে যায়, তাই ওপরের করোগেটে আধলা ইট চাপিয়ে ছাদ বানানো হয়েছে। সেই বাড়িখানাই ঠাকুরমশাই দেখাল। পাঁচ কাঠার ভেতর অনেকটা জায়গা মাটি কেটে উঁচু করার জন্যেই লাগানো হয়েছে। আসলে স্ট্রাকচার কোনোক্রমে আধকাঠার কিছু বেশি।

কেনার টাকা নেই, থাকলেও এ জিনিস কুবের কিনত না। বুলুও দেখে শুনে মুষড়ে পড়ল। ঠাকুরমশাই অনেকক্ষণ বাড়িখানার প্রশংসা করছিল। কুবের দাবড়ি দিতে থামল। মাঝখান থেকে গাড়িভাড়ার তিনটে টাকা জলে গেল।

ফেরার পথে ঠাকুরমশাই বলল, 'আর একটু যদি পেছনে যান তা হলে ছ-শো টাকায় বিঘে পাবেন। হাজরা মোড়ের এক বড়ো ডাক্তার আড়াই শো বিঘে কিনে লেক কাটাচ্ছেন—পরে প্লট করে বাজারে ছাড়বেন।'

সেদিন আর বুলুকে কিছু বলল না কুবের। ছুটির দিন দেখে একাই গেল। ছ-শো টাকা বিঘে কোথায়—শালি জমির বিঘেই দশ বারো হাজার। এক জায়গায় উঁচুমতো কাঠা তিনেক জমি পাওয়া গেল—মোট দাম চব্বিশশো, পাশে দু-চারখানা বাড়িও হয়েছে।

বুলুকে নিয়ে একদিন দেখিয়ে আনল। যার জমি সে উত্তরপাড়ায় থাকে। লোকাল দালালই সব কথা

চালাল। বুলুর মন্দ লাগেনি জায়গাটা। কিন্তু কেনার মতো টাকা কোথায় পাওয়া যায়। বুলু মোটামুটি একটা আন্দাজও করে ফেলেছে, কী ধাঁচের বাড়ি হবে। কুবের এসব ভাবনায় বাধা দেয়নি। আলোচনাতেই কত সুখ—হলে না জানি আরও কত!

শেষ পর্যন্ত জায়গাটা কেনা হল না। কারণ, টাকা পাওয়া গেল না। বুলুকে সে কথা বলা গেল না, মাকে না, বাবাকেও না। মুখে বলল, 'আটশো টাকা করে এই জমির কাঠা, কে কিনবে?'

বুলু একদিন হাসতে হাসতে বলল, 'জমি না হোক—দেখতে গিয়েও সব মিলিয়ে আঠারো উনিশ টাকা বেরিয়ে গেল। এই টাকায় তোমার একটা রেডিমেড পাঞ্জাবি, হ্যান্ডলুমের ধুতি হয়ে যেত—'

ক্লিন হিসেব। কথা বলার সময় ঘরে কেউ ছিল না। এর পর বুলু কী বলত কুবের জানে। 'নগেনবাবুর ছেলের বউয়ের মতো একটা স্টিলের ট্রাংক আনবে?—সাতাশ ইঞ্চি সাইজেরগুলো আঠারো উনিশ টাকা—'

এসব কথা অনেকবার বলেছে বুলু। এবারও বলত। চারদিক তাকিয়ে ঠিক ঠোঁটের ওপর বড়ো একটা চুমু বসিয়ে দিল কুবের। তা সরিয়ে দিয়ে ঠিক যখন ট্রাংকের কথাটা পাড়তে গেল বুলু—তখন কুবের বেশ জাপটে বুলুর কাঁধ কামড়ে ধরল। ভালোবাসার লাইনে কতরকম যে আছে। যা ইচ্ছে একটা করে দিলেই তা লেগে যায়। অন্তত কুবের তাই মনে করে। মাথার তেল, কয়েকটা চুল জিভে—তবু ছাড়ল না কুবের।

তখন বুলু, 'ছাড়বে?' বলে এক ধাক্কায় কুবেরকে সরিয়ে দিল।

বিকেল ছিল। ট্রাম চেঁচাচ্ছে, প্যাসেঞ্জার চেঁচাচ্ছে, ঠেলার আগা রাস্তার জন্যে বাসের পেছন-সামনে খোঁচাচ্ছে—বিকেল বেয়ে ঝুলন্ত ধোঁয়া সমস্ত বাতাসটুকু শুষে নেবার তাল খুঁজছে। ঠিক এখন যদি এক বিঘের ওপর তাদের একটা বাড়ি থাকত (বাবার জন্যে ছোটো হামানদিস্তেয় শব্দ করে পান ছেঁচছে ঝি),—গ্রিল দেওয়া জানালা (পশ্চিমের জানালাটার চোখ কানা—এক চৌকোয় কোবো কাচ নেই), চাঁদোয়া টানাবার জন্যে দোতলায় ছাদ (এ বাড়ির ছাদে হনুমানরা এসে নিয়মিত এরিয়াল ছেঁড়ে), হলঘরের মতো টানা বারান্দা (কুবের বারান্দায় দাঁড়ালেই ট্রামবাসের সঙ্গে এ বাড়ি কেঁপে ওঠে—খুব আনসেফ লাগে তার)—শীতে, বর্ষায় চিক নামিয়ে ঘর বানিয়ে ফেলা যায়—

সবচেয়ে ভালো হত, বাড়ির সামনে যদি মাঝারি একটা নদী থাকত। খ্যাপা নদীতে লাভ নেই। বুলুর তাহলে শান্তি থাকত না। সেদিন রাতে শুয়ে শুয়ে কুবের বলেছিল, 'একুশ বছর বয়স অবধি আমার বড়ো হারিয়ে যাওয়ার ভয় ছিল—একা কখনো বেরোতাম না—'

বুলুকে কামড়ানোর পরদিন ভোরে ডিউটি ছিল কুবেরের। হাওড়ার কয়েক স্টেশন পরেই ন্যাশনাল মেটালস্। কারখানা গেট থেকে মেল্টিং শপ সবচেয়ে দূরে—চিমনি এক-স্টেশন আগে থেকে দেখা যায়। একতলায় মাটির নীচে ব্রিক চেম্বার—থরে থরে নানান ইট জাফরি করে সাজানো। কোনোখানার দাম দু-টাকা, কোনোখানা পাঁচ টাকা। এসব কোতরং-এর এক নম্বর ইট নয়—হাজার দরেও বিকোয়

না—দূর জাপান থেকেও আনতে হয়। ইস্পাত বানানোর চুলোয় অনেক তাপ চাই। ওপেন হার্থ ফার্নেসে স্ক্রাপ, পিগ আয়রন, লাইম-স্টোন, ডলোমাইট, ম্যাংগানিজ সব ফুটিয়ে জল করে ফেলতে হয়। তাই কয়লা জ্বালিয়ে—সঙ্গে হাওয়া মিশিয়ে মাটির নীচের এসব ইট-কুঠুরির ভেতর দিয়ে গরমটা দ্বিগুণ চৌগুণ করে দোতলায় ফার্নেস বেডে ছাড়া হয়। কুবের এখানে অ্যাসিস্ট্যান্ট মেল্টার।

সেদিন দোতলায় ফার্নেস বেডে দাঁড়িয়ে কুবেরকে অনেকখানি ঘোল খেতে হল। গোড়া থেকেই অন্যমনস্ক ছিল। কাল রাতে গোড়ার দিকে বুলুন মাথাধরা ছিল—শেষ রাতে তাকে খালি অ্যাভয়েড করেছে। শুধু, 'উহু, না না, বললাম তো—'

এমন বুলুকে কুবের কোনোদিন চিনত না।

একবার ট্রেনে উঠে গেলে কারখানা পৌঁছোনো কঠিন না। অবিশ্যি মুশকিল হয় গেটে এসে। ইলেকট্রিক ফার্নেস, রোলিং মিল, ফাউন্ড্রি, ড্রয়িং অফিস, রিফ্র্যাক্টরি শপ, সান্ডিং ইয়ার্ড—মায় হিন্দিতে লাল বড়ো বড়ো হরফে নাম লেখা মারবেল পাথরের সাবানমার্কা মন্দিরটা অবদি নরম পাড়ায়। রিফ্র্যাক্টরি শপের সামনে তো একটু বাগানও আছে। রোলিং মিলের ফোরম্যান যখন ট্রেনে ফেরে কুবের তার হাতে পেংগুইনের বই দেখেছে। কিন্তু গেটে এসেও কুবেরের ওপেন হার্থ ফার্নেসে যেতে একদম ইচ্ছে করে না।

কারখানা বাড়তে বাড়তে এ-পাড়ায় এসে শেষ হয়েছে। মেল্টিং শপের পরেই হোগলা বন, জলা। সবচেয়ে বিশ্রী, একটা বুড়ো গাছে সারাদিন গুচ্ছের ছাতা ঝুলছে। কুবের বাজি রেখে বলতে পারে—সব ক-টা শকুন বুড়ো। ওদিকে তাকালেই দিনটা গণ্ডগোল।

রাতের শিফটের লোক ভোরের হাতে ফার্নেস যখন বুঝিয়ে দিয়ে গেল—তখন ভেতরে তিরিশ টন ইস্পাত ফুটছে। মুশকিল ফার্নেসের ছাদ নিয়ে। গরমটা বেশি হয়ে যাওয়ায় ছাদের সিলিকা ইট খানিকটা গলে নীচের ফুটন্ত ইস্পাতে মিশে যেতে লাগল। চার ব্লেডের ঢাউস ফ্যানের হাওয়ায় পোড়া চুন চারদিকে উড়ছে। দোতলায় ফার্নেসের চাতালে দাঁড়িয়ে বারো বার স্যাম্পেল নিয়েছে কুবের। মাত্র দু-ঘন্টার মধ্যে। ফার্নেসের দরজা ওপরে তুলে ভেতরে পনেরো হাত লম্বা লোহার চামচ ডুবিয়ে বাটি বাটি ফুটন্ত ইস্পাত এনে সুপার কংক্রিটের মেঝেতে ঢেলে দেখেছে। চোখ-বাঁচানোর চশমার কাচ নীল। ডাঁটি ঘামের ভেতর গরম ভাপ তুলছে। তিরিশ টন মাল নানান কসরত করে ভীমের বিয়ের সাইজের ল্যাডেলে যখন নামিয়ে দিল তখন দুটো বেজে পাঁচ। ইভিনিং শিফটের লোকও হাজির। পৌনে দুটোর ট্রেন এতক্ষণে হাওড়ায়—পরের গাড়ি সেই তিনটে দশ।

কোথায় যায় তখন। ওয়েলফেয়ার অফিসার ধনরাজ কিছুকাল ভগবানকে খুব ভালোবাসছে। বিশ্বকর্মা পুজোয় যেখানটায় রামযাত্রা হয়—তারই উত্তরে ম্যারাপ বেঁধে ধর্মসভা বসিয়েছে। গত হপ্তায় ছিল কংসপালা—এ দু-দিন বিচারসভা চলছে। সিম্পল তর্ক—রাম বড়ো না নারায়ণ বড়ো, কৃষ্ণ না রাধা। শোনা যাচ্ছে, বেয়াড়াদের বশে আবার জন্যেই এত কাণ্ড। ধনরাজের ভাষায় আনরুলি এলিমেন্টদের

ওপর সোবারিং এফেক্ট আর কী—

অনেক মাথার ওপর দিয়ে উঁকি মেরে অবাক। কুবের ঠিক চিনতে পেরেছে, গেরুয়াধারী যে নেচে নেচে গাইছে, ছড়া কাটছে ও তো ব্রজ দত্ত। কত রকমই দেখাল ব্রজদা। ধনরাজের পুরো ব্যাপারটাই যে জুয়োচুরি তাতে আর কোবো সন্দেহ থাকল না কুবেরের। না হলে ব্রজদা নাচে যেখানে—

কিছুকালই কুবের পথেঘাটে আধা-সাধুর পোশাকে ব্রজদাকে দেখেছে। আর পাঁচটার মতো সাধুগিরিতেও ব্রজদার কিছুদিন কাটবে—কিন্তু এ যে প্রায় মিশনে আসার মতো ঘড়ি ধরে নেচে যাচ্ছে।

ট্রেন ছাড়ার খানিক আগে ব্রজদাই লাফিয়ে ভেতরে ঢুকল। ছোটো ঢোল, ঘুঙুর চামর, একখানা পকেট আয়নার ফ্রেমে রাধাকৃষ্ণ পট বসানো—সবই ব্রজদার হাতে, ডানে বাঁয়ে দু-দুটি শাগরেদ। কুচো ছেলে দুটো বেঞ্চে বসেই পা তুলে ঘুঙুর খুলতে বসল।

'এসে গেছিস?'

কোথায় কুবের জানতে চাইবে আগে, তা-না ব্রজ দত্তই পয়লা কথা পাড়ল। কুবের থতমত খেয়েছিল, সামলে বলল, 'আমায় দেখতে পেয়েছ অতদূর থেকে? তুমি তো স্টেজে লাফাচ্ছিলে?'

'পষ্ট দেখলাম তুই। এখানে কাজ করিস সে তো তুই-ই একদিন বলেছিলি—'

'তোমার না চশমা ছিল চোখে?'

'কবে?'

'যখন ম্যাজিশিয়ান ছিলে—'

'সে তো ফলস!'

শাগরেদ দুটি কুবেরের দিকে জোড় মিলিয়ে হাসল। ম্যাজিকের আমলে এদের দেখেনি কুবের। কত বদল হচ্ছে। সেই সিনেমার পিরিয়ডে কুবের নিজেই ছিল ব্রজ দত্তর শাগরেদ। অনেক আগে।

'আজকাল থাকা হয় কোথায়?'

'কাউকে বলবি না? কদমপুর—'

কুবের নামও শোনেনি কোনোদিন। মুখে মুখে চিনিয়ে দিল ব্রজদা। শেষে বলল, 'ফাইন জায়গা। ঘর ভাড়া আট টাকা—সব সেগারেট—মায় একটা পুকুর অবদি সেগারেট—তোর বউদি আর আমি একসঙ্গে সাঁতার কাটি, নো ডিস্টারব্যান্স!'

'সরস্বতী বউদি সাঁতার কাটছে আজকাল?'

'তিনি তো সিঁথিতে থাকেন।'

'তবে?'

'তোর আভা বউদি কদমপুরে থাকেন—'

প্রথমজনার নাম তো আভা ছিল না। তিনি তো বেহালায় আছেন, তাই-ই কুবের জানে। কুবের তাকিয়ে আছে দেখে ব্রজ দত্ত বলল, 'একটা বিয়ে করেছি নতুন—গত চোতে আমাদের মালাবদল হল—'

কলকাতার কাছাকাছি আট টাকায় এমন সেগারেট কেলির পুকুর পাওয়া যায়—জায়গাটা নিশ্চয় গোপিনীদের বস্ত্রহরণ মার্কা ক্যালেন্ডার থেকে ব্লেড দিয়ে কেটে এনে বাড়িওয়ালা ব্রজদার জন্যে বসিয়ে দেয়নি। সরস্বতী বউদিকে কুবের চেনে। তিনি সাঁতার কাটার লোক নন। বেহালার বউদির কথা বললে না-হয় বিশ্বাস হত। নাম মনে আসছে না। অনেক দিন আগে দেখেছে। সে ব্রজদার জন্যে সব পারে। বিধবা হওয়ার পর পাঁচ ছেলেমেয়ে নিয়ে ব্রজ দত্তর সঙ্গে বিয়ের আগের দিন পিচ রাস্তার ওপর দোতলা বাড়ি ব্রজদাকেই লিখে দিয়েছে।

'তোর নতুন বউদি বাউল গাইয়ে পিরেলি দাশের বড়ো মেয়ে—'

প্রথমজনার কথা হিসেবেই আসে না আজকাল। কুবের বলল, 'সরস্বতী বউদি?'

'আছে।'

'একই বাড়িতে?'

'পাগল নাকি? দু-দুটো পার্সোন্যালিটি একই জায়গায় থাকতে পারে? তিনি ছেলেদের নিয়ে সিঁথিতে থাকেন।'

'তোমারই ছেলে তো?'

'হ্যাঁ, দুই ছেলে—বড়োটা খুব হেলদি।'

'খরচপাতি?'

'সেই চালাচ্ছে। এলআইসি-র কাজ তো ছাড়েনি—শুনেছি আমাকে ছাড়ার পর আরও প্রমোশন হয়েছে।'

হাওড়ায় ভিড়ের ভেতর মিশে যাওয়ার আগে অনেক কথা বলল ব্রজদা। আট টাকায় দু-খানা ঘর—তবে টালির ছাদ। স্টেশন কাছেই—শেয়ালদা আধঘন্টা চল্লিশ মিনিট লাগে। হাতে টাকা থাকলে দু-পাঁচ বিঘে ধরে রাখত ব্রজদা। ইচ্ছে ছিল একটা আশ্রম বানায়।

জমি দেখার গাড়ি ভাড়া উনিশ টাকা গচ্চা যাওয়ার কথাটা চাপা দিতে সদ্য সদ্য আগের দিন বিকেলে কুবের বুলুন মুখে চুমু বসাতে গিয়েছিল। তেমন সুবিধে হয়নি। ব্রজদার মুখে জমির দর শুনে তখনই কদমপুর যাওয়ার ইচ্ছে হচ্ছিল কুবেরের। ব্রজদা বলল, 'কাল ভোরে ছ-টা পঁয়তাল্লিশের ট্রেনে আসিস—'

পরদিন ভোরে বুলুকে নিয়ে যখন কদমপুরে নামল তখন প্ল্যাটফর্মে কেবল ব্যাপারীদের ভিড়। ডেলি

প্যাসেঞ্জারদের আসল ভিড় তখনও শুরু হয়নি। কালো কালো কাঠের পিপে, কাছে যেতে তাড়ির গন্ধ। পরে শুবেছে, কলকাতায় বড়ো বড়ো ভাটিখানার এখানে গাছ জমা নেওয়া আছে। তাদেরই তাড়ি রোজ সকালে পিপে বোঝাই হয়ে কলকাতায় যায়। ভেন্ডারের কামরাটা ডিমেভর্তি।

সারাটা ট্রেন বুলুকে ধাতস্থ করার চেষ্টা করেছে কুবের। একটা লোক, তার তিনটে বিয়ে। তিনজনই জীবিত। প্রথমজনকে পাঁচ ছেলেমেয়ে সুদ্ধ বিধবা অবস্থায় বিয়ে করে একখানা বাড়ি পাওয়ার পর সেখানে একটি ছেলে হয়। তখন কুবের ব্রজ দত্তর মালটিকলার ফিল্মভেঞ্চারে অ্যাসিস্ট্যান্ট। বাচ্চাটির বছর দুই বয়স ছিল তখন। সেবার কুবেরকে সঙ্গে নিয়ে ব্রজদা তার জন্যে দরদাম করে ফুটপাথ থেকে একজোড়া মোজা কিনেছিল।

তারও বেশ কয়েক বছর পরে চৌরঙ্গিতে দশাসই এক মহিলার সঙ্গে কুবেরের হ্যান্ডসেক করিয়ে দিয়েছিল ব্রজ দত্ত। তিনি সরস্বতী বউদি। আর আজ যাকে দেখবে তিনি থার্ড। তাঁকে কুবের জানেও না। এরপরেও কুবের বুলুকে বোঝায় কী করে ব্রজদা লোকটা খারাপ নয়। হয়তো ভালো নয়, কিন্তু খারাপ বলে কী করে? কুবের ব্রজ দত্তকে যতটুকু জানে তার সবটাই ধাঁধানো চমকে ভর্তি। জানে আর কতটুকু!

ডিরেকসন মতো প্ল্যাটফর্ম শেষ করে কাঁচা পথ ধরে শ-দুই গজ যাওয়ার পর ব্রজদার সবকিছু—সেগারেট সেই পুকুর মায় টালির ঘর পাওয়া গেল। ভাড়া-খাটানোর বারোয়ারি বাড়ি—তবে, দিব্যি খোলামেলা বলে বেশ লাগে।

ব্রজদা উরু অবদি লুঙ্গি তুলে বারান্দায় আসন করে সন্ধে করছিল। চানের পর মাংস-মাখানো পিঠে-পেটে জলের ফোঁটা লেগে আছে। কুবেরদের ভেতরে নিয়ে বসাল ব্রজদার তিন নম্বর বউ। বেশ লম্বা, চোখে একটা ঢুলুনি, গলায় কালো পুঁথির ডুমো মালা। বুলুর একটু রাগ হল। বউটি তাদেরই বয়সী। এতটা কেয়ারলেস হওয়ার মানে হয়। কালো ব্লাউজ পরেছে—অথচ পাউডার মাখার পর কী হাল হল দেখার সময় পায়নি। পাউডারের সাদা গুঁড়ো কাঁধে বুকে পড়ে আছে।

বুলুর ওপর ব্রজদার বউ তিন চার ইঞ্চি লম্বা। বুলুর কাঁধ ধরে ঘরে এনে বসাল। ঘরে ঢোকার মুখে কুবের দেখল, নতুন বউদির পায়ে খড়ম।

প্রথম আলাপে যেমন হয় তা সবই হল। বুলু কিন্তু অনেকক্ষণ কাঁটা হয়ে বসে থাকল। কুবেরের একটুও খারাপ লাগল না। বরং পষ্ট বলতে পারে, সেদিন ব্রজদা আর তার বউয়ের আন্তরিকতায় একটুও খাদ ছিল না।

'জমি দেখাবার জন্যে ডেকেছ—দেখালে না?'

বউদি বলাই ভালো। কুবেরের চেয়ে বয়সে ছোটোই হবে। গলায় বেশ ঝাঁঝ।

'উঠছি।' কুবেরকে বলল, 'কিন্তু তুই কি এখান থেকে কারখানা যাতায়াত করতে পারবি? তারপর বউমা আমাদের কলকাতার বাইরে—'

বুলু তেড়েফুঁড়ে উঠল, 'আমি আবার কবে কলকাতার মেয়ে? অবিশ্যি রেশন এনেছি লাইন দিয়ে মির্জাপুর স্ট্রিটে থাকতে—'

বউদি বলল, 'দেখাবে তো নিয়ে চলো—আমিও যাচ্ছি—'

'উহুঁ তুমি বোসো না। হাঁটলেই আবার মাথা ঘুরবে। এতটা পথ—হয়তো, শেষে পড়ে-টড়ে যাবে—'

'আমার কথা ভাবতে হবে না—তোমরা এগোও তো—আমি আসছি।'

জমি দেখে ফেরার পথে রেলের ছড়ানো ঝিলের ধারে আভা বউদির সঙ্গে দেখা হল। কদমপুরের মতো জায়গায় লেস লাগোনো, শাড়ি, অথচ পায়ে খড়ম, কপালে লম্বা করে আবিরের টিপ—ঝিলের স্থির জল ব্যাকগ্রাউন্ডে। বেশ দেখাচ্ছিল।

'দেখানো হয়ে গেল?' বলে হেসে ফেলল বউদি। যেন কী মিস করল। নিজেই বলল, 'জায়গাটা আপনাদের ভালো লাগবে। এসব জায়গা কী সস্তা ছিল। টাকা থাকলে ঠিক কিনে ফেলতাম।'

'পাগল নাকি? দুজন মানুষ আমরা—বাড়িঘর করে লাভ কী?'

'তুমি বুঝবে না।'

আগের দিন ব্রজদা যখন বলেছিল দু-চার বিঘে ধরে রাখতাম, তখনই সন্দেহ হয়েছিল। এমন কথা তো ব্রজদার মুখে বসে না। সেদিন কুবের বুঝল, এ-বচন বউদির।

দর শুনে সত্যি ঘাবড়ে যেতে হয়। একদিন নিশ্চয় জমি আরও অনেক সস্তা ছিল। তবে এখন যখন কলকাতার আশেপাশে জমির দর চড়া তখন কদমপুরে বোধহয় বাইরের হাওয়া ঢোকেনি। সবাই নিটোল আপেলের কায়দায় নির্দোষ এক তল্লাট খুঁজে পেতে চায় বোধহয়। কোথাও একেবারে নখের দাগও পড়েনি এমন জায়গা।

কয়েক বছর আগেও কদমপুর হয়তো তা ছিল—চারদিক দেখে তখন ওইটুকু বুঝেছে কুবের।

সীতাকুণ্ডু-বেগমপুর বাস রুটের ওপর বাঁ হাতে বিঘে দুই জমি দেখিয়েছে ব্রজদা।

জমির মালিক চটিরাম, বুড়ো মানুষ, জামাইয়ের বাড়ি গেছে মেটিয়ারিতে—ফিরতে সেই সন্ধে। ঠিক হল ব্রজদাই সব জেনে রাখবে।

ফেরার পথে আবার ঘরে গিয়ে বসল। বসতে গিয়ে বুলু টেবিলের ওপরে বসানো একখানা ফ্রেমে বাঁধানো ছবি তুলে নিল হাতে, 'কার?'

কুবের দেখেই বুঝতে পেরেছে, ন্যাংটো দুই ছেলেকে তেল মাখাচ্ছে সরস্বতী বউদি। ফটোর আধখানা জুড়ে একখানা হাত। ভাগ্যিস ক্যামেরায় তেলের ছবি ওঠে না।

'মেজদির—', কথা বলতে বলতে নতুন বউদি কাজুবাদামের জোড় খুলছিল। অনেকদিন ঘরে থাকায় দুটো-একটার ভেতর সাদা সাদা পোকা হয়েছে। বাদাম বেছে এনামেলের প্লেটে রাখল। পাড়ার এক

রাখাল ছেলে ছুটতে ছুটতে এসে মিষ্টির ভাঁড় বারান্দায় নামিয়ে দিয়ে তেমনি ছুটে বেরিয়ে গেল, 'ট্রেন আসছে—গরুগুলান মাঠে নামিয়ে এসে পয়সা ফেরত
দেব'খন—,' ছেলেটার ডান হাতে একটা পাচন।

'আপনাদের দেখা হয় না?'

'আগে তো এক বাড়িতেই থাকতুম। ছেলেদুটো আমার হাতে জমা দিয়ে সরস্বতীদি অফিস যেত—'

এখানে কুবের ভেবে নিতে পারল—কী কী হয়ে থাকতে পারে। প্রধান চরিত্র ব্রজ দত্ত। গান জানে, ম্যাজিক পারে, ইংরিজি বলে ফটাফট—স্মার্ট, তাকে যদি পাশের ভাড়াটের আইবুড়ো মেয়ের ভালো লেগে যায়, তাতে অবাক হওয়ার কিছু নেই।

'আমাকে পেলে ছেলেদুটো হামলে পড়ে—আমারও ছেড়ে আসতে কষ্ট হয়—সৎ মা হওয়ার আগে থেকেই দুজনার মায়ের কাজ করেছি কত—' এইখানে এসে ভাঙা বাদাম হাতে জানলা দিয়ে ডিসট্যান্ট সিগন্যালের দিকে তাকিয়ে থাকত ব্রজ দত্তর তিন নম্বর বউ।

'ব্রজদা যায় না?'

'আমি যাই—মানে আগে যেতাম, সরস্বতীদি অফিস যাওয়ার পর'—তারপর নতুন বউদি গুনগুন করে বলল, 'মেজদির সঙ্গে কেউ বেশিক্ষণ থাকতে পারে না, যা শক্ত—ভীষণ কঠিন, কী করে যে আপনাদের দাদা পাঁচটি বছর একসঙ্গে ছিলেন—'

ব্রজদা মাথা দুলিয়ে হেসে ক্রেডিট নিল, 'আরও কতজনের সঙ্গে থাকব দেখো। কষ্ট হলেও আমি ঠিক থেকে যাব। হাতে আমার পাঁচ বিয়ে—'

ব্রজদার মেলে ধরা হাতখানার আঙুলগুলো হলদে। কুবের যখন ব্রজদাকে চেনে, তখন থেকে দেখে আসছে—ব্রজ দত্ত সিগারেটের তামাক ফেলে দিয়ে ভেতরে গাঁজা পুরে টানে।

'না না—দেখবেন, আপনাদের দাদা আর বিয়ে করবে না—'

বুলু আভার গলা শুনতে শুনতে তার সিঁথি দেখল—সিঁদুর নেই, চুলগুলো শুকবো, চোখে সুরমা, শাড়ির লেসের সঙ্গে মানিয়ে ব্লাউজের একদিককার হাতায় লেস লাগানো। পায়ের খড়মের দিকে বুলু তাকিয়ে আছে দেখে আভা বউদি অনেকখানি হেসে বলল, 'আপনাদের দাদার যা সব বিতিকিচ্ছিরি জিনিসে পছন্দ—!'

'উহুঁ আমি আরও দুটো বিয়ে করব—হাতে আছে,' হাত মেলে ধরল সবার সামনে। মুখে হাসি মাখানো। লুঙ্গি আবার হাঁটু অবদি গুটিয়ে এবেছে। বাবরি ঘাড়ের ওপর দুলছে।

'তা হলে মেজদির কাছেই ফিরে যেয়ো—' হাসতে হাসতেই বলল নতুন বউদি, 'কী শক্ত মানুষ মেজদি—সেবার গটগট করে হাসপাতালে গিয়ে অপারেশন করিয়ে নিজেই রাতের দিকে গাড়ি ডাকিয়ে টলতে টলতে ফিরে এল—'

কুবের বলল, ‘আপনারা খানিকটা জায়গা কিনে এখানে বসে যান—’

‘আমারও তাই ইচ্ছে। বলুন না আপনার দাদাকে—’

ব্রজদা তখন সুটকেস খুলে তিন-চারখানা অ্যালবাম নামিয়েছে। ফটোগুলো কুবেরের চেনা। কুবেরও অনেকগুলো ছবি এর আগে ব্রজদার নানান ডেরায় নানান বছরে দেখেছে। কোনোটায় ভারতখ্যাত ফিল্ম-ডিরেক্টরের সঙ্গে ব্রজদা আউটডোরে টোকা মাথায় দিয়ে রোদের মধ্যে বসে চা খাচ্ছে, কোনোটায় টিবি পেশেন্ট ব্রজদা। বুলু একটার পর একটা দেখে যাচ্ছিল। নতুন কতকগুলো ছবি পড়ল। ব্রজ ফকির দীক্ষান্তে ন্যাড়া মাথায় বিশ্বনাথের মন্দিরের সামনে দাঁড়ানো—এরকম আরও অনেক।

কাজুবাদাম, মিষ্টি খেতে অসুবিধে হল না কুবেরের। কিন্তু চায়ের কাপ দেখে ঘাবড়ে গেল। এইমাত্র যেন পুরোনো বাসনের দোকান থেকে চেয়ে আনা হয়েছে। হাতলে ছাতকুড়ো। ব্রজদা কতরকম জায়গায় ঘুরেছে—থেকেছে। নতুন বউদি না হয় সব মিলিয়ে ব্রজদাকে নিয়েছে। কিন্তু এ কাপে চা খেয়ে বুলু আর তার সারা গায়ে যদি কিছু বেরোয়। নতুন বউদি কেমন শুকবো পানপাতা হয়ে গেছে।

সিগারেট, ধুলো, ধোঁয়া আরও কত কী এই শরীরটার ভেতর ভাঁজে ভাঁজে জমে যাচ্ছে। কুবেরের প্রায়ই ইচ্ছে হয় তার সারাটা শরীর যদি কোবো সাইকেল সারানোর দোকানে আগাগোড়া খুলে ফেলে ডবল চেনে সিলিং থেকে ঝুলিয়ে দিতে পারত—তাহলে জয়েন্টে জয়েন্টে তেল ঢেলে ঘষে মেজে নিত। বলা তো যায় না, এত দিনের মেশিন—কোথায় কী হয়ে আছে। বাঁ হাত উলটে আঙুলের কালো কালো দাগগুলো দেখল।

একবার ছোটোবেলায় টাইফয়েডের পর আর ভালো করে ডাক্তার দেখানো হয়নি। অবিশ্যি আর কোবো ট্রাবেলও হয়নি। কেবল বাঁ হাতের আঙুলের গাঁটে গাঁটে মরচে পড়ে যাচ্ছে।

চা খেল না কুবের। বুলুকেও খেতে দিল না, ‘তুমি আবার চা খাবে নাকি—ট্রেনেই তো তিন খুরি খেলে।’

ব্রজদা ওদের দুটো কাপই নিজের গ্লাসে ঢেলে নিল। বুলু এক খুরিও খায়নি ট্রেনে। কুবেরের মুখে অবাক হয়ে তাকিয়ে থাকল।

৩

চটিরামের জমি কিনতে গিয়ে শুধু হেনস্তাই হল। বুড়োর জমি বিক্রি খুবই দরকার। কিন্তু লোভ সামলাবার ক্ষমতা নেই। মোট দু-বিঘের মধ্যে প্রায় সবটাই ভাইপোদের। নিজের অংশে আঠারো শতক—দশ কাঠা চৌদ্দ ছটাক। সাড়ে তিনশো করে কাঠা ঠিক হল।

মাস মাস মাইনে থেকে যদি জমিয়ে আসত কিছু কিছু। কেউ যদি ধার দিত চার হাজার টাকা—কুবের তাকে কিস্তিতে কিস্তিতে শোধ করে দিত। প্রভিডেন্ড ফান্ডে খোঁজ নিয়ে জানল সাত বছর চাকরি না হলে ওখানে হাত দেওয়ার জো নেই। কোথায় পাওয়া যায়। সামান্য হাজার চারেক টাকা হলে স্টেশনের ধারাধারি জায়গাটুকু আটকানো যেত। ক-কামরার বাড়ি হবে কুবের তা ভেবেও ঠিক করতে পারে না। তবে, বাড়ির সামনে খানিক ফাঁকা জায়গা থাকবে। সেখানে গরমের দিনে বিকেলে বেতের চেয়ার পেতে বসে বাসি খবরের কাগজ পড়া যাবে।

আত্মীয়ের ভেতর একজনকে টেলিফোনে বলল সব। মাসে মাসে একশো করে ফেরত দেবে কষ্টেসৃষ্টে। সব শুনে তিনি ফোনেই বললেন তার আগাগোড়া ওভার ড্রাফটে মোড়া। রাসেল স্ট্রিটের বাড়িখানা নাইন পারসেন্ট লোনে তৈরি। দশ বছর হয়ে গেল আজও আসলের অর্ধেক শোধ হয়নি। এদিকে ডায়েবেটিস—কবে আছেন কবে নেই তার ঠিক কী!

অতএব ধনরাজ শরণং। ওয়েলফেয়ার অফিসার হলেও কোম্পানির নানা কাণ্ডে জড়ানো ধনরাজকে অনেক টাকা নাড়াচাড়া করতে হয়। একদিন সকালবেলা কুবের তার বাড়ি গিয়ে হাজির হল। ধনরাজ নতুন কেনা বাড়ির লনে চিনে ফুলের তোয়াজ করছিল ঝারি হাতে। কুবের বোগেনভেলিয়া না কী একটা জমকালো ফুলের নাম জানত। জিনিসটা ফুল নাও হতে পারে। কোনোদিন চোখে দেখেনি। তাই নিয়েই খানিক কথা চালাল। বেতের চেয়ারে বসতে বসতে ধনরাজ চিনের ভূগোল টেনে আনল। কুবের গভর্নমেন্ট স্কুলের স্টুডেন্ট ছিল। বেতের ডগায় হোয়াং হো, ইয়াং সিকিয়াং করেছে পুরো ক্লাস এইট। চোখ বুজে চিনের প্রদেশগুলো, নদী, এমনকী পাহাড়—শেষে ভাষা নিয়ে দৌড়োদৌড়ি আরম্ভ করে দিল।

ধনরাজ তখন চিনের দুর্ভিক্ষ নিয়ে পড়ল। কোন পোলিস সাহেব হিটট্রিটমেন্ট ফার্নেসের রিফ্র্যাক্টরি কারখানা বসানোর ব্যাপারে দিল্লি থেকে এসেছিল ক-দিন আগে। তারই মুখে শোনা, চিনেরা এখন খাবারের অভাবে পুরোনো ভারী ভারী ডিকসনারির মলাট জলে ভিজিয়ে সকাল বিকেল টিফিন সারে।

এই জায়গায় খানিক থেমে থেমে কুবের গড়গড় করে বলে গেল, 'জীবনের সাকসেসের মাঝখানে আপনি আজ দাঁড়িয়ে,' কথাগুলো প্রবন্ধ হয়ে যাচ্ছে দেখে মুখটা অনেকখানি ভাবালু করে বলল, 'খানিকটা জায়গা দেখেছি—বাড়ি করে উঠে যাওয়ার খুব ইচ্ছে ছিল, কিন্তু, কোথাও অতগুলো টাকা

জোগাড় করতে পারলাম না—অথচ পেলে আমি মাসে মাসে শোধ করে দিতাম।'

'কত?'

'চার হাজার—'

'অত তো হবে না। আড়াই হাজার নিয়ে যেয়ো—বাকিটা দেখ আর কেউ দিতে পারে কি না—'

কুবেরের বিশ্বাস হচ্ছিল না।

পরদিন কারখানায় টিফিনে ধনরাজের ঘরের সামনে গিয়ে স্লিপ দিতেই ভেতরে ডেকে পাঠাল কুবেরকে। মেঝে থেকে টেবিল অবদি থাকে থাকে একশো টাকার নোটের বান্ডিলের সাজানো সিঁড়ি। রেডি করা ছিল। কুবের গুনে দেখল পঁচিশখানা।

'কিছু সই করতে হবে না?'

'দরকার নেই', বলে একখানা বাঁধানো খাতা খুলে কুবেরের নামের পাশে টাকার অঙ্কটা লিখে রাখল ধনরাজ, 'এখন পঞ্চাশ করে কাটব মাসে মাসে—শেষে কিন্তু বেশি কাটব, আমার কন্টিনজেন্সি ফান্ড থেকে দিলাম। তাড়াতাড়ি ফেরত দিলে অন্যদেরও দরকারে টাকাটা দিতে সুবিধে হয়।'

'নিশ্চয়ই নিশ্চয়ই—সে তো একশোবার। আরও অনেক কিছু বলতে পারত অন্য সময় হলে। এখনই ঠিক ধন্যবাদ, কৃতজ্ঞতার মতো কোবো কথাই মুখে এল না কুবেরের। তাহলে জায়গা বোধ হয় কেনা হবেই।'

রাতে বাড়ি ফিরে টাকাটা বুলুন হাতে দিল, আরও দেড় হাজার দরকার।

বুলু বলল, 'কদমপুর থেকে তোমার ব্রজদা লোক পাঠিয়েছিল—চটিরাম জমি ছেড়ে দিতে পারে—আজকালের ভেতর বায়না করতে হবে।'

সেদিন কদমপুর যাওয়ার পর কুবের অন্তত দশবার চটিরামের ওখানে গেছে। যাতায়াত করে দর ঠিক হওয়ার পর টাকার ধান্দায় আজ হপ্তা দুই চৌদিকে ঘুরে বেড়িয়েছে। তাই আর এ-কটা দিন ওদিক মাড়ানো হয়নি। তা বলে জমি ছেড়ে দেবে চটিরাম!

কিছুকালের ভেতর কুবের খানিকটা খানিকটা করে অন্যরকম হয়ে গেছে। রবিবার সকালের আড্ডা আজকাল জমে না। ফার্নেসে দু-চারজনকে জমি কিনে বাড়ি তৈরির প্ল্যান বলেছে। গুপ্তবাবু বলেছেন, আমরা কলকাতার বনেদি ভাড়াটে—পাঁচ পুরুষের ওপর ভাড়াটে। কদমপুর গিয়ে এতখানি পথের হ্যাঁপা পোয়াতে পারব না। দিব্যি মাসের শেষে ভাড়া দিয়ে যাও —কোবো ঝামেলা নেই।

'কালই বায়না করব—'

'বাকি টাকা?'

'জোগাড় করতেই হবে—'

আবছা আবছা শুনেছিল, জমি কেনার আগে সার্চ করাতে হয়। আরও নাকি সব কাগজপত্র লাগে। পরদিন সকালেই কুবের বুলুকে নিয়ে শিবপুরে সারদা চ্যাটার্জি লেনে চলে গেল। সেখানে কুবেরের বন্ধু প্রসূনের শ্বশুরবাড়ি। শ্বশুর নিত্য গুপ্তরায় বাড়িই ছিলেন। মানুষটি বড়োদরের সার্ভেয়ার। বায়নায় কী করতে হয় তাও কুবের জানে না। রায়মশায় আর বুলু কদমপুর চলে গেল মিড ট্রেনে। পরের ট্রেনে প্রসূনকে নিয়ে কুবের সাবরেজেস্ট্রি অফিসে গেল। দুখানা ডেমি আর দু-টাকার স্ট্যাম্প নিয়ে ওরা যখন কদমপুরে চটিরামের বাড়ি পৌঁছোল তখন েবেলা প্রায় এগারোটা।

গুপ্তরায়মশায় এতক্ষণ জামাই-এর বন্ধুর জন্য চটিরামকে নরম গরম কথা দিয়ে আটকে রেখেছে। কত লোক নাকি ওই দশ কাঠা চৌদ্দ ছটাক কেনার জন্যে হাঁটাহাঁটি করছে।

শ্রীশ্রীকালী দিয়ে বায়নাপত্রের শুরু হল—

> বায়নাপত্র গ্রহিতা—শ্রীকুবেরচন্দ্র সাধুখাঁ, পিতা শ্রীদেবেন্দ্রলাল সাধুখাঁ, জাতি হিন্দু, পেশা চাকুরি, আদি সাং ১৩।২, মুন্সী জেলার রহিম লেন, সালকিয়া, হাওড়া, থানা গোলাবাড়ি।
>
> বায়নাপত্র দাতা—শ্রীচটিরাম সরদার, পিতা ময়ূর সরদার, জাতি হিন্দু, পেশা চাকুরি, সাং কদমপুর, থানা ও সাবরেজিস্ট্রি বহরিডাঙা, জেলা ২৪ পরগনা।

কোথাও দাঁড়ি কমার বালাই নেই।

তারপর অন্তত পঞ্চাশখানা দলিল করে কুবেরকে খুচখাচ শরিকানি জমি কিনে দাগ ধরে এগোতে হয়েছে। এখন তার এসব প্রায় মুখস্থ—

> কস্যরায়ত স্থিতিবাদ স্বত্ত্বের ভাগী বিক্রয়ের বায়না পত্রমিদং কার্যাঞ্চাগে... নিরাংশে অবিবাদে নির্দায় নির্দোষ নিঃগৌল পরিষ্কার সুস্থ অবস্থায় খাসে ভোগ বাস দখলীকার আছি।
>
> অদ্য তারিখে বায়নার বাবদ আদায় ১০০ একশত টাকা লইয়া অঙ্গিকার করিতেছি যে, অদ্য হইতে ১ মাহার মধ্যে পণের অবশিষ্ট তিন হাজার নয় শত টাকা দিলেই মহাশয়ের খরচে মহাশয়ের নাম বরাবর রীতিমত সাফ কোবালা লিখিত পঠিত সহি সম্পাদন ও রেজিস্টারি করিয়া দিতে বাধ্য থাকিলাম।

বানানগুলো সব খোদ বিদ্যাসাগরের।

বায়নাপত্র লেখার পর মাঠে নামতে হল। বেলা তিনটে থেকে ফিতে ধরে মাপতে মাপতে সন্ধে হয়ে এল। চটিরাম একখানা লাঠিতে ভর দিয়ে দাঁড়িয়ে দেখল, ভাইপোদের অংশ আগেই বিক্রি হয়ে গেছে। কিনেছে এখানকারই এক বাগ। হরি বাগ—ব্যাংকশাল কোর্টে কী একটা কাজ করে।

মাপামাপির পর গুপ্তরায় মশায় বললেন, বোর্ডে ফেলে দেখতে হবে কতটা জায়গা আছে—'

চটিরাম তখনও দাঁড়িয়েছিল, 'মেপে কী আর দেখবেন। দলিলের চেয়ে কাঠা দুই বেশিই আছে। দু-কুড়ি বছর চাষ নিজেই দিয়ে আসছি—আল সরে গিয়ে দু-কাঠা জমি বেড়ে গেছে—'

‘যা দখলে আছে—দলিল আছে—তাই কিনব আমরা।’

চটিরাম হাসল, ‘দু-কাঠা মুফতে পাবেন—তার জন্যে কিছু টাকা আমার হাতে ধরে দিতে হবে।’

‘তা কেন? যে জমি আপনার না—তার জন্যে দাম দিতে পারব না—’

‘ও হবে না বাবু।’

কুবের আরও কিছু বলতে যাচ্ছিল। গুপ্ত রায়মশায় তাকে থামাল, ‘বেশ তো, আগে বাড়িতে আঁক কষে দেখি—ঠিক কতটা জমি আছে—কমেও তো যেতে পারে।’

‘বেশ তো কষে দেখুন—’

চটিরাম স্টেশন অবধি এগিয়ে দিতে আসছিল। লোকাল লোক—যজমানি করে বলে মনে হল, আগ বাড়িয়ে কথা আরম্ভ করল, ‘যা জমি আছে তার দাম দেবেন না?’

সারাদিন দৌড়োদৌড়িতে সবাই টায়ার্ড। প্রসূনকে যে কী বলে কৃতজ্ঞতা জানাবে। এমন সময় এ আবার কী ফ্যাকড়া! কুবের নিজেকে সামলাতে পারল না, ‘আপনার জমি?’

‘না।’

‘তবে?’

‘আমাদের এখানকার লোক—আমরা দশজনই তো বলব, দেখব—ঠিক দর পাচ্ছে কিনা।’

‘বেশ তো বলবেন। কিন্তু, কিন্তু আগে কষে দেখি কতটা জায়গা আছে—’

‘রোজ রোজ আমিনবাবুকে টেনে এনে তাঁর পিছনে দশ-পনেরো টাকা না ঢেলে একদিনে সব মেপে দেখে নিন না—’

কুবেরের মাথায় আগুন চড়ে গেল। পকেট থেকে গুপ্তরায়মশায়ের কার্ডখানা বের করে দেখাল, ‘দশ পনেরো নয়—রোজ একশো দেড়শো টাকা ফি ভদ্রলোকের—আমিন নয়, সার্ভেয়ার—’

লোকটা চমকে গেল, মুখের চেহারা নরম হয়ে এল, ‘আমারই ভুল হয়েছে—আপনারা এসেছেন যখন, একবার আমার বাড়ি ঘুরেই যেতে হবে—’

‘আমাদের সময় নেই মশাই—সন্ধের ট্রেনে ফিরব—’

‘সে অনেক দেরি—বাড়ি আমার স্টেশনের উলটোদিকেই—চলুন, দু-মিনিট বসবেন—’

দু-মিনিটের জায়গায় দশ মিনিট বসতে হল। শান বাঁধানো পুকুর। প্রসূন গুপ্ত রায়মশায়, বুলু আর কুবেরকে চণ্ডীমণ্ডপের বারান্দায় বসিয়ে প্লেট ভর্তি মিষ্টি খাওয়াল। লোকটির নাম প্রবোধ মণ্ডল। মণ্ডপের কোণে বড়ো বড়ো তামার বাসনের ডাঁই—জং ধরে নীল হয়ে গেছে, ওপরে মাকড়সার জাল, একসময় সেখানে ধুমধাম পুজো হত। তখন ঘাটলা বোধ হয় এমন ভেঙে যায়নি, ধসে যায়নি।

বায়নাপত্রে চটিরাম সই দেবার পর বুলুকে একবার একা পাওয়ার ইচ্ছে হচ্ছিল কুবেরের। বুলুর নামেই কেনা হচ্ছে। স্টেশনে কেনা পান খেয়ে বুলুর ঠোঁট এখন শুকিয়ে কালো হয়ে আছে।

ট্রেন যখন কদমপুর ছাড়ল তখন, লালজি আর ঘনরাম চাটুজ্যের ইটখোলার মাথায় দগদগে লাল আর নিখুঁত গোল হয়ে সূর্য ঝুলছে—যেকোনো মুহূর্তে গাছপালার আড়ালে টুপ করে খসে পড়বে।

আলো প্রায় নেই, কামরায় বাতি জ্বলতে জ্বলতে শেয়ালদা এসে যাবে। ছুটন্ত মাঠে মেটে-জ্যোৎস্নার কায়দায় সূর্যের ফ্যাকাসে আলো নিভে আসছিল। তার ভেতরেই গুপ্তরায়মশাই বললেন, 'কেমন প্লেন জমি দেখেছেন? এক সময় সি বেড ছিল,' একটু থেমে বললেন, 'দু-চার শো বছর আগে এখানে নদী বইত—'

তার মানে এসব জায়গার ওপরে জল ছিল। ভাবাই যায় না। এখন তাহলে জলের ভেতরে দিয়ে ট্রেন এগোচ্ছে। তার চেয়ে কামরার জানলায় বসে ফুটি ফুটি তারা দেখা ঢের সোজা।

বায়না করে একদিকে কুবেরের যেমন সুখ হচ্ছিল, অন্য দিকে তার মন বেশ খুঁতখুঁত করছিল। মোটে দশ-বারো কাঠা। কতটুকুই বা জায়গা। আশা ছিল অন্তত দেড় বিঘে। সামনের দিকে কাঠা পাঁচেক ছেড়ে দিয়ে বসতবাড়ি, পেছনে দশ-বারো কাঠার পুকুর, পাড় ধরে কলাগাছ আর সুপুরির চারা বসিয়ে দেবে—এক কোণে থাকবে জালে ঘেরা পোলট্রি, হাঁসের আস্তানা—কত কী! সেই যে ঠাকুরমশাই মাথায় ঢুকিয়ে দিয়েছিল পঞ্চাশ টাকার কাঠা। তা বোধহয় বে অব বেঙ্গলের পাড় ঘেঁষে পাওয়া যায়। সেখানে বড্ড ঢেউ।

বায়নার বয়ানে ছিল, '১ মাহার মধ্যে পণের অবশিষ্ট' টাকা দিয়ে সাফ কোবালা লেখাতে হবে। কুড়ি দিন পার হয়ে গেল। কুবের বাকি দেড় হাজার কিছুতেই জোগাড় করতে পারল না। পাড়ার কাবুলিদের লিডার গোছের তিন মন ওজনের এক খাঁ সাহেব তার অনেক দিনের বন্ধু। সে বলতেই রেডি। কিন্তু বুলু পইপই করে বলল, 'তাহলে ডুববে তুমি—'

এক মাস পুরোতে দিন পাঁচেক বাকি থাকতে কুবের কদমপুর গিয়ে দেখে, হরি বাগ তার থুঁটো পোঁতা জমির হাত দশেক ভেতরে পিলার পুঁতে তার লাগোয়া জমির দখল নিয়েছে। চটিরাম বলল, 'কী করব বাবু। আজ দু-কুড়ি বছর চাষ দিয়ে আসছি। ও জায়গা আমার। বাগমশাই তো মানা না শুনেই পিল্পে বসিয়ে দিলে শনিবার।'

বাগের সঙ্গে দেখা করল কুবের। লোকটা আইন বোঝে, কোর্টে কাজ করে। চা খাওয়াল কুবেরকে, তারপর বলল, 'আমি মেপেই পিলার দিয়েছি—ডিস্ট্রিক্ট বোর্ডের রাস্তা কাঠা দুই জায়গা খেয়ে ফেলেছে। সেটুকু সব শরিকের ঘাড়ে ভাগ দিয়ে আমার কেনা অংশটুকু সব পাচ্ছিলাম না। তাই চটিরামের গা থেকে খুঁজে বের করে তবে পিলার দিলাম।'

কুবের বুঝল, হরি বাগের সঙ্গে পারা যাবে না। আর চটিরামেরও জায়গা অন্য কেউ কিনুক হরি চায় না। কেননা হরির ওটা পেতেই হবে। এদিকে তারও বাকি টাকা জোগাড় হয়নি। স্টেশনে ফেরার পথে

চটিরামকে বলল, 'আপনি দখল দিতে পারছেন না—আমি কিনব কী করে?'

'হরেনবাবু উকিলের সঙ্গে পরামর্শ করে আমি মামলা ঠুকে আপনাকে দখল দেব।'

'ততদিন আমি বসে থাকব?' এবারে উলটো চাপ দিল কুবের, 'আমি কিনব বলে তৈরি—পাঁচ দিনের ভেতর দখল দিন, আমি কিনছি।'

'সে আমি কোত্থেকে পারব—শরীরটাও হেলে গেছে ক-দিনের ঠান্ডায়—'

কুবের বলতে যাচ্ছিল, গত বছর জমির বিঘে ছিল আড়াই হাজার। সে জিনিস ক-দিনের তফাতে সাত হাজারে ছাড়ছ—তখন শরীরের কথা মনে ছিল না? কিন্তু এসব কিছুতেই বলতে পারল না। রেলের এই বরো পিট, এই ভিজে কচুবন—এদের পাশাপাশি চটিরাম অনেকদিন এখানকার লোক। কদমপুরের কত কথা লোকে ভুলে গেছে—সেসব মাটি চাপা জিনিস চটিরাম চেষ্টা করলে এখনও মনে করতে পারে হয়তো।

বিকেলবেলা পাশের মৌজা কমলপুরের দিকে সূর্য ঢলে গেছে। থাক থাক আলে ভাগ করা জমির সারা গায় সবুজ ঘাস—রোগা রোগা তালের চারা মাথা ধরে উঠেছে—এ সবের মাঝে আদুড় গায়ে চটিরাম দাঁড়ানো—চোখের কোণ ভালো ধোয়া নয় বলে কেমন অস্পষ্ট—মনে মনে ঠিকও করেছে হয়তো, আর পাঁচ দিনের ভেতর সাফ কোবালা হয়ে কুবেরবাবুর হাজার চারেক টাকা কোন দফায় কী রকম লাগাবে।

'কিন্তু আমিই বা বসে থাকি কী করে?'

'তাহলে কাল এসে বায়নার টাকা নিয়ে যাবেন—আর বায়নাপত্রখানা সঙ্গে নিয়ে আসবেন বাবু।'

চটিরামের নীচের ঠোঁটের ওপর মুখের বাকিটুকু দাঁতের অভাবে চেপে বসে গেছে—পাকানো শরীরখানা খুব অবহেলায় তালের আঁটি মাথাটা ধরে আছে। কুবেরের এই বিকেলবেলায় তার জন্যে খুব কষ্ট হল। ষাট সত্তর বয়স হবে। মাথার ওপর বাপ-মা নেই, চটিরামের ছেলেবেলার লোকজনও কমে যাচ্ছে চারদিকে। অতগুলো আল ডিঙিয়ে চটিরাম এখন তার বাপকেলে ভিটেয় গিয়ে উঠবে।—সন্ধে হতে দেরি নেই। বায়না করার দিন কুবের উঠোনের গোলাটা দেখেছে—একেবারে ফাঁকা, এককালে নাকি চার পাঁচশো মন ধান থাকত। মাটির বারান্দা বুক সমান উঁচু, চটিরাম কারো হাত না ধরে উঠতে পারে না, নামতেও পারে না।

ঠাকুরমশাই একদিন ভাটিখানার ওদিকে বাড়ি দেখাতে নিয়ে গিয়ে কুবেরকে কী করে দিল। তার কারখানার কলিগরা কেউ এখন ফার্নেসে—কেউ অফডে বলে ঘুমোচ্ছে, নয়তো ঘুরতে বেরিয়েছে। আর কুবের! এমন ফাইন বিকেলে।

কদমপুরে প্রথম আসার পর কিছুদিন কেটে গেছে। কুবের এখন জায়গাটা প্রায় তার মনে ধরেছে বলতে পারে। মাত্র কিছুদিন আগেও কদমপুর সে একদম চিনত না। এত ঘোরাঘুরির পর সব ঠিক

হতে হতে হল না। সেদিন বিকেলে মাপামাপির সময় প্রসূন আর বুলু জায়গার পাশে উঁচু কিনারে সারা দিনের ছুটোছুটির পর বসে ছিল। প্রসূন বুলুর মাথার ওপর রোদ বাঁচিয়ে ছাতা খুলে ধরেছিল। গুপ্তরায়মশায়ের সঙ্গে ফিতে ধরার সময় কুবের দেখছিল, বুলু প্রসূনের ছাতা ধরার সময় লজ্জায় আপত্তি করছে—প্রসূন শুনছে না। বন্ধুর স্ত্রীর মাথায় ছাতা ধরতে সবারই ভালো লাগে। বুলুর লজ্জাটাও নর্মাল। কালো শান্তিপুরের পাড় ঘেঁষে লাল সুতোর লতাপাতা তোলা বুলুর শাড়ি মাটিতে ঘাগরা হয়ে ঘুরে ছড়িয়ে আছে। শাড়িটা সবুজ হলে বিকেলে বুলুকে কুবের বনদেবী বলে ডাকতে পারত।

কিন্তু আজ বাড়ি ফিরে বুলুকে কী বলবে। এ যে সেই ভাটিখানার বাড়ি দেখার মতো শেষ অবদি শুধু গাড়িভাড়াতেই গুচ্ছের পয়সা গচ্চা গেল। কদমপুর-শেয়ালদা রেলের টিকিটেই কম করে পঞ্চাশ টাকা গেছে এ ক-দিনে।

বায়নার পর বুলু বলেছিল, ‘একবারেই দোতলা বাড়ি করতে হবে। ঢালাই ছাদ চাই।’ করোগেট ভীষণ অপছন্দ। একতলা তিনখানা ঘরের মোটামুটি বাড়িতে ইট চাই পঁচিশ ত্রিশ হাজার—ছাদে, ভিতে, দেওয়ালে—সব নিয়ে সিমেন্টও প্রায় আট ন-টন। দোতলায় অবশ্য খরচ কিছু কম লাগে। তার ওপর আছে জানলা, দরজা, স্যানিটারি ফিটিং—কত কী। এত জিনিসের কত দাম—তার একটা হিসেব মনে মনে কষতে গিয়ে কুবেরের মাথার ভেতর নোটের পাহাড় ডাঁই হয়ে উঠেছিল।

এ লাইনই ছেড়ে দেবে কুবের। ধনরাজ মাস মাস মাইনে থেকে যেমন কাটান দিচ্ছে দিক। টাকাটা দিয়ে বুলুকে একজোড়া চুড় বানিয়ে দেবে। বিয়ের আংটিটা সুদ-আসল দিয়ে ছাড়িয়ে আনবে—তারপর ফার্স্ট ক্লাস ট্রেনে চড়ে লটবহরসুদ্ধ চেঞ্জে যাবে—রাজগীর নয়তো নেতারহাট।

শেয়ালদা থেকে একখানা প্যাসেঞ্জার এসে দাঁড়াল। সামনের স্টেশনে কোনোদিন যায়নি কুবের। ঢুকতে একটা ব্রিজ আছে। কদমপুর প্ল্যাটফর্মে দাঁড়িয়ে সেটাই শুধু দেখা যায়।

প্যাসেঞ্জারের লেজে মালগাড়ি থেকে কুলিরা কিম্ভূতসাইজের যন্ত্রপাতি নামাচ্ছে। গায়ে লেখা ওএনজিসি। তেল ও প্রাকৃতিক গ্যাস কমিশন। গুপ্তরায়মশাই সেদিন মাপামাপির পর ট্রেনে বসে ঠিকই বলেছিলেন, জমি কী প্লেন—এদিকটা সি বেড ছিল। সারা তল্লাট জুড়ে গভর্নমেন্ট গর্ত খুঁড়ছে, তাঁবু গাড়ছে। সকালের দিকে কদমপুর বাজারে নতুন নতুন জিপে চড়ে সরকারি অফিসারদের ঠাকুর-চাকর দশ পনেরো মাইল দূরের মাঠ থেকে বাজার করতে আসে। লেভেল ক্রসিংয়ে গেট পড়ে গেলে ওদের জিপের জন্যে আবার পথ খুলে যায়।

প্রাগৈতিহাসিক আমলের সমুদ্র যা কিছু গিলেছিল, তা সবই এখন মাটির চাপে পড়ে এতদিনে কালো তেল। কোনোদিন হয়ত চটিরামের জমিতে টিউবয়েল বসাতে গিয়ে হরি বাগ তেল পেয়ে যাবে।

কুবের উলটোদিকে তাকাল। দূরের স্টেশনে ঢোকবার মুখে ব্রিজটা এখন একটু দেখা যাচ্ছে। ওদিক থেকে শেয়ালদার আপ গাড়ি আসতে আসতে ডিসট্যান্ট সিগন্যালে আলো দেখা যাবে। একদিন কুবের ওদিকে যাবেই—যেতে যেতে নাকি সমুদ্র পাওয়া যায় শেষে। এক-একদিন ফার্নেস বেড়ে

দাঁড়িয়ে ঠান্ডা হাওয়ার জন্যে কুবের হাঁপিয়ে ওঠে। ফার্নেসের দরজা তুলে তাকেই বেলচায় করে পোড়াচুন ফুটন্ত ইস্পাতের জলে ছুড়ে দিতে হয়। স্ল্যাগের ফেনা সরিয়ে গুঁড়ো চুনের দলা ভেতরে গিয়ে পড়ে। কোনো শব্দ নেই—শুধু গলন্ত ইস্পাতের বুক বেয়ে নীলচে আগুন তখন পাক খায়।

'কখন এসেছিলেন?'

লোকটা কাউন্টারে টিকিট দেয়। ভিড় দেখে কুবেরকে একদিন ভেতর থেকে টিকিট দিয়েছিল। নিজে নিজেই লোকটা আবার বলল, 'তিনটে কুড়ির?' একটু থামল, 'জায়গা পছন্দ হল?'

এখন একে সব বলতে গেলে রামায়ণ হয়ে যাবে। তার চেয়ে অন্য কথাই ভালো। কিন্তু কী নিয়ে এখন কথা বলা যায়? আজ বোধহয় লোকটার ছুটি। কাছেই কোয়ার্টার—পায়চারির পক্ষে এমন বাঁধানো প্ল্যাটফর্মই প্রশস্ত—তাই বোধ হয় এখানে। কথা বলতে বলতে ফার্স্ট ক্লাস ওয়েটিং রুমে ঢুকল দুজনে। অন্যদিকে দারোগার টুপি মাথায় যে টিকিট নেয় সে একটি অল্পবয়সি ছোকরার সঙ্গে জমিয়ে আড্ডা দিচ্ছে। কুবেরের দিকে আড্ডা ঘুরে গেল। কী করে যেন ওরা জানে, কুবের জমি কেনার জন্যে ঘোরাঘুরি করছে।

ছোকরার কাছে তিনটে বাচ্চা দাঁড়িয়ে—ছোটোটা বছর তিনেকের, চেঁচিয়ে উঠল, 'বাবা—'

আরও কী যেন বলল। কুবের অবাক, এই ছোকরার তিন তিনটে পোনা। এলেম আছে তো।

'আমাকে চিনতে পারছেন?'

ছোকরা উঠে কুবেরের দিকে এগিয়ে এল, বাচ্চা তিনটেও পায়ে পায়ে এল। ঠিক মনে করতে পারল না। কোথায় দেখেছে?

'আমি কিন্তু আপনাকে চিনি—'

ধড়াস করে উঠল বুকের মধ্যে। কুবের সাবধান হয়ে গেল।

'সালকের কুবের সাধুখাঁ না আপনি?'

কুবের মাথা নাড়ল। আর কী জানে ছোকরা? সাদা শার্ট, মালকোঁচা ধুতি, কবজিতে মানানসই ঘড়ি। এই বয়েসে তিন তিনটে বাচ্চা—নিশ্চয়ই পয়সা আছে।

'আমার নাম বিকাশ বোস—'

কুবেরের কথা কী জানে? কোন সময়ে কুবেরকে চিনত? রিজার্ভড্ কুবের? ফ্লিভোলাস কুবের? কুবের দ্য মিন? লিবারাল কুবের? কিংবা, প্রায় ভবঘুরে?

'আমরা যেবার ফার্স্ট ইয়ারে ভর্তি হলাম—আপনারা ফোর্থ ইয়ারে—'

কুবের হাঁপ ছেড়ে বাঁচল। কীভাবে চেনে কে জানে! কখন কোথায় দেখেছে। এত কষ্টের পর চটিরামের জমিটা কেনা হল না। কাল আবার ভোরের ট্রেনে এসে বায়নার টাকাটা ফেরত নিয়ে যেতে

হবে। তখন না আবার কোনো ঝামেলা পাকায়। মনটা একটু খিঁচড়ে ছিল—খানিক ডিস্টার্বড, বিকাশ তার দিকে দাঁত কেলিয়ে তাকিয়ে আছে।

ফোর্থ ইয়ারে যখন পড়ত, তখন নেহরু অবদি তাজা ছিল। সে বছর পনেরো আগের কথা। প্রায় কিছু মনে নেই। তখনকার এমন কী মনে থাকতে পারে? কী জানে এই ছোকরা? কেই চেনে বললে কুবেরের সবচেয়ে বেশি ভয় করে। তখনকার একখানা ছবি দেখে বুলু নাক কুঁচকে বলেছিল, 'এ মা কী রোগা। মাথা অমন হেলিয়ে বসেছ কেন?' এখনও কুবের কারও সঙ্গে কথা বলতে বলতে অন্যমনস্ক হয়ে ডাইনে কিংবা বাঁয়ে মাথা কাত করে ফেলে। ওই অভ্যেস।

অতীত কুবেরের কাছে প্রায় ভূত।

বিকাশ তার কথা কী জানে, তা বের করতে না পেরে কুবের মনে মনে কাঁটা হয়ে থাকল। এখনই ট্রেনটা এলে লাফিয়ে উঠে বসত। অথচ আজই দশ মিনিটের ওপর লেট। কথায় কথায় জানা গেল, বিকাশ বোসের বাবা ননী বোস বছর তিরিশেক আগে কলকাতার এক কলেজ থেকে ভাইস প্রিন্সিপ্যাল হিসেবে রিটায়ার করেন। তখন যা পেয়েছেন, তা দিয়ে এখানে স্টেশনের ধারাধারি তিনি বেয়াল্লিশ বিঘের ঝিল সমেত একশো আশি বিঘে জায়গা এক লপ্তে কেনেন। ঝিলে মাছ চাষ, ডাঙায় ইট আর টালির ব্যাবসা—সবই ননী বোস চুটিয়ে করেছে। কথায় কথায় মনে হল, বিকাশ তার বাপের আট আনায় কেনা কাঠা এখন বাজার বুঝে হাজার দেড় হাজারে ঝেড়ে যাচ্ছে। কেননা, বিকাশ বার বার জানতে চাইছিল, কী দরের ভেতরে কুবের জমি চায়—মানে, তার রেস্ত কত, সে হদিশ পাওয়াই আসল মতলব।

'আমি যখন গড়পার হইতে চলিয়া আসি, তখনও প্রবোধিনী পড়াশুনায় হাত দেয় নাই। বেহালায় দুইশত আশি টাকায় আড়াই বিঘা জমি কিনিয়া কোনোমতে দোতলা তুলিলাম একখানা। প্রথম প্রথম মা-বাবা-ভাইয়ের একান্নবর্তী পরিবার ছাড়িয়া আসিয়া খুবই কষ্ট হইত। দুঃখটা দৈহিক অপেক্ষা মানসিকই বেশি। বাবা চান নাই, আমি প্রবোধিনীকে বিবাহ করি। সে-ও বড়ো আনাড়ি ছিল। কতদিন ভাতের হাঁড়ি বসাইয়া ফার্স্ট বুকে এমন ডুবিয়া গিয়াছে—শেষে, ফেন উথলাইয়া আমাদের নতুন পাতা চুলার ঝিক গলিয়া গিয়া কষ্টের একশেষ। আমার বয়স তখন পঁয়ত্রিশ।'

এখানে এসে ব্রজ থামল। বাবার আত্মজীবনী লেখা বড়ো কঠিন কাজ। তখন কি রজনী দত্তর বয়স পঁয়ত্রিশ ছিল? রজনীর একচল্লিশে ব্রজ হয়। ততদিনে প্রবোধিনী ম্যাট্রিকুলেট। তার হাতেখড়ির সময় প্রবোধিনী বড়িশার উচ্চ-প্রাইমারিতে ইতিহাসের দিদিমণি।

গুচ্ছের প্রুফ পড়ে আছে। আভা খানিক দেখে দিলে কাজ অনেক এগিয়ে থাকত। সামনের আশ্বিনে তার এতদিনের পরিশ্রম বই হয়ে বেরিয়ে যেত। হারিকেন জ্বালিয়ে রাত আটটা নাগাদ লিখতে বসেছিল। খাওয়া-দাওয়ার পরেই লিখতে সুবিধে। আভা অতটা রাত জাগতে পারে না। লাস্ট ট্রেন বেরিয়ে গেছে সেই কখন। এখন কেবল মালগাড়ি যাবে—শব্দ শুনলেও চোখে দেখা যাবে না—বাইরে ঘুটঘুটে অন্ধকার। তেল পাওয়ার আশায় কিছুদিনই সারারাত ধরে যন্ত্রপাতি যায় মালগাড়ি বোঝাই হয়ে। একদিন শেষরাতে কদমপুরে একটা মালগাড়ি দাঁড়িয়ে ছিল—হাতির শুঁড়ের কায়দায় দফায় দফায় খোলা ক্রেনের মাথা বগির ছাদ দিয়ে বেরিয়েছিল।

খাটে ওঠার আগে আভা ব্রজর পিঠের ওপর একখানা শাড়ি দু-ভাঁজ করে মেলে দিয়ে গেছে। খুব মশা। শাড়িখানা নামিয়ে আড়মোড়া ভেঙে উঠে দাঁড়াল। রজনী দত্ত লোকটা তার বাবা ছিল ঠিকই, কিন্তু তার আত্মজীবনী লিখতে গিয়ে রোজই মনে হচ্ছে, ছেলে হয়েও ব্রজ তার কথা একেবারেই জানে না। কী করে রজনী ডায়মন্ডহারবার রোডের ওপর আড়াই বিঘের বাস্তুজমি দশ বিঘেতে তুলেছিল সেসব ব্রজ জানে। কিন্তু পঁয়ত্রিশ কিংবা বিয়াল্লিশে এক শনিবার কী বেস্পতির সন্ধেয় রজনী কী ভেবে থাকতে পার, কিছুতেই তা ব্রজর মাথায় আসতে চায় না।

হারিকেনটা থুঁ দিয়ে নিবিয়ে ব্রজ খাটে উঠল। আভা সুড়সুড়ি খেয়ে জেগে গেল, 'হচ্ছে কী, লাগে না? দেব তোমায় একটা—'

আভার চিমটি, টিপুনিতে বড়ো লাগে। ব্রজ কী বলতে যাচ্ছিল, পারল না, একখানা নরম হাত তার মুখে চাপ দিল, 'উঁহু, একটু জড়িয়ে শোও তো।'

জড়াজড়ি ব্রজ অনেক করেছে। বাঁ কাতে শুলে ডান হাতের ওপর মাথা রাখতে হয়—বেশিক্ষণ

একধারা থাকলে রক্ত বন্ধ হয়ে যাওয়ার জোগাড়। হঠাৎ ব্রজ তড়াক করে উঠে দাঁড়াল। আজই দুপুরে বউবাজারের মোড়ে দু-পুরিয়া কিনেছে। গাঁজা টেনে টেনে তার বুকের চাঁদি লাল হয়ে গিয়েছিল। ভেতরে সব সময় আঁচ ধরে থাকত। কী পিপাসা! এদানী মোদকই তাকে খাড়া রাখে।

'না। ওসব আজ খেতে পারবে না—আমিও পারিনে।'

আভার মুখ দেখা যাচ্ছিল না। শুয়ে শুয়ে কথা বলছে। ব্রজ উঠে দাঁড়াতে মাথার উপর বাড়তি অনেকখানি অন্ধকার আরও ঘোলা হয়ে গেল।

'একশোবার খাবে—'

কুলুঙ্গিতেই ছিল। রাস্তার মোড়ে কাচের বাক্সে আলো দিয়ে জিনিসটার নাম রাত এগারোটা অবদি জ্বালিয়ে রাখা হয় কলকাতায়। মদন আনন্দ। নিজে মুখে দিয়ে আভাকে এক রকম টেনে তুলল, 'একেবারে সবটা মুখে দিয়ো না—আস্তে আস্তে খেতে হয়।'

'আমি পারিনে।'

'কাঁদছ কেন? দ্যাখো, কী বোকা! শেষে খুব ভালো লাগবে—'

'আমি পারিনে,' আভার গলা বুজে এল, 'তোমার পায়ে পড়ি—'

ব্রজর ঝাঁকুনিতে সোজা হয়ে বসল, 'কানের লতি গরম হয়ে যায়—কিছু শুনতে পাইনে সত্যি—নাকের নীচে, হাওয়া চলে শুধু—'

'ফাইন,' দু-হাতে আভার কাঁধ ধরে ব্রজ তাকে সোজা রেখেছিল। অন্ধকারে মুখ খুঁজে নিয়ে একটু চুমু দিল, 'একী! এখনও কাঁদছ, কী হল?'

'সত্যি, আমি পারিনে—দিনের বেলায় কাউকে আর এনো না—,' ব্রজ খুঁজে খুঁজে ঠোঁটের জায়গাটা বের করল, ' হাঁ করতো লক্ষ্মী—আবু কী হচ্ছে?' ব্রজ আঙুল ভরে দিয়ে আভাকে হাঁ করাল, পুরিয়ার সবটুকু নীচের ঠোঁটে গুঁজে দিয়ে আভাকে ছেড়ে দিল, 'হাজারবার আনব।' তারপর কী মনে হল, 'কেন? আমাদের কুবের তো বেশ ভালো—'

'খারাপ বলেছি?' এতক্ষণে শুয়ে শুয়ে ফোঁস করে উঠল আভা।

'বেশ ফিটফাট—নোংরা নয় একদম, ছেলেও ভালো—'

'অ্যাতখানি বয়সে আমি কি আবার পাত্রী হলাম নাকি?' একটুও নামল না আভা, 'কুবেরবাবুকে এদিকে টানছ কেন? তার কথা বলেছি?'

ব্রজ চুপ করে আছে দেখে নিজে নিজেই বলল, 'মোষটা আজ তিন দিনে নানা ছুতোয় পাঁচবার এসেছে। সারাদিন তুমি বাইরে বাইরে থাকো। এইটুকু তো দেওয়ালের আড়াল—লাথি দিলেই ঘেঁস-সুরকির গাঁথনি খুলে যাবে—দুপুরে এদিকটা একেবারে ফাঁকা হয়ে যায়—'

‘বারণ করলে পারো।’

‘কখন কী অবস্থায় থাকি—জামদানিখানা তো সবসময় পরে বসে থাকা যায় না—’

‘সত্যি, তোমার শাড়ি কেনা হয় না অনেক দিন—,’ ব্রজ আর বেশি কথা বাড়াল না। এখন কথার পিঠে কথার তাল ঠুকে যাওয়া শুধু। আভার গলা জড়িয়ে আসছে—হাঁ করলেই খুশি যেন ছিটকে বেরিয়ে আসে। এখন বোধহয় ওর নাকের নীচে হাওয়া চলছে। একটু পরে বাগ মানানো কঠিন হবে। এতটুকু খাটে খ্যাপাচণ্ডী সামলানো যে কী! সারাটা ভোর একেবারে নেতিয়ে পড়ে থাকে।

‘তোমার গোলাপ চারার গোড়া খোঁচাখুঁচির পর গোবর দিচ্ছি—এমন সময় আবজানো দরজা গুঁতিয়ে মোষ একেবারে ভেতরে। নষ্ট হবে বলে, শাড়ি পরিনি। সায়া পরে নীচু হয়ে খুরপি চালাচ্ছি—আচমকা দরজা ঠেলার আওয়াজে চমকে ফিরে দাঁড়িয়েছি, কোথায় যাই! তখন বলে কী জানো?

‘কী?’

‘ক-খানা আঙুরবালার রেকর্ড এনেছি—’

‘বললাম, ‘আমাদের তো মেশিন নেই—’

‘খোকাকে দিয়ে পাঠিয়ে দোব ওবেলা?’

ব্রজ চুপ করে থাকল। গাঁজা, ভাঙ, মোদক তার রক্তে মিশে গেছে এতদিনে। ক-দিনই দেখছে মদন আনন্দ আভার সয় না একেবারে। ভবেন সীকে নিয়ে পারা গেল না। ভবেনের এঁচোড়ে পাকা খোকাটিও প্রায়ই ঘোরাঘুরি করে। ব্রজর নজরে পড়েছে।

‘তখন খেয়াল হয়েছে আমি তো কিছু পরে নেই। একেবারে সোজাসুজি তাকিয়ে গিলছে—আর দাঁড়াই! দৌড়ে ঘরে ঢুকে সেই যে দোর দিয়েছি— তিনটে কুড়ির ট্রেন এলে তবে খুলেছি—’

ব্রজ আভাকে কাছে আনল। আভা তার হাতখানা টেনে বুকের ওপর রাখল। এখন আর কথা বলবে না। বলতে পারবে না। এখন তাকে জড়াতেও বলবে না। বাউল গাউয়ে পিরেলি দাশের বড়ো মেয়ের এখন নাকের নীচে বাতাস বইছে। হাত রেখে দেখল—নরম হাওয়া, শুঁকে দেখল নতুন পাটালির গন্ধ।

এক ফ্যাকড়া এসে তার আত্মজীবনী লেখা ভণ্ডুল করে তুলেছে প্রায়। অথচ, তার অনেক সাধ—বাবার জীবনী মেলায় মেলায় বিকোয়। কতজনের জীবন-কথা বাজারে চলে। বীরভূমের গাঁয়ের হাটে অদ্বৈতের জীবনী, কোলাঘাটের মহোৎসবে নবনীর কথা রাস্তায় গীতা-চণ্ডীর সঙ্গে ডাঁই হয়ে বিক্কিরি হয়।

ভবেন জুটেছে—সঙ্গে তার ছেলেটাও। কী কুক্ষণেই যে শ-দুই টাকা হাওলাত করেছিল। বাবার আত্মজীবনী শেষ করেই বেনারস ঘুরে আসবে আভাকে নিয়ে। নৌকোয় বসে দুজনে আখ খাবে। ছিবড়ে গঙ্গায় ভেসে যাবে। মাংসের সের মোটে আড়াই টাকা। তিন মাসে দুজনেই মুটিয়ে ফিরবে।

আভাকে ঝাঁকুনি দিল। একেবারে বেডিং। খানিকটা দুলে কাত হয়ে গেল। তারপর হঠাৎ ব্রজকে চেপে ধরল। না নড়ে, ব্রজ ট্রেনের কামরার বাংকের মতো পুরো বোঝা নিল। এবার তাকে নিশ্চয় কামড়াবে, আঁচড়াবে— তারপর হয়ে গেলে, থেমে ঘুমের ভেতর ফোঁপাবে।

ব্রজ সিয়োর, তার গায়ে এতদিনে শ্যাওলা পড়েছে। গলায় আজকাল ময়লার র‍েক রেক দাগ ধরেছে। পুকুরে চানের এই হ্যাবিট ছাড়তে হবে, 'কী হল—'

'অ্যাঁ তুমি কোথায়?'

'এই তো—' শক্ত করে ধরল আভাকে।

'দেখতে পাচ্ছিনে।'

'পাবে কী করে? অন্ধকার যে!'

'তাই বলো। আমি ভেবেছি অন্ধ হয়ে গেছি—তাই দেখতে পাচ্ছিনে—কাছে এসো।'

'বাঃ। আর কত আসব?'

আভার বুক, বুকের হাড়, তলপেট সব নরম লাগল ব্রজর। জ্বর হবে না তো? সরস্বতী একদম ঠান্ডা ছিল। ঠান্ডা ময়াল। প্রথমজনকে ব্রজ আজ আর মনে করতে পারল না। কী যেন নাম ছিল। লতিকা, বিলাসী, কদমা, ফুল্লরা, বাঁধাকপি? একেবারে পাঁঠার পাঁজরের মাংস। নলি নলি হাড় বেরিয়ে থাকে—পাতলা মাংসের চাদর ওপরে লেপটানো।

চটিরাম বায়নার টাকাটা ফেরত দেওয়ার পর কথাটা বুলুকে জানানো গেল না। কদমপুরে এবারে ভালো ধান হবে। সময়মতো ফাইন বৃষ্টি হচ্ছে। সকালেই কিন্তু কুবেরের গায়ে ফোসকা পড়ার জোগাড়। ফার্নেস বেড়ে দাঁড়িয়ে তিরিশ টন গলন্ত ইস্পাতের মুখোমুখি দূরের মাঠে বৃষ্টি পড়া দেখতে ভালোই লাগে। তবে বাতাসের সঙ্গে উড়তি চুন জোলো ভাবটা শুযে নিয়ে গায়ে বসছে—আর গা চুলকোচ্ছে।

এবারও অনেকগুলো টাকা গচ্চা গেল তাহলে। বুলু কেন, বাড়ির সবাই জানে কদমপুরে এবার বাড়ি-ঘর বানানোর মতো একটুখানি জায়গা হচ্ছে। অথচ হচ্ছে না আসলে। মন্দের ভালো, বুড়ো সৎ লোক। বায়নার টাকাটা পুরোই ফেরত দিয়েছে।

কেন যে এই ভজকট ব্যাপারে জড়াতে গেল। এই টাকায় পুরী কি দেওঘর দিব্যি ঘুরে আসা যায়। তাও ঘুরবে না বুলু। জমি কিনতেই হবে—সেখানে থাকবার মতো একখানা বাড়িও একদিন করতে হবে।

হাতের মরচে-ধরা আঙুলগুলো দেখে একবার ইচ্ছে হল কারখানার ডাক্তারকে গিয়ে দেখায়। কিন্তু এখানকার ডাক্তার পোড়া, কাটা আর থ্যাঁতলানোর ড্রেস শুধু জানে। ড্রাম বোঝাই কালি বানানো আছে। হাত পুড়লে তাতে ডুবিয়ে রাখলে ঠান্ডা লাগে। সরল চিকিৎসা। ভদ্রলোক ভালো ফ্ল্যাশ খেলে।

দেড়টা নাগাদ তিরিশ টন ইস্পাত ভালোরকম ফুটে উঠল। গরম গরম মাল ক্রেনে ঝোলানো বিরাট বালতিতে নামিয়ে দিয়ে কুবেরের কাজ শেষ হল। একটু আগে বেরিয়ে একটা-পঞ্চাশের ট্রেনটা ছুটতে ছুটতে ধরল। জানলার ধারে বসতে চিরকাল ভালোবাসে। সাদা শার্ট গায়ে একটা লোক সেখানে বসে। আর তিনটে জানলা তিনটে বাচ্চা আগেভাগেই দখল করে আছে।

সাদা শার্টের গায়েই বসল। লোকটার ঠোঁট, হাতের আঙুল ও গলায় শ্বেতি। কতবার শুনেছে—এসব জিনিস ইনফেক্সাস নয়। তবু একটু ফাঁক রেখে বসল। লোকটা গল্পবাজ। নিজেই আলাপ করল। কী মনে হতে জানতে চাইল, ‘রোগটা কী?’

শ্বেতিওয়ালা যা বলল তা এই—

ঠিকাদারের সঙ্গে মাঠে মাঠে কাজ মাপত। রোদের আলো নাকি এইসব রোগে চামড়ার শত্রু। আগেকার শভার চিনির বড়ো বড়ো দানার মতো আমাদের গায়ে কালো রঙের দানা আছে। রোদে সেসব দানা জ্বলে গিয়ে তার ঠোঁটে, গলায়, হাতে এই অবস্থা।

শেষে বলল, ‘গোড়াতেই যদি ডাক্তার দেখাতাম—’

‘কী হত?’

‘প্রথমে তো সামান্য ছিল। ছড়াবার আগে স্পটে অ্যারেস্ট করতে পারতাম।’

কুবের তার আঙুলগুলো উলটে লোকটাকে দেখাল, ‘খুব দেরি হয়ে গেছে?’

‘কতদিনের?’

বিমল ডাক্তারকে যা বলেছিল, তা সবই কুবের ফিরে বলল।

‘রোদ বাঁচিয়ে চলবেন—আমাদের মতো লোকের বড়ো শত্রু সূর্য।’

তাকে ওই লোকটার দলে টানায় কুবের শিউরে উঠল। তার মানে কিছুদিনের মধ্যে কুবেরের হাত-পা’র আঙুল, গলা, ঠোঁট সবই আস্তে আস্তে রং হারাবে—আর ফিরবে না।

ট্রেনের জানলা দিয়ে একদিকে শুধু কারখানার চিমনি, ছোটো ছোটো ঢালাই ঘরের কিউপোলা ফার্নেসের টোপর আর ইয়ার্ড দেখা যায়। কদমপুরের দিকে এখনও কারখানা যায়নি বিশেষ। মাঝে মাঝে কুয়ো খুঁড়ে পেট্রোল বের করার সরকারি যন্ত্রপাতি যায় মালগাড়িতে।

বুলু, ব্রজদা ইত্যাদি পরিচিত ইউজুয়াল এলাকা থেকে তাকে একদিন না সরে আসতে হয়। আঙুলের মরচেগুলোর বয়েস এখন প্রায় চার বছর। আরও বছর চারেক পরে হয়ত তার গায়ের রঙের দানাগুলো রোদে-জলে জ্বলে ফ্যাকাসে হয়ে আসবে। তখন আর বুলুর সঙ্গে মেশা যাবে না। সব সময় ফুলহাতা শার্ট পরে থাকতে হবে। অথচ জমি দেখতে গিয়ে আজ কিছুদিন ভীষণ রোদে পুড়তে হচ্ছে। তাও চটিরামের জায়গাটা হল না।

এসপ্ল্যানেডে এসে বাস থেকে নেমে রেডিমেড জামাকাপড়ের দোকানের শোকেসে একটা নীল রঙের শার্ট দেখে কুবেরের পা আটকে গেল। দারুণ জামাটা। পরলে তাকে রয়াল দেখাবে। কতকাল ফাইন জামাকাপড় পরে না। এভরি আধুলি এত সাবধানে খরচ করে আজকাল। শুধু মনে হয় যেদিন থেকে টাকা পয়সা আয় করে আসছে—সেদিন থেকেই বাজে খরচ না করে সব যদি জমাতে পারত, তাহলে আজ অন্তত চার-পাঁচ বিঘে জমি ক্যাজুয়ালি কিনতে পারত।

শার্টটা দেখে তার খুব ইচ্ছে হল, কিনে ফেলে। সেই সঙ্গে একটা লাগদার ট্রাউজার। আর একটা চকচকে কালো সু—মাথার চুল ছোটো, ডিস্টিংগুইস্ড হবে, মেট্রোর সামনে থেকে জওহরলাল নেহরু রোড ধরে সে স্কেট করে এগোবে—হাত দুখানা চলতি দুলুনির সঙ্গে ব্যালেন্সে বিশাল পাখির ডানার ধারায় দুলবে—বাসট্রাম সব বন্ধ—ফুটপাথে লোক ধরে না, তখন কুবের সাধুখাঁর মুখে এক্সটাসির চূড়ান্ত হাসি। ছেলেছোকরারা বলবে কী ফিগার! কুবের জানে তার ফিগার ভালো নয়। দর্জির মাপে চল্লিশ—কিন্তু ঢোলা প্যান্ট পরলেই তার নীচের দিকটা রেশন ব্যাগ হয়ে যায়।

কিংবা—

ফার্নেস বেড়ে ভিলাইয়ের স্টিল উইজার্ড স্কু সেন, দুর্গাপুরের পি কে পাল, বার্নপুরের ভাড়াটে এক্সপার্ট মাফেট দাঁড়ানো। সালকের কুবের সাধুখাঁ ফার্নেস ডোর উঁচু করে স্যাম্পেল স্পুনে আধ বাটি গলন্ত

ইস্পাত বের করে সিলিকা প্লেটে ঢেলে দিল। মাইল্ড স্টিল ম্যারিয়েবল অ্যান্ড ডাকটাইল।

গলন্ত ইস্পাতটুকু প্লেটে পড়ে আস্তে আস্তে ঠান্ডা হলে কুবের সেটাকে চৌদ্দ পাউন্ড ওজনের হাতুড়ির তিন বাড়িতে দু-খণ্ড করল। তারপর ভাঙা জায়গাটায় ইস্পাতের দানার ফরমেসন সেন-পল-মাফেটকে দেখিয়ে বলল, 'পারফেক্ট।'

ল্যাবরেটরিতে পাঠিয়ে দেখা গেল, অ্যানালিসিসে কুবেরই ঠিক।

তখন ফুটন্ত ইস্পাতের বুকটা নীলচে আগুন চেটে চেটে ঘুরে বেড়াচ্ছে। কুবের, সুকু সেন, পি কে পাল আর মাফেট ফাইভ লেগেড্ রেসের কায়দায় ভেতর দিকের পাগুলো জোড় মিলিয়ে নাচতে শুরু করল—গলায় কোরাস—'পারফেক্ট! মাউল্ড স্টিল ম্যালিয়েবল্ অ্যান্ড ডাকটাইল।'

'কী রে।'

আচমকা চড় খেয়ে ফিরে তাকাল কুবের। এসপ্ল্যানেড ভর্তি লোক। তার বুক-পকেটে ঘামে ভেজা সুতোয় পেঁচানো ফার্নেস গ্লাসের মাথা উঁকি দিচ্ছে। চুলে বোধ হয় ফার্নেসের চুন লেগে আছে। সামনে একখানা হাসি-মাখানো মুখ, 'খুব রেসপেকটেবল্ হয়ে গেছিস—চেনাই যায় না। সেই হ্যাগার্ড লুক কোথায়!'

কুবের একটুও চিনতে পারল না। কোথায় আলাপ করেছিল। কলেজে? রেলে ইন্টারভিউ দিতে গিয়ে? স্কুলে নিশ্চয় নয়। প্ল্যাটফর্মে?

কুবেরের গা টিপে বলল, 'মোটাও হয়েছিস। ভালো কথা, তুই নাকি জমিজমা কিনছিস খুব—কোথায় আছিস—দারুণ টু পাইস হয়!'

স্কুলেরই। সনৎ। চিনতে পেরেছে—খালিশমারির নাগদের বড়ো ছেলে সনৎ। খেয়া পার হয়ে স্কুলে আসত। কী চেহারা হয়েছে। কথা না বাড়িয়ে বলল, 'চল—শরবত খাবি রেলি সিং-এ।'

'হসপিটালিটি? চলো।'

শরবত ছাড়াও আরও কিছু খেলে ভালো হত। কিন্তু, সনৎ-সুদ্ধ বিল চড়ে যাবে।

'কত মাইনে পাস?'

'শ-দুই', তিনশো টাকার ওপর কমিয়ে বলল কুবের। সনতের যা চেহারা হয়েছে, তাতে সত্যি বললে ওর গায়ে লাগত।

'অনেক! আমায় একটা কাজ দেখে দে না—শ-দেড়েক হলেও চলবে।'

'কতদূর পড়লি?' দেখা হয়নি বহুকাল। কুবের আন্দাজে ঢিল ছুঁড়তে থাকল। ক্লাসের ফার্স্ট বয়, লাল টকটকে গায়ের রং, হেড স্যার বলতেন—'ফলো সনৎ—সনৎকে ফলো করো সবাই।'

সেই সনৎ। হাতের আঙুল উপুড় করে আর একবার দেখল কুবের। আজই ট্রেনের লোকটা বলেছে,

সূর্যই আমাদের সবচেয়ে বড়ো শত্রু। দোকানের ভেতরটা ছায়া।

'আইএস-সিতে গিয়ে এমন আটকে গেলাম—ছ-ছটা ভাইস চ্যান্সেলার হজম হয়ে গেল—আমি কিন্তু এক জায়গাতেই।'

'জমিজমা কিনেছি কে বলল?'

'খবর পৌঁছোয়। আমাদের বাড়ি বিজন মুহুরি ছিল মনে আছে—সে তো এখন তোদের সেই জায়গার সাবরেজিস্ট্রি অফিসে বসে। তোকে দেখেছে কাগজপত্র নিয়ে ঘোরাঘুরি করতে।'

'আচ্ছা সনৎ—একদিন দুপুরের কথা তোর মনে পড়ে?'

'কবে?'

'ফর্টিফোরের সামারে—বীরেন লস্কর স্যারের ফেয়ারওয়েলের আগের দিন, ক্লাস এইটে, আমি আর তুই দুজনে সাইকেল রিকশায় ফেরিঘাট চলে গেলাম—'

'আমার হাতে বাবার সাদা তামাক কেনার টাকা; তোর কাছে রেশন আবার ব্যাগ, টাকা—'

'ফেয়ারওয়েলের প্রাইজ কেনার টাকাও ছিল—'

'লরি লরি সৈন্য যাচ্ছিল—'

'টিফিনে বেরিয়ে সেভেনথ পিরিয়ডে ফিরে এলাম আমরা।'

সনৎ হাসতে হাসতে বলল, 'ফেয়ারওয়েলের ধুমধামের মধ্যে কেউ আর কিছু বলল না সেদিন। নয়তো হেড স্যার লম্বা করে দিত।'

'তারপর তো তুই দেশের বাড়ি চলে গেলি। বম্বিং-এর ভয়ে সেখানে ভর্তি হয়ে গেলি—আমরাও বছর দেড়েকের ভেতর কলকাতায়—'

'একবার দেখা হয়েছিল—তোরা যেদিন প্ল্যাটফর্মে ট্রেনে উঠতে এসেছিলি—'

'কোথায়? আমি তো দেখিনি তোকে সনৎ।'

'সামনেই যাইনি। আমরা সেদিন দেশের বাড়ি থেকে শহরে ফিরে আসছি—তোর চেহারা কী খারাপ হয়ে গেছে—ন্যাড়া, এমনিতেই হ্যাগার্ড দেখতে ছিলি, আরও বিচ্ছিরি হয়ে গেছিস—'

'কেন জানিস?'

সনৎ অবাক হয়ে তাকাল, 'বাঃ! এতকাল পরে কী করে জানব?'

কুবের অনেক কিছু মনে করার চেষ্টা করল। কিছুই মনে করতে পারল না । শেষে বলল, 'আচ্ছা, সেদিন প্ল্যাটফর্মে দেখেও এলি নে কেন?'

সনৎ হাসতে হাসতেই বলল, 'এখন এত ছেলেমানুষি মনে হবে বলেই হাসি পাচ্ছে। কেননা, এখনও

তো আমি প্রায়ই যাই—কত লোক যায়, কেউ কেয়ারও করে না—'

কুবের চুপ করে তাকিয়ে আছে, আয়নার কালো শার্টটা দেখা যাচ্ছে না। সনৎ অ্যাট ইজ বলল, 'দেশে ফিরেই হপ্তা দুই বাদে তোদের বাড়ি গিয়েছিলাম—বারান্দা থেকেই তোর দাদা হাঁকিয়ে দিল—রীতিমতো থ্রেটেনিং—আমি তো ভড়কে গেলাম। কী হল! শেষে ভয় হল, তুই কি এতই কাঁচা—সব বলে ফেলেছিস—?'

'আচ্ছা, তারপর তোর কিছু হয়নি?'

'কী হবে? কতবার গেলাম—'

কুবেরের গায়ে কাঁটা দিয়ে উঠল। একদিন দুপুরের কাণ্ড তার কত কী গণ্ডগোল করে দিল।

'যাঃ। গ্রেভ করে দিচ্ছিস চারদিক। বিয়ে করেছিস?'

কুবের মাথা নাড়ল।

'ছেলেপিলে?'

'একটা ছেলে—তোর? মানে, বিয়ে করেছিস?'

'কবে! কিন্তু, মাইরি বউটাই আঁটকুড়ো—'একটু থেমে নিজেই বলল সনৎ, 'এক দিক দিয়ে ভালো—নো রিসক্ ফুল গেইন!'

কুবের চুপ করেই ছিল। খালি পেটে শরবত পড়ে গা গোলাচ্ছে। কথা না বলে বাড়ি চলে গেলে ভালো হত। পাহাড়ি দেশে একরকম জন্তু আছে—তার খানিকটা কেটে খেলেও আবার গজায়—আবার খাওয়া যায়। আয়নার দিকে পিঠ ফিরিয়ে সনৎ বসে। কথা বলছে, মুখের ভেতরটা অনেক দূর দেখা যাচ্ছে—কালচে, কেমন খাওয়া-খাওয়া পোকায় কাটা।

'তবে অন্য জায়গায় যাস কেন?'

'এক গ্লাস শরবতে এত কথা হয় না। কী খাবি বল?'

'পকোড়া নে।'

টমেটোর সস্ মাখিয়ে একটা বড়ো অনেকক্ষণ ধরে তারিয়ে তারিয়ে চিবিয়ে বলল, 'ভালো লাগে। হবিষ্যির পর মুখ ফেরায় না কে?' সনৎ নিজেই বলে গেল, 'বিয়ে দিয়ে বাবা স্বর্গে রওনা হলেন। মা গিয়ে মামাবাড়ি উঠল। এক বউ নিয়ে কতকাল কলকাতার ভাড়াটে খোপে নতুন লাগে তুই বল?'

'ডাক্তার দেখালে পারিস—অনেকে বেশি বয়সে কনসিভ করে।'

'মানে?'

'বেশি বয়সে গর্ভ হয়। কতরকম চিকিৎসা হয়েছে আজকাল—'

সনৎ থামিয়ে দিল, 'বেশ আছি। ডাক্তারের কাছে গিয়ে কী হবে—,' এ-ব্যাপারে আর কথা বাড়াতে না দিয়ে সনৎ বলল, 'দে না মাইরি একটা চাকরি, শ-দেড়েক হলেই চলবে—এক কেয়ারটেকারের অ্যাসিস্ট্যান্ট হয়ে আছি—দো বেলা ফ্রক পরা বুড়ি-ধুড়ির মড়া বাক্সে ভরছি, পার ক্রস টাকায় তিন পয়সা কমিশন—'

'মাইনে নেই?'

'সে বেলায় টাইট! অ্যালাউন্স—মানে জলখাবার, আর ট্রামের একখানা অল সেকশন মান্থলি। তুই বল কুবের, টাকায় তিন পয়সা হলে কত লোক মরলে তবে মাস গেলে একশো টাকা হয়? আগে তবু সবাই বেলেপাথরের ক্রস দিত, আট দশ টাকার ভেতর হয়ে যায়। তারপরও কম্পিটিশন। নতুন নতুন লোক ব্যাবসায় এসে স্রেফ কাঠের ক্রস পাঁচ টাকার ভেতর ছাড়ছে—নিজেদের পায়েই কুড়ুল মারছে —'

কুবের পুরো ব্যাপারটা শর্টকাট করার জন্যে বলল, 'তবু প্রিয়জন মরলে লোকে একটা স্থায়ী জিনিসই বানায়। দেখবি কাঠের জায়গায় পাথর আবার দখল করে ফেলবে। পাথরের মতো আবার জিনিস আছে নাকি। কেটে কেটে নাম লিখে রাখো—শ্যাওলা পড়লেও জেগে থাকবে—'

সনৎ এসব কিছুই শুনতে পায়নি। ভোঁতা নাক দিয়ে গরম জল ছেটাতে ছেটাতে একটা ডবল ডেকার এসে শব্দ করে ব্রক কষল। প্যানিকি প্যাসেঞ্জারেরা পড়িমরি করে নামছে।

সেই গণ্ডগোলের ভেতরেও সনৎ শুরু করে দিল, 'গত চোতের আগের চোতে স্মল-চিকেন মিলিয়ে তালতলা, কিড স্ট্রিটে বেশ ব্যাবসা হয়েছিল! সব মিলিয়ে পুরো সিজিনটা দেড়শো-দুশো টাকা মাস গেলে পেয়েছি। অবিশ্যি ফুর্তির চোটে পয়সাও ধরে রাখতে পারিনি। এসেছে—গেছে। সরকারি ঠিকেদারদের এমন আঠা কাজে—গত বছর অ্যায়সান টিকে দিয়ে গেল যে, সারা চোত-বোশেখ একেবারে লবডঙ্কা। মোটে সাহেবদের পাড়া-বেপাড়া মিলিয়ে শতখানেক ক্রসও বিকোলো না।' কুবের শুনছে কিনা বোঝার চেষ্টা করল। কিছু বোঝা গেল না। তার দিকে মুখ, চোখ রাস্তা পার হয়ে মনুমেন্ট দেখছে।

মাসান্তে দেড়শো টাকা দেয় এমন একটা পাকা চাকরি সনতের খুবই দরকার।

'এখন তো বর্ষার সময়—লাস্ট টেন ইয়ার্সে ফি বছর কত বড়ো বড়ো সাহেব-বাড়ি কলেরায় বিলকুল ফৌত হয়ে গেছে, শুধু পাথরের অর্ডার। এবার দ্যাখ কি ফাইন বর্ষা, এক একদিন কলকাতা ভেসে যাচ্ছে—তাও সিজিন জমছে না—'

'থামবি?'

থামাতে গিয়ে কুবের প্রায় চিৎকার করে উঠেছে। কাউন্টারে ম্যানেজার গোল করে তাকাল। সনৎ চমকে উঠেছে। সামলে নিতে গিয়ে মুখ বেঁকে গেল, 'কেন?'

‘সে তুই বুঝবি নে—’

‘ওঃ!হিউম্যানিটি! তা তুই হিউম্যানিটি চোষ গে—’

‘হিউম্যানিটি? এসব কথা তুই জানলি কী করে?’

‘লোকে বলে। শুনি,’ সনৎ থামল না, তবে আস্তে গুনগুন করে বলল, ‘না, তুই কিনা বললি প্রিয়জন! আজকাল আবার প্রিয়জন কী রে? যে যার কাছে প্রিয়—যে যার কাছে—’

‘কেন? তোর বউ? প্রিয় না?’

‘বুঝি নে। তবু একসঙ্গে থাকি। শেষ রাতে ঠান্ডায় কুকুরকুণ্ডলা মেরে ঘুমোতে দেখলে নিশ্চয় উঠে গিয়ে পায়ের দিকের জানলা আটকে দিই—ওই আর কী? বললাম না একসঙ্গে থাকি।’

‘কষ্ট হয় না কখনো?’

সনৎ মনে করতে পারল না। শেষে অনেক মাথা খাটিয়ে বলল, ‘ফুর্তির দিনে চোলাই পেটে গেলে দেখেছি অম্বল হয়ে আমার বুক ব্যথা করে—দম আটকে আসে, ভেতরের সব বাতাস বোধ হয় একসঙ্গে ওপর দিকে উঠতে চায়—কিংবা কুবের—তুই বিশ্বাস করবি কিনা জানি নে, ছ-আউন্স রামের পর তিন আবার গাঁজা টেনে বিকেলের দিকে গড়ের মাঠে চিত হয়ে শুয়ে থাক—দেখবি তুই খালি পিছলে পড়ছিস, পৃথিবীটা লাটিমের মতো পাক খাচ্ছে, আর তুই কোনোক্রমে ব্যালান্স করে শুয়ে আছিস, টাল খাচ্ছিস, পৃথিবী ঘোরার সাঁইসাঁই শব্দও শুনতে পাচ্ছিস—তখন মাইরি কুবের, আমি নাকি সঙ্গের লোকজনকে বলি—আমাকে কাইন্ডলি বউয়ের কাছে পৌঁছে দিবি—একেবারে বিছানায়—তখন যদি কেউ আমাকে জাপটে জড়িয়ে ধরে—’

‘ধ্যাত শালা—বউ, বউ—তুই!’ বলতে বলতে কুবের উঠে দাঁড়াল, ‘কথায় কথায় বিকেল কাবার করে দিলি—’

‘ঠিকানাটা দে।’

অফিস ছুটির ভিড় শুরু হয়ে যাচ্ছে। এখন ট্যাং ট্যাং করে সালকে ছুটতে হবে। সেই পিলখানার ধারে। সনৎ বাড়ি চিনে চিনে গেলে বিপদ। কী বলতে কী বলবে। বাবা ঠিক চিনে ফেলবে।

রোজ ট্রামে নতুন গজানো এক স্নো কোম্পানির ভয়ংকর সব বিজ্ঞাপন দেখতে দেখতে যায়। কত নম্বর ক্যানাল ওয়েস্ট রোড যেন লেখা থাকে। রাস্তার নামটা দিয়ে বলল, ‘লিখে নে, সতেরোর দুই—দোতলায় উঠে বাঁদিকের ফ্ল্যাটের দরজায় কড়া নাড়বি।’

'কী হল—', পারলে বুলু জোরে কেঁদে উঠত। এক একদিন মনে হয় এত চাপে বুকের পলকা হাড়গুলো মুড়মুড় করে ভেঙে যাবে। অথচ তখন খেয়াল থাকে না।

'ঠিক করেছি—,' খোকনের পা বুলুর পেটের ওপর পড়ল।

নাকে অনেকটা বাতাস ভরে বুলু অন্ধকারে শুয়ে শুয়েই হাসল। খুকখুকের বদলে একটা বড়ো উঁ ধরনের আওয়াজ হল। বুলুর কুবেরের ওপর খুব রাগ। বউ কষ্ট পাবে—চাই কি কাটা-ছেঁড়া করতে গিয়ে মরেও যেতে পারে—সেজন্য এমন পুতুপুতু হয়ে চলবে?

'মনে নেই? খোকনের বেলায় মর মর হয়েছিল—'

'তা বলে রোজ ফেলে দেবে?' বুলুর মাথায় আগুন ধরে যাওয়ার জোগাড়। হিসেব মতো আজ বোধ হয় জোড় দিন ছিল। তারও প্রায় হয়ে এসেছিল—অথচ এমন সময়—

অন্ধকার। আয়না থাকলেও মুখ দেখা যাবে না। মশারিতে কে আর আয়না রাখে। একটু আগে বুলুর শেকড়-বাকড়সুদ্ধ কুবের মোটা ভারী শাবল দিয়ে খুঁড়েছিল। এক এক খোঁচায় বুলু ডালপালাসমেত ওপরে উঠে যাচ্ছিল—আবার নীচেও পড়ছিল। এসব সময় কুবেরকে তার এত নিজের—এত জোরালো, ভর দিয়ে দাঁড়ানোর মতো লাগে। পিঠ, পিঠের হাড়, হাত দুখানা খুঁতে সবচেয়ে আরাম। এক একদিন কিন্তু সে আগে ফুরিয়ে যায়—কুবের খুঁড়ে চলে। সেসব সময় নিজেকে একটা কাঠামো মনে হয়, একেবারে কাঠের—কুবের আরও বড়ো কাঠামো—তখন খুঁড়লেও শরীরের ভেতরের শক্ত জিনিসপত্রে শুধু গুঁতো।

কুবের মুখ খুলল না। এসব কথার জবাব আসে না তার। কত কাজ বাকি। ধনরাজের টাকাটা নিয়ে চটিরামের জমি বায়নার কথাই বুলু জানে। বায়নার টাকা ফেরত নেওয়ার কথা জানে না। কীভাবে বলবে? সেদিন সারাদিনের ওই টানাপোড়েনের পর এখন কীভাবে বলবে বুলুকে?

বুলু কুবেরকে খোঁচাল না।

কুবের মনে মনে পুজো প্যান্ডেলের ধারায় বাঁশের কাঠামোর মতো পর পর তার প্ল্যান সাজিয়ে দেখল—এখন অনেক কাজ বাকি। ন্যাড়া করণীয়গুলো মাথা ঠেলে শুধু বাইরে বেরিয়ে আছে।

সস্তায় খানিকটা জায়গা ধরতে হবে। তারপর সে জমিতে মাটি ফেলে উঁচু করার ব্যাপার আছে। মাটি বসতে বছর দুই—তারপর ভিত খোঁড়ার পালা। ভিতের আগে অবশ্য প্ল্যান—ক-তলা বাড়ি হবে তাও ভেবে-চিন্তে ঠিক করতে হবে। ধনরাজ তো বার-বার দেবে না। এই অবস্থায় আবার যদি বুলুর পেট ফুলে ওঠে—সে এক দুশ্চিন্তা।

‘তোমার তো কোনো চিন্তা নেই—হলেই হল।’

বুলু ঘুমিয়ে পড়েছিল প্রায়, ফোঁস করে উঠল, ‘তোমার জমিজমা কবে শেষ হবে বলতে পারো?’

‘হয়ে এসেছে—’

‘চটিরামের জায়গাটুকু কিনে স্থির হয়ে জিরোও কিছু দিন—এই যে সারাদিন চরকির মতো ঘুরে বেড়াচ্ছ—কোনদিন আবার রাস্তায় অজ্ঞান হয়ে না পড়ে যাও।’

একবার জ্ঞান হারিয়ে রাস্তায় পড়ে গিয়েছিল কুবের। বছরখানেক আগে। সকালবেলা খিদের মুখে পাঁচখানা আটার রুটি গিলে বেরিয়েছিল। হজম না হয়ে শেষে কী যন্ত্রণা বুকের ভেতর। প্রায় দৌড়ে বাড়ি ফিরছিল। ট্রাম-বাস বোঝাই, ট্যাক্সিগুলো হাত তুললে থামে না—বড়ো রাস্তার মোড়ে ঘুরে পড়ে গিয়েছিল।

অজান্তে বাঁ হাতের কড়ে আঙুলের গাঁট গায়ে ঘষে দেখল কুবের। জায়গাটা শুধু কালোই হয়নি—কেমন খসখসে হয়ে যাচ্ছে। ডাক্তার দেখাতে হবে।

‘চটিরামের জায়গা কেনা হবে না।’ অন্ধকারে মুখ দেখা যায় না। এই সময় কঠিন কাজ খুব সোজা হয়ে যায়।

‘কেন?’

কুবের সব বলল। খানিকক্ষণ কোনো কথাই বলতে পারল না বুলু। সারাদিন শুধু রোদে পোড়ার ব্যাপারটা ঘুরে-ফিরে মনে পড়তে থাকল। ঠিকই করে ফেলেছিল, রাস্তার দিকে ফুলবাগান করবে। দোতলার ছাদে জ্যোৎস্না উঠলে খোকনকে তোলা বিছানায় উপুড় করে ঘুম পাড়াবে।

কোনো সাড়া না পেয়ে কুবের বলল, ‘অন্য কয়েকটা জায়গা দেখেছি। দর অনেক কম—তবে স্টেশন থেকে খানিকটা দূরও বটে। দেখো, ঠিক কিনে ফেলব।’

‘কেনাকাটা বন্ধ করে চলো কোথাও ঘুরে আসি।’

‘বাঃ! এতদিন পরে একথা বলছ কেন?’ কুবের আরও জানতে চাইতে পারে। যেমন, ‘আমিই তো সে কথা বলেছিলাম গোড়ায়। কিন্তু তুমি বলেছিলে, না, আগে জায়গা কেন—তারপর ঠিক বাড়ি হয়ে যাবে।’

‘বিয়ের পর কোথাও আমরা যাইনি কিন্তু—’

কুবের কিছু বলতে পারল না। কোথাও যাওয়া হয়ে ওঠেনি ওদের। টাইম অফিসের রামকৃষ্ণভক্ত সাধু প্যাটার্নের অমৃতদের বাড়ি ত্রিবেণিতে একবার গিয়েছিল দুজনে। দারুণ যত্ন-আদর হয়েছিল। তখনও খোকন হয়নি। আর একবার কেষ্টনগরে মামশ্বশুরবাড়ি গিয়েছিল। সারাটা দুপুর ট্রেনে গরমে কাটল। মামাশ্বশুর টাকার অভাবে কলি ফেরাতে পারেনি। ভাঙা ছাদের বিপদ জানান দেবার জন্যে কার্নিশের কোলে একটা তিন পা চেয়ার উলটে রাখা রয়েছে। খুব যত্ন পেয়েছিল কুবের—উঠোনের ইঁদারার

জল খেয়ে অম্বলভাবটা কেটে গিয়েছিল কয়েক ঘন্টায়।

কিন্তু এসব তো কাছে-পিঠের জার্নি। বুলু কতদিন বলেছে, ‘চলো না যশিডি ঘুরে আসি।’

মধুপুরে কুবের একটা বিনে ভাড়ার বাড়িও পেয়েছিল। অথচ শেষ অবদি যাওয়া হল না।

ফার্স্ট ক্লাসে কতকগুলো টাকা শুধু শুধু গচ্চা। থার্ড ক্লাসে স্লিপিং বার্থ রিজার্ভ করে জানলায় পর পর দুটো সিটে বিছানা পেতে দুজনে নাগপুর নয়তো দিল্লি যাবে—বাইরে বৃষ্টি হবে, খোকন অবেলায় ঘুমিয়ে ফুলো ফুলো মুখে উঠে বসে জানলা দিয়ে অবাক হয়ে তাকিয়ে থাকবে—তখন কুবেরদের মেলট্রেন ফুলস্পিডে একটা স্টেশন মাড়িয়ে চলে যাচ্ছে, অনেক কষ্টে স্টেশনের নামটা পড়া যাবে—রাজনন্দগাঁও।

কিন্তু এখন কোথাও যাওয়ার উপায় নেই। চার-পাঁচ জায়গায় কুবের চার ফেলেছে। চিনের মোড়ে কাটাখালের মুখোমুখি একটা প্লট দেখেছে। সব ভালো—শুধু স্টেশনে পৌঁছোতে হাঁটতে হবে অনেকটা।

‘রাজগীর যাবে? হট স্প্রিংয়ে চান করবে—’

‘কেন? আমার কি বাত হয়েছে?’

‘হুঁ । হয়েছে—মাথায় হয়েছে—,’ বলে কুবের অন্ধকারেই বুলুর মাথাটা ধরে ঘোরাতে গেল। রেডিয়োর নব নয়। ফলে ঘোরানো গেল না।

‘উঃ! লাগে না? ছাড়ো বলছি—’

বুলুর গলা চিনে গেল। আজকাল কুবের রোজ এত মোটা হয়ে যাচ্ছে—ঘাড় ঘামে, হয়ত সেখানে কিছু দিন পরে খানিকটা থলথলে মাংস গজাবে।

চলন্ত মোটর, চলন্ত ট্রেন, চলন্ত রিকশায় বুলুর পাশে বসে হাওয়া কেটে এগোতে এত ভালো লাগে।

বুলু মাথা ঘুরিয়ে মশারি ফেলে—ঘুমোনো শুরু করে এবার।

আঙুলের খসখসে জায়গাটা অজান্তে আর একটা আঙুলে একটু ছুঁয়েই থেমে গেল কুবের। সেদিন কতদিন পরে দেখা হল সনতের সঙ্গে। এই সনতের সঙ্গে একদিন দুপুরে ক্লাস এইটে রিকশা চড়ে ঘোলাডাঙায় গিয়েছিল।

সেদিন তখন দুপুর ছিল। লরি লরি সোলজার কুকুর-মানুষ সব চাপা দিয়ে হুহু করে চলে যেত। ফৌজদারি উকিল জ্ঞান ঘোষ খারাপ মেয়ে-মানুষ পাড়ার পেছনে আমবাগানে একখানা বাড়ি ভাড়া করে থাকত। তার মেয়ে সেবার সন্ধেবেলা একদিন বিষ খেল। হরি ডাক্তার শেফালিকে বমি করানোর জন্যে সেদিন রাত আটটা নাগাদ তাদের বাড়ি ডিম চাইতে এসেছিল—কাঁচা ডিম খাইয়ে দিলে এই অবস্থায় নাকি হড়হড় করে বমি হয়ে যায়। পরে শুনেছিল শেফালি লজ্জা ঢাকার জন্যে মরতে গিয়েছিল। জ্ঞান ঘোষের বড়ো ছেলে ধীরেন নাকি প্রায়ই দুপুরে শেফালিদের বাড়ি যেত। এর সামান্য

কিছু জেনে আর অনেক বেশি শুনে কুবের তখন টুকরো ব্যাপারগুলো জায়গা মতো সাজিয়ে গরম হয়ে উঠত। তখন সবে তার গলা ভাঙতে আরম্ভ হয়েছে। কণ্ঠমণি দিনকে-দিন চামড়ার চাদর ঠেলে জেগে উঠছিল।

একদিন তো মফস্সল শহরের একেবারে দুপুরে দুই আমেরিকান সোলজার স্রেফ জাঙিয়া পরে জলে নেমে গেল। সঙ্গে ঘোলাডাঙার দুই মেয়েলোক। তাদেরও সাঁতার কাটতে হচ্ছে। পুকুরের চারপাশে শহরের ভিড় ভেঙে পড়েছে। বোমার ভয়ে সালকে ছেড়ে কুবেররা তখন ওই শহরে ভাড়া বাড়িতে থাকে।

একদিন দুপুর শুক্রবারের দেড়ঘন্টার টিফিনে সনতের সঙ্গে সাইকেল রিকশায় উঠে বসল। সনৎ নেড়া—সদ্য সদ্য পৈতে হয়েছে, পকেটে ব্রত-ভিক্ষার টাকা। কুবেরের বুক পকেটে খুচরো নোট মিলিয়ে প্রায় টাকা কুড়ি। লস্কর স্যারের ফেয়ারওয়েলের চাঁদা। ডাকবাংলোর মোড়ে স্টেশনারি দোকান থেকে ফাউন্টেনপেন কিনবে। স্যারকে দেওয়া হবে।

ডাকবাংলোয় দোকান বন্ধ। রিকশায় বসে ফুর্তি লাগছিল। রেলের মাঠে হিন্দুস্থানি বউ মতো একজন নিচু হয়ে ছাগলের খুঁটো পুঁতছে। সনৎ রিকশাওয়ালাকে বলল, 'স্টেশনের দিকে চলো।'

'ফিফথ্ পিরিয়ডে ফিরবি নে?'

'অনেক দেরি—খানিকটা ঘুরে নিই, চল—'

স্টেশনে যেতে হাতকাটা রিটায়ার্ড দারোগার 'গাঁজা ও আফিম'-এর দোকান। তারপরই ঘোলাডাঙার ফেরিঘাট। সনৎ হঠাৎ পয়সা মিটিয়ে দিয়ে কুবেরের হাত ধরে রিকশা থেকে টেনে নামাল, 'যাবি?'

'কেউ যদি দেখে ফেলে—'

'এখন কেউ আসে না। চল—'

বেলা দেড়টা হবে। ঘরে ঘরে জানলা বন্ধ। সন্ধেবেলা এই রাস্তা দিয়ে হেঁটে গেছে কুবের। তখন হারমোনিয়ম বাজে, গান হয়, পেঁয়াজি আর হিঙের গন্ধে গোটা পাড়া ম ম করে।

মোটাসোটা একজন ঘোমটা খুলে ওদের দেখছিল। সবে ভাত খাওয়ার পর পানমুখে জিভটা অনেকখানি বের করে বোঁটা থেকে একদলা চুন মুখে টেনে নিল। টেনে, কুবেরদের দিকে ফিক করে হেসে ডাকল।

সনতের সঙ্গে খানিক এগিয়ে যেতেই ঘোমটা ফেলে দিয়ে মেয়েলোকটা আবার ডাকল 'এসোগো। এই দুপুরে?'

এমন সহজে কথা বলছে দেখে কুবেরের হাত-পা আরও ঠান্ডা হয়ে গেল। ওরা দুজনে খিড়কি দিয়ে বাড়ির ভেতর ঢুকল—আগে আগে সনৎ।

ঘোমটা একদম ফেলে দিয়ে মেয়েলোকটা পিচ কাটল। বেশি জলে খুব অল্প খুনখারাবি রঙ গুললে

ফ্যাকাসে লাল হয়। একটা লাল শাড়ি পরা মেয়েকে বারান্দায় বসিয়ে ক-জনে মাথায় জল ঢালছে।

সনৎ থেমে দাঁড়াল, 'কী কুচ্ছিত মাইরি—'

কুবেরের কানের ভেতর দিয়ে তখন ভিমরুল উড়ে যাচ্ছে। কেবল 'কুচ্ছিত' কথাটা শুনতে পেয়ে বলল, 'এই মেয়েটাকে দেখ না—'

সনৎ তাকে আঙুল দিয়ে দেখাতেই বারান্দায় দাঁড়ানো সেই মেয়েলোকটা বলল, 'কেন? খারাপ হয়ে গেছি দাদাবাবু?' তারপর হেসেই বলল, 'ওর তো কাল রাত থেকেই চার ডিগ্রি জ্বর—'

সনৎ কুবেরের হাত ধরে খিড়কিতে বেরিয়ে এসে বলল, 'তবে আমরা চললাম।'

ওরা তখনও পথে পড়েনি। ভেতরে বারান্দা থেকে জল ঢালার আওয়াজ—আর তার সঙ্গে অনেকজনের হাসি একসঙ্গে ওদের পেছনে ছুটে এল।

গনগনে রোদ—বুড়ি বেশ্যারা গরম পিচের রাস্তায় সেদ্ধ ধান মেলে দিয়ে শুকোচ্ছে, মুড়ি হবে, পাড়ায় পাড়ায় ক-দিন পরেই বিকোতে বেরোবে। লম্বা লাঠি দিয়ে পায়রা তাড়াচ্ছে। টিনের খাপরার চালের ভাপাবো ছায়ায় পোষা বেড়াল কোলে একজন কুবেরের চোখে তাকিয়ে গেয়ে উঠল। গানটার এক চিলতে আজও ভোলেনি কুবের—

> 'ওরে কে কে যাবি আয়-য়-রে
>
> বাঁশি বাজে-এ-এ বিপিনে-এ'

হাসতে হাসতে গানটা থামিয়েছিল বুড়ি। পরনে বিধবার থান, একটা প্রমাণ সাইজের তোবড়ানো ঝুনো নারকেল মুখে, আঠা লাগানো পাটের কায়দায় কয়েকগাছি পাকা চুল ঝুলে।

সে-ই আঙুল দিয়ে একটা ঝুলবারান্দা দেখিয়ে, 'নোতুন এসেছে—জেগে আছে।'

ফিরেই যাবে ঠিক করে ফেলেছিল। দু-এক বাড়ি উঁকি দিতে এতক্ষণে যা চোখে পড়েছে তা হল, কেউ সায়া পরে হুমহাম করে ঘর মুছছে।—কেউ বা ভেতরের চাতালে রক্ষেকালী হয়ে কাপড় আছড়াচ্ছে—আর, সব জায়গাতেই প্রায় একই গন্ধ—দারুণ পেঁয়াজ-রসুনে বোধ হয় খুবই পচা কোনো মাছ জম্পেস করে কড়ায় চাপাবো হয়েছে।

এমন সময় সাইকেলে কাকামিঞার উদয়। উঃ! ভাবলেও এখন জ্বর আসে কুবেরের! দেখতে পেলে ঠিক বাবাকে গিয়ে লাগাত। সনৎকে হ্যাঁচকা টানে সেই ঝুলবারান্দার নীচে নিয়ে এল কুবের। তারপর দুজনে মরা ড্রেনের ওপর সরু সিঁড়ি ধরে দেড়তলায় উঠে এল।

কড়া নাড়তে হল না। দরজা খোলা ছিল। উঁকি দিতেই যে উঠে এল সে ফৌজদারি উকিল জ্ঞান ঘোষের খারাপ মেয়েমানুষের মেয়ে শেফালি—কিছুদিন আগে এরই জন্যে হরি ডাক্তার কুবেরদের বাড়ি থেকে কাঁচা ডিম চেয়ে নিয়ে গিয়েছিল।

‘তুই?’

কুবের বলল, ‘কাউকে বলবি নে—মেরে ফেলব তাহলে—’

শেফালি ভয় না পেয়ে হাসল, হেসে পেছন ফিরে ঘরে ঢুকতে ঢুকতে সনৎকে বলল, ‘কিছু খাবেন—?’

সনতের পেছন পেছন কুবেরও ঢুকল। শেফালি ঘরের ভেতর বড়ো আলোটা জ্বেলে দিয়ে আপনি আপনি করে কথা বলতে থাকল। যেমন—

‘দোরটা বন্ধ করে দিন—’

‘একসঙ্গে দুজনের তো একঘরে থাকার নিয়ম নয়—পুলিস ধরবে—’

‘আচ্ছা উঠবেন না—এক কাজ করছি—’

জ্যালজেলে ছাপা শাড়িটা অনেকখানি তুলে নিজেই পালঙ্কে উঠে টানানো নেটের মশারি ফেলে দিল, ফ্যাকাসে মুলোর চেয়ে ফকফকে সাদা দুখানা পা বেশ রোগা, ‘আপনাদের একজন ততক্ষণ ওই চেয়ারটায়— বসুন—কেমন ঘরের ভেতর ঘর হয়ে গেল!’

ড্রেসিং টেবিলের পাশে হাতল লাগানো সিংহাসন মার্কা চেয়ারটায় বসে কুবেরের পরিষ্কার মনে হয়েছিল, শেফালি মোটা হয়ে গেছে—ফর্সা। ফ্যানের হাওয়ায় কুবেরের শীত ধরেছিল। ঝুলবারান্দাটা দেখাতে গিয়ে বুড়ির হাত ঠিকই এই দেড়তলার ঘরের দিকে উঠেছিল, কিন্তু ঘোলা দুই চোখ তাকেই দেখছিল। অন্য সময় হলে কুবের দাঁড়িয়ে যেত—ভাব জমিয়ে বুড়ির সঙ্গে কথা বলত। বলতে বলতে বুড়ির চোখের ঘোর ভালো করে দেখে নিত। কিন্তু আর দাঁড়ালে ঠিক কাকামিঞার চোখে পড়ে যেত। পড়ে যায়নি তো?

পুলিসের লোক কাকামিঞা। দিন নেই দুপুর নেই সাইকেলে ঘুরছে কাকামিঞা।

কী খেয়াল হতে কুবের আয়না-টেবিলের দেরাজ খুলল। দুখানা ভাঁজ করা পাঁচ টাকার নোট—কিছু ছোটো ছোটো ছবি, দেখতেই কুবেরের চোখ ঠেলে উঠল, মুখ হাঁ হয়ে যাওয়ার জোগাড়। মশারির ঘরের দিকে পেছন ফিরে কুবের ফটোগুলো পকেটে পুরলো, নোট দুখানাও পকেটে ভরে নিল। একটু আগে সনৎ টাকাটা শেফালিকে দিয়েছিল।

সনৎ বেরিয়ে আসতে কুবের মশারিতে ঢুকল। ভেতরে শেফালি, বুনো চুনের গন্ধ ঝুলছে। পা-দুখানা খানিক দূর অবদি দেখা যায়। তারপর— ঘরের নীল আলোয় সবই প্রায় অন্ধকার। বর্ষাকালের ভিজে স্কুতলার গন্ধের ভেতর নামতে গিয়ে আগেকার সেই আবিষ্কার, গরম-ভাব সব কোথায় মিলিয়ে গিয়েছিল সেদিন। এখন পর পর সাজিয়ে ভাবতে গিয়ে কুবের একটা জিনিস বুঝতে পেরে ভীষণ ভয় পায়। লোকের পাশে লোক থাকে—অথচ কী ভয়ংকর সব জিনিসপত্র নিয়ে মেয়েলোক কেমন চুপচাপ থাকে সর্বদা। বেশিক্ষণ এগোতে হয়নি তাকে—প্রথমটা জ্বলে গিয়েছিল, তারপর মাথার ভেতরের

ঘিলুর খানিকটা কে সুড়ৎ করে চুষে নিল—সেই ফাঁকা জায়গা দিয়ে শব্দ করে হাওয়া পাস করছে আজও।

পরদিন খুব ভোরে, বুলু তখনও ঘুমে, চারটে পঞ্চান্নর ট্রেনে কুবের চেপে বসল। সরু পিয়াসলে ট্রেনটা থেমে থাকল পেট্রোলের খোঁজে। ভারী ভারী ড্রিলিং পাইপ বোঝাই হয়ে একটা গুডস্ ট্রেন গেল। ইলেকট্রিফিকেশনের ওভারহেড তার পোস্টে টেনে টেনে লাগানো হচ্ছে। যে কোনো উপায়ে ইলেকট্রিক ট্রেন চলবার আগেই এদিকে জমি কিনতে হবে কুবেরকে।

ব্রজদা বাড়ি ছিল। ঘুমচোখে চা খেয়ে কুবেরকে বলল, 'চল তোকে এক জায়গায় নিয়ে যাই। গোটা সাউথ বেঙ্গল—মায় বে অব বেঙ্গলের খানিকটা ভবেন শী বন্ধকি কারবারে কিনে রেখেছে।'

কদমপুর বাজারে ঢুকতে ভবেন শী-র দোকান। আদ্দির ফতুয়া টেবিল ফ্যানের হাওয়ায় ঘাড়ে গর্দানে কাঁপছে। সামনের বড়োঘরে এক ফর্সা বুড়ো করজোড়ে বসে। আলাপ করিয়ে দিতে ভবেন বলল, 'কী দরকার আপনার? বাড়ি না জমি?'

কুবেরকে চুপ করে থাকতে দেখে বলল, 'রাস্তা নেই এমন জমি সরু পিয়াসলে দিতে পারি—ধান হয় এখনও, সাত হাজার টাকা বিঘে। এ-বছর পুকুর কেটে সামনের বছর ভিত বানাতে পারবেন। তৈরি বাড়ি যদি কেনেন—তাও পাবেন। এই তো বাজারের মোড়ে আছে—দোতলা, টিউবয়েল পুকুর দুই-ই আছে—একতলায় তিনখানা ঘর, দোতলায় ভালো চিলেকোঠা—চব্বিশ হাজার পড়বে, রেজিস্ট্রি খরচ আলাদা।'

'অত টাকাই নেই আমার!'

'তাতে কী? এগ্রিমেন্ট করে নেব। দশ বছরের কিস্তিতে শোধ দেবেন—সাড়ে বারো পারসেন্ট সুদ পড়বে, দলিলখানা মর্টগেজ থাকবে আমার কাছে—শোধ হয়ে গেলে ফেরত পাবেন।'

কুবের বোমকে যাওয়ার দাখিল। এমনও হয় নাকি! মুখে বলল, 'তার চেয়ে স্টেশনের ধারাধারি আমায় একটু জায়গা দিন। ছোট্ট বাড়ি করে নেব সুবিধেমতো। অফিস-ফেরত ট্রেন থেকে নেমেই যেন বাড়ির উঠোন চোখে পড়ে—'

'তাই বলুব। যেমন চাইবেন তেমন পাবেন। কাল সকাল সাড়ে ন-টায় আসুন—সঙ্গে লোক দেব—সরু পিয়াসলেই কুড়ি শতক—ধরুন গিয়ে বারো কাঠা দু-ছটাক জমি আছে। চরণদার লোকটিকে গাড়িভাড়া দেবেন দুটি টাকা। একবেলা আটকে থাকবে বেচারা।'

বাইরে বেরিয়ে দেখল রুপোর একগাদা গহনা গায়ে এক ঘুঁটেওয়ালি দাঁড়ানো। কোলে একটা সাদা হাঁস। ভবেন শী ভেতরে থেকে ডাকল, 'কইগো—কী এনেছ?'

ব্রজ কুবেরকে ভেতরে পাঠিয়ে কার সঙ্গে কথা বলছিল। কুবেরকে দেখে এগিয়ে এল, সব শুনে

বলল, ‘ততক্ষণ আমার ওখানে বসবি চল—’

আভা বৌদি একটা বেঁটে ছাতা মাথায় দিয়ে কোত্থেকে ফিরছে। বাঁ হাতে একটা ব্যাগ, ‘খালপাড় থেকে মাছ নিয়ে এলাম—মেছুনিরা রাতে পোলো বসিয়ে রাখে, ভোর ভোর তুলে পাড়ে বসেই যা ধরা পড়ে বেচে দেয়—’

ভোরে ব্রজদার বাড়িতে কুবের খেয়াল করেনি, আভা বউদি ঘরে নেই। ফ্রিলের ঝালর দেওয়া ব্লাউজের হাতা কনুই ছাড়িয়ে নেমে এসেছে—তারপর লাল রঙের দু-গাছা ভারী কাচের চুড়ি—বালা বললেও দোষ নেই। সুরমাটানা চোখে মণিদুটো হলদে হয়ে ঠেলে উঠছে—কাল রাতে বেমক্কা খোঁচা খায়নি তো?

‘বসবেন চলুন—টাটকা পুঁটি মাছ ভেজে দেব—’

ঘরে বসে ব্রজদা যা বলল, তার মর্মার্থ : ভবেন শী সস্তার বাজারে বন্ধকি কারবারে নামমাত্র পয়সায় বিরাট বিরাট সম্পত্তির একেবারে ফালতু মালিক হয়ে বসেছে। বন্ধকি সোনার গয়না মেয়াদ ফুরোতেই গালিয়ে বেচে দিয়েছে। এখন এত টাকাপয়সা, জমিজায়গা, পুকুর, খামারবাড়ি, যেন-তেন না ওগরালে বিপদ। বয়েস বাড়ছে—বড়ো ছেলেটাও নেশাভাং ধরেছে, ঘরে গিন্নিরও রোজ নাকি এক পাঁট না হলে সন্ধেই মাটি হয়ে যায়—এই অবস্থায় পুলিস, ইনকাম ট্যাক্সের লোক সবাই ছোঁকছোঁক করছে। টাকা দিয়ে কতদিন আর সামলাবে? তবে, লোক ভালো—গরিব হলেও ব্রজ ফকিরকে বিপদে-আপদে দেখে।

‘যা-ই বলো, তোমার এত পিরিতের ভবেন কিন্তু সুবিধের নয়।’ বারান্দায় তোলা-উনুনে চাপাবো কড়ার মাছগুলো এপিঠ-ওপিঠ ভাজতে ভাজতেই আভা বৌদি বলল।

মেঘ করে আসা সকালে টালির ছাদের নীচে এই চিলতে বারান্দায় আলোই আসেনি। কাঠের আঁচে এক-একটা আগুন শিখা হয়ে উঠেছে—তাতে আভার মুখ, মুখে বসানো হলদে কালো চোখের মণি—সবই অন্যরকম হয়ে যাচ্ছে। কাল শেষ রাতে ঘুমিয়ে পড়েছিল। এতক্ষণে নিশ্চয় ঘুম ভেঙেছে। ব্রজদা এক খাবলা তেল মাথায় চাপড়ে গামছা কাঁধে লাফিয়ে বেরিয়ে গেল। নিশ্চয়ই সেই সেপাই-এর কেলির পুকুরে।

‘দেখুন তো—এত জ্যান্ত। অনেকক্ষণ ভাজলেও ভেতরে দগদগে রক্ত থাকে—,’ আভার একটা বেণি ঝপাং করে কুবেরের পিঠে পড়ল, বাসি তেলের গন্ধ মাখানো মাথাটা তার ঠিক কপালের ওপরেই। অনেকটা ঝুঁকে পড়ে কথা বলছিল।

আভা হঠাৎ টান টান দাঁড়িয়ে পড়ল, ‘কাল সন্ধেয় আমি নিজেই খালপাড়ে গিয়েছিলাম—আপনার দাদা ফিরতে সেই রাত দশটা, জ্যোৎস্নার মধ্যে ছিটছিটে এমন বৃষ্টি শুরু হয়ে গেল, শেষে একটা পাকুড় গাছের নীচে গিয়ে দাঁড়ালাম—’

অন্ধকার হয়ে আসা ঘরে বুকচিতানো বোকা পাখির কায়দায় আভা দাঁড়িয়ে। কাল সন্ধেবেলা হাতায়

তিন থাক ঢেউ তোলা এই ব্লাউজটা পায়েই হয়তো খালপাড়ে গিয়েছিল।

মেছুনিদের পোলো বসাবার সময়—হাতে পয়সা নিয়ে গিয়েছিল, তখন হাতে পেলে ওদের সুবিধে—হাটবাজার করে ফেরে—

বড়ো একটা ধান্য পুঁটির পিঠ তুলে কুবের মুখে দিল।

'বৃষ্টি থামতেই পাকুড়তলা থেকে বেরিয়ে একটু এগিয়েছি—বাঁ হাতেই ইটখোলার মাঠ জ্যোৎস্না পড়ে খাঁ-খাঁ করছে, আমার যেন গলা শুকিয়ে কাঠ হয়ে আছে অনেকক্ষণ—ভীষণ জল খাওয়ার ইচ্ছে হল, কোথায় যাই —একবার মনে হল মেছুনিরা পোলো বসিয়ে চলে গেছে অনেকক্ষণ, ভুল সময়ে এসে পড়েছি, একেবারে একা-একা, এই মাঠে—কোথায় যাই, আচমকা নস্করদের পোড়ো বাগানে তাকিয়েছি—কী বলব আপনাকে, ঢ্যাঙা ঢ্যাঙা দুই সারি তালগাছের ফাঁকে আকাশের সরু মতো গলিটা ধরে চাঁদ একেবারে কদমপুরের মাথার ওপর নেমে এসেছে—'

একবার ইচ্ছে হল থামায় আভাকে। মোড়ায় বসে এক গ্লাস জল খেয়ে একটু জিরোক। থামানো গেল না। মিড ট্রেনটা হাঁপাতে হাঁপাতে প্লাটফর্ম ছাড়ছে। দু-হাত মেলে ধরল আভা, 'এই এত বড়ো চাঁদ, ঠিক এত বড়ো,' বলতে বলতে আভার হাত দুখানা প্রায় বাতাস কাটতে শুরু করে দিল, 'কদমপুরের সবাইকে দেখতে নেমে এসেছে অনেকখানি—এত কাছে বলে স্পষ্ট দেখলাম চাঁদখানার ওপর অন্তত দু-ইঞ্চি পুরু করে নরম নীল মাখন মাখানো—', এখানে সামান্য থামল আভা, 'অথচ চিরকাল জেনে এসেছি চাঁদ হলুদ রঙের—'

পাখির মধ্যে ধনেশ নামটা কুবেরের অনেকদিনের পছন্দ। অথচ আজও দেখা হয়নি পাখিটাকে। নামটা এত সজল। নিশ্চয়ই খুব খোলামেলা বড়ো দুই ডানা থাকে। আভাকে কোনোদিন এরকম জানত না কুবের। চাঁদের এতদিনকার রং নিয়ে ভাবনায় পড়ে দাঁড়ানো। মেলেধরা হাত দুখানা প্রায় বুজিয়ে ফেলেছে। হঠাৎ উঠে দাঁড়িয়ে বাকিটুকু আবজে দিল কুবের, তারপর পিঠসুদ্ধ মাথাটা একেবারে তার মুখের নীচে—শেষে ঝটকানো ঠোঁট একটা চুমোতে চেপে ধরল। কতক্ষণ এভাবে ছিল তা বোঝার আগেই আভা তার দুই হাতের ভেতর থেকে গলে গিয়ে বারান্দায় চলে গেছে—একেবারে কড়ার কাছে, হাতে খুন্তি, 'ডিম হয়ে গেছে বুঝলে—'

প্রথমে কিছু কানে গেল না কুবেরের। তারপর 'বুঝলে' কথাটা মনে পড়তেই সামনে তাকিয়ে দেখে একখানা মস্ত পিঠ, জলে ভিজে—তার দু-পাশ দিয়ে দুখানা হাত উঠছে নামছে। ব্রজ ফকির গা মুছে ভিজে গামছা মেলে দিচ্ছে।

'দিন—প্লেটটা এগিয়ে দিন, শেষের এই মাছগুলো ভালো ভাজা হয়েছে', কুবেরকে দিতে-দিতেই আভা বলল, 'তুমি সন্ধে করে পিঁড়েটা টেনে বোসো—আমার রান্না নেমে যাবে ততখোনে।'

রান্না মানে এই ভাজা মাছের ঝোলের জন্যে জল বাটনা নামিয়ে দিয়ে কয়েক মিনিট আভা ফুটিয়ে ফেলল। ব্রজদাকে ভাত বেড়ে দেওয়ার আগে মাথার ঘোমটা তুলে নিল।

পৌষ মাসে জমিজায়গা বিক্রি হয় না। অঘ্রানের শেষাশেষি বলরাম-ভুবনদের জায়গাটুকু হয়ে গেল। মোট এক একর চব্বিশ শতক—তিন বিঘে পনেরো কাঠা দশ ছটাক জায়গা বলরাম-ভুবনদের বাবা-কাকা-জ্যাঠাবাবুদের খরিদা সম্পত্তি। খাজনা সাত টাকা পাঁচ আনা তিন পাই। বাপকেলে জায়গাটুকুর দাম দলিলে দেখল নব্বই টাকায় কেনা। কুবের দলিল পড়ে অবাক। ইংরেজি সন উনিশশো বিয়াল্লিশের পাঁচই মে কোন ভূতনাথ সরদারদের কাছ থেকে মাত্র ওই টাকায় কেনা সম্পত্তির ভেতর জমির দাম সত্তর আর 'মাঠের ধান্য' কুড়ি টাকা। ভূতনাথরা আবার উনিশশো দুই সালে জমিদার হরি বাঁড়ুজ্যের খাসজমি থেকে তিন টাকায় ওই লপ্তটুকু কিনেছিল।

সবটুকু নিতে কুবেরের মোটামুটি বারো হাজার পড়ে গেল। বারো হাজার টাকা জোগাড় করতে কুবেরকে দল বাঁধতে হল। ভূতনাথরা বেঁচে আছে কি না জানা যায়নি। হয়তো কবে মরে হেজে গেছে। বেঁচে থাকলে না হোক আশি পঁচাশি বছর বয়স হত। তাদের এক জীবনের জায়গার দর চার হাজার গুণ বেড়েছে। অথচ সেই লাইন দিয়ে রেলই চলে, একই মাঠগুলো ধানই দিচ্ছে শুধু।

সারদা চ্যাটার্জি লেন থেকে প্রসূনের শ্বশুর রায়মশায়কে আনতে হল। টিপটিপ করে বৃষ্টি পড়ছে দেখে তিনি গামবুট পরেই বাসে উঠলেন। অঘ্রানের ঠান্ডার সঙ্গে ছিঁচকে বৃষ্টি মিশে একেবারে হাড় অবদি কালিয়ে দেবার যোগাড়।

জল পড়ে পড়ে সাপের গর্ত বরফ হয়ে উঠেছে। জায়গা মাপার সময় আগাগোড়া একটা সাপ আল বদলে বদলে কুবেরদের দেখল মাথা তুলে। রায়মশায় বললেন,'এ জন্যেই সব জায়গায় আমি একখানা লোহার গজ কাঠি নিয়ে যাই। লাঠির কাজ হয়ে যায়। আজই আনিনি।'

ভুবন সঙ্গে সঙ্গে সাপটাকে তেড়ে গেল, 'একদম বিষ নেই—এই দেখুন ধরে আনছি।' সত্যিই গেল। সাপটাও ভুবনকে দেখে মাথা একটু উঁচু করেই ছুট। তিন-চার হাত লম্বা তো হবেই। শুধু হাতে ফিরে হাঁপাতে লাগল ভুবন, বড়ো বড়ো বিশ্বাস ফেলে বলল, 'ঢ্যামনা।'

বহরিডাঙা সাবরেজিস্ট্রি অফিসে দুর্গা মুহুরির খাটে বসে দলিল লেখা হল। জেএলআর অফিসে নোটিশ পাঠানোর জন্যে দুর্গার শাগরেদ জয়কেষ্ট খাম পোস্টকার্ড সব রেডি করে দিল। বেলাবেলি রেজেষ্ট্রি হয়ে যেতে ভুবনদের সঙ্গে বুলুকে নিয়ে কালী মিষ্টান্ন ভাণ্ডারে বড়ো বড়ো রাজভোগের মধ্যে ঢাকাই পরটা ঠেসে ভেঙে খেয়ে ফেলল কুবের। তাহলে এতদিনে জায়গা কেনা হল!

বারো হাজার টাকা জোগাড় করতে বুলুর জামাইবাবু বলাই মহাপাত্র, তার বন্ধু রং-কোম্পানির ধীরেন দাস আর মারোয়াড়ি হাসপাতালের স্টাফ নার্স ঊষাদিকে একত্র করে কুবের জায়গা কিনতে নেমেছিল।

পৌষ মাস কেটে গেল বন্টননামা তৈরি করতে। হাজারো তকলিফ। ছ-কাঠার কমন প্যাসেজসুদ্ধ নকশা তৈরি করে দিলেন রায়মশাই। তা ছাপাতে গিয়ে কিলবার্নের অফিসে ঢুকে কুবের অবাক। কত যন্ত্রপাতি, কত ম্যাপ, কত স্কেল। সেই তো জমিজায়গা, ঘরবাড়ি, সেতু-খালের জন্যে। আজকাল ম্যাপ

বুঝতে আটকায় না কুবেরের। স্কুলবাড়ি, রাস্তা, ডাঙাজমি, ভদ্রাসন—সব কিছু চিহ্ন দেখে দেখে ম্যাপ থেকে খুঁজে বের করতে পারে।

এক এক মৌজায় কত জমি। এখন সরকার বাহাদুরের খাজনা জমে পড়ে। কিছুকাল আগেও জমিদার-কাছারিতে গিয়ে দিয়ে আসতে হত। তখন নিলামে কত লাট হাত বদলাত। জয়কেষ্ট বলছিল, 'এখন আর কী মামলা দেখছেন। বহরিডাঙা রেজিস্টারি অফিস তো আজকাল শ্মশান। জমিদারি থাকতে চোত মাসে এই আমাদের সেরেস্তাতেই লোকে লোকারণ্য।'

ট্রেনের জানলায় বসে, স্টিমারের ডেকে দাঁড়িয়ে যত জায়গাজমি দেখা যায়—তার হিসেবনিকেশ কড়ায়-ক্রান্তিতে সরকার বাহাদুরের খাতায় লেখা থাকে। কোন জায়গা কার ছিল, কার হাতে গেল—সব লেখা থাকে। কথা হচ্ছিল সেটেলমেন্ট ক্যাম্পে বসে।

কুবেরের জায়গা কেনা থামেনি। বরং বেড়েছে। এদানীং বুলুও বিরক্ত। অফিসে প্রায়ই কামাই। সে বলতে বসলে সাত কাহন।

মাঝবয়সী কানুনগো আরও অনেক কথা বললেন। বহরিডাঙা, মেদনমল্ল, শোলাগোহালিয়া, নাটাগাছি—এসব মৌজার সেটেলমেন্ট ক্যাম্প এই ঢাকুরিয়ায়। অফিসঘরে বসে কথা হচ্ছিল। সামনেই গেরস্থ বাড়ি—পাশ দিয়ে খোয়াওঠা রাস্তা, দু-ধারে বয়স্ক সব নারকেল গাছ। শহরের মধ্যে আর এমন দেখা যায় দমদম নয়ত উলটোডাঙায় কিংবা হাওড়ার গা দিয়ে যেসব বসতি উঠেছে গত বিশ-ত্রিশ বছরে সেসব পাড়ায়। এই রাস্তা আর বাঁকুড়ার কেদুঁয়াডিহির ফাঁকা মাঠে দাঁড়িয়ে যে শালবন দেখা যায়—সব সরকারি খাতার হিসেবে তোলা আছে। ভাবতেই কুবেরের গায়ে কাঁটা দিয়ে উঠল।

হরির পুকুর, রামের ডাঙা, পালানের ভদ্রাসন সব মেপে মেপে নকশা করে রাখতে হয়েছে।

কানুনগো বললেন, 'মোগল আমলের আগে থেকেই আমাদের দেশে এই মাপজোক শুরু হয়ে গিয়েছে। ভুমিরাজস্ব একটা দারুণ সায়েন্টিফিক ব্যাপার।'

কুবের একটা জমির ইতিহাস জানতে এসেছিল। জমির পরিমাণ খুব বেশি নয়। কাঠা পনেরো হবে। পাঁচজন শরিক। স্বামী মারা যেতে নতুন হিন্দু আইনে বিধবার কপালে একভাগ পড়েছে। বাকি চার ভাগের তিন ভাগ তিন মেয়ে আর বাকিটুকু ছেলে হরেকেষ্টর ভাগে বর্তেছে। চার ভাগ কেনা খতম। বাকি শুধু হরেকেষ্টর অংশ। সেই অংশ নিয়েই ঝামেলা আছে কিছু। বছর দুই আগে হরেকেষ্ট তার নতুন বউকে কেরোসিন ঢেলে পুড়িয়ে মেরে জেলে গিয়েছে। জেল থেকে বেরোলেই আর ও-জায়গা কেনা যাবে না। তখন খেয়ালখুশি মতো হরেকেষ্ট কুবেরকে নাকে দড়ি দিয়ে ঘোরাবে। অথচ হরেকেষ্টর ভাগটুকু না হলে নয়।

কানুনগোর কথাগুলো শুনে একদম ঘোরের মাথায় কুবের বেরিয়ে পড়ল। এখন নয়ান বাড়ি নেই। ব্রজদাও তার বাবার আত্মজীবনী বাঁধাইখানায় আনতে গেছে হয়তো। বহুদিনের পরিশ্রমের পর বইখানা বাজারে বেরোচ্ছে। এই ফাঁকে একবার কদমপুর ঘুরে আসবে।

দুপুরের ট্রেন ফাঁকা। প্রায় দুলকি চালে লাইনের ওপর দিয়ে গাড়ি ছুটেছে। কুবের এখন জানে সরু পিয়াসলে পেরুলেই একটা খাল পাড়—তার ওপর দিয়ে ট্রেন আস্তে যায়। সেখান থেকে খানিক এগিয়ে একতলা একটা বাড়ি ডানদিকে, গোয়ালের ছাদে বীজ রাখার একটা ঢাউস লাউ ছাতকুড়ো

পড়ে কালচে হয়ে উঠেছে।

লেভেল ক্রসিংয়ে গেট খোলেনি। কলকাতা যাওয়ার ট্রেন আসছে উলটো দিক থেকে। কুবের লাইন পেরোবার মুখে একখানা স্টেশন ওয়াগন দাঁড়িয়ে আছে দেখল। ড্রাইভারের পাশের সিটের দরজা খোলা। সেখানে গগলস্ চোখে তাগড়াই মতো একজন ঘন ঘন কবজি ঘড়ি দেখছিল। কুবেরকে দেখে বলল, 'এখানে ডাব কোথায় পাওয়া যাবে বলতে পারেন?'

'এখন তো বাজার বন্ধ। ভোরের ট্রেনে ডাব, মাছ সব কলকাতায় চলে যায়—'

'আমাদের সঙ্গে একজন বিদেশি আছেন। হঠাৎ খুব শরীর খারাপ হয়ে পড়েছে। ঠান্ডা দেশের লোক। গরমে কাহিল হয়ে পড়েছেন—'

দুজন ব্যাপারী বোধহয় বিকেলের ট্রেনের জন্যে বেশ আগেই এসে পড়েছে। রিকশা-ভ্যান বোঝাই দিয়ে স্টেশনের দিকে আসছিল। কুবের তাদের থামিয়ে চারটে ডাব কিনে দিল দরাদরি করে। পাশের চায়ের দোকান থেকে একটা বড়ো কাচের গ্লাসও জোগাড় করে দিল।

গাড়ির গায়ে লেখা 'গভর্নমেন্ট অব ইন্ডিয়া'। পাশে ইংরাজি হরফে লেখা ওএনজিসি। পেট্রোল খোঁজার দল। কলকাতার ট্রেন চলে গেল। স্টেশন ওয়াগনের ভেতর গরমে কাহিল সাহেব নানাভাবে ধন্যবাদ জানাল কুবেরকে।

'কোত্থেকে আসছেন আপনারা?'

'সোঁদালিয়া ক্যাম্প।'

গাড়ি ধোঁয়া তুলে বেরিয়ে গেল। মাইল সাত আটের মধ্যে তেল খুঁজে দেখা হচ্ছে। এদের গাড়ি আরও দু-চারবার কুবেরের চোখে পড়েছে। বড়ো পাকুড়তলায় বিক্রির জন্যে বাঁশ কিনে কিনে জমা করেছে কে। বিশাল গাছটার গায়ে হেলানো বাঁশের গোছা একটা দৃশ্য হয়ে আছে। পাশেই ধানকলে বটবট আওয়াজ। বিকেল হওয়ার আগেই খালপাড়ে এসে হাজির হল কুবের। এখানেই আভা বউদি মাছ কিনতে আসে ভোর ভোর—নয়তো সন্ধের ঘোরে।

মাঠ দেখে কোন জমিটা কতদূর বোঝার উপায় নেই। উত্তরে খেজুর গাছ ছিল আগেকার সীমানা। ভুবনদের জায়গা কেনার পর কুবের সাধুখাঁ বহরিডাঙা সাব রেজিস্ট্রি অফিসে আরও অনেকবার গেছে। ইলেকট্রিক ট্রেন চালু হতে আর দেরি নেই। কদমপুরের বাজারে নতুন নতুন দোকান হচ্ছে। স্টেশন রোডে ঘরভাড়া এখন চড়া।

বিকেলে একখানা ছায়ার শতরঞ্চি সারা মাঠে একেবারে মাপসই হয়ে ছড়িয়ে পড়ল। ছায়ার শেষে শেষে পড়ন্ত রোদ্দুর ঝলক তুলে দাঁড়ানো। সেদিকে তাকিয়ে কুবের আর পলক ফেলতে পারে না। ছায়াবন্দি এই বিশাল চৌকোমতো জায়গাটুকু কিনতে পারলে ভেতর দিয়ে কয়েকটা রাস্তা বের করে দিলেই হবে। তারপর রাস্তার দু-ধারে প্লট কেটে কেটে নগর বসানো।

ছায়ার শেষ অবধি একবার ঘুরে আসার জন্যে কুবের মাঠে নেমে পড়ল। শীতের শেষদিককার মাঠ। হলুদ ঘাসের মধ্যে পাম্প-সু পায়ের চাপে ডুবে যাচ্ছে। এই মাঠ, মাঠের শেষ দিককার গাবগাছের মাথা-চাড়া-দিয়ে-ওঠা ভঙ্গি, সরলরেখার ধারায় একটি খাল—এসবের মাঝখানে কুবের যেন এইমাত্র ঘুম থেকে উঠে তাজা শরীরে হাঁটতে শুরু করেছে। এখানে তার হাঁটাচলা আটকাবার কেউ নেই। কেউ বলবে না, আর এগিয়ো না—ব্যস এই পর্যন্ত। পাম্প সু-র ওপর শুকনো ধুলোর গুঁড়ো ঘিয়ে রঙের পাউডার হয়ে ছড়িয়ে যাচ্ছিল। এক ঝলক রক্ত উঠে এল বুকে। কুবের ঝোঁক সামলে থমকে দাঁড়াল। ঘাসের মধ্যে অবলীলায় একটা সাপ এঁকেবেঁকে এগিয়ে যাচ্ছিল। তাকে দেখে থমকে দাঁড়িয়েছে—একটু মাথা তুলল, তারপর যেমন যাচ্ছিল চলে গেল।

কুবের দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখল, সাপটা খেজুরগাছের গোড়ায় একটা গর্তে একটু একটু করে ঢুকে গেল। শেষে লেজটুকুও ভেতরে নিয়ে গেল।

ধাক্কা খেয়ে চমক ভাঙল কুবেরের।

'সেই থেকে আপনাকে ডাকছি। কোনো সাড়া নেই। কী ব্যাপার?'

লোকটাকে কোনোদিন দেখেনি কুবের। তোবড়ানো মুখে খুব বুঝসমঝ করে কথা বলার ভাব। তখনও কুবের পরিষ্কার দেখতে পাচ্ছিল, সাপটা এঁকেবেঁকে কুঁচকে গিয়ে ভাঁজে ধাক্কা দিয়ে ঠেলে এগিয়ে যাচ্ছে। মাথাটা এই হাতের মুঠোর মতো। ঘাড় ফিরিয়ে কুবেরকে দেখছিল—গলায় বোধহয় খড়মের ছাপ। গায়ে চর্বি হয়েছে বেশ—সাপটা অনেকদিনের পুরোনো।

'সাপ মানুষকে দেখে?'

'তা দেখে বৈকি। এই নিদমানে আবার সাপ দেখলেন কোথায়? এখন তো ওনাদের বেরোবার সময় নয়।' একটু থেমে বলল, 'নয়ানের আমি জ্ঞাতি কাকা। আপনাকে আমার কথা বলেনি নয়ান? আপনি তো সালকের কুবের সাধুখাঁ। তাই না?'

মনে করতে পারল না কুবের। আন্দাজে মাথা নাড়াল।

'শুনলাম সর্দারদের জায়গাটুকু কিনবেন। বড়ো বেগ দিচ্ছে ওরা। তাই যেচেই এগিয়ে এলাম।'

এবার ভালো করে লোকটাকে দেখল কুবের। শীত চলে গেলেও ঠান্ডা যায়নি। খয়েরি রঙের র‍্যাপার একখানা গায়ে। বগলে টিনের একটা নল। ভেতরে কী আছে জানে কুবের। মৌজা ম্যাপ। দাগওয়ারি জায়গার চেহারা, রাস্তা, খানা, খাল-খন্দের নিশানা সবই আঁকা আছে। সারা পৃথিবীটা কালি করে খাতায় হিসেবপত্তর তোলা সারা।

'আপনি ভদ্রেশ্বরের নাম শোনেননি? আমি সেই ভদ্রেশ্বর।'

খুব শুনেছে কুবের। এখনকার জমিজায়গার জট ছাড়ানোর জন্যে ভদ্রেশ্বরের কাছে প্রায় সবাই যায়। নয়ানদের কর্তাবাবারা ছিলেন তিন ভাই। সেই তিন বুড়োর সংসার ডালপালায় এখন কদমপুরের

আধখানা জুড়ে আছে। তাদেরই কারও ছেলে ভদ্রেশ্বর।

'এখন তো সাপ বেরোয় না। সে সেই মাঝরাতে। তখন আহারে বেরোতে হয় ওনাদের।'

তারপর ভদ্রেশ্বর বলল, 'সাপ যা-কিছু ওই বাঁশবাগানের ওখানে আছে। এদিককার সব সাপ ইটের লরির আওয়াজে পালিয়ে গেছে।'

তা বটে। কুবেরের কেনা জায়গার এখানে-ওখানে বাড়ি উঠতে শুরু করেছে।

'এ তল্লাটে আগে মানুষ আসত না। বাংলা তিরিশ সন থেকে জলে ডুবে ছিল। সবাই বলত ভাসার লাট। আর কী মাছ! সে খেয়েছি বটে—'

এসব কথা অনেকবার শোনা কুবেরের। রায়মশাই বলেছিলেন, এখানে আগে সমুদ্র ছিল। পুকুর কাটতে গিয়ে কুবেরের ভায়রাভাই বলাই মহাপাত্র পেল্লাই এক গাছের গুঁড়ি পেয়েছে। তিনটে লোকেও বেড় পায় না তার। দশ ফুট নীচে মাটি কী কালো! হাত দিলে গুঁড়ো গুঁড়ো হয়ে যায়। আগুনে জ্বলে। আগে হয়তো জঙ্গল ছিল। কিংবা নদীর খাঁড়ি। গেঁয়োর জঙ্গল মাথা তুলে দাঁড়াতেই কোনোদিন বোধ হয় পাড়ধসানো বানে সব ভেঙেচুরে মাটি চাপা পড়েছিল।

বিকেলবেলা এসব ভাবলে মন বড়ো খারাপ হয়। ভদ্রেশ্বরের সঙ্গে হাঁটতে হাঁটতে খালপাড় ছাড়িয়ে রাস্তায় উঠল।

সর্দারদের জায়গার ইতিহাস সব কণ্ঠস্থ ভদ্রেশ্বরের। সর্দারদের বড়ো বুড়ো কোটিরাম নস্করের চাকর ছিল। কোটিরাম বুড়োকালে কাশীবাসী হওয়ার আগে ষোলোটা টাকা ধার করেছিল চাকরের কাছে। তার বদলে জায়গাটুকু লিখিয়ে নিয়েছিল সর্দারদের বড়ো বুড়ো। কে জানত, সে-জায়গার দর আজ এমন হবে! তা হোক—তাতে কুবেরের আপত্তি নেই। জায়গার দর বলে কিছু আবার আছে নাকি। এ হল এক খেয়াল। কিংবা ঝোঁক। ওই জায়গাটা আমার চাই-ই—নাহলে সাইজে আসছে না। এইসব ভেবেই তো লোকে জায়গা কেনে। নাহলে কুবেরের কাছ থেকে লোকে এত জায়গা কিনছে কেন?

জানা গেল, সর্দারদের বড়ো ভাই মেয়ের বিয়ে দেবে। টাকা দরকার। তার অংশটা কিনে অবিভক্ত সম্পত্তির ভাগীদার হয়ে এখন চুপচাপ বসে থাকতে হবে। তাহলে বাকি শরিকরা অন্য জায়গায় কোবালার কথা পাড়তে পারবে না। তখন মানে মানে করে সবটুকু কুবেরকেই দিতে হবে।

কত জায়গা যে কুবেরের দরকার। শুরু হয়েছিল সামান্য জায়গা নিয়ে।

এখন কুবের কয়েক বিঘার মালিক। এই অবস্থায় আসতে তাকে অনেক কাঠখড় পোড়াতে হয়েছে। অনেক ঝুঁকি মাথায় নিতে হয়েছে।

রাতে বিছানায় বুলু বলে, 'তুমি যে বেশি দামে জমি দিচ্ছ শেষে কোনো কথা হবে না তো?'

কুবেরও যে এসব একদম ভাবেনি—তা নয়। নিজেকে বুঝিয়েছে, এর নাম ব্যাবসা। জমি তো লোকে কম দামে কিনে বেশি দামে ছাড়ে। সবাই তাই করে। এতে আর দোষ কী!

এমন সব যুক্তি নিজের মনের মধ্যে অনেকবার ভেঁজেও কেমন দুর্বল লাগে কুবেরের মাঝে মাঝে। ব্যাপারটার নাম ব্যাবসা দিয়ে, সে তাই চাঙ্গা হয়ে ওঠার চেষ্টা করে। আর তাছাড়া, জায়গাটার উন্নতির জন্যে সে-ও তো কম করছে না।

এক এক সময় মনে হয়—উনিশশো দশ কিংবা তারও আগে বঙ্গভঙ্গের সময় জন্মালে কত সুবিধে ছিল। অল্প টাকায় দমাদ্দম মৌজার পর মৌজা কিনে ফেলত কুবের। তারপর সাজিয়ে-গুছিয়ে বাজার বুঝে ছাড়ত। আজ অবশ্য সে বুড়ো হয়ে যেত—কিন্তু কত নিশ্চিন্ত হতে পারত। তখন পৃথিবীতে এত লোকও ছিল না।

আবার মনে হয়, এই পৃথিবীতে এক-একদল লোক এসে ঘরবাড়ি, রাস্তাঘাট, বাগান, ফুলগাছ সব বানায়। কত লোক পলেস্তারার সময় পঙ্খের কাজ করায়, ছাদের আলসেতে সিমেন্টের পরি বসায়, পুকুরঘাটে বেঞ্চ দেয়—অথচ শেষে সব একদিন রাবিশ হয়ে ঠিকাদারের লরিতে ওঠে, জঙ্গলে ঢাকা পড়ে—নতুন লোক জায়গা বদলে আর এক জায়গায় গিয়ে বসতি বানায়।

'এই খাল দেখছেন—এখানে আগে কত দূর দেশের নৌকা আসত।'

'অনেক দূরের?'

'আবাদের ধানের নৌকা এই খাল দিয়ে চেতলার হাটে গিয়ে আটিদের ঘাটে নোঙর ফেলত। বেশি কী বলব—শ্রীহট্টের কমলালেবুর চালান এই পথ দিয়ে নৌকায় কলকাতা যেত। নদী মজে গিয়েই সব গেল।'

কুবেরের বুকের ভেতরটা ধক করে উঠল। এ আমি কোথায় আছি এখন। সালকের বাড়িতে মা চোখে চশমা দিয়ে লাল বারান্দায় মাদুর পেতে বই পড়ে এ সময়। বাবার শুঁড়তোলা গেঞ্জি পরা হয়ে গেছে। এবার গরম শার্ট চাপিয়ে চৌরাস্তা অবদি হেঁটে আসবে। বুলুর তিনমাস। খোকন হয়েছিল বছর চারেক আগে। ফার্নেসে বিকেলের শিফট শুরু হয়ে গেছে। অ্যাপ্রেন্টিসরা কেউ লম্বা লোহার রড দিয়ে গলন্ত ইস্পাত ঘেঁটে দেখছে। এ আমি কোথায় আছি! ধানকাটা মাঠের হলুদ রং পড়ন্ত রোদের আলো বেয়ে অনেকখানি উঠে এসেছে। তার মাঝখানে এক একটা তালগাছ সিধে দাঁড়ানো। দূরে দূরে এক-এক পরতে এক-একটা আবাদ। প্রথমে কেষ্টবাবুর আবাদ, তারপর নবীনবাবুর—শেষে তার মৈত্রী আবাদ, ডাক্তারবাবুর আবাদ।

'নদীও গেল। আমরাও ম'লাম—'

ভদ্রেশ্বর এমনভাবে বলছে, চোখের জায়গায় আয়না বসানো থাকলে তিরিশ বছর আগের ঘোলানো ভরা নদীর সুদূর ছায়া তাতে পড়ত।

'রেলের পুল দেখছেন ওই যে—এখন তো ওর নীচে নদীর বুকে চাষ হচ্ছে। ছোটোবেলায় বাবার সঙ্গে রেলে গেছি ওখান দিয়ে—গাড়ির বেগ কমে যেত, লোকে পয়সা ফেলত। যেমন-তেমন বর্ষায় সাহেবরা পাথর ফেলত—ঢেউয়ের কোমর ভেঙে দিতে।'

‘নদী মরে যাওয়ার পর সেসব পাথর পাওয়া গেছে?’

‘অঢেল! মোটা মোটা কাছি বেঁধে মোষ জুড়ে তবে সেসব পাথর সরিয়েছে চাষিরা। আরও কত পড়ে আছে ধারে ধারে।’

খালের ওপারেই ননী বোসের পুরোনো ইটখোলার ধ্যাড়ধেড়ে কঙ্কালটা পড়ে আছে। মাটি-মাখানোর দু-দুটো পগমিল জং পড়ে কোমরসমান উঁচু ঘাসের মধ্যে কোনোরকমে জেগে আছে। ইট করার পর বাতিল বিরাট গর্ত এখন জলে ভর্তি। ননীর সেই মহা ফোক্কড় ছেলেটা বিকাশ এখন তাতে মাছ চাষ করে। লগনসার জন্যে বড়ো বড়ো মাছ তুলে বাড়ির পায়ের খানায় ছেড়ে দিচ্ছে। বিয়ের মরশুমে ঝাড়বে। মাটি এতও দেয়।

না-দিলে কুবের আজ কারখানায় নাগা হওয়ার তোয়াক্কা না রেখে কদমপুরে আকাশের নীচে ফাঁকা মাঠে এসে ঘুরে বেড়াত না। কোল কোম্পানির হীরেন নেবে আট কাঠা জায়গা। দু-হাজার টাকা আগাম দিয়েছে। দলিলপত্র তৈরি হলে রেজিস্ট্রির দিন বাকিটা দেবে। গত ক-দিনে আরও যেন কে কে টাকা দিয়ে গেছে। বাড়ি ফিরে খাওয়া-দাওয়ার পর ডাইরি খুলে নামের পাশে টাকার অঙ্ক লিখে তারিখ দিতে হবে। নয়তো কত টাকার হিসেব যে গুলিয়ে যাবে শেষে। নানান দিকে খরচও হচ্ছে টাকা। সরকারি অনুমতি জোগাড় হয়েছে। এখন খালপাড় ঘসে মেজে অ্যাভিন্যুর চেহারা পাবে। কী নাম দেওয়া যায় রাস্তার? কুবের সাধুখাঁ অ্যাভিন্যু? না। কুবের রোড? বেঁচে থাকতে সে বড়ো বিচ্ছিরি হবে।

‘প্রবোধিনীকে আমি চিরকালই ভালোবাসিয়াছি। ঢেঁকি শাক দুই প্রকার। এক প্রকার মাটিতে হয়—অন্য প্রকার বৃক্ষশাখায়। শেষোক্ত শাকের ডগা বড়ো নরম। এই শাক আমাকে সবিশেষ প্রযত্নে জোগাড় করিতে হইয়াছে। প্রবোধিনীর বড়ো প্রিয় জিনিস। জীবনটাকে লইয়া কত প্রকারে নিয়াছি। ভালোবাসিবার এবং ঘৃণা করিবার এত জিনিস জীবনে আছে আগে জানিতাম না। ব্রজ কোলে আসিতে প্রবোধিনী আমার কুরূপ চেহারা যেন সুরূপ হইয়াছে এই ভঙ্গিতে দেখিতে লাগিল। বালক ব্রজ এখন আমাদের সংসারে প্রধান আকর্ষণ। বড়ো ইচ্ছা, সে বড়ো হইয়া যেন একজন মানবদরদি চিকিৎসক হয়। আজ রাইটার্স বিল্ডিংয়ে বিপ্লবীরা ঢুকিয়া সাহেবদের গুলি করিয়াছে। কলিকাতা তোলপাড়। এই ডামাডোলে বাজারে অনেক ইলিশ আসিয়াছিল। কিনিবার খরিদ্দার নাই। চওড়া পেটি দেখিয়া আমি একটি কিনিলাম। জীবন কত দ্রুত বদলাইতেছে।’

বুলু আরও পড়তে পারত। পেছন থেকে কুবের জড়িয়ে ধরতে চমকে উঠল, ‘দিনের বেলা এসব কী?’

ঠোঁট ও চোখ কোঁচকালে বুলুর বয়স দশ বছর বেড়ে যায়। অনেকবার কুবের ভুরু কোঁচকাতে বারণ করেছে বুলুকে। পেঁয়াজ খেতেও নিষেধ। চুমু খাওয়ার সময় মনে হবে এঁটো কলাই বাসনের গন্ধ দিচ্ছে।

‘তোলার জন্যে—’

‘আবার শাড়ি এনেছ? নিজের একটা গরম স্যুট করাবে করাবে বলছ আজ কতদিন। অথচ করলে না—’

‘হবেখন। পরে দ্যাখো তো—’

‘এখুনি!’

‘হ্যাঁ, এখুনি—’

‘পাগল! মা রয়েছেন—সবাই কী বলবে—’

‘পরে এসো। দেখব।’

‘না। কত দাম নিল?’

‘বলো তো?’

‘আটান্নো উনষাট—’

‘পঁচাশি—’

‘কী আরম্ভ করেছ? টাকাগুলো নয়ছয় করছ এ ভাবে—আজ অফিসে গিয়েছিলে?’

‘নাঃ! কী হবে গিয়ে।’ কী মনে হতে কুবের বলল, ‘কী বই পড়ছ দেখি।’

‘তোমার ব্রজদার বাবার আত্মজীবনী।’

বইখানা হাতে নিল কুবের।

রজনী দত্তর জীবন ও সময়। লেখক ব্রজ দত্ত।

‘আজই ডাকে এসেছে।’

কয়েক লাইনের ভূমিকা।—

> ‘রজনী দত্ত আমার পিতৃদেব ছিলেন। বাঁচিয়া থাকিলে না-হোক নব্বই একানব্বই বছর বয়স হইত। যতখানি দেখিয়াছি জানিয়াছি তিনি সৎ থাকিবার চেষ্টা করিতেন। আমাকে লইয়া তাঁহার অনেক আশা ছিল। কিছুই পূরণ করিতে পারি নাই। নানাভাবে শুধু সৎ হইবার চেষ্টা করিতেছি। পুত্র হিসাবে তাঁহাকে জানাইবার দায়িত্ব আমারই। এই গ্রন্থ পাঠে কাহারও কোনো কাজ হইলে বুঝিব আমার পরিশ্রম সার্থক।’

‘খাঁটি গ্রন্থকার বনে গেছে ব্রজদা। রিয়ালি।’

তাকিয়ে দেখল বুলু উঠে গেছে।

ব্রজ দত্ত এখন ফকিরের আলখাল্লা পরে। দশ বারো বছর আগেও পুরোদস্তুর সাহেব ছিল। প্রথম আলাপ কলেজে। কলেজ সোস্যালে ম্যাজিশিয়ান ব্রজ দত্ত ম্যাজিক দেখাতে এসেছিল। কালো কোট-প্যান্ট পরে স্টেজে নেমেছিল, হাতে ম্যাজিক ওয়ান্ড। পায়রা ওড়াল সবার সামনে—আবার হাওয়া করে দিল।

সেই প্রথম দেখা। দ্বিতীয় দর্শন বইপাড়ায়। ক্লাস এইটের র‍্যাপিড রিডারের একখানা নোটবই বেরিয়েছে। নোটমেকারের নাম বি দত্ত—ব্রজ দত্ত। খুব অবাক হয়েছিল কুবের, ‘তুমি এতও জানো ব্রজদা—’

‘জানতে হয় রে। আমাদের একটা ট্র্যাডিশন আছে রে। আমাদের স্কুল থেকে আমাদের ব্যাচেই ম্যাট্রিকে ফার্স্ট হয়েছিল কুমুদ রায়। তার সঙ্গে সকাল-সন্ধে আমার ওঠাবসা ছিল। সেই থেকেই আমি স্কলার—’

‘কোন ডিভিশনে বেরিয়েছিলে?’

‘রয়াল অবশ্য। তাতে কী? সঙ্গগুণ বলে কিছু আছে না?’

কী করে লিখতে হয় জানলে কুবের একখানা বই লিখত। বইয়ের নাম দিত ‘ব্রজ দত্তর জীবন ও বাণী।’

পাঁচটি সন্তান ও একটি বাড়ি সমেত এক বিধবার সঙ্গে ব্রজদার প্রথম বিয়ে। মহিলার গর্ভে ব্রজ দত্তর

প্রথম সন্তান জন্মাল। ছেলেটির বছর দুই বয়সের সময় কুবের ব্রজদাকে ফুটপাথ থেকে দর করে পাঁচসিকের মোজা বারো আনায় কিনতে একদা সাহায্য করেছে। তখন ব্রজ দত্তর বড়ো দুঃসময়। ফিল্ম লাইনে হবু ডিরেক্টর। পায়জামা, পাঞ্জাবি পরে সারাদিনের শেষে মাল খেয়ে বাড়ি ফিরত। কুবের আর সেই মহিলা ধরাধরি করে ব্রজ দত্তকে বিছানায় নিয়ে গিয়ে শুইয়ে দিত।

সে সময় কুবের একবার বড়ো বিপাকে পড়েছিল। হঠাৎ সিনেমার সর্বভারতীয় চালু সাপ্তাহিকে খবর বেরোলো—মালটি মিলিয়ান রুপিজ কালার ফিল্ম ভেঞ্চার। হিরো নিউ ফাইন্ড কুবের সাধুখাঁ—হিরোইন সবচেয়ে জ্বলজ্বলে তারকা সুরাইয়া। ডিরেক্টর ব্রজ দত্ত। জানাশোনা মহলে তোলপাড়। মুখ দেখানো যায় না। পুরো ব্যাপারটাই ব্রজ দত্তর একটা বৃহৎ গুল। নিজের ব্যানারে ছবি তোলার জন্যে এমন দু-চারটে গুল প্রেস কনফারেন্স করে মারতেই হয়। নাহলে ফাইনান্স আসবে কোত্থেকে? তখন কুবের কনফার্মড বেকার। মেকানিকাল ইঞ্জিনিয়ার থেকে রেডিয়োর তেলুগু ট্রান্সলেটর—সব চাকুরিতেই এলোপাতাড়ি অ্যাপলিকেশন ছাড়ছে। কোনোটা লাগে না। রোগা হতে হতে ওজন প্রায় একশো পাউন্ড। এক রেসুড়ে বন্ধু তো কুবেরকে পেয়ে যেন স্বর্গ পেয়েছে এমনভাবে জড়িয়ে ধরল রাস্তায়। তার কী আদর! 'তুই মাইরি আদর্শ জকি হতে পারবি। চল তোকে একজন ওনারের সঙ্গে আলাপ করিয়ে দেব।' কুবেরকে নিয়ে প্রায় টানাটানি।

বুলু চা হাতে নিয়ে ঘরে ঢুকতেই একটা হর্ন শোনা গেল।

কুবের বলল, 'ওই যাঃ। ভুলে গেছি—'

'কী? আবার ট্যাক্সি দাঁড় করিয়ে রেখে এসেছ নীচে—তুমি যা হয়েছ একখানা।'

'না হয়ে উপায় কী বুলু?' বড়ো ক্লান্ত শোনাল কুবেরের গলা। এ-মাসে না হোক জনা ছয়েক জমি কিনেছে কুবেরের কাছ থেকে। কত কী বলতে হয় কুবেরের, 'জায়গার আমার ত্রুটি অনেক। সুবিধে শুধু নিরিবিলি, আর দক্ষিণের হাওয়া। যে যার বাড়িটুকু করে নিলেই কোনো খুঁত থাকে না আর।'

দাম? দাম বলে কিছু আছে নাকি আর। এখন কুবেরের মুখ দিয়ে যা বেরোয়—তাই-ই প্রায় দাম। কত লোক যে জমি চায় তার ইয়ত্তা নেই। ভাবতে গেলে তার মাথা ঘুরে আসে। এক-একটা প্লটের দাম তার এক বছরের মাইনের চেয়েও বেশি।

আবার হর্ন। 'তাড়াতাড়ি করো। শো আরম্ভ হতে দেরি নেই।'

'বলা-কওয়া নেই—এখন সিনেমায় যাব কী করে? খোকনও ফেরেনি পার্ক থেকে।'

'মা দেখবে। চলো তো। নতুন শাড়ি পরেই চলো।'

রাস্তায় বেরিয়ে কুবের স্পষ্ট বুঝল আরও আগে বেরোলে ভালো হত। তার জন্যে পৃথিবী প্রায় শেষ হয়ে আসছে। সিগারেটের বিজ্ঞাপনগুলো যা হয়েছে আজকাল—শুধু দপদপ করে। কী বাহার। ট্যাক্সিতে বুলু বলল, 'এভাবে টাকা নষ্ট কোরো না। কদিন পরে খোকনেরও একজন খেলুড়ে জুটবে—

তখন অনেক টাকা লাগবে।'

'আজ একটা সাপ দেখলুম বুলু। আমাকেও দেখছিল।'

'শেষ রাতে তো। আমিও দেখেছি। সাপের স্বপ্নে বংশবৃদ্ধি।'

'শেষ রাতে নয়। আজই বিকেলে দেখলাম—,' হঠাৎ থেমে গিয়ে কুবের বলল, 'দাঁত পড়ার স্বপ্ন দেখলে কী হয় জানো?'

বুলু চুপ করে ছিল। কলকাতা মাড়িয়ে ট্যাক্সি ছুটছে, 'সন্তানশোক—'

'চুপ করবে?' তারপর বুলু বলল, 'তুমি আজকাল আর আভা বউদিদের বাড়ি যাও না?'

'যাওয়ার উপায় নেই বুলু।'

তাকিয়ে আছে দেখে ফিরে বলল কুবের,'আমার যেতে মন্দ লাগে না। কিন্তু কদমপুরের সবাই এমন চোখে দেখে ব্রজদাকে, কী বলব—কেউ ভাবে স্পাই, কেউ বলে লম্পট, নয়ানরা মনে করে ভগবানের নামে জায়গা দখলের তালে আছে—তাই আমি আর মিশতে পারি না। অথচ ব্রজদা খারাপ —এ কথা আমি কিছুতেই বলতে পারি না। ভালো? তাই-বা বলি কী করে?'

সিনেমা শুরু হয়ে গিয়েছিল। অন্ধকারের মধ্যে জায়গা খুঁজে নিয়ে বসতে বসতে কুবেরের মনে হল, কোথায় যেন কী করা বাকি রয়েছে—কী যেন ভুল করে ফেলে এসেছে। আজকাল সব সময় মনে হয়, কোথায় যেন ভুল হয়ে যাচ্ছে। একটা বড়ো গিঁট পড়েছে আন্ডারঅয়ারের দড়িতে। সেটা কিছুতেই খোলা যাচ্ছে না।

'মার জন্যে আমার বড়ো কষ্ট হয় বুলু।'

'এখন সিনেমা দেখো তো। পরে শুনব।'

কুবের দেখল, একটা উজ্জ্বল দৃশ্যের আলো পর্দা থেকে ছিটকে দর্শকদের মুখে পড়েছে। সবাইকে দেখা যাচ্ছে। বুলুর মুখ খুবই সুদৃশ্য। টিকালো নাক, টানা চোখ, ছোটো কপালের ওপর ঘন বুনোটের দুই থাক কালো চুলের মাঝখান দিয়ে একটা লাল ডগডগে সিঁথে। এই মেয়েলোকটি তো তার বউ। ইদানীং বুলুর নাক মুখ চোখ কী তৃপ্তিতে ঢলঢল করে! অথচ বুলুর সঙ্গে বিয়ের আগে আলাপের সময় হাত ধরতেই কেমন খিঁচিয়ে উঠেছিল।

এই আলোতে নিজের হাত দুখানা মেলে ধরতেই কেমন পাথরের মতো হয়ে উঠল। খুব ফর্সা দেখাচ্ছে। আমি কুবের সাধুখাঁ। আমাদের চারপুরুষ আগে লবণের গোলা ছিল। আমার মা ঘাড় ফেরালে চিবুকের নীচে আজও নীল নীল শিরা দেখা যায়। আমার হাতের আঙুলে কালো কালো ছোপ পড়েছে। কনুইতেও কালো ছোপ। কুবের স্পষ্ট বুঝল এবারে তার গা আস্তে আস্তে কালো হয়ে যাবে। বহরিডাঙা রেজিস্ট্রি অফিসে সারাগায়ে এমন কালচে ছ্যাতলা পড়া একটা লোক পয়সা চেয়ে বেড়ায় সবার কাছে। গায়ে গা লেগে যাবার ভয়ে সবাই তাকে পয়সা দেয়। লোকটাও চাইবার আগে

একেবারে গা ঘেঁষে দাঁড়ায়। বিমল ডাক্তারকে আজকাল আর দেখা যায় না। বদলি হয়ে যায়নি তো!

অথচ তার হাত-পায়ের আঙুলের গাঁটে কালো ছোপ পড়ার কথা নয়। সেদিন যদি সনতের সঙ্গে শেফালির ঘরে গিয়ে না বসত। সেইসব কথা মনে পড়লেই একটা ভয়ংকর ওজনের পাথর কিংবা লোহার দরজা তাকে একেবারে মাটিতে চেপে ধরে। নিশ্বাস ফেলা যায় না।

শেফালির ঘর থেকে ফেরার পর বেশ কিছুদিন ভয়ে ভয়ে ছিল কুবের। কেউ যদি দেখে থাকে। ক-দিন পরে তার শরীর খারাপ হল। এমনিতেই মনে মনে কুবের মরে ছিল। বীরেন লস্কর স্যার বদলি হয়ে গেছেন। সারা স্কুল কেমন শুকনো লাগে। রাস্তাঘাট মায়া-মমতাহীন। কণ্ঠমণি ঠেলে উঠে একটা বেয়াড়া আওয়াজ গলা দিয়ে বের হয়।

শেষে ডাক্তার ডাকতে হল। তখন কুবেরের পুঁজ বেরোতে শুরু করেছে। কী লজ্জা! কোথাও যাওয়া যায় না। কাউকে বলা যায় না। বিষ খাবার পর শেফালিকে বাঁচিয়েছিল হরি ডাক্তার। সেই হরি ডাক্তার এসেই দরজা বন্ধ করে দিল। তারপর মার সামনে কুবেরকে সব বলতে হল। ডাক্তার একটা লম্বা লেকচার দিল। কুবেরের কানে কিছু যায়নি। তখন পেনিসিলিন যুদ্ধের সাহেবদের জন্যেই শুধু বিলেত থেকে আসে। ভয়ংকর দাম। অনেক মিকশ্চার, ইনজেকসন, ট্যাবলেট চলল। মার আদেশে কুবের রোজ ঘুম থেকে উঠে গীতার দ্বাদশ অধ্যায় পড়ে। কালীর ফটোর সামনে দম আটকে ব্লেড দিয়ে বুকের ঠিক মাঝখানটায় একটু চিরে কুবের রোজ ভোরে ফটোর ফ্রেমে খানিক রক্ত লাগাত। লাগানোর পর আটকানো নিশ্বাস ছেড়ে দিত। অসুখ থেকে ওঠার পর নিয়মে থাকতে থাকতে কুবেরের গায়ে সবরি কলার ঘিয়ে রং ধরল। সব সময় ভয় হত, তার বয়সি বন্ধুদের সঙ্গে মেশার সময় মা এমনভাবে তাকাত যেন সব সময় চোখ দিয়ে বলছে, কুবের তুমি ওদের সঙ্গে মিশছ, কিন্তু ওরা তো জানে না তুমি কী করে বসে আছ। মার চোখের সামনে একেবারে মাটিতে মিশে যেত কুবের। কাচের পিচকিরিতে গরম জলের সঙ্গে একটা হলুদ ওষুধ মিশিয়ে মা ধারা করে পুঁজের জায়গায় দিত। একদিন সন্ধেবেলা জ্যোৎস্নার মধ্যে পাড়ার ছেলেদের সঙ্গে গাদি খেলছিল। মা ডেকে পাতা মোড়ানো একখানা মাসিক পত্রিকা হাতে দিল, 'এই লেখাটা পড়ো।'

লেখার নাম 'হীনমন্যতা ও তার প্রতিকার'।

পত্রিকাখানা হাতে নিয়ে মাকে এত কঠিন লেগেছিল কুবেরের। একটুও পড়েনি সে। পড়ে কী হবে! ভালো হবার জন্যে অসুখ সেরে ইস্তক কত কী করে চলেছে সে। দেওয়ালে রুটিন। পড়ার বই সব বালি কাগজ দিয়ে মোড়া, টেবিলে টাইমপিস, তার পাশেই গীতা, চণ্ডী—উপরন্তু ব্রাহ্মমুহূর্তে ব্যায়াম।

মাঝখান থেকে ফল হল, তার চেহারাটা ফিরে গেল। পাড়ার মেয়েরা টালুসটুলুস তাকায়। কলেজের মেয়েদের সঙ্গে আগে ভোররাতে বকুল ফুল কুড়িয়ে মালা গাঁথত। তাদের দু-একজন আড়ালে পেলে আদর করে গাল টেপে। আর দিনকে দিন ভালো হবার জন্যে, নির্দোষ দেখাবার জন্যে, নিষ্পাপ কুসুম হওয়ার লোভে সে অজান্তে নিজের মুখে একটা প্রশান্ত, ভাবলেশহীন, ছায়া পাকাপাকি ঝুলিয়ে দিল।

বিয়ের পর বুলুই বলেছিল, 'তোমার চোখ গোরুর চেয়েও শান্ত—তাকাও এমনভাবে, যেন কিছুই জানো না।'

সিনেমায় এমন সময় নায়িকা দোতলার ঝুলবারান্দায় একটা আবেগের গান জুড়ে দিল। অন্তরায় তাল রাখার জন্যে দুই কলির ফাঁকে নায়িকা দু-বার বড়ো বড়ো দুটো দীর্ঘশ্বাস মিউজিক বুঝে ছাড়ল। বুলুও আবেগ দিয়ে কুবেরের দিকে তাকাল। এইসব বুলুর খুব ভালো লাগে, 'কী ভাবছ?'

'পোর্টফোলিও ব্যাগটা খাটের ওপর ফেলে এসেছি—'

'টাকা ছিল?'

'সাত হাজার।'

'আমি আন্দাজে তোশকের নীচে গুঁজে রেখে এসেছি।'

'তার মধ্যে ডায়েরিতে একটা ফোন নাম্বার ছিল, মনে পড়ছে না—'

'নাম মনে আছে?'

'রেফ্রিজারেটার কোম্পানির ইঞ্জিনিয়ার এস কে বসু। এগারো কাঠা জায়গা নেবেন। হাজারের দর। সিনেমা থেকে বেরিয়ে গাইড দেখে ফোন করতে হবে আবার—'

'হাজার টাকা কাঠা। শেষে জানাজানি হলে—'

'জানাজানির কী আছে? জায়গার দাম এমনই হয়। এসপ্ল্যানেডে আগে কত দাম ছিল? খুব সস্তা ছিল নিশ্চয়—না হলে মোহনদাসবাবু গোরুদের জল খাওয়ার জন্যে তড়াগ কাটাতে পারতেন?'

'সে তো অনেক আগের দিনের কথা। তখন হয়তো রাস্তা ছিল না, আলো ছিল না, লোক ছিল না—'

'আমরাও তো আগে কিনেছি। রাস্তা বানাব, আলো আনাব—'

'এখন সিনেমা দেখো। শুধু জায়গাজমির চিন্তা! কী হয়ে যাচ্ছ তুমি—'

আজকাল কলকাতার রাস্তায় ফাঁকা জায়গার দেখা পাওয়া কঠিন। কলকাতার বাইরে বেরোলেই এন্তার ফাঁকা জায়গা। কোথাও কচুরিপানা হয়ে আছে, কোথাও সুপুরি নারকেলের বাগান—একটু ভেবেচিন্তে সাজিয়ে-গুছিয়ে নিলে সেসব জায়গায় দিব্যি বাড়ি হয়, পাড়া হয়, সন্ধে হলে শঙ্খ বাজানো যায়।

হাত দুখানা মুঠো করে ফেলল কুবের। বিমল ডাক্তারের কথামতো ট্রপিকালে গিয়ে দরজা থেকে ফিরে এসেছে। লাইনে হরেক অসুখের মানুষ। বোধ হয় তার সেসব অসুখ আর নেই। থাকলে খোকন নিশ্চয় অন্যরকম হত। অবিশ্যি এসব অসুখে প্রথমটা সব চিহ্ন লোপ পায়। পরে আস্তে আস্তে দেখা দেয়। তখন আর সারানো যায় না। তার মেরুদণ্ডের হাড়ের ভেতর আজকাল, কুবেরের সন্দেহ, সবকিছু বুঝি শুকিয়ে যাচ্ছে। কাত হয়ে শুলে মটমট করে ওঠে। খোকনের ঠোঁট খুব লাল। চোখে আলো বেরোয়, হাসলে দাঁতের ঘষাঘষিতে মিছরি চিবোনোর মিষ্টি গন্ধ মেশানো মুড়মুড়ে শব্দ হয়।

অথচ সনৎ দিব্যি আজও সেসব জায়গায় যায়। এখন কুবেরের কাছে দিনকে দিন একটা জিনিস পরিষ্কার হয়ে উঠেছে। বুলু, মা, খোকন, তার এবং আর পাঁচটা মানুষের শরীর কিছু মাংস, হাড়, বাতাস, রক্ত, চর্বি, শিল্লি, শ্লেষ্মা এসব জিনিস দিয়ে বানানো। তারই মধ্যে সব জিনিসেরই এক একটা মাত্রা আছে। এর ভেতর একটু এদিক-ওদিক হলেই গণ্ডগোল। নয়তো যন্ত্রটা ভালো মেকের। কত সামান্যের জন্যে আজ বিকেলে বেঁচে গেছে কুবের। সাপটা মাথা তুলে দেখছিল তাকে। কী চাই? এখানে কেন বাবু? ভাগ্যিস থমকে দাঁড়িয়ে পড়েছিল। ভদ্রেশ্বর ডাকছে, শুনতে পেয়েছিল। কিন্তু উত্তর দেবার উপায় নেই। তার গলার আওয়াজে যদি তেড়ে আসে। দৌড়ে কূল পাবে না।

হিরোর চেস্ট চমৎকার। আজ কুড়ি বছর এক চেহারা নিয়ে হাসছে, গাইছে, টাকা কামাচ্ছে। একই লোক দিয়ে টুথপেস্ট আর ব্লেডের বিজ্ঞাপন দেওয়া যায়। ইচ্ছে করলে হোসিয়ারি কোম্পানি হিরোর পাঁয়ের-ছেলে-মার্কা ছবি দিয়ে গেঞ্জি অ্যাডভারটাইজ করতে পারে। কালো চুল দেখিয়ে তেল কোম্পানি আর স্যুট পরা ছবি দেখিয়ে ভালো পাড়ার দর্জিও খদ্দের টানতে পার। ভোগ্যপণ্যের এমন মালটিপারপাস জ্যান্ত পুতুল তখন হিরোইনকে জড়িয়ে ধরে বিবেকের রোলে কথাবার্তা বলছে।

বুলু বলল, ‘অমন পারবে?’

‘রোজই তো করি—’

‘উহ্‌! তুমি তখন খারাপ খারাপ কথা বলো শুধু—’

তা কুবেরকে বলতে হয়। শরীরটা এমন বেয়াড়া। ইদানীং না চাবকালে চলতেই চায় না। অথচ সে মোটেই বেতো ঘোড়া নয়। আসলে চাঙা হওয়ার কায়দা রোজ ভুলে যাচ্ছে। গান জানে না, জানলে গাইত। সেদিন বুলুর অ্যাকাউন্টে একটা লম্বা টাকার চেক জমা দিয়ে ফেরার পথে বার বার মনে হচ্ছিল, ব্যাংকপাড়ার এই এলাহি মনোরম সব রাস্তায়, সারি সারি ঝকঝকে বাড়ির ছায়ায় হঠাৎ মোটর থামিয়ে কুবের খুব ভাবালু একটা গান ধরবে, গাইতে গাইতে স্টিয়ারিং-এ মুখ রাখবে, তন্ময় দুপুরবেলা, গাছের ছায়া নিয়ে হাওয়া নিঃশব্দে যাতায়াত করবে—বুলু শুনতে শুনতে তাতানো পথের শুকনো বকুল তুলতে খুট করে দরজা খুলে নেমে পড়বে।

এসব এত ফানি! এখন আর তাকে মানায় না।

বাবু হরিরাম সাধুখাঁ কুবেরের পাঁচপুরুষ আগে বংশের সবচেয়ে কৃতী মানুষ। তিনি ঠগি দমনের সময় কোত্থেকে যেন বহু কাঁচা পয়সা পান। সেই সুবাদে গঙ্গার ঘাটে লবণের গোলার অংশ কিনে ব্যাবসা শুরু করেন। দুই বিয়ের দরুন বিপুল সংসার হয় তাঁর। অনেক বাড়িও বানাতে হয়েছিল ফলে। দোল-দুর্গোৎসব ছাড়াও দিয়তাং ভুজ্যতাং তাঁর রক্তে ছিল।

কুবেরের বাবার আমলে এসে ভাগের ভাগ তস্য ভাগ হয়ে তাদের অংশে পড়েছিল আড়াইখানা ঘর আর তিন দেওয়াল ভর্তি অয়েল পেন্টিং। তার বাবাই প্রথম চাকুরে। অবস্থা বুঝে দেবেন্দ্রলাল ছেলেদেরও পড়িয়েছিল। অল্প বয়স থেকে কুবেরের বড়ো ভাই বাপের সংসার টানতে গিয়ে চল্লিশেই বুড়িয়ে যায়। দেবেন্দ্রলাল যুদ্ধের আগে অবদি মন্দ চালায়নি সংসার। তারপর বাজার পালটে গেল, স্টিমার কোম্পানির চাকরি দেশ ভাগাভাগিতে নষ্ট হয়ে গেল। ভাগ্য ভালো, মেয়েদের তার অনেক আগেই পার করে দিতে পেরেছিল। বড়ো ছেলের পর দেবেন্দ্রলালের তিন মেয়ে—তারপরেই কুবের। তার পরেও আরও দুই ছেলে হয় দেবেন্দ্রলালের।

কুবের জানে উনিশশো উনচল্লিশ পর্যন্ত দীর্ঘ একশো দেড়শো বছর চাকুরেদের সোনার সময় গেছে। খাবার-দাবার, বাড়িভাড়া কাপড়-চোপড় সবই সস্তা। সেই সোনার যুগে কুবেরের মা বউ হয়ে আসেন। তিনি ফেলে ছড়িয়ে সংসার করেছেন। সাধুখাঁ পরিবারের পুরোনো কালের রবরবা দিদি-শাশুড়ির মুখে শুনতে শুনতে তিনি অন্য জায়গায় চলে যেতেন। তখনকার নফরমহল এখন ভাড়াটেতে বোঝাই। তখনকার আস্তাবল এখন বিড়ির কারখানা। কুবেরের মা পরের বাড়ির মেয়ে হয়েও এই বাড়ির ঐতিহাসিক গৌরব তিনি নিজের পাওনা বলে আঁকড়ে ধরেছেন। তাই জীবনে কোথাও তিনি অর্ডিনারি হতে রাজি নন। সব সময় উত্তমে তাঁর আগ্রহ। তাই ব্যথাও পান বড়ো বেশি।

দেবেন্দ্রলাল ঘরে এসে বসতেই একে একে তার সব ছেলেই চাকরিতে বসেছে। সবাই মিলে সংসারটিও মন্দ চালায় না। কিন্তু কুবেরের মা আগেকার ঢিলেঢালা মেজাজে চলতে না পেরে সব সময় দুঃখ পান।

হরেকেষ্টর জায়গা কেনার পর সে জায়গা হাত-ফের হয়ে কুবেরের হাতে হাজার চারেক টাকায় এল। মার জন্যে লালপেড়ে শাড়ি, বাবার শীতকালের শাল, বড়দার জন্যে আশি সুতোর ধুতি কিনে বাড়ি ঢুকতেই দেবেন্দ্রলাল কুবেরকে বলল, 'টাকাকে এমন হেনস্তা করতে নেই। আসছে বলেই দুড়দাড় খরচ করতে হবে।'

মা থামিয়ে দিল, 'তুমি থামো তো। ছেলে এনেছে—কোথায় আদর করে নেবে—'

'আমার জীবনে বাবার হাতে সাতবার টাকা আসতে দেখেছি। লক্ষ্মী চঞ্চলা! বাবা যত্ন নেননি।

আটবারের বার লক্ষ্মী আর এলেন না। হরি সাধুখাঁর বংশধর আমি—অবৈতনিক ইস্কুলে আমার পড়াশুনো—'

কুবেরের হিপ পকেটে তখনও সাঁইত্রিশখানা একশো টাকার নোট। মুখ তার ইদানীং গোল হয়ে এসেছে, তাতে হাসি ধরে বলল, 'আমার গা বেয়ে বাবা টাকা আসবেই।'

কুবেরের ছোটো ভাইরাও বিয়ে করেছে। তার পিঠোপিঠি ভাই নগেন সরকারি প্রেসে ভালো মাইনের কাজ করে। একেবারে ছোটোজন বীরেন পঁচিশ পেরোয়নি। স্টেটবাসে জোনাল ইন্সপেক্টর। তার বউ রাতে খাওয়াদাওয়ার পর গল্প করতে বসে বলে, 'আপনার ভাই যে উপায় করে না।' কথাটা প্রায়ই খচ করে লাগে কুবেরের। পুরুষমানুষ এই বয়সে আর কত উপায় করবে। প্রায়ই ভাবে, একবার বলবে, ছোটো বউমা, বীরেনের বয়েসে তো আমি বেকার। তুমি একটু ট্যাকট্যাক করা ছাড়বে! পুরুষমানুষের কানের কাছে সদাসর্বদা ওই অমুঙ্গলে কথাগুলো বন্ধ করো। কার যে কখন কী হয়, কে বলতে পারে! দেখবে, বীরেন একদিন কলকাতা কিনে দিল্লির কাছে বেচে দিচ্ছে, মাদ্রাজ ইজারা নিচ্ছে। শীতকালে নোটের লেপ বানিয়ে তোমাকে নিয়ে শুয়ে থাকবে। ভাশুর হওয়ার পর থেকে ভাইদের সঙ্গে আর খোলাখুলি কথা বলা যায় না। নইলে পুরুষমানুষের কাজে যে-বউ নাক গলায় তার স্বামীর রোজগারের হাত পায় আড় ভাঙে না কোনোদিন।

বীরেন আর নগেনের জন্য রেডিমেড শার্টও এনেছে কুবের। ছোটো দু-ভাই ছোঁ মেরে নিয়েই গায়ে দিয়ে ফেলল। আয়নার সামনে ঘুরে দেখতে দেখতে নগেন বলল, 'চলো আজ সবাই সিনেমা দেখব। তুমি তো বড়োলোক—'

মা নগেনকে থামাল, 'ওর মাথাটা খারাপ—তার ওপর তুই আবার উসকে দিচ্ছিস। এখুনি গুচ্ছের টাকা নষ্ট করে দিয়ে আসবে—'

কুবের লাফ দিয়ে উঠল, 'চলো সবাই। আজ রান্না বন্ধ। হোটেলেই খাব সবাই—তারপর এসপ্ল্যানেডে যেকোনো হলে ঢুকে পড়ব—'

'এখন কি টিকিট পাবেন?'

নগেনের বউ রেখা হিসেবি। মাসকাবারি বাজারের কাপড়কাচা সাবান মেপে নিয়ে কলতলায় দেয়। ঘরে সিগারেটের ছাই ফেললে পোস্টকার্ড দিয়ে তুলে নিয়ে ছাইদানিতে রাখে। বিয়ের আগে নগেন জুতো পায়ে দিয়ে সারা বাড়ি ঘুরত। আঁচিয়ে গামছার অভাবে পর্দায় মুখ মুছত। সবার এক টুকরো, নগেনের তিন টুকরো মাছ না হলে ভাতই উঠত না মুখে। রোজ পাটভাঙা জামা গায়ে না-দিলে বেরোতে পারত না রাস্তায়। সেই নগেন এখন বাড়ির বাইরে জুতো রেখে ঘরে ঢোকে। ভাবখানা, যেন শয়ন মন্দিরে ঢুকছে। মা এক টুকরোর বেশি মাছ দিলে পাতে ফেলে রেখে যায়। বিয়ের পর থেকে নগেনকে আর পায় না কুবের। মুখে হাসি নেই। বেহিসেবি হয়ে ট্যাক্সি দাবড়াতে পারে না। বুলুর অ্যাডভান্সড স্টেজ। রাতে শুয়ে শুয়ে দুঃখ করে বলেছে কুবের,'কী হয়ে গেল ভাইটা। আর কাছে

আসে না—’

খুক করে হেসে উঠেছে বুলু, ‘তা চিরকাল তোমারই থাকবে? বিয়ে করেছে, আপনজন হয়েছে—এখন তো বদলাবেই—’

‘তাই বলে পর হয়ে যাবে? আমার সঙ্গে একখাটে শুয়ে গল্প করবে না? রেখা যেন ওর দুখানা ডানাই কেটে দিয়েছে—’

‘ওমা—মেয়ে হয়েছে, বউ হয়েছে—চিরদিন তোমার সঙ্গে ঘুরে বেড়াবে? সে কখনো হয়?’

‘আমি তো বদলাইনি।’

‘তোমার কথা আলাদা।’ তারপর থেমে থেমে বলেছে, ‘তুমি যত ভাইকে ভালোবাস, ভাই তোমায় তত ভালোবাসে না—’

এইখানে কুবেরের ইচ্ছে হয়েছে, চেঁচিয়ে বলে ওঠে—‘তুই থাম মাগি। কতখানি জানিস আমার ভাইকে? বিষম খেলে নগেনের বুক লাল হয়ে ওঠে, জামার ভেতর দিয়ে আমি দেখতে পাই, তুই জানিস এসব?’ কিন্তু বলতে পারেনি কুবের। বিয়েকরা বউ, ছেলের মা বুলু, আরও একটা পেটে এসেছে। জীবনের মাঝখান থেকে শেষ অবদি এই অন্য আরেকজনের সঙ্গে স্বামী-স্ত্রী হয়ে থাকতে হবে। কড়ি খেলার সময় মনেও আসেনি এসব কথা। এখন অবলীলায় বিবেকবাণী ঝাড়ে। নগেন, বীরেন, মা, বড়দা, বাবা, বড়ো বউদি—এসব মেলায় কেনা মাটির পাখি নয়। রং চটে গেলেও তা কুবেরের নিজের জিনিস।

মন সেকেন্ডে গ্রহতারায় চলে যায়। পলকে এসব মনে এসে মনেই ডুবে গেল কুবেরের। রেখাকে বলল, ‘যত টাকার টিকিটই লাগুক না কেন—সবাই যাব—’

মা বলল, ‘টাকাগুলো নষ্ট করিস নে। দশ টাকার বাজার করাই—দশ টাকার একখানা পাটি আনাব হরগঞ্জ বাজার থেকে। রাতে তোশকে পা কুটকুট করে।’

‘সিলি! যত আর্থলি ব্যাপারে সারাদিন জড়িয়ে আছ! এখন তোমার গীতা চণ্ডী আওড়ানোর সময়—’

মা’র শেষকালের ছেলেগুলো বেশি ছাড়া ভাবে মানুষ হওয়ায় যা ইচ্ছে বলে মাকে। তবে হাসতে হাসতেই বলে।

বীরেন বলল, ‘সেজদা একন রিচম্যান—’ দেবেন্দ্রলালের বড়ো ছেলের পর এক ছেলে ছিল। সে আর নেই। তাকে হিসেবে ধরেই কুবেরকে ছোটোরা সেজদা ডাকে। বীরেন ডিউটিতে বেরোচ্ছিল, হেসে বলল, ‘সেজদার কাছে এখন একশো টাকার নোট ইকোয়াল টু এক পয়সা। ভালো কথা, তোমরা তো সিনেমায় যাচ্ছ—আমাকে ফাইভ রুপিস দেবে?’

একটা দশ টাকার নোট এগিয়ে ধরতে ছোটো বউমা ডলি ঝাঁপিয়ে পড়ল, ‘ওকে দেবেন না সেজদা, সব উড়িয়ে আসবে—আমাকে কিছু দেবে না—’

'তাই তো চাই! ওড়ালেই আসে। যত ওড়াবে তত একশো টাকার নোট তোমার ছাদে উড়ে উড়ে এসে পড়বে সারা রাত ধরে। সকালে শুধু কুড়িয়ে নিতে হবে ডালায় করে—,' বলতে বলতে কুবের মার হাতে বুক পকেট থেকে দুখানা দশ টাকার নোট বের করে দিল।

দেবেন্দ্রলাল ছেলেদের গোলমাল থেকে আলাদা হওয়ার জন্যে খবরের কাগজে সূর্যোদয় আর সূর্যাস্তের সময় দেখছিল। আর থাকতে পারল না, 'মূর্খ! আমার এই ছেলেটা মহা মূর্খ। টাকা রাখতে শেখ। জীবনেও কষ্ট পাবি না।'

'রিকোয়ার মানি?'

দেবেন্দ্রলালের গম্ভীর মুখের ওপর একখানা একশো টাকার নোট ভাঁজ করে উঁচু করে ধরল কুবের, 'এনি অ্যামাউন্ট ইউ লাইক?'

কানে শুনতে পায় না দেবেন্দ্রলাল। আন্দাজে হাসল, তারপর 'দেখি' বলে নোটখানা টেনে নিল, 'বাড়ির ট্যাক্স বাকি সাতাশি টাকা—'

নগেন এগিয়ে এল, 'তেরো টাকা ফেরত দাও সেজদাকে—'

'রাখ! বাজারে আমার লাগে না—'

তা লাগে। কোথায় কোন জিনিসটা ভালো, জন্ম ইস্তক ছেলেদের খাইয়ে আসছে দেবেন্দ্রলাল। কুঠিঘাটার ইলিশ, সাঁত্রাগাছির ওল, অনেক আগে সাতক্ষীরের গজাও নিয়ে এসেছে ছেলেদের জন্যে। তখন নাভারোন থেকে বাসে যাওয়া যেত। একবার ভেতরে জায়গা পেল না দেবেন্দ্রলাল। একজন মৌলবি সাহেবের সঙ্গে বাসের ছাদে বসে ধুলো খেতে খেতে একাশি মাইল এসেছিল দেবেন্দ্রলাল। সঙ্গে গজার হাঁড়ি। সাবধানে আঁকড়ে বসেছিল।

নগেন ক্ল্যাপ দিয়ে উঠল, 'লর্ড সেজদা। জবাব নেই। লা-জবাব!'

কথাটা একসঙ্গে দু-ভাই হিন্দি সিনেমা দেখতে গিয়ে শিখেছিল। কতকাল একসঙ্গে সিনেমা দেখে না। বুলু বলে, বিয়ের পর ভাই ভাই আলাদা হয়ে যায়। জীবন অন্যরকম হয়ে যায়। সেটাই নাকি স্বাভাবিক। শুধু কুবেরই নাকি অস্বাভাবিক।

বিয়ে হয়ে গেলে কচু হয়। আমি, নগেন, বীরেন, মা, ছোড়দা—সবাই কেরোসিন কাঠের দুখানা খাট জোড়া দিয়ে শুতাম। বাড়ি ভাগাভাগি হয়েছে সবে। বাবার চাকরি নেই। বড়দা শুধু রোজগেরে। আশিজন পাওনাদার ছোঁক ছোঁক করছে। স্কুল কলেজে মাইনে বাকি, রেশনের টাকা থাকত না—ভোরে ঘুম থেকে উঠলে পিঠ ব্যথা করত। সারা রাত এক কাতে শুয়ে না ঘুমোলে জায়গাই হত না। তবু তখন কত শান্তি ছিল।

'রেখা তুমি তো কিছু চাইলে না?'

'বাঃ! আমি আবার কী চাইব! সব সময় তো দিচ্ছেন—'

সব সময় কুবের দিচ্ছে না—একথা কুবেরের চেয়ে ভালো আর কে জানে! সবাইকে দিতে ইচ্ছে করে ঠিকই। কিন্তু আগের চেয়ে প্রয়োজনগুলোও এখন বেড়ে গেছে জীবনে। কুবেরকে লোকে আজকাল চালাক, ধুরন্ধর, চতুর, ঘুঘু কত কী ভাবে। কেউ জানে না কুবের সাধুখাঁর মতো বোকা আর কেউ নেই। টাকা আসছে ঠিকই—কিন্তু তা ষোলো আনা ধরে রেখে নতুন নতুন জায়গায় লাগানোর মতো ব্যাবসায়িক বুদ্ধি বা ধৈর্য তার নেই। হরিরাম সাধুখাঁর অয়েল পেন্টিংখানা আজও দরদালানে টাঙানো আছে। তীক্ষ্ণ চোখ, সিংহ নাসা, চ্যাটালো বুক—এই মানুষটি সাধুখাঁ বংশে প্রতিষ্ঠা এনেছিল। বাড়ির লাগোয়া নফরমহল তৈরি করেছিল—আস্তাবলের ঘোড়া বছর বছর পালটাত।

রেখার সঙ্গে ভাশুর হয়ে তর্ক করা যায় না। হয়তো মিতব্যয়ী। হয়তো অবস্থা বুঝে আবেগ চেপে চলতে অভ্যস্ত।

এখন কুবেরের সামনে সারাটা জগৎ নানান রঙে ভর্তি হয়ে উঠেছে। কে জানত তাকে একদিন টাকার হিসেব রাখতে ডাইরি করতে হবে—লিখে রাখতে হবে। সাতটা ব্যাংকে বুলু আর তার নামে সাত দু-গুনে চৌদ্দটা অ্যাকাউন্ট। কোনোটায় চেক জমা পড়ে—কোনোটায় নগদ। মাসের ছ-তারিখ অবদি টাকা থাকলে সুদ হয়। সুদের তোয়াক্কা না রেখে কুবেরকে মাঝে মাঝে ছ-তারিখের আগেই টাকা তুলতে হয়। জমি কেনার সময় সুদের কথা ভেবে টাকা ফেলে রাখা যায় না। হাজরার মোড়ের ব্যাংকে চেক জমা দেওয়ার কাউন্টারের ছেলেটি কয়েকবারই বলেছে, এভাবে টাকা তোলেন আপনি—প্রায়ই সুদ হারাচ্ছেন শুধু শুধু। বুঝিয়ে বলা যায় না। দশ কিংবা কুড়ি বছরে ব্যাংক যা সুদ দেবে তার চেয়ে অনেক বেশি বহরিডাঙায় গিয়ে একটা জমি কোবালা করে দিলেই হাতে আসবে।

'আপনি খুব বড়োলোক হয়ে গেছেন সেজদা—'

রেখার কথায় হাসল কুবের। বড়োলোক হয়নি। বড়োলোকের কোনো মাপ নেই। সাইজ নেই। একদা সে ফ্যা ফ্যা করে ঘুরে বেড়াত। গম্ভীর গলায় 'স্টাফ' বলে ট্রামে কনডাক্টরকে এড়িয়েছে। আচমকা তার আন্দাজে কেনা জায়গা হাতবদলের যোগাযোগে প্রায়ই তাকে টাকা দিচ্ছে। নগেন জানে না কুবের কত টাকা নাড়াচাড়া করে ইদানীং।

এখন তার পকেটে কত টাকা আছে বীরেন জানে না। গত কিছুকালে দশ-বারোটা প্লট কোবালা করে দিয়ে কত টাকা ব্যাংকে ফেলে রেখেছে বুলুও জানে না। লোকে অভাবের কথা বলে, দেশের কথা বলে, আকাশের বৃষ্টি দেখে ফলনের কথা বলে—এসব কদমপুরেও শুনেছে কুবের। কিন্তু মাথায় কিছুই ঢোকে না তার। চোখের সামনে খালপাড় দোলে শুধু। ফ্রনটেজ দু-হাজার ফুট কেনার পর এখন পেছনের জায়গাগুলো কুবের ছাড়া আর কেউ কিনতে পারবে না।

'এবার বাড়ি শুরু করব রেখা। সেখানে আমরা সবাই আরামে থাকব।'

হেলতে দুলতে বুলু ঘরে ঢুকল, হাতে খোকন, 'পরে বাড়ি কোরো। এখনকার মতো একটা পাখা ভাড়া করো। নইলে ওই ঘরে আর শোয়া যায় না। ফালি বারান্দায় মা শুয়ে থাকেন রাতে—গরমে শুধু

এপাশ-ওপাশ করেন, চোখে দেখা যায় না।'

রেখা বলল, 'ইনস্টলমেন্টে পাখা পাওয়া যায়—'

সিগারেট কিনতে দেওয়ার মতো হিপ পকেট থেকে আটখানা একশো টাকার নোট বের করে নগেনকে দিয়ে কুবের বলল, 'তিনটে পাখা আনবি—আটচল্লিশ ব্লেড—'

'লর্ড! তোমার কমপ্যারিজন হয় না সেজদা। এত টাকা পাচ্ছ কোত্থেকে—'

'আমার গায়ে বেঁধে আসে রে!'

বাড়িতে হুলুস্থুল পড়ে গেল। বীরেনের বেরোনো হল না। দেবেন্দ্রলাল হাতে টাকা পেয়ে বাজারে চলে গেছে। নগেন পাড়া ছাড়িয়ে বড়ো রাস্তার দোকানে পাখা কিনতে বেরোনোর আগে জানতে চাইল, 'সত্যি বাড়ি করবে সেজদা? সে তো অনেক টাকা। তোমার আছে?'

'সব নেই। আবার আসবে—'

মা বীরেনকে মোড়ের দোকান থেকে টাকা দিয়ে সন্দেশ আনাতে পাঠাল। বাড়ির বিগ্রহে মিষ্টি দেবে। প্রথমবার মাইনে হবার পর এক টাকার সন্দেশ চড়িয়েছিল মা। তখন নগেন, বীরেন পড়ে। বড়দার ওপর পুরো সংসার। সেই সময় কুবেরের মাস মাইনের টাকা হাতে পড়তেই খুব কাজে দিয়েছিল। বদলির চাকরিতে বড়দা এখন বাইরে বাইরে থাকে। আগের মতো আর চাপ নেই। মাসখানেক হল চুলে কলপ দিচ্ছে রবিবার রবিবার।

বুলুর হাতে বাকি টাকা রাখতে দিয়ে নোটবইটা চাইল।

'আজ কে টাকা দিল?'

নামের পাশে টাকার অঙ্ক লিখতে লিখতে বলল, 'রেফ্রিজারেটর কোম্পানির সেই মিস্টার বোস অ্যাডভান্স করল—সামনের হপ্তায় রেজিস্ট্রি।'

'এই শরীরে আমি বহরিডাঙা যেতে পারব না—'

'কষ্ট করে যেতে হবে বুলু। নাহলে লোকে আমাদের টাকা দেবে কেন?'

'তুমি আমার শরীরের দিকে একটুও তাকাও না। ছেলেটার স্বভাব কেমন হল বাপ হয়ে একবার ফিরেও দেখলে পার। আক্যুটে—দামি দামি জামা পরছে, ছিঁড়ছে—কোনো কিছুর মূল্য বোঝে না—'

'এক গ্লাস জল দেবে?'

'তা দিচ্ছি। তুমি যে কী হয়ে যাচ্ছ দিনকে দিন—'

'খারাপ হয়ে গেছি?' তারপর কী ভেবে কুবের বলল, 'বিয়ের সময় কত মাইনে পেতাম আমি—'

'নব্বই টাকা প্লাস ডিএ কত যেন—ঠিক মনে নেই।'

'আরও অনেক জিনিস ভুলে যাবে বুলু। আমি কিন্তু সব মনে রাখি। তুমি আসবার আগে আমি ষাট টাকার একটা কাজ পেয়েছিলাম। বড়দার একার আয়ে আর সংসার চলে না। সেই চাকরি পাওয়ার খবর শুনে মা কেঁদে ফেলেছিল। টাকা জিনিসটাই কুলটা! কখন যে কার ঘরে থাকবে তার ঠিক নেই। এমনভাবে আসছে—আমারই এক-একসময় ভয় করে। ফাঁকা লাগে—'

'তাই বলে ছেলেকে দেখবে না? বউকে দেখবে না? মাঠে মাঠে ঘুরে বেড়াবে? বহরিডাঙা সাবরেজিষ্ট্রি অফিস গিয়ে মুহুরিদের সঙ্গে কাটাবে? অফিসেও যাচ্ছ না—'

'আর যেয়ে কী হবে?'

'মাস গেলে মাইনে দেয়। পুজোয় বোনাস দেয়—'

'আমার আর ভালো লাগে না। প্রোডাকসন বোনাস একশো সাঁইত্রিশ কি পঁয়ত্রিশ—তাই নিয়ে চুলেচেরা গজালি ঘন্টার পর ঘন্টা, হিট অ্যালাউন্স বাহান্ন টাকা পঁচাশি পয়সা হবে, না তিরাশি পয়সা হবে—তার কুটকচালি—বোরিং—'।

'এক সময় তো এ-ই কত লোভের ছিল। তাই না?'

'ও কী কথার ছিরি! তোমার কি কেউ নেই! এমন করে বলো কেন?' কুবেরের হাত থেকে জলের গ্লাসটা নিতে নিতে বুলু বলল, 'আমার অত বৈরিগিপনা নেই বাপু—খাব, থাকব, সুখ করব, বয়স হলে মরে যাব—'

'আমার কত লোভ মরে গেছে বুলু। এখন কত টাকা আসে—সব তুমিও জানো না। আমার মনে হয় ঘুড়ি লুটছি—হইহই করে ট্রাম রাস্তা ধরে ভোকাটা ঘুড়ির পেছনে ছুটছি। মাঞ্জা দেওয়া সুতোয় হাত কেটে যাচ্ছে—তবু ছুটছি। আজকাল একশো টাকার নোটের গোছা ব্যাংকে লাইন দিয়ে দাঁড়িয়ে জমা দেওয়ার আগে লোটা ঘুড়ির মতো পরপর সাজিয়ে নিই। জানি এগুলো আমার নয়।'

'ছেলেবেলায় ঘুড়ি ধরেছ?'

'কোনোদিন পারিনি। আঁকশি ছিল না। প্যান্টে বোতাম থাকত না, গায়ে জামা না। নগেনকে পেছনে নিয়ে কোমর ধরে ছুটতাম। শুধু একবার একখানা পেয়েছিলাম—'

বুলু হাসি ঢেলে তাকিয়ে আছে দেখে কুবের উৎসাহ পেল, 'একখানা কাটা ঘুড়ি দুলতে দুলতে গিয়ে পুকুরে পড়ল। সবাই ছুটে এসে পুকুর পাড়ে থমকে দাঁড়াল। নগেনকে দাঁড় করিয়ে রেখে আমি ঝাঁপিয়ে পড়লাম। কোনো কম্পিটিটর নেই। ঘুড়িখানার কেনিফট্টাশ দশা। কাগজ জলে গলে গেছে—'

'কী করলে?'

'তাই নিয়ে পাড়ে উঠলাম বীরদর্পে। সুতো গুটিয়ে নগেনের হাতে দিলাম। আমার জীবনে অন্তত একবার ঘুড়ি লোটার দরকার ছিল বুলু। একবার আমাকে টাকার শেষ দেখতেই হবে। ঘটির তলায় কী আছে আমি জানবই।'

আড়াইখানা ঘরের এককোণে নারায়ণ। ঠাকুরমশাই পুজোর পর আরতি দিয়ে নৈবেদ্যর থালা কখন নামিয়ে দিয়ে চলে গেছে। রেখা মেয়ের দুধ জ্বাল দিচ্ছে ফালি বারান্দায়। স্টোভটায় পলতে নেই সলতে নেই। ডলি বিটি পড়েছিল। স্কুলে কাজ পায় না। চাইল্ড এডুকেশন পড়েছিল। বাচ্চা চায়। ডাক্তার দেখানো দরকার। বীরেন সময় পায় না। ডলি তার পার্টিশন করা ঘরের জানলা-দরজায় যবনিকার স্টাইলে খালি খালি পর্দা টানাচ্ছে। পাশেই শরিকানি একখানা ঘর চল্লিশ টাকায় ভাড়া নিয়ে সেখানে নগেন আর রেখা থাকে। রাতে ফালি বারান্দায় মা আর বাবা থাকে। তালপাতার পাখা নাড়ার আওয়াজ বড়ো ঘরখানাতে শুয়ে শুয়েই রোজ রাতে শুনতে পায় কুবের।

'এখন তোমাকে দেখলে ইরা নিশ্চয়ই বিয়েতে বসত—'

মেয়েলোকের চপল হওয়ার বিষয় ওই একটাই। বিয়ের আগেকার কিছু স্মৃতি, কিছু কাহিনি। ছাড়াছাড়ির সময় অল্প বয়সে মনে হয়, ওঃ! এসব কথা কোনোদিন ভোলা যাবে না। তারপর এমন অবস্থা হয়, হাজার চেষ্টা করেও ইরার মুখখানা অবদি মনে পড়ে না। অথচ আগে কত খুঁটিনাটি মনে থাকত। মনে হত, কোনোদিন ভুলব না। এখন ব্যাপারটা প্রায় শীতকালের বাতের কামড়ের মতো। গরমকালে কোনো চিহ্ন নেই। ঠান্ডার দিনে হঠাৎ এক-একদিন টনটন করে ওঠে শুধু।

'বিভূতিও তোমাকে দেখলে নিশ্চয় হিংসে করত—'

'তা করতে যাবে কেন? বেশ আছে বউ নিয়ে বেহালায়—'

'তাতো আছেই। তিনটি মেয়ে। এই বাজারে আড়াইশো টাকা মাইনে। মেলিং ক্লার্ক। অফিসের পরেও বড়তলা থানার পাশে এক কোম্পানির খাতা লিখে দিতে যায়—'

'তুমি এসব জানলে কোত্থেকে? খোঁজখবর করো বুঝি—'

'দেখা হয়ে গেল রাস্তায়। লাল আলোতে ট্যাক্সি দাঁড়িয়ে গেল। দেখি সামনে দিয়ে যাচ্ছে। বাসে প্যাসেঞ্জার বোঝাই। উঠতে পারছে না। ডেকে পৌঁছে দিলাম। তখন সব বলছিল—'

'আর কী বলল?'

'ভয় নেই। তোমার কথা তোলেনি।' মজার ঘোরে কুবের বলল, 'আচ্ছা তোমাকে তিন বছর গান শিখিয়েছিল?'

'বিয়ে হয়নি, বয়স বেড়ে যাচ্ছিল। মন খারাপ থাকত। পাড়ার ক্লাবে কোরাস গাইতে গিয়ে একসঙ্গে গান করেছি। একদিন বৃষ্টির রাতে জল ভেঙে আমায় বাড়ি পৌঁছে দিয়েছিল—গলির মধ্যে হাত টেনে নিয়ে কী যেন বিড়বিড় করে বলতে শুরু করল, আলো নেই, আমি হাত টেনে নিয়ে দৌড়ে বাড়ির ভেতর চলে গেছি। অন্ধকার বারান্দা। উঠে পেছন ফিরে দেখি আমাদের খোলা দরজার সামনে ভূতে পাওয়ার মতো বিভূতি দাঁড়ানো—'

'কোঁকড়া চুল বিভূতির—তোমার ভালো লাগত—'

খুক করে হেসে ফেলল বুলু, 'তা লাগত। যারাই মেয়ে দেখতে আসে তারাই এটা চায় ওটা চায়। দাদা কোথেকে দেবে? বাবা থাকলে না হয় হত। কে তা বুঝবে। তখন যে কোনো একজন হলেই ভালো লাগত। আমি টিউশনি করে হারমোনিয়াম কিনেছিলাম। বিভূতি স্বরলিপি তুলতে জানত—'

'শুধুই স্বরলিপি তুলে দিত?'

'আবার কী। তুমি তো কতজনের সঙ্গে কত কী করেছ। আমি খোঁজ নিতে গেছি!'

'আমি খুব কিছু করিনি বুলু। মিশেছি অনেকের সঙ্গে। দু-চারজনের সঙ্গে ঢলাঢলির জোগাড় হয়েছিল। কিন্তু তখন আমি কনফার্মড বেকার। কারও সঙ্গে জমত না। নেশার মতো জড়িয়ে পড়েই কেটে গেছি—' হঠাৎ কুবের বলে দিল, 'বুলু—বিভূতি চুমু খেয়েছিল—'

'চুমুর মতো করেছিল—মুখ কাছে এনে সেরকম করতে চেয়েছিল—'

'তুমি ঠোঁট বুজেছিলে—তাই না—'

'কেন খুঁচিয়ে পাগল করছ। আমি তো কিছুই লুকোইনি তোমাকে। আমার এসবে কিছুই হত না। এক-একদিন অনেকক্ষণ বসে থাকত। হারিকেনের আলো—চিমনি কালো হয়ে এসেছে হলদে কেরোসিনে। দাদা বাজার করে ফেরেনি। বউদির বাচ্চাগুলো না খেয়ে ঘুমোচ্ছে। বিভূতি কখন উঠবে বলে বসে আছি। উঠলেই ছাতু আর গুড় মেখে খেতে বসব। এক দানাও চাল থাকত না কোনো-কোনোদিন। তিন টাকা, সাত টাকা সব টিউশনির রেট—পাঁচ বাড়ি ঘুরে যা পেতাম তাই জমিয়ে জমিয়ে লাল পাথরের ডুমো বসানো একটা হার গড়িয়েছিলাম দেড় বছরে—', হঠাৎ থেমে দম নিল বুলু। বিকেলে ট্রামে একরকমের শব্দ হয়। তার মাঝখানে ফিরে বলল, 'তখন চাকরি পেলে ইরার সঙ্গে নিশ্চয় বিয়ে হয়ে যেত তোমার?'

'তা হত। ডিপ লাভের পিরিয়ড যাচ্ছিল তখন। দু-শো টাকার চাকরি পেলে অন্যরকম হয়ে যেত। শেষদিকে আর পাঁচটা হিসেবি মেয়ের মতো বলতে শুরু করল—''আমার সঙ্গে তোমার খাপ খাবে না। আমি একভাবে মানুষ—তুমি একভাবে মানুষ!'' বুঝতে পেরেছিল, আমি শিগগিরি কোনো চাকরি পাচ্ছি না।'

'কষ্ট হত তোমার?'

'তা হত বুলু। কিন্তু কিছু করার ছিল না। অবশ্য এমন কষ্ট আমার ভুলতে দেরিও লাগত না। ইরার বাবা পাকিস্তানে ওষুধ ব্ল্যাক করে অনেক টাকা করেছিল। কলকাতায় দুখানা বেনামা বাড়ি। তারপর নিউ আলিপুরে নতুন বাড়ি তৈরি হচ্ছিল—'

'কষ্ট ভুলে যেতে? আমার কিন্তু খুব মন খারাপ থাকত। বিভূতিটা ভীষণ ভিতু ছিল। অল্প মাইনের চাকরিতে তখন আমাকে বিয়ে করতে ভয় পেয়েছিল। মানে মানে করে কেটে পড়ল। আমার তো শরীর খারাপ হয়ে গেল—'

‘তখন আমি গিয়ে হাজির। তোমাদের ছাদে প্রথম আলাপেই হাত চেপে ধরলাম তোমার। তুমি দাঁত খিঁচিয়ে উঠেছিলে। আমি ওরকমই করতাম বুলু। অঙ্কের মতো একজনের পর একজনের সঙ্গে মিশতাম। সবাই যে যার জীবনের জায়গায় বসে আছে। শুধু আমিই সিট পাইনি। হাউস ফুল। তখন ইনসাল্টেড হতে এত ভালো লাগত—’

‘ইরার হাত চেপে ধরতে?’

হোহো করে হেসে উঠল কুবের, ‘হাত কী! জড়াজড়ি করেছি কত। তখন তো কলকাতায় এমন খালি বাড়ির সন্ধান জানতাম না। ইংরাজি মাসের গোড়ার দিকে ওর ছিল পিরিয়ডের সময়। লাল নয়তো খয়েরি শাড়ি পরে আসত। তখন কী পাগলামিই করত। গলার স্বর বড়ো মিষ্টি ছিল। জাগরণে যায় বিভাবরী—এমন গাইত—গলার ভেতর দিয়ে বুকের সুধা বলো, অমৃত বলো—সব উঠে আসত। দোষের মধ্যে ওর নাকটা কিছু মোটা ছিল, কিন্তু ভয়ংকর গাঢ় গম্ভীর চোখ দিয়ে সে-খুঁত পুষিয়ে নিয়েছিল। চুমু খাওয়ার সময় বুঝেছিলাম, এ মেয়েকে আমি ভালোবাসব নিশ্চয়—পরে হয়তো সব গুবলেট হয়ে যাবে—কিন্তু ভালোবাসা হবেই। চুমু খেয়েই বুঝেছিলাম—’

‘কেমন করে?’

‘যেমন করে তোমাকে বুঝেছিলাম। তিনদিনের মধ্যে জোর করে চুমু খেয়েই বুঝলাম তোমার সঙ্গে ভালোবাসা হবে। তবে সময় লাগবে। আসলে বিয়ের পর আস্তে আস্তে তোমাকে ভালোবেসেছি বোধ হয়—অথচ লোকে বলত আমাদের লাভ ম্যারেজ—’

‘বুঝলে কী করে—’

‘চুমু খেয়ে সুগন্ধি লাগলেই জানতাম। তোমার আগে শুধু ইরাকেই তেমন লেগেছিল। এক-একজনকে এমন বিচ্ছিরি লেগেছে চুমু খাওয়ার পর—কী বলব—কিন্তু সেই মোমেন্টে তো পিছোনো যায় না। আমাকে তখন গাড়িভাড়া দিয়ে করুণা করে মেয়েরা ফাঁকা জায়গায় নিয়ে গিয়ে প্রেম করাতো, প্রেমের ডায়লগ শুনত। আমারও কোনো চাকরি ছিল না, কাজ ছিল না—জগৎটাই শুকবো—আমি তখন প্রায় মেয়েমানুষের নাঙ হয়ে উঠেছি।’

‘মানে?’

‘ও তুমি বুঝবে না—’

‘বলোই না—’

‘কেষ্ট বোঝো? পুরুষলোক পয়সা হলে রক্ষিতা রাখে। আমি তখন মেয়েদের রাখিত্—সস্তার নাঙ। লাভমেশিন বলতে পার—ঘোরে থাকতাম—সামনে সব কিছুই ধুধু করছে—’

‘ভালোই ছিলে বলতে হবে?’

‘চমৎকার! শুধু মন খারাপ লাগত—এ আমি কী করছি! সকালে কৃষ্ণা। বিকেলে তৃষ্ণা। সন্ধেয় আরতি

—এরকম কত কী।'

'বিবেক কামড়াত তাহলে?'

'আফটার অল হিউম্যান বিইং। কামড়াবেই। আর বয়স বা কী ছিল। তখনকার কুবের সাধুখাঁকে এখন দেখতে পেলে আমি নিজেই টাকা-পয়সা দিয়ে সাহায্য করতাম। দেখলে মায়া হত। বলতাম—ব্রাভো ইয়ংম্যান। খুব হয়েছে। অনেক পরিশ্রম করেছ। এই নাও দশ হাজার টাকা। এবার খেয়েদেয়ে দরজা আটকে ঘুমোও গিয়ে। কেউ ডিসটার্ব করবে না। তোমার সব চিন্তা আমার—'

'খুব পরিশ্রম হত বলো।'

'হবে না? বৃষ্টির দিন। একটা গেঞ্জিও শুকোয়নি। মার সাদা ব্লাউজ পাঞ্জাবির নীচে। পুলিশ অফিসারদের সাততলা ফ্ল্যাটবাড়ির পেছনে আলিপুরের দিকে গাছপালা-ঘেরা একটা মাঠ ছিল। ইরার কোলে মাথা দিয়ে শুয়ে ভালো ভালো কথা বলছি—মাথা নিচু করে ইরার তিন-তিনটে চুমু খাওয়া হয়ে গেছে—আমি তখন নন্দনকাননের পুকুরে চিত সাঁতার দিচ্ছি প্রায়—এমন সময় ইরা আমার বুকে ভালোবাসার হাত বোলাতে গিয়ে গায়ে গেঞ্জির বদলে মার ব্লাউজ আবিষ্কার করে গলগল করে মাটিতে ভেঙে পড়ে হাসতে লাগল। হঠাৎ এক সঙ্গে অনেক হাসির শব্দ—কথা—তড়াক করে দুজনেই উঠে দাঁড়ালাম। পুলিশ অফিসারদের সেই ফ্ল্যাটবাড়িটার সব ফ্লোরেই পেছনের ঝুল-বারান্দায় মেয়েপুরুষ দাঁড়ানো। এতক্ষণ তারা বিনে পয়সার সিনেমা দেখছিল। এবার একটা হাসির সিনে সবাই হেসে উঠেছে।

'কী করলে?'

'আমরা দুজন মাথা নিচু করে সবার চোখের সামনে দিয়ে মাঠ পেরোলাম। মাঠ যেন আর শেষ হয় না। রাস্তায় উঠে ইরাকে চাঙ্গা করার অনেক চেষ্টা করলাম। ততক্ষণে আমার কেস হোপলেস। পৃথিবীতে আমাদের আড়াল করার একটা শেড নেই। বিশেষ করে আমার নেই। ইরা বলল,—'একটা কাজ জোটাতে পারো না—কত লোক চাকরি করে।' এত স্যাড—করুণ হয়ে গেল বিকেলটা। তারপরেই মেয়েটা এক ডাক্তার জুটিয়ে বিয়ে করে ফেলল। বিলিভ মি, আমার কোনো কষ্ট হয়নি। অথচ মজা দেখ সেই ডাক্তারকে নিউ আলিপুরের বাড়িতে ঘরজামাই রেখে নারসিং হোম করেছিল ইরার বাবা। অনেক টাকা আসবে। কিন্তু ওপাড়ার বাসিন্দারা কচি ধন্বন্তরিতে বিশ্বাস করে না। তারা ছোটে ঘাঘু ডাক্তারের খোঁজে। বেচারার নতুন নারসিং হোমে ওষুধ নিতে আসে তারাতলার লেবার ক্লাসের লোকজন। তারা ওষুধের দামই বাকি রাখতে চায়। অতএব ইরাকে স্কুলে চাকরি নিতে হল—'

'তুমি এত খোঁজ পেলে কোত্থেকে—'

'কঠিন না। আমাদের কারখানার গুপ্তর বউয়ের সঙ্গে একই স্কুলে পড়ায় ইরা। তার কাছে বলেছে—বর যতদিন নিজের পায়ে না দাঁড়াচ্ছে—ততদিন কোনো বাচ্চা আনবে না। বরকে সাপোর্ট দেওয়ার জন্যে স্কুলে কাজ নিয়েছি।'

'মিসেস গুপ্ত জানলেন কী করে—ইরা তোমাকে চেনে?'

রীতিমত জেরার ভঙ্গি দেখে হাসি পেল কুবেরের, 'ন্যাশনাল মেটালস নাম শুনে ইরাই আমার কথা জানতে চেয়েছিল গুপ্ত বউদির কাছে। তিনিই ঘুরিয়ে, ফিরিয়ে এসব কথা বলেছেন। ভালো কথা— বিভূতি বেহালায় আছে জানলে কী করে?'

'বাঃ! তোমার সামনেই তো বলল।'

তা ঠিক। বিয়ের বছর দুই পরে কুবের একদিন কারখানার টাইম অফিসে শুনল বিভূতি নামে কে এক ভদ্রলোক তার জন্যে দু-ঘন্টা বসে থেকে ফিরে গেছে। বলে গেছে পরদিন আসবে। রাতে বাড়ি ফিরে বুলুকে নামটা বলতেই, বুলু বলেছিল, 'ওঃ! আমাদের পাড়ার ছেলে ছিল—'

পরদিন অফিসে বিভূতির সঙ্গে দেখা হল। প্রথম আলাপেই জানাল, বুলুদির বরের সঙ্গে পরিচিত হতে এসেছে। বুলুকে দিদি বলতেই কুবের বুঝল, এই পাতলা আড়ালটুকুর দরকার ছিল না কোনো। বরং ছেলেটাই ধরা পড়ল নিজের কথায়। বুলুর চেয়ে কোনোমতেই ছোটো না। সেন্ট্রাল আর নর্থ ক্যালকাটার বাইরে বছর দশ পনেরো আগেও পাড়ার মেয়ের সঙ্গে ভালোবাসা করতে এসে নরম নরম ছেলেরা প্রথমেই দিদি পাতাত। হঠাৎ ধরা পড়লে পাড়ার ছেলেদের হাতে আড়ং ধোলাই হওয়ার মুখে ওই ডাকটুকুই লাভারদের কাছে বিপদের মাঝে লাইফ বয়া হয়ে দেখা দিত।

ছোকরার ইচ্ছে ছিল বুলুদির বরকে দেখে। ছোকরার ইচ্ছে ছিল বুলুকে একবার দেখে। অনেকদিন দেখেনি। নানান জনের ভালোবাসার নাঙ কুবের সাধুখাঁ বিশেষ মজা পেয়েছিল। কিছুই মনে করেনি সে। কিছু না জানিয়ে বিভূতিকে একেবারে বসবার ঘরে এনে বসিয়ে তবে বুলুকে ডেকেছিল কুবের, 'দেখবে এসো—কে এসেছে—'

খোকন হওয়ার পর তখন সূতিকার মতো হয়েছিল বুলুর। আস্তে হেঁটে ঘরে ঢুকেই বুলু প্রথমে বোবা হয়ে গিয়েছিল, তারপর অনেক কষ্টে বলেছিল, 'কী ব্যাপার—'

ছেলেটাও ঘাবড়ে গিয়েছিল। কুবের মিষ্টি আবার নাম করে পাড়ার দোকানে গিয়েছিল। কোনো সন্দেহবাই তার মনে নেই। একটা মজা শুধু। তবে কঠিন মজা। রসগোল্লা খেতে গিয়ে গলায় আটকে গিয়ে প্রচণ্ড বিষম লাগল বিভূতির। বুলু উঠল না। কাঠ হয়ে বসে থাকল চেয়ারে। বেচারা! বড়ো সৎ! এসব কেউ আর গায়ে মাখে নাকি আজকাল। পৃথিবীটা কত বদলে গেছে বাইরে—তার কোনো খবরই রাখে না বুলু। পুরোনো কথা ভেবে কাঁটা হয়ে বসেছিল। শেষে কুবের উঠে জল এনে দিয়েছিল। আর আসেনি ছেলেটা। বিয়ে করার ভয়ে বুলুর কাছ থেকে কেটে পড়েছিল। কুবের কত জায়গায় কেটে পড়েছে। পরে সেই সব মেয়েকে বরসুদ্ধ ফুটপাথে হাঁটতে দেখে বুকের মধ্যে খচ করে উঠত তার। আহা এসব আমার সম্পত্তি ছিল। এক-একটি পুরাতনী শিখা।

খোকন জুতো পায়ে লাফাতে লাফাতে কাছে এল। কাকিমাদের ঘরে সব সময় ঘুরঘুর করে। ছেলেটার ভালো নাম অমিতাভ সাধুখাঁ। দেবেন্দ্রলাল নাম দিতে চেয়েছিল সৃষ্টিধর। কাছে টেনে এনে একটা চুমো খেল কুবের। কতদিন যেন দেখা হয় না। নদীর ওপারের ছেলে একেবারে। মুখখানা

তুলে ধরে ভালো করে চোখ দেখল কুবের। তার নিজের শরীরে ঘোলাডাঙার পাপ কিছু থেকে থাকলে এই নরম ছেলেটার গায়ে একদিন না একদিন ফুটে বেরোবেই। কুবের দেখল তারই মতো নিষ্পাপ, নির্দোষ মুখশ্রী—নখ বসালে আপেলের ওপর যেমন বসে তেমন বসে যাবে—এখন একেবারে নিটোল। এই ইনোসেন্ট মুখোশটা অনেকদিন না-খোলায় একেবারে মাংসের মধ্যে বসে গেছে কুবেরের।

'ছেলেটাকে ওভাবে ধরেছ কেন? ওর হাড় ভেঙে যাবে তো—,' খোকনকে বুলু সরিয়ে নিল, 'নাও জুতো জামা ছাড়ো। ঠাকুরপো কুলির মাথায় দিয়ে পাখাগুলো আনছে—এখন বড়ো রাস্তায়—'

কুবেরদের জানলা দিয়ে ট্রাম লাইন অবদি দেখা যায়। হঠাৎ বলল, 'বিভূতি তোমাকে চুমু খেয়েছে মনে পড়লেই আমার বুকের ভেতর মোচড় দিয়ে ওঠে—'

'খেতে দিইনি তো। মুখ সরিয়ে নিয়েছি—,' তার চেয়ে বুলু বলতে পারত—'বড়ি শুকোতে দিয়েছিলাম, কাক বসতে দিইনি।'

'ওই হল। আমার ভাবলেই কষ্ট হয়।'

'আমার কষ্ট হয় না তোমার সব কথা শুনে—?'

'বাঃ! আমি যাই করি আমার মনে তো কোনো দাগ কাটেনি কোনোদিন—'

'আমিও দাগ ফেলতে দিইনি।'

কুবের দেখল বুলুর হাত জানলার পর্দা টানতে টানতে জবাবের জন্যে থেমে আছে। হেসে বলল, 'কী জানি! কিন্তু বিভূতির সঙ্গে তোমার ওসব মনে হতেই আমার বুকের মধ্যের দেওয়ালগুলোয় গরম হাওয়া ঘুরে ঘুরে পুড়িয়ে বেড়ায়—'

এবারেও খুক করে হাসল বুলু, 'ন্যাকামি'!

'আমি একটা কথা বলব বুলু, তোমাকে?—আমার জীবনের একটা স্যাড ঘটনা—খুব স্যাড।'

কুবের জানে ওই ফালি বারান্দায় তার জন্ম। হোগলার বেড়া দিয়ে ঘিরে দেওয়া হয়েছিল। তখন হাসপাতালের এত চল হয়নি। মিডওয়াইফ শশীবালার হাতে সে ভূমিষ্ঠ হয়েছিল সাত টাকায়। বুড়ির কেউ নেই। এক ইউনিটের কার্ডে নিজেই রেশন নেয় লাইন দিয়ে। কুবের বড়ো হয়ে ভাঁড়ার ঘরে একই ধরনের লম্বা লম্বা বোতলে কেরোসিন রাখতে দেখত। সেগুলো মৃত-সঞ্জীবনী সুধার বোতল। কুবের হওয়ার পর শরীর ভেঙে যাওয়ায় মা অনেকগুলো খেয়েছিল।

এগারোই চৈত্র, শনিবার, অমাবস্যার দুপুরে তার জন্ম। ক-দিন পরেই বোধহয় নীলের উপোস ছিল। কুবের জন্মাতেই কলকাতা-হাওড়া-সালকের ওপর দিয়ে গত চল্লিশ বছরের সবচেয়ে বিখ্যাত ঘূর্ণিঝড় বয়ে গিয়েছিল। সেকেন্ডে হোগলার আড়াল নিশ্চিহ্ন। তখনও ফুল পড়েনি মার।

কাশীবাসী এক পাগলি পিসি ছিল কুবেরের। ভয়ংকর মুখরা বলে বিয়ের পরেই স্বামী তাকে ফিরিয়ে দিয়ে গিয়েছিল। বড়োঘরের ছেলে। আচমকা মরে যাওয়ার তার ভাগের সম্পত্তি থেকে টাকা আসত পিসির নামে। সেই টাকায় পিসি কাশীবাসী। ভয়ংকর শুচিবাই।

হোগলার আড়াল সরে যাওয়ায় ঝড়ের মধ্যে কাতরাতে কাতরাতে মা বলেছিল, 'ঠাকুরঝি, ছেলেটাকে একটু ঘরে নিয়ে যাবি?'

'বউ, তুই কি আমাকে গঙ্গচান করাবি? ও আমি ছুঁতে পারব না।'

ননদের কথায় মুখ চেপে ঘষটে মা ঘরে এসেছিল। আসবার সময় কয়েক ঘন্টা কুবেরকে গামলা চাপা দিয়ে বাইরে রেখে এসেছিল। ঝড় থামলে তবে তাকে ঘরে আনা হয়।

কোনো ক্ষণজন্মা মহাপুরুষের জীবনের ইতিবৃত্ত নয়। জন্মের পর যারা একদিন গাছপালা, পশুপাখি, পোকামাকড়ের ধারায় মরে যায়—কুবের সাধুখাঁ তাদেরই একজন। মা বড়ো ভালো কথক। তার মুখেই এসব শোনা। ইতিহাসে যেমন যুদ্ধ-বিগ্রহ, সন্ধি, শান্তিস্থাপন, পতন-উত্থান—এক একটা স্তর, সময়ের ধাপ—এই মহিলার জীবনেও তার ছেলেমেয়েদের জন্ম, অসুখ, পরীক্ষা পাস, বিয়ে, চাকরিতে বসা—জীবনের এক-একটা মনে রাখার মতো সিঁড়ি।

কুবের চেষ্টা করে দেখল, একেবারে পেছনে, কত পেছনে তার কী মনে আছে। আচার্য প্রফুল্লচন্দ্রের 'চা-পান না বিষ পান' পড়ে অনেকে চা ছাড়লেও বাজারে বাজারে তখন কলের গানে থরথরে রেকর্ডে ভাটিয়ালি শুনিয়ে বিনি পয়সায় চা খাওয়ানোর বিজ্ঞাপন শুরু হয়ে গেছে। গোপি চাকরের কোলে উঠে কতদিন কুবের এইসব গান শুনেছে। গোপি ফ্রি চা খেত, মুখের চা কুবেরকে খাওয়াত। সেই সময় তিন বছরের কুবেরকে অলস্টার পরিয়ে দেবেন্দ্রলাল একটা ছবি তুলিয়েছিলেন। ছবিখানা এখন বুলুর অ্যালবামে। ঘাড় ঠিক ডানদিকে হেলানো। এক মাথা কোঁকড়ানো চুল। ডান কানের কাছে

ছবিটা উইয়ে কেটেছে।

দ্বিতীয় যা মনে পড়ে, তা হল, এক জ্ঞাতি দাদুর একটি সাদা ঘোড়া। হরিরাম সাধুখাঁর তৈরি পৈতৃক এই বাড়ির চারতলার চিলেকোঠায় বুড়ো থাকত। হরিরামের প্রথম পক্ষের দিক দিয়ে প্রপৌত্র। অনেক বয়স। কার ছেলে—কী বৃত্তান্ত, সবাই ভুলে গিয়েছিল। দেখবার কেউ ছিল না বুড়োর। তার বয়সকালের ঘোড়াটা পৈতৃক আস্তাবলে পা ঠুকে ঠুকে ডাঁশ তাড়াত মাঝরাতে। মার পাশে শুয়ে রাত জেগে বালক কুবের সেই শব্দ শুনত। একদিন রাতে স্বপ্নে দেখল, ঘোড়াটা সদর দরজা দিয়ে ঢুকে সোজা সিঁড়ি বেয়ে তাদের ঘরের সামনে এসে দাঁড়াল। তারপর কুবেরের বুকে উঠে এক জায়গাতেই পুরো দৌড়ের কসরত শুরু করে দিল। কুবের চেঁচিয়েও কূল পায় না। ঘুম ভাঙতে দেখল মশারির মধ্যে সবাই ঘুমোনো। ঘরের বড়ো আয়নায় জ্যোৎস্না পড়ে উলটোদিকের দেওয়ালের অয়েলপেন্টিং-এ হরিরাম আচমকা আলোয় জ্বলজ্বল করছে। সেদিনই ভোরে কম্প দিয়ে জ্বর এল। টাইফয়েড। ছত্রিশ দিনের দিন রেমিশন। বড়দা চৌরাস্তা থেকে সেদিনই কুবেরের জন্যে বড়োদানার চিনিমাখানো একটিন হাংলিপামার বিস্কুট নিয়ে এল। দুধে ভিজিয়ে তাকে একখানা খেতে দেওয়া হয়েছিল।

পাড়ার রায়সাহেববাড়িতে কাঠের বাক্সে রেডিয়ো থাকত। শীতকালে সন্ধেবেলা রেডিয়ো শুনে সবাই বলল, যুদ্ধ লাগল। কিছুদিন পরেই বড়দা পট করে চাকরি পেয়ে গেল। মা কালীবাড়ি পুজো দিয়ে এল।

৮ জানুয়ারি অ্যাডমিসন টেস্ট দিয়ে কুবের সাধুখাঁ ক্লাস থ্রিতে ভর্তি হল। রোল সেভেন। হাফ-ইয়ারলি পরীক্ষার পর ঢিলেঢালা ক্লাসে ফিফথ পিরিয়ডে সনৎ একদিন কু দিল। ক্লাসটিচার মহতাবউদ্দিন স্যারের ক্লাস। কে করেছে? জানতে চাইতেই সনৎ উঠে দাঁড়িয়ে বলল, ‘‘স্যার আমি।’’ অমনি স্যার সনতের সত্যবাদিতার প্রশংসা করে ক্লাসসুদ্ধ সবাইকে বললেন, ‘‘ফলো সনৎ।’’

পরের সপ্তাহে ওই পিরিয়ডে কুবের কু দিল। কে করেছে? জানতে চাওয়া মাত্র কুবের উঠে দাঁড়াল। মহতাবউদ্দিন স্যার কাছে ডাকলেন। স্যারের মাথার পেছনে দেওয়ালে হরিণের মাথা লাগানো একটু উঁচুতে। স্যার চক দিয়ে কুবেরের গোঁফ এঁকে উঁচু টুলের ওপর কুবেরকে দাঁড় করিয়ে মাথাটা হরিণের দুই শিংয়ের মধ্যে আটকে দিলেন। তারপর ক্লাসসুদ্ধ সবাইকে বললেন, ‘আমার ক্লাসে গোলমাল হলে এই শাস্তি।’

সেদিন থেকে কুবের জীবনে বেতাল হয়ে গেল।

রোজ সে খারাপ হতে থাকল। লোকে যাকে খারাপ বলে—তাই।

শীতকালে হরগঞ্জ বাজারে কমলা ঢেলে বিক্রি হত। একপাল বন্ধুর সঙ্গে সন্ধেবেলা চাদর জড়িয়ে কমলা আনতে যেত। দরাদরি করে কেনার সময় কে কটা চাদরের নীচে সরাতে পারত—তাই ছিল খেলা। মারাত্মক খেলা। ধরা পড়ে একদিন বেদম মার খেল ব্যাপারীদের হাতে। বাড়িতে বলার উপায়

নেই। বললে, ডবল ধোলাই হবে।

ব্ল্যাকআউট হয়ে গেলে কুবেররা সনৎদের দেশের বাড়ির কাছাকাছি মফস্সল শহরে চলে গেল। সেখানকার স্কুলের গায়ে ম্যাজিস্ট্রেটের বাড়ি ছিল। একদিন মর্নিং স্কুলের সময় কী ভিড় সাহেব ম্যাজিস্ট্রেটের বাড়ি। কুমির মারা পড়েছে সাহেবের গুলিতে। কুমিরের পেটের ভেতর থেকে চুড়ি, হার, দুল, মানুষের হাতের হাড় পাওয়া গেল একখানা।

এরপর সনতের সঙ্গে ঘোলাডাঙায় শেফালির ঘরে যাওয়া অবদি কিছু মনে নেই কুবেরের। তারপর সবই ঘোলা। হরি ডাক্তারের ওষুধে ইঞ্জেকশনে কুবেরের পুঁজ পড়া বন্ধ হল। কুবের সৎ হয়ে যাওয়ার জন্যে উঠে পড়ে লাগল। কলেজ পার করে দিয়ে চাকরির বাজারে নেমে দেখল, এই নিষ্পাপ ভাবটা কোনো কাজেই আসে না। বরং এজন্যে তাকে ঘা খেতে হচ্ছে। চাকরিতে সবাই তুখোড় লোক চায়। ফুলের এগজিবিশনে মানুষের একটা নিষ্পাপ মুখ টবে বসিয়ে রাখা যায়। মিলমিশ হতে অসুবিধে হয় না। কিন্তু অফিসে কারখানায় অমন মুখের লোককে কেউই ভরসা করে না। বরং বোকা, নয়তো মিনমিনে মনে করে। অথচ মুখে এই ছাপ কুবের সাবান ডলেও ওঠাতে পারবে না। এক শুধু ধার চাওয়ার সময় এই ভাবখানা খুব কাজে এসেছে। ধনরাজের সামনে টাকার কথা তোলার দিন কুবেরের মুখে সব কিছু মিলে একটা করুণ ছায়া ফেলেছিল।

কুবের সিয়োর—ইরা তাকে ভালোবাসত। ভালোবাসত তার মুখের পাপহীন অবুঝ, করুণ ভঙ্গিকে। বুকের মধ্যে তার মুখটা ঠেসে ধরে মাথার গন্ধ নিত। পুষ্পঘ্রাণ। মেয়েলোক ভালোবাসার এমন এমন সব জিনিস খুঁজে পায়। কুবেরকে মাঝে মধ্যে বানিয়ে বানিয়ে বিপদ আপদের কথা বলতে হত। তখন ইরা টাকা দিতে পেরে আরাম পেত। অথচ কুবের রোগাভোগা নয়। গীতা চণ্ডীপাঠ, কালীর পায়ে দম আটকে রক্তদান, সাঁতরানো, গাছে-ওঠা, ফার্স্ট থেকে ফোর্থ ইয়ার অবদি কুস্তির সঙ্গে ডন বৈঠক—সব কিছু করে জামা-কাপড়ের নীচে সে আর পাঁচজন পুরুষের মতোই ছিল। কিন্তু তবু তাকে জ্বর-জ্বর ভাব মুখে নিয়ে ইরার পছন্দমাফিক দুর্বল, করুণ লাভার হতে হয়েছিল। ইরার স্বপ্নে ছিল—তার প্রেমিকের চুল কোঁকড়া হবে। কুবেরের তা ছিল। স্বপ্নে ছিল, চোখে চশমা থাকবে। কুবের নগেনের অল্প পাওয়ারের চশমা চোখে দিয়ে ইরার সামনে টলতে টলতে ঘুরত। কেননা চোখে দেওয়ার খানিক পরেই মাথা ঘুরত। স্বপ্নে ছিল, লাভার গান জানবে। এইটে আর হওয়ার উপায় ছিল না। একদিন নগেনকে আনিয়ে মাঠের মধ্যে বসে ইরার সামনে 'মনে রেখো, ম-ও-নে-রে-এ-এ-খো'—গাইয়েছিল। সেজদার হিরোইন। নগেন তাই গেয়েছিল।

এমন পছন্দ মিলিয়ে মিলিয়ে ভালোবাসা হয় না। এ যে শুধু শর্তপূরণ। শেষদিকে পুরো ব্যাপারটাই বোঝা হয়ে দাঁড়াল।

ইরা বলেছিল, ভালো চেহারার লোকজনে তার মার বড়ো ভয়। ইরার মা ভালো দেখতে নয় বলে ইরার বাবা তার শালির দিকে ঝুঁকেছিল। অতএব ইরার পক্ষে কুবেরের সুন্দর হওয়ার ব্যাপারটা কিছু অসুবিধের ছিল। তখন কুবের নাইট্রিক অ্যাসিড দিয়ে নিজের মুখখানা ইরার পক্ষে জুতসই করে

তুলতেও রাজি ছিল। প্রেম!

গ্র্যান্ড হোটেলের নীচে ব্রজদার সঙ্গে দেখা। দেখেই বলল, 'তোর হবে। আয়।'

তিরিশ মাইল বেগে হাঁটছে ব্রজ দত্ত। নিখুঁত স্যুট—হাঁটার দমকে গলার টাই একবার এদিক, আরেকবার ওদিক।

'কোথায় যাচ্ছি আমরা?'

'গ্র্যান্ডে। কানাডার ফেমাস ম্যাজিশিয়ান সস্ত্রীক এসেছেন। কাল ভোরেই কলকাতা ছেড়ে যাবেন। আমি ইন্ডিয়ান সোসাইটি ফর ম্যাজিকস্‌-এর ভাইস প্রেসিডেন্ট। আজ আমাকে লাঞ্চে ডেকেছে। তুই হলি কাগজের রিপোর্টার—'

'কবে থেকে?'

'আমিই বা কবে থেকে ভাইস প্রেসিডেন্ট?' থেমে ব্রজ দত্ত বলল, 'কাল বিকেলে সাহেব জাদুকরের সঙ্গে ফোনে কথা বলার সময় সোসাইটির কথা বলে ফেললাম। মুখে এসে গেল। সঙ্গে সঙ্গে আনকোরা এই সোসাইটির ভাইস-প্রেসিডেন্ট পোস্টে নিজেকেই নিজে ইলেক্ট করতে হল। একটা রিপোর্টার দরকার ছিল—হ্যাগার্ড লুকিং—ফাইটিং ফর ফুটিং। ভগবান তোকে মিলিয়ে দিল—'

আর কিছু বলার চান্স পেল না কুবের। একটা ঘরের সামনে দাঁড়িয়ে ব্রজদা বোতাম টিপছে। মোটাসোটা বুড়ো সাহেব বেরিয়ে এলেন। কুবেরের পরিচয় দিয়ে ব্রজ দত্ত তাকে নিয়ে ঘরে ঢুকল। টেবিলে সাজানো রয়েছে ভালো ভালো খাবার। ব্রজ দত্ত সাহেবকে বিশেষ কথা বলতে দিল না। কুবেরকে নিয়ে সোজা খাবার টেবিলে। একটু পরে বুড়োর বুড়ি এসে যোগ দিলেন। খেতে খেতে ব্রজদা একটা চামচ হাওয়া করে দিল। সঙ্গে সঙ্গে সাহেব দু-স্লাইস পাউরুটি, একখানা মাছভাজা শূন্যে উড়িয়ে দিলেন। এইভাবে উড়তে উড়তে টেবিল প্রায় ফাঁকা। দুজনেই খুব গুণী জাদুকর। দুজনের উড়িয়ে দেওয়া খাবার, চামচ সব আবার একে একে টেবিলে ফিরে আসতে লাগল। কিন্তু কুবের অনেকক্ষণ ধরে একা একা যেসব জিনিস ওড়াচ্ছিল, তা আর ফিরিয়ে আনা গেল না। টেবিলের নীচে থেকে ব্রজদা একটা লাথি দিল, দাঁত চেপে বললে, 'অত গেলে না—'

সঙ্গে সঙ্গে কুবের সাহেবের দিকে তাকিয়ে বলল, 'হাউ লং ইউ আর ইন দি প্রফেশন?'

সাহেব নানা শব্দ করে কী বলল। কুবেরের পকেটে একটি আটা কোম্পানির প্রসপেক্টাস ছিল। সেইটে মুড়িয়ে নোটবই করে বাংলা লং হ্যান্ডে লিখল,—'জীবনে এমন বিপদে পড়িনি।' সাহেবের কথার শেষে ছিল, '...লাইফ লং।'

ভাইস-প্রেসিডেন্ট ব্রজ দত্ত সমঝদারের হাসি হাসল। সাহেবের বউ অল্প হেসে খাওয়ার শেষে ছোটো কাপের কফি এগিয়ে দিলেন। কুবের সেই ফাঁকে তার নোটবই ব্রজদার চোখের সামনে তুলে ধরল। ব্রজ দত্ত খুঁটিয়ে দেখে আর একবার হোহো করে হেসে উঠল।

সঙ্গে সঙ্গে কুবের দেখল, টেবিলের ওপর তার কলম নেই। হাওয়া।

ব্রজদার হাতসাফাই। সঙ্গে সঙ্গে ভাঁজ করা প্রসপেক্টাসখানাও অদৃশ্য। সাহেবই বা পিছিয়ে থাকবেন কেন? যাবার আগে সাহেব অবশ্য ফেরত দিলেন। কেননা কালকে সকালের কাগজেই বেরোবে। সাহেব তখন প্লেনে কোনো সমুদ্র পার হচ্ছে। বিজনেস ট্রিপে বেরোননি বলে কোনো প্রেস এজেন্ট সঙ্গে আনেননি।

গ্র্যান্ড থেকে বেরিয়ে ব্রজদা বলল, 'কেমন লাঞ্চ খেলি ফ্রি। এবারে এক খিলি পান খাওয়া তোর দাদাকে—'

'আমি না-হয় এমপ্লয়মেন্ট এক্সচেঞ্জে এসেছিলাম। খাওয়া হয়নি। কিন্তু তুমি তো খেয়ে বেরোতে পার। বউদি নিশ্চয় রেঁধে রাখবেন—'

'রাখবেন কী রে। ষোড়শোপচারে রেঁধে রাখেন। ওঁর ওপক্ষের বড়ো মেয়ে আমি খেতে বসলে হাওয়া করে। কিন্তু যতক্ষণ ঘরের ভেতর থাকি—স্রেফ মনে হয় আমার ডানা কেটে দিয়েছে কে—'

'ওসব ধানাই-পানাই আর মানায় না তোমাকে। বউদি এত ভালোবাসেন—'

'ভালোবাসার তুই বুঝিস কী রে! পুচকে পুচকে মেয়ে নিয়ে এদিক-সেদিক করে বেড়াস। সব নজরে আসে। ভালো ভালো কথা বলিস গাছতলায় নয়তো রেস্টুরেন্টে বসে। তুই ভালোবাসার কী বুঝবি রে?'

'শুধু তুমি একাই বোঝো। বউদি বোঝেন না?'

'খুব বোঝে। একবার স্বামী হারিয়েছে। দোবারা হারাতে চায় না। কিন্তু আমি জানি—আই ফর মাইসেলফ—দি ব্রজ দত্ত খোলাখুলি যখন ভাবি, পরিষ্কার বুঝি, পুরুষলোকের কোনো মেয়েলোককে ভালোবাসা সম্ভব নয়। কাছাকাছি থাকা যায়। বিপদে-আপদে দেখা যায়। কিন্তু আমরা সবাই স্ট্রেঞ্জ বেডফেলোজ—'

একটা প্রসেশন যাচ্ছে। দুজনকেই থামতে হল। ট্রাম, বাস, ট্যাক্সি, প্রাইভেট অচল করে দিয়ে কতগুলো লোক চেঁচাতে চেঁচাতে হাঁটছে। আর স্লোগান—''চালের মন ষোলোটাকায় বেঁধে দাও—বেঁধে দাও—দাম বাড়ানো চলবে না।''

সামনেই ইলেকশন। উলটোদিকের বড়ো বাড়িটার দেওয়ালে ছাপাবো পোস্টারে নেহরু তাকিয়ে। পাশেই এক দুই তিন করে গত ক-বছরে দেশের উন্নতির খতিয়ান লেখা।

'বুঝলি। আমার বাবার জীবনেও তাই। মা ভীষণ ডোমিনেটিং লোক। বাবা সুতো ছেড়ে দিয়ে বসে থাকতেন। ছাড়তে ছাড়তে মার কাছ থেকে বাবা এত দূরে সরে গিয়েছিল, শেষদিকে বোধ হয় মাকে চিনতেই পারত না। অথচ চোখ খারাপ নয়—'

কুবেরের বাঁ হাতের কোনো আঙুলে খানিক জায়গা কালো হয়ে উঠেছে ইদানীং। শীতকাল বলে

ঘষতে ঘষতে খানিক ছাল উঠে এল। চাকরি পাওয়া গেল না একটা। অথচ এই সময় আঙুলে এসব কী ফ্যাকড়া!

'রাতে ডিনারে তোর নেমন্তন্ন—'

'কোথায়?'

'আকাডেমি অব মালটিপিল্ আর্টস অব ইন্ডিয়া। স্যার বিপিনের বাড়িতে পার্টি। লেডিও থাকবেন। দুজন ফরাসি আর্টিস্টের সঙ্গে সবাইকে ইনট্রোডিউস করিয়ে দেব। তুইও থাকিস। দাড়ি কামিয়ে পাউডার মেখে আসবি। গপ গপ করে গিলবিনে। একটু আধটু ড্রিংকসও থাকবে—'

'তুমি সেখানে কী ব্যাপারে?'

'বাঃ! আমি হলাম ফাউন্ডার সেক্রেটারি-জেনারেল। লেডি হলেন গিয়ে প্রেসিডেন্ট।'

'আমি কোন সুবাদে যাব?'

'তুই একজন কনটেম্পোরারি আর্টিস্ট। সত্যি কি না বল? তুই এ-যুগে বাস করছিস—যুগের সঙ্গে জড়িয়ে আছিস—তোর এভরি রাইট আছে আর্টিস্ট বলে পরিচয় দেবার। ক-জন তোর আমার মতো সাফার করছে বল? কজন তোর আমার মতো টাইমকে নিংড়ে নিয়ে সেকেন্ড, মিনিট একটুও ফাঁকি না দিয়ে সবসময় ফিল করছে?'

'সর্দারজির দোকানে কাচের আলমারিতে আস্ত ছাড়ানো মুরগি কেমন মশলা মাখিয়ে থাক থাক সাজিয়ে রেখেছে—'

'তোকে খাওয়াব একদিন।'

'এরল ফ্লিন রবিন হুড আধপোড়া মাংস আখের কায়দায় দু-হাতে ধরে খাচ্ছিল—'

'আমার বড়ো দুঃখ কুবের—,' সিনেমার লাইনটা পেছনে বাড়তে বাড়তে কুবেরদের সেখানে দাঁড়াতে দিল না। এত গোলমাল, তার ভেতর কাশ্মীর সরকারের সূক্ষ্ম হাতের কাজের জিনিসপত্র ঝুলিয়ে ধুলো মাখানো হচ্ছে, 'আমি যা জানি—শেখাবার মতো কাউকে পাচ্ছি না—'

'ছেলেমেয়েদের শেখাও। সৎ বাপের কাছ থেকে তারা ম্যাজিক শিখুক হাঁটাচলা শিখুক—কত কী শেখার আছে শিখুক—'

'তুই হাসবি না কুবের?' ব্রজ দত্ত ইলেকট্রিক সাপ্লাইয়ের লোহার বাক্সে হেলান দিয়ে দাঁড়াল, 'বিপদে ভেসে বেড়াতে এত্ত ভালো লাগে—আমি জানি বিপদ কী করে কাটিয়ে উঠতে হয়। আমার কোনো নিজের লোককে ব্যাপারটা শিখিয়ে যেতে চাই—', এখানে একটুও না থেমে ব্রজ বলল, 'তুই আমার ছেলে হবি? অনেকে তো দত্তক নেয়,—বেশ—না হয় মানসপুত্র হ—,'

'ওয়ান্ডারফুল প্রোপোজাল—একটা সিগারেট ছাড়ো আগে—,'

‘আইডিয়াটা বল? কেমন এসেছে মাথায়! আচ্ছা এবার তোকে দীক্ষা দেব। খুব কিছু কঠিন না। ওই যে বড়ো মিষ্টির দোকানটা দেখছিস—,’

ঠিক হল ওই দোকানে গিয়ে কুবেরকে একটা কালোজাম খেতে হবে। দাম দেওয়া যাবে না—দোকানিও চটবে না। পুরো ব্যাপারটাই দু-তরফে হাসির ভেতর দিয়ে সারতে হবে।

কুবের এগিয়ে গিয়ে দোকানের শোকেসে হাত বোলাতে বোলাতে বলল, ‘চুলোয় টেম্পারেচার কন্ট্রোল করে এসব বানাতে হয়—,’ চোখে শ্রদ্ধা ফুটে উঠল কুবেরের। লোকটা গাঁটাগোট্টা, তার ওপর ফর্সা—নিশ্চয় খুব নৃশংস। একটা সিলভার লাইন আছে। সময় দিয়ে লোকটা গোঁফ ছাঁটে। তার মানে মনটা একেবারেই পাথর না। আর্ট লাভার।

‘না তেমন কিছু না। বেশির ভাগ মিষ্টির ফিনিশিং টাচ ঢিমে আঁচে দিতে হয়—’

‘তবু বলতে হবে ব্যাপারটা খুবই কঠিন—,’ বলতে বলতে কুবের সন্দেশ, রসগোল্লা, কমলাভোগ, কালোজাম, লেডিকেনির থাকগুলো খুব ধীর চোখে দেখে নিয়ে অবাকভাবে বলল, ‘এসব আপনার—’

লোকটা হাসতে হাসতে বলল, ‘নিন না খান—খেয়ে দেখুন। কোনটা দেব?’

‘দেবেন। মানে—’

‘খান আপনি। কালোজাম দিই?’

কুবের গোটা তিনেক খেল। তারপর পকেটে হাত ঢুকিয়ে পয়সা দিতে গেল। লোকটা হাহা করে উঠে নিষেধ করল। তখন ছানার দর, দুধের চালান এসব নিয়ে মোট তিনটি বাক্য ব্যয় করে কুবের ফিরে এল রাস্তার এপারে।

বজ্রদা হাঁটতে হাঁটতে বলল, ‘ফুলমার্কস। কিন্তু আমার জন্যে একটা আনলে পারতিস।’

‘সিচুয়েসনের সঙ্গে খাপ খেত না। নইলে আনতাম—,’ বলতে বলতে কুবের দেখল, সামনেই একটা লোক বিজ্ঞাপনের জন্যে বিখ্যাত ছাতা কোম্পানির একটা ঢাউস ছাতা মাথায় দিয়ে ফুটপাথ জুড়ে হাঁটছে।

অল্পক্ষণ আগে মানসপুত্র হওয়ার পর থেকেই কুবের খুব হালকা বোধ করছে। বিশেষ বলতে হল না। লোকটা হাঁফিয়ে উঠেছিল। হাতে নিয়ে কুবের প্রথমেই সামনেই শোকেসের আয়নার নিজের চেহারা দেখল। চ্যাপটা চোয়াল। হাসল। ছায়ায় ভালো দেখাল না। কত লোক হাসলে সুন্দর দেখায়। অথচ তার বেলায় যত গোলমাল। মুখ বুজে থাকলে এত সাধু, এত পবিত্র, এত নিষ্পাপ লাগে। তা আর থাকতে চায় না কুবের। তাই আবার হাসল। এবার আর সাহস করে ছাপ দেখল না। গার্ডেন পার্টির বিরাট ছাতাটার হাতল সাবধানে ধরে হাঁটতে লাগল কুবের। একপাশে ব্রজ দত্ত, অন্য পাশে সেই লোকটা।

‘সারাদিন কতটা হাঁটতে হয়?’

‘মাইল দশেক বাবু।’

‘কত দেয় রোজ?’

‘পাঁচ টাকা আর জলপানি—’

কুবের হিসেব করে দেখল সে আজ কম করেও সাত মাইল হেঁটেছে। সব মিলিয়ে সারাদিন দশ মাইলে দাঁড়াবে। অথচ তার জন্যে দুপুনের লাঞ্চ আর তিনটে কালোজাম ছাড়া নগদে কিছুই পায়নি, ‘রোজ কটা ছাতা এমন বেরোয়?’

‘কোনো কোনো দিন সাতটা অবদি—নইলে চারজন লোক রোজ বেরোয়—।’

রাস্তা দিয়ে লোক যাচ্ছে আর কুবেরদের দেখছে। মেট্রোর কাছাকাছি ভিড়ের চাপে ছাতাটা একটু কাত হয়ে চিরুনির একজন ফেরিওয়ালাকে প্রায় ঢেকে ফেলল। কাঠের বাক্সের ওপর ঢেলে বিক্রি করছে। মাথার চুল ঠিক রাখা ব্রজ দত্তের হাতে একখানা চিরুনি উঠে এল। মাথা আঁচড়াতে আঁচড়াতে কুবেরকে বলল, ‘দেখবি ওখানে?’ তারপর ছাতার বাইরে গিয়ে ঘুরিয়ে ঝালরে লেখা কোম্পানির নাম ঠিকানা জোরে জোরে পড়ে শোনাল। পড়বার সময় কুবেরের হাঁটা থামেনি। ব্রজ দত্ত লেখা পড়তে পড়তে পেছন ফিরে হেঁটেছে।

‘আমরা গেলে ছাতা মাথায় দিয়ে ঘুরতে দেবে?’

‘বাবুরা বিশ্বাসী লোক চায়। আজ বিশ বছর ছাতা মাথায় ঘুরছি। বর্ষাকালে একটা লোক দিলাম বাবুদের। আমার নাম খারাপ হয়ে গেল বাবু। পয়লা দিনেই লোকটা ছাতা নিয়ে পালাল। তারপর অনেক খোঁজখবরের পর ব্যাটা পূর্ণিয়ায় ধরা পড়েছে—’

কুবের অবাক হয়ে গেল। অত বড়ো ছাতা মাথায় দিয়ে পূর্ণিয়া অবদি এত মাইল গেল কী করে লোকটা! কিছুকাল আগে পূর্ণিয়ায় বন্যার ছবি কাগজে ছাপা হত। সব বন্যা, সব শীতকাল এত একঘেয়ে। আলাদা কোনো ফ্লেভার নেই। বাড়ি ফিরতে ফিরতে সন্ধে হয়ে যাবে। রাস্তা বাড়বে বলে হরিরাম সাধুখাঁর বাড়ি ভাঙার নোটিস পড়েছে। অথচ এখন কোথাও যাওয়ার উপায় নেই। একটি বাড়ি খুঁজে নেওয়া দরকার। পাড়াটা বেশ খোলামেলা হবে। বাড়ির সামনে একটা লন থাকলে সোনায় সোহাগা। সেখানে শীতকালের সকালে বেতের চেয়ার-টেবিলে বসে রঙিন ছবির বই দেখবে। মাথার ওপর ছাতাটা বসানো থাকলে খুব আরাম হবে।

বড়ো বউদির কী আনন্দ! তার বিয়েতে কুবের ছিল নিতবর। সেই কুবেরের আজ ভিত পুজো। বড়দা আসতে পারেনি। কদমপুরের জানাশুনোর মধ্যে নয়ানের বাবা কান্তবাবু এসেছে। কিন্তু ব্রজদা বা আভা বউদি কাউকেই বলা যায়নি। এখানকার সবাই ব্রজদাকে এমন সন্দেহের চোখে দেখে। আসলে লোকটার কোনো মানে করতে না-পেরে এই অবস্থা হয়।

বিয়ে হয়ে এসে ইস্তক মা সালকের ওই বাড়িতেই একটানা দীর্ঘদিন রয়েছে। কলকাতার বাইরে এসে খাল, খোলা মাঠ, গাছপালা সব কিছু দেখে ভীষণ খুশি। বুলুকে নিয়ে পুজোর গর্তের চারদিকে ঘুরে কুবের একখানা ইট বসিয়েছিল ভেতরে। এখানে কুবেরের বাড়ি হবে। বুলু আস্তে ঘুরছিল। অল্পদিন পরেই বাচ্চা হওয়ার তারিখ। এই ‘হবে’ কথাটায় কতখানি সুখ। ভিত পুজোর পর সবাই সালকে ফিরে চলল। বহুকাল পরে দেবেন্দ্রলাল কিছু কথা বলে ফেলল অল্প সময়ে।

যেমন—‘ইলেকট্রিক ট্রেনে বেশি সময় তো লাগল না। কদ্দিন চালু হয়েছে এ-লাইনে?’

কুবের বলল, ‘মাস দুই। আগের চেয়ে এখন প্রায় অর্ধেক সময় লাগে।’

‘সালকের ওই বাড়িতে আমার জন্ম। তোমাদের জন্ম। ওপাড়া ছেড়ে আসতে পারব তো? ভেবে দেখো বাবা। শেষে ঝোঁকের মাথায় ঘরবাড়ি বানিয়ে টাকাগুলো মাঠের মধ্যে ফেলে রেখে ফিরে এসো না।’

বাবা অল্প বয়স থেকে ভীষণ সামলে চলতে শিখেছে। বাবার তো ভীতু হওয়ার কোনো দরকার নেই আর। থাকার একটা পৈতৃক আস্তানা আছে—ছেলেরা চাকরিতে। তবু কুবের এই মানুষটার কাছে নিশ্চিন্ত একটা ছবি তুলে ধরার জন্যে বলল, ‘যায় যাবে—আবার নতুন টাকা আসবে।’

অফিসটাইমের পনের ট্রেন। লোক বলতে গেলে নেই। ফার্স্ট ক্লাসের ভেতরটায় মন-ভুলানো রঙ। মাঠে ধান কাটছে। এসব স্লিপ করে ট্রেনটা যেভাবে যাচ্ছে, মনে হবে পাতালের রাস্তা। একটুও আটকাচ্ছে না কোথাও।

দেবেন্দ্রলাল জানতে চাইল, শান্ত গলায়, ‘তোমার কত টাকা?’

‘কত হতে পারে?’

‘আমার কোনো আন্দাজ নেই। আমি জীবনে টাকার মুখ বেশি দেখিনি। তোমাদের গর্ভধারিণীর সেজন্য দুঃখ ছিল অনেক দিন—’

কোণের জানলায় মা, বড়ো বৌদি, বুলু কেউ কারও কথা শুনছে না। সবাই একসঙ্গে বকবকম করে সুখের কথা, স্বপ্নের কথা বলে যাচ্ছে। কুবেরকে দেখেই মা বলে উঠল, ‘এক কাঠা জায়গা দিবি আমাকে। পালম বুনব—’

মুখে বলল, 'বেশ তো। তোমার যেখানে ইচ্ছে—যতখানি ইচ্ছে জায়গায় পালম, ঢেঁড়শ যা ইচ্ছে হয় করো।' মনে মনে খুব হাসি পেল। আমি কুবের সাধুখাঁ। ওয়ানটাইম ভ্যাগাবন্ড। এখন আমি ড্রিম মারচেন্ট। এবেলা ওবেলা স্বপ্ন বিক্রি করি। স্বপ্ন ছাড়া কী! পাঁচ কাঠায় বিরাট বাড়ি হয়েও অনেকটা খোলামেলা জায়গা থাকে। একটা ঘেরা বারান্দা করবেন দক্ষিণমুখো। দিনে বসবেন, রাতে শোয়া যাবে। এমন কত কী বলতে হয়। কলকাতার এত কাছে কেউ এই দামে জায়গা দিতে পারবে না। ভেতরে দেখুন ষোলো ফুট চওড়া রাস্তা রাখতে গিয়ে কতটা জায়গা ছাড়তে হয়েছে। এখানে একদিন লোকালিটি হলে বেশ ছিমছাম একটা পাড়া গজিয়ে উঠবে।

মা হয়ে তুমি মাত্র এককাঠা জায়গা চাও! হরিরাম সাধুখাঁ বাড়ির বউ তুমি। এসবই তো তোমার মা। এত অল্পে খুশি হবে জানলে আমি আরও কত কী ব্যবস্থা করতে পারি তা তুমি জানো না মা। আমার পাঞ্জাবির ইনসাইড পকেটে এখন আটত্রিশ হাজার টাকার একখানা চেক আছে। জমা দেওয়ার দেরি শুধু। দু-দিনের মধ্যে আমার নামে টাকাটা ক্যাশ হয়ে যাবে।

কুবের দেবেন্দ্রলালকে বলল, 'আমারও কোনো আন্দাজ ছিল না বাবা। বড়দার পরে তুমি আর কোনো ছেলের কুষ্ঠি করাওনি। তাহলে জানতে পারতাম কোন রাশি কোন নক্ষত্রে আমার জন্ম। যে-গণৎকারকেই হাত দেখাতে চাই—সেই বলে কী রাশি কী নক্ষত্র? কিছুই জানিনে। অথচ দেখো কেমন আন্দাজে টাকা আসে—আসতেই থাকে—আসার কোনো মানে বুঝিনে—'

দেবেন্দ্রলালের মনে হল, কুবেরের মনের মধ্যে কোথায় একটা কষ্ট আছে।

'এক এক সময় এমন বিপদে পড়ি—ঝুঁকি নিয়ে এমন সব জায়গা কিনে ফেলি, বিক্রি না হলে ডুবে গেলাম। ঠিক বিক্রি হয়ে যায় বাবা। যখন চেষ্টা করি—তখন হয় না। যখন হাত-পা ছেড়ে দিয়ে বসে থাকি তখন সেধে বাড়ি এসে লোকে টাকা দিয়ে কিনে নেয়। ভালো জিনিস সেধে দিলে—নেবে না। খারাপ জিনিস নিয়ে গুমোর করে বসে থাকো—পড়িমরি করে সবাই কিনতে ছুটে আসবে।'

সরু পিয়াসলে ছাড়তেই দেবেন্দ্রলাল জানতে চাইল, ' তোমার কীসের দুঃখ কুবের—'

সোজা বাবার দিকে তাকাল। কুবেরের এই শরীর এই মানুষটার দান। গুরুগম্ভীর শান্ত প্রলেপ মাখানো মুখ দিয়ে দেবেন্দ্রলালও তাকে দেখছে।

দুঃখের কথা অনেক। কটা বলা যায়!

কারখানায় ঢুকেছিল নব্বই টাকায়। ঘষাষষিতে বাড়তে বাড়তে সেটা প্রায় ভদ্র চেহারা পেতে পেতে কুবেরের অনেক জিনিসে স্বাদ কমে গেছে।

এই যে এখন টাকা আসে, পুরোনো হয়ে যায়, আবার নতুন টাকা আসে—বেশ লাগে। কিন্তু কত অল্প টাকাতেই লোক কেমন গরিবের মতো করুণ আভা ছড়িয়ে হাসে। তখন এত কষ্ট হয়। দুঃখ হয়। ছাপ মারা এইসব কাগজের টুকরো কতদূর আর দেবে! আমরা তো এসব চাইনি।

'তুমি কতদিন কারখানায় যাও না। সেখানকার কাজ আছে না গেছে—তা একবার দেখ। থাকলে ভালো। তাহলে এত ঝুঁকি নিয়ে ঝামেলায় না জড়িয়ে ঝরঝরে জীবন কাটাও। খুব বড়োলোক হওয়ার দরকার কী!'

কুবের হাসল। আর পিছোনোর উপায় নেই। প্ল্যান হয়ে গেছে—এবারে গেঁথে তুলতে হবে বাড়িটা। নতুন নতুন জায়গার খবর আসছে। সস্তায় পুকুর। ভদ্রেশ্বর বলেছিল, 'হোমড়াপলতার ওদিকে জায়গা রাখবেন? বিয়েতে কাহন কাহন ধান হয়। কোনোরকমে চষে চারা গুঁজে দিলেই মোটা মোটা গোছ বসে যায়।' ব্যাপারটা মন্দ না। মাথা গোঁজার জন্যে একেবারে নিজের একটা বাড়ি—সম্বচ্ছরের ধান—সে যে প্রায় ষোলো আনা নিশ্চিন্ত।

যেসব লোক প্রায়ই দেশপ্রেম, ইতিহাস, বিজ্ঞান নিয়ে পটাপট কথা বলে যায়—কিংবা টাকা আছে বলে মুখখানা তেলোহাঁড়ি করে বসে থাকে—তাদের সবাইকে কুবেরের একটা প্রশ্নই করতে ইচ্ছে করে, তা হল, মশাইয়ের দাম কত? মানে আপনি, আপনার বকবক, টাকাপয়সা, বিদ্যেবুদ্ধি, সম্পত্তি-সমেত আপনার বাজার দর কত? আপনি যে দাম বলবেন, তাতেই আমি রাজি। তবে দাম মিটিয়ে দেওয়ার পর জামাকাপড় খুলে সব কিছু রেখে দিয়ে নিঃশব্দে ভবসাগরে মিশে যেতে হবে আপনাকে।

আত্মীয়স্বজনের মধ্যে এমন কিছু লোক আছে। বাড়িটা হয়ে গেলে তাদের কয়েকজনকে ডেকে এনে দেখাতে হবে।

মা বলল,'বড়ো দুঃখ ছিল—আমাদের কারও একেবারে নিজের একখানা ঘর নেই—একটু যে বসব, একা একা থাকব তার উপায় নেই—তুই একটা ভালো বসার ঘর করিস—,' কী মনে হতে মা বলল, 'পাঁজা করে ইট পোড়ালে বংশ লোপ পায়। আর বাড়ি করে মাটি কামড়ালে মা বসুন্ধরা এক কামড়ে কাউকে না কাউকে তুলে নেয়। সাবধানে থাকিস। আমার বাবার দালান সঞ্চারের সময় নতুন পুকুরে আমাদের এক বোন ডুবে মারা গেল। সে পঞ্চাশ বছর আগের কথা—'

বুলু ইলেকট্রিক ট্রেনের ঝাঁকুনিতে সাবধানে বসল। এবারের বাচ্চায় কুবেরের খুব ইচ্ছে ছিল না। লক্ষ্মীপুজোর কোজাগরির রাতে নাইট ডিউটি থেকে আচমকা এসে পড়েছিল কুবের। নিশুতি রাত। ঘুমন্ত বুলু। ছেলের জন্যে ও একটা খেলুড়ে চায়। সেজন্য পেটে ধরতেও আপত্তি নেই। বরং ভীষণ ঝোঁক। কুবের অনেকবার এড়িয়ে গেছে। সময়মতো অঙ্ক কষে সরে এসেছে।

কয়েকদিন বহরিডাঙা রেজিস্ট্রি অফিসে কেটেছে। রাতে ফার্নেসের সামনে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দূর গাঁয়ে লক্ষ্মীপুজোর শঙ্খ শুনেছে। কোথাও নিজেকে একেবারে ছেড়ে দেওয়ার জন্যে মাঝরাতে কুবের এলিয়ে পড়েছিল। সেই সময় এই কাণ্ডটি ঘটে।

'আমি আর কারখানায় যাব না বাবা।'

'চাকরি নেই?'

'তা নয়। খুব আছে। সেজন্যেই যাব না।' আর বলতে পারল না কুবের। কারখানা জিনিসটা তার বড়ো

কাঁচা লাগে। পাড়ায় স্টেজ বেঁধে থিয়েটারের মতো। কিছুকাল পরে উঠে যাবেই। অথচ জায়গাজমিজায়পারটা জায়গায় থাকে। লোকজন আসে যায়—আবার মরে হেজেও যায়। অথচ সেই জায়গা আগের মতোই ধান দেয়, মাটি হয়, জল দেয়—কত বিশ্বাসী। এখন এক টুকরো বেচলেই কুবেরের এক বছরের মাইনে।

‘এতদিনের কাজ ছেড়ে দেবে?’

দেবেন্দ্রলাল ঝুঁকি নিতে বড়ো ভয় পায়। কুবেরের বড়ো ভাই অনেককাল চাকরি করে। সময়ে অফিস যেতে খুব ভালোবাসে। ডিসিপ্লিন, পাংচুয়ালিটি—এসব কথা তার কাছে বাংলা হয়ে গেছে।

‘আমার ভালো লাগে না বাবা। আমি আর পারি না।’

‘কী পারো না?’

সব বুঝিয়ে বলা যায় না। কত জায়গার জিনিসপত্র একসঙ্গে জ্বাল দিয়ে ইস্পাত তৈরি হয়, ইস্পাত জল হয়ে ফোটে। অথচ যারা তৈরি করে—তারা শুধু ইনক্রিমেন্ট, অ্যালাউন্স নয়তো বোনাসের হিসেব করে মরে। চাকরিতে এক ধাপ থেকে আরেক ধাপে উঠতে কত লোকের বুকের ভেতর আশা-নিরাশার ঢেউ উঠতে দেখেছে কুবের। বৃষ্টি, আলো, মাটির নীচের রাঙালু ইত্যাদি ভগবানের জিনিস—ভগবানের দান। আন্দাজ তাই মনে হয় কুবেরের। কেউ প্রোমোশন পেয়ে ঠিক সেরকম পাওয়ার ভাব করলে কুবেরের ঘেন্না লাগে। সবই তো সেই টাকা। অল্প টাকা, বেশি টাকা, আরও বেশি টাকা।

এই যে লোকটি তার সামনে বসে—নাম দেবেন্দ্রলাল সাধুখাঁ—একদা ইনি কত সুন্দর ছিলেন। কেমন একটা ভাব-মেশানো মুখ। হাতে টাকা থাকলে, বেশি টাকা থাকলে দেবেন্দ্রলালকে স্টিমারঘাটের কাজ নিতে হত না। বিশ্রাম, নিরুদ্বেগ জীবন হলে ওইসব দাগ পড়ত না কপালে।

‘অত অল্প টাকায় আমি আর পারি না বাবা—’

‘হাত বড়ো হয়ে গেছে। কিন্তু যেদিন আর টাকা আসবে না কুবের—তখন? তখন তুমি কী করবে?’

‘সেজন্যেই তো লোকে বিষয়-আশয় করে—খারাপ সময়ে বিষয় থাকলে আশ্রয়ের চিন্তা থাকে না। বিষয় মানুষকে দেখে—আশ্রয় দেয়।’

‘আমাদের বংশের হরিরাম সাধুখাঁ তো কম করে যাননি। আমাদের বুড়ো ঠাকুরদাদের একজন শেষ বয়সে রাস্তায় মরেন। বিষয় তাঁর বিষ হয়েছিল।’

‘বয়সকালে সাবধান হলে বিপদ নেই।’

‘তুমি তো সাবধান নও কুবের—’

‘এখন কেন সাবধান হব বাবা! সময় হলেই কসাস হয়ে যাব—’

‘তা কেউ হতে পারে না কুবের। কখন যে টাকা আসা বন্ধ হয়ে যাবে টেরও পাবে না। তখনও তুমি

ভাবছ—এই বুঝি আসে, ওই এল। মাথা খুঁড়ে যাচ্ছ—তবু আর আসে না। যা সব করবে বলে ফেলে রেখেছিলে, তার সবটাই তখন বাকি। তখন টাকা না থাকলে মাথা দুলে ওঠে।'

'তুমি এসব জানলে কোত্থেকে?'

'তোমাদের বয়সে কাজে ঢুকে এক আরমেনি সাহেব দেখেছিলাম। আজ বার্জ কিনছে, কাল লঞ্চ কিনছে, পরশু রিভাররুটের পারমিট বের করছে—সেই সস্তার আমলেও ছোকরার টাকা রাখবার জায়গায় টান পড়ত। মাঠ-ঘাটে পয়সা উড়িয়ে বেড়াত। শেষে যেদিন টান পড়ল—অগস্ত্য চুমুকে সমুদ্র শেষ। অনেকদিন বেঁচেছিল। খুব কষ্ট পেয়ে মারা যায় শেষ অবদি।'

কুবের বুঝিয়ে বলতে পারত। বুলু, মা, বড়ো বউদি, নগেন, বীরেন ওদের বউরা কিংবা বাবা—কেউ বোঝে না কী করে কুবেরের টাকা আসে। বড়দা কুবেরের জন্যে চিন্তা করে। পাছে এই সুসময়ে তার কেউ ক্ষতি করে দেয়। নগেন ভাবে, তার দাদা কুবের না কোনোদিন বিপদে জড়িয়ে পড়ে। এদের বোঝায় কী করে—দু-হাজার ফুট ফ্রনটেজ কিনে তার পেছনে অন্তত তিনশো বিঘে জায়গায় যাওয়ার রাস্তা তার হাতের মুঠোয়। গুপ্তরায়মশায় মাপামাপি করে ম্যাপ বানিয়েছেন। এখন খদ্দের এলেই ম্যাপ মেলে দিয়ে বসে কুবের কথা বলে। এই যে দেখছেন সোজা লাইন গেছে—এটা হল ওই খাল। এই হল খালপাড়। আমাদের মেইন রোড। জিনিসের দাম কমে না, লোক কমে না। যে আসবে তাকেই জায়গা দিতে পারবে কুবের। খালপাড়ে দাঁড়িয়ে এখন বলতে পার—কোন জায়গাটা চাই আপনার? পূর্ব-দক্ষিণে? ওই শিমুল গাছটার পাশে? ওখানে দর একটু চড়া—আপনার কিছু বেশি পড়বে। তবে সারাজীবন পুবে রোদ, দক্ষিণের হাওয়া পাবেন। কেউ আটকাতে পারবে না।

দেবেন্দ্রলাল বলল, 'ইদানীং জায়গাজমি বাড়িঘর করাও বিপদ। চারদিকে হায় হায় নেই নেই। এর মধ্যে এসবে কেমন অস্বস্তি লাগে—'

'আমারও লাগে বাবা। কিন্তু—'

খানিক পরেই শেয়ালদা। লাইনের দু-পাশে কত ঘরবাড়ি উঠছে।

'কিন্তু কী কুবের?'

'তাই বলে কি লোকে জায়গাজমি ঘরবাড়ি করবে না?' নয়ানের বাবা কান্তবাবু বলেন—দাপটে না থাকলে বিষয়-আশয় থাকে না। বিষয়-আশয়ের জন্যে আমি? না, আমার জন্যে বিষয়-আশয়? কতরকম ফেরে পড়া যায় রে বাবা! ভবেশ শী তো বিষয়-সম্পত্তির আড়ত।

'নিশ্চয় করবে। একশোবার করবে। তুমি আমার ছেলে কুবের। তোমাকে একটা কথা বলি। খুব বড়োলোক আমাদের হওয়ার দরকার কী? এই তো বেশ আছি। যা এমনি এসে যায় তাতেই খুশি থাকো।'

কুবের তো তাই থাকতে চেয়েছিল। কিন্তু হরিরাম সাধুখাঁর সালকের ভদ্রাসনে ভাগাভাগি করে যেটুকু

দেবেন্দ্রলালের ভাগে পড়েছে, তাতে এতজন একসঙ্গে থাকলে চলাফেরা করাই মুশকিল। সকালে ঘুম থেকে উঠে পিঠ ব্যথা করত। এক কাতে ঠাসাঠাসির মধ্যে সারারাত পড়ে থাকলে গা ব্যথা হবেই। আজ মা কতখানি আনন্দ করে কুবেরের জায়গার ওপর চলেফিরে বেড়াচ্ছিল। মা সবকিছুতে গলা ডুবিয়ে ভাবতে ভালোবাসে না। সে জানে, ছেলের ব্যাবসায় সব হচ্ছে।

শেয়ালদায় নেমে বড়ো বউদি, মা, বুলু দরদাম করে হরেক জিনিস কিনে ফেলল। দেবেন্দ্রলাল একখানা দা কিনতে বলল কুবেরকে। কয়লা ভাঙতে গিয়ে হাত দা-খানা অনেকদিন ভোঁতা হাতুড়ির চেহারা নিয়েছে। ডাব কাটতে হলে বড়ো অসুবিধে হয়। অতএব একখানা দা কিনল কুবের।

ট্যাক্সিতে ওঠার সময় বুলুকে নানা অঙ্গভঙ্গি করে ভেতরে ঢুকতে হল। আর কিছুদিন পরেই হাসপাতালে যেতে হবে। বড়ো বউদির সুখ ধরে না। পরিষ্কার জানতে চাইল,'এসব করলি কী করে কুবের।'

কুবের নিজের কপালে টোকা দিয়ে দেখাল।

বুলু ফোঁস করে উঠল, 'আমি কিছু নই না? তখন পইপই করে বলেছিলাম বলেই তো তুমি লেগে পড়ে থাকলে। নয়ত কবে সব টাকা ফুটিয়ে বসে থাকতে—'

বউয়ের জন্যে কুবেরের কৃতজ্ঞ হওয়া উচিত। কিন্তু ইদানীং বুলুর দিকে তাকালে কুবেরের বার বার মনে হয়—বুলু মূর্তিমতী প্রতিবন্ধক। বড়ো সাইজের কোনো ঝুঁকি নিতে গেলে ভয় হয়। ভরাডুবি হলে এই মেয়েলোকটি ভাসবে। কোথায় তাকে খানিকটা রিলিফ দিয়ে ইচ্ছেমতো কাজ-কারবারে এগোতে দেবে—তা নয়, ঠিক এই সময় ফিরে মা হয়ে বসল।

কোম্পানির পুরোনো ভেড়ি বরাবর চরভরাটি একশো বিঘে জায়গা এক লপ্তে—বন্দোবস্ত পেয়েছিল। কপাল ঠুকে চাষবাসে নামলে ধানের মতো ধান করা যেত। বস্তা যাচ্ছে নব্বই টাকা। এক মরশুমেই তিরিশ-চল্লিশ হাজার টাকা উঠে আসত। বুলু সেসবে যেতে দেবে না। চরের জায়গায় ধান যেমন, লাঠালাঠিও তেমন। তার ওপর ধানের লোভ বড়ো লোভ। কে কোথায় চোরাগোপ্তা মেরে দেবে। বুলুর সবটাতেই ভয়। কুবের আঁচলে থাকার প্রদীপ নয়। এই জিনিসটা বুলু বোঝে না।

'তোর জন্যে কত চিন্তা ছিল। মা, আপনি তো সবসময়ই এই ছেলের জন্যে সিন্নি চড়িয়েই বসে থাকতেন। এখন দেখুন।'

বড়ো বউদির কথায় মা খুব খানিক হাসল। কুবেরের কোনো কিছুই সহজে হয় না। খুব ঘষতে হয়। কদমপুরেই তাকে কতবার আসতে হয়েছে। এখন এ-তল্লাটে সব তার জানা হয়ে গেছে। হোমড়াপলতায় ডিসট্যান্ট সিগন্যালের ধার দিয়ে বিধবার সম্পত্তি কিছু পাওয়া গেছে। বয়সকালে আবাদে যেন কার বউ ছিল। তখন হোমড়াপলতায় শক্তসমর্থ একজনের রাখনি হয়ে চলে এসেছিল। লোকটা খুব ভালোবাসত। এই ভাগানো আবাদে বউকে মরার আগে সব লিখে দিয়ে গিয়েছিল লোকটা। এখন তার আগের পক্ষের নাতিরা কোর্ট-কাছারি করছে। তাদের কথা—এই বিধবা তাদের

দাদুর বিয়ে করা বউ নয়। মাগি অন্যের বিধবা। উড়ে এসে জুড়ে বসেছে। অতএব হটাও। এ সম্পত্তির হক তাদেরই। কিন্তু দলিল তা বলে না। কাগজ বিধবার দিকেই। পরচা, দাখিলা সব এখন কুবেরের কাছে। জায়গাটা জলের দরে হাতে আসবে ঠিকই। কিন্তু দখল নিতে কিছু ঝক্কি পোয়াতে হবে। কুবের সাধুখাঁর চোখে সারা দুনিয়াটা এখন একটা মৌজা মাত্র।

হাতের আঙুল ছাড়িয়ে এখন সেই কালো মরচেগুলো কবজিতে গেড়ে বসেছে। সারা গায়ের রং আগের চেয়ে অনেক কালো হয়ে গেছে। তবু কুবের খুব নিষ্পাপ চোখে, এই মাত্র ফুটে ওঠা ফুলের কায়দায় বুলুর দিকে তাকাল। কদমপুরে শুনেছে, শিষ বেরোনোর আগে ধানগাছে থোড় আসে। নয়ান বলছিল, গর্ভ হয়। তখন ঘন সবুজ ধানের মাঠ কালো মেঘ করে আসে। নয়ান বলছিল, গর্ভ হয়। তখন ঘন সবুজ ধানের মাঠ কালো মেঘ করে আসে। বুলুও তেমন ভরে আছে মাসখানেক। কুবেরের শিরদাঁড়া কী এক কাঁপুনিতে শিরশির করে উঠল। সনতের সঙ্গে সেবারে ঘোলাডাঙায় যদি না যেত। শরীরের ভেতরে কোথায় যে কী হয়ে আছে। ভালো করে দেখাতেও ভয় হয়। কী বেরিয়ে পড়বে শেষে কে জানে! হরি ডাক্তারের চিকিৎসার সময় এত ওষুধপত্রই ছিল না। কোথায় গোঁজামিল দিয়ে রেখেছে কে জানে! কিছুদিন হল চলেফিরে বেড়ানোর সময় কুবেরের শিরদাঁড়ার ভেতর দিয়ে বাতাস যাতায়াত করে—মজ্জা নেই কোনো সেখানে, শুকিয়ে গেছে—দৌড়োলে তাই ভেতরকার হাড়ের চাকতিগুলো তেলের অভাবে খটখট করে আওয়াজ করে ওঠে। এমন একটা গভীর সন্দেহ কুবেরের মনের মধ্যে অনেককাল ধরে পাক খাচ্ছে।

ঠিক এই সময় আর একটি বাচ্চা। বুলু শুধু খুব নরম গলায় বলল, 'তুমি কী বলবে বলেছিলে—কী একটা এক্সপিরিয়েন্স—খুব স্যাড—'

‘আপনি একী করলেন?’

আভা বউদির বুকের ওপর দিয়ে পুরোনো কালের কায়দায় শাড়ির সোনালি ফুলতোলা চওড়া পাড় হাঁটু অবধি নেমে গেছে। কুবেরের আগেকার অভ্যাসগুলো পালটে গেছে। এখন কোথাও গেলে আড়ষ্ট ভাবটা আর তাকে চেপে রাখতে পারে না। ব্রজ দত্ত বাবার আত্মজীবনীসমেত নানান বইপত্তর নিয়ে তাড়দার হাটে বিকোতে গেছে। কুবের মাথায় বালিশটা তাকিয়ার মতো পিঠের নীচে ঠেসে দিয়ে কাত হয়ে শুয়েছে।

‘আমি সেদিন সামলাতে পারিনি নিজেকে—এমনভাবে হাওয়া কাটছিল আপনার হাত—বলছিলেন, চাঁদ নীল—’

‘ওদিকটা তো আর যাওয়ার উপায় রাখেননি আপনি। কেমন খোলামেলা ছিল। এখন শুধু লরি যায়। এপার থেকে খালপাড়ে সবসময় ধুলো উড়ছে দেখি। মিস্ত্রিরা সন্ধেবেলা গান গায়। আপনার বাড়ি হচ্ছে, আরও অনেকের বাড়ি উঠছে। খালপাড় আর আগেকার মতো নেই—,’ শূন্যে তাকিয়ে থেমে গেল আভা বউদি।

‘পরশু ছাদ ঢালাই হয়ে গেল।’

‘আপনি খুব বড়োলোক হয়েছেন।’

‘কে বলল?’

‘আপনার দাদা—’

‘ভালো।’ থামতে পারল না কুবের, ‘আমি যে কী হয়েছি আমিই জানি না—’

‘আমি জানি—,’ আভা নীচের ঠোঁট দাঁতে চেপে হাসছে। কুবের অন্যদিকে তাকিয়ে আছে বলে দেখতে পেল না।

‘কেমন?’

‘পরের বউয়ের সঙ্গে কী সব করে ফেলছেন।’

‘তাই বলুব।’

‘অবিশ্যি তাতে আমি পচে যাচ্ছিনে—’

ধক করে কুবেরের মাথার ভেতর কার হাত থেকে একখানা খাগড়াই থালা পড়ে গেল। পড়ে আর থামতেই চায় না। ঝনঝন আওয়াজ হয়েই যাচ্ছে। মাথার ভেতরে নেমে অনেক কষ্টে কুবের

আওয়াজটা থামাল।

‘আমার কিচ্ছু ভালো লাগে না—’

‘নিন উঠে বসুন। চা খাবেন?’

কুবের শুনেও শুনল না। ফিরে বলল, ‘আমার সত্যি কিছু ভালো লাগে না—’

‘খারাপের কী হল? আপনার দাদা বলে—আমাদের কুবেরের এলেম আছে। দু-হাতে পয়সা কামাচ্ছে। ভবেশ শী, ইটখোলার ঘনরাম চাটুয্যে সবাইকে কাত করে দিয়েছে। কদমপুনের নিরিমিষ্যি ডাঙায় যে অত পয়সা ছিল কে জানত।’

‘তা সত্যি!লোকে কেন যে জায়গা কেনে? কেন যে যা দাম তাই দেয়। এক-এক সময় আমিও কোনো মানে খুঁজে পাইনে—’

‘ছেলের পিঠে মেয়ে হল। আমাদের মিষ্টি বাদ পড়ল।’

‘খুব কষ্ট পেয়েছে বুলু।’

‘তা পাবে না?’

তার চেয়েও বেশি কষ্ট পেয়েছে কুবের। সময় পার হয়ে যায়—বুলুর কোনো ব্যথা নেই। হাসপাতালের বাইরে এসে কুবের ডাক্তারকে ধরে ফেলল, ‘স্যার, আমার একটা স্যাড এক্সপিরিয়েন্স—’

ডাক্তার এক ঝটকায় তাকে সরিয়ে দিয়েছিল, ‘যে ওষুধগুলো আনতে দিয়েছি, এনেছেন?’

‘এনেছি। কিন্তু একটা স্যাড ঘটনায়—মানে আমি দায়ী—’

‘পরে বলবেন। পেসেন্ট এখন অপারেশন টেবিলে—’

তারপর নাভি থেকে ন-ইঞ্চি চিরে ফেলল ডাক্তার। একটা মেয়ে বেরোল। বুলুর চোখ বোজা। স্যালাইনের নল। হাতে ছুঁচ বিঁধিয়ে দেওয়া ছিল। এবার কুবের কোনো বাচ্চা চায়নি। ফাও একটা মেয়ে এসে গেল।

আভা বউদি বলল, ‘আপনার তো অনেক টাকা। আপনাদের দাদাকে একটা কাজ দিন না। হাটে হাটে ঘুরে বই বেচে বেড়াচ্ছে। হাটুরে গাইয়ে বাড়ি বয়ে ধরে আনছে আর গান শুনছে। ভাব এলে নাচও জুড়ে দেয়। অথচ সংসার টানতে আমাকে কী না করতে হয়—’ বলতে বলতে আভা জানলা দিয়ে বাইরে তাকাল। দূরে স্টেশন ঘুরে একখানা জিপ ছুটে আসছে।

‘উঠুন এবার। আপনার দাদার কাছ থেকে লোক আসছে—’

‘জিপে?’

‘ওরকম প্রায়ই আসে। পেট্রোল খোঁজার সরকারি লোক। উঠুন তো।’

প্রায় ধমকে তুলে দিল কুবেরকে। বাইরে বেরিয়ে এসে দেখল জিপগাড়ি থেকে সেই লোকটা নামছে। একদিন লেভেল ক্রসিংয়ে এদের ডাব কিনে দিয়েছিল কুবের। কিন্তু এ-লোকটা এখানে কেন?

'মিসেস দত্ত আছেন?'

'যান না, ভেতরে আছেন—'

কুবের কোনো মানে করতে পারল না। জানলা দিয়ে পরিষ্কার দেখতে পেল, আভা তার বাসি বেণিটা ঝপাং করে বুকের ওপর ফেলে দিচ্ছে। কুবেরের ভেতরটা হুহু করে উঠল। এ আমি কোথায় আছি! সরাইখানায় সকালবেলায় শুয়ে আছি। সবাই চলে গেছে যে যার কাজে। আমি জানি না আমার সামনে কী কাজ আছে। অল্পদিন হল আমার একটি মেয়ে হয়েছে। এই সব জন্মদানের কাণ্ডকারখানা আমাকে দিয়ে কেন? আমি কি ভালো মতো পারি? থাকি সালকিয়া—হাওড়া স্টেশন দিয়ে কারখানা যেতাম (আপদ চুকে গেছে)—কদমপুর আমার দেশ হয়ে যাচ্ছে। এক জায়গায় এতদিনকার টান ভালোবাসা ছিঁড়ে এ কোথায় আমি চলে আসছি? বুলু বেশ বলে, এখন খাটে শুয়ে শুয়েই বলে, নতুন বাড়িতে উঠে গিয়েই কিন্তু লাউ-কুমড়োর চারা বসাব। তুমি একটা লোক ঠিক করে দিয়ো। কুঁবিয়ে দেবে। 'কুঁবিয়ে দেবে' কী? ও কথাটা কী? কুপিয়ে বলবে বুলু। মাই আরনেস্ট রিকোয়েস্ট। আর নয়। তুমি ভীষণ অর্ডিনারি হয়ে যাচ্ছ—সে খেয়াল আছে?'

সিঁথির পাশ দিয়ে একটা চুল পেকেছে। কুবের সেটা অনেকবার তুলে দিয়েছে। না দেখে আন্দাজে সেটা ছুঁতে পারে। ভায়রাভাই বলাই মহাপাত্র নিয়মিত দাড়ি কামায়। না হলে ভুরভুর করে পাকা দাড়ি গাল ঢেকে ফেলে দু-দিনে।

ননী বোসের ছেলে বিকাশ বোস দু-দুটো পাম্প বসিয়ে ঝিল ছেঁচে ফেলছে। চব্বিশ ঘন্টা পাম্পের আওয়াজ। এখন তিন বছর চার বছরের মাছগুলো ধরা পড়বে।

হঠাৎ ব্রজ ফকিরের বাড়ি থেকে আভা বউদির গলার স্বর চিরে বেরিয়ে এল, 'ছিঃ!' ক-বার এমন বলে ফেলেছে আভা এতদূর পর্যন্ত শোনা যায়নি। লোকটা তাড়া খেয়ে ছুটে বেরিয়ে এল। এসেই লাফিয়ে জিপে উঠে স্টার্ট দিল। তারপর কুবেরের গা ঘেঁষে ছিটকে বেরিয়ে গেল।

কোনদিকে যাবে। শেষে ব্রজদার বাড়িতেই গিয়ে ঢুকল।

তখনও আভা চেঁচাচ্ছে, 'ছিঃ! এই কি প্রবৃত্তি!' তারপর গায়ের শব্দ পেয়ে ঘর থেকেই চেঁচিয়ে উঠল, 'কে আবার?' বাইরে বেরিয়ে এসে কুবেরকে পা থেকে মাথা অবদি দেখল, শেষে একদম কিছু বুঝে ওঠার আগে হুহু করে কেঁদে উঠল, থামানো যায় না, ভাগ্যিস অন্য ভাড়াটেরা যে যার কাজে প্রায় সবাই বাইরে।

'আমি আর পারিনে কুবেরবাবু।'

অনেকক্ষণ কথা বলানো গেল না। কুবের চুপচাপ বসে থাকল। ঘরে কিছু ঝুল, কোণে একটা

একতারা। জানলার পাশে ছোটো টেবিল—টেবিলে পাউডার, চুলের ফিতে, একখানা আয়না। এসব আগে কোনোদিন দেখেনি কুবের—আসলে চোখে পড়েনি। কোনো জিনিস তার আজকাল চোখে পড়ে না। সূর্যের নীচে যা কিছু তা এই মাঠ-ঘাট, এ-সবই শুধু দেখতে পায় কুবের। ভদ্রেশ্বর জায়গাজমির খোঁজ আনে। দর বলে। হাজারো লোকের জমির পরচা হাতে একখানা ডাইরির মধ্যে গুঁজে নিয়ে ঘুরে বেড়ায়। বেশ বলে লোকটা। কথার ঢিমে তালে লোকটার সুর থাকে কেমন। প্রায় ছড়া তুলে বলবে: সাগর ভেঙে নগর। নগর ভেঙে সাগর। কাল পরশুর মধ্যে নতুন জায়গা দেখাতে নিয়ে যাবে চড়াবিদ্যায়।

'পেট্রোল খোঁড়ার জায়গা থেকে একজনার আসার কথা ছিল। আপনার দাদার খবর নিয়ে আসবে। এলেই তার সঙ্গে সোঁদালিয়া ক্যাম্পের ওখানে চলে যাবে—'

কুবের কিছু বুঝতে পারছিল না, 'কী ব্যাপার—'

'ওখান থেকে পুলিশ দিয়ে সব লোক তুলে দিচ্ছে। আপনার দাদা আজ মাস তিনেক ঘর তুলে সেখানেই পড়ে আছে। তাড়দার হাটে হাটে বই ফিরি করে, গান গায় ঘুঙুর বেঁধে, ভাবের গান তুলে নাচে—' হাঁপাচ্ছিল আভা।

'এক গ্লাস জল খেয়ে নেবেন?'

'না থাক। শিষ্য জুটেছিল দু-একজন। ভেবেই ছিল ওখানে থেকে যাবে। পুলিশ দিয়ে লোক ওঠানো হচ্ছে। শুধু ধর্মস্থান, মন্দির আশ্রম এসবে রেহাই পেয়ে থাকে। কথা ছিল, গোলমাল দেখলেই খবর দেবে। আমি গিয়ে একেবারে সংসার পেতে বসব। তাহলে সংসার তুলে ওখান থেকে আপনার দাদার উঠে আসতে হবে না?'

'উঠতে হবে কেন?'

থতমত খেয়ে গেল আভা, 'আপনি কিছু জানেন না?'

'না তো!'

'তেল বেরিয়েছে—পেট্রোল। কাউকে থাকতে দিচ্ছে না। যন্ত্র দিয়ে মড়মড় করে আধ ঘন্টার ভেতর বাঁশ বাগান উপড়ে ফেলছে—সে কী প্রলয় কাণ্ড! আপনি কোনোদিন যাননি বুঝি ওদিকে—'

কুবের আভার শেষ দিককার কথাগুলো কিছু শুনতে পেল না। শুধু বলল, 'তেল বেরিয়েছে—পেট্রোল—'

আভা বলল, 'হ্যাঁ, সে জন্যেই তো তুলে দিচ্ছে সবাইকে। আপনার দাদার খবরের নাম করে অন্য একটা লোক এসে হাজির। দেখতে ভদ্রলোক। ভেতরে বসিয়েছি—,' এখানে একবারের মতো থামল আভা, 'ঠিক আর পাঁচটা পুরুষের মতো—,' এবার কুবেরের মুখে তাকিয়ে ফেলল। একেবারে থেমে যেতে যেতে হঠাৎ এগিয়ে এসে কুবেরের গলাটা ডান হাতে জড়িয়ে ধরে মাথা প্রায় গলার কাছে

চেপে ধরল, 'কী ঘেন্না!' কুবের বুঝল আভা তখন কাঁদছে।

কোনোক্রমে মাথা ছাড়িয়ে নিয়ে কুবের সোজা হয়ে বসার চেষ্টা করল। 'ঘেন্না! কী ঘেন্না!' কথাগুলো তার মাথার ভেতর গদাম করে এইমাত্র একটা ডান্ডা মেরেছে। খানিক আগে লোকটা এমন ঝিলিক তুলে মিলিয়ে গেল। ব্রজদা নিশ্চয় তেল কোম্পানির আখড়ার ওখানে জমিয়ে আড্ডা দিয়ে থাকে। নইলে বলা নেই, কওয়া নেই—লোকটা এল, এসেই বলা নেই কওয়া নেই কাজকর্ম শুরু করে দিল। তক্কে তক্কে ছিল বোধ হয়।

'একদিন বাজারে দেখেছিলাম ওকে। ফিরে ফিরে দেখছিল আমায়—'

'তোমায় সবাই এত দেখে কেন বলো দিকিন?'

'আমি জানব কী করে?'

'একটু কম ঘোরাঘুরি করলে পারো।'

'চলে মশাই? মানুষটা সব সময় ঘোরের মাথায় আছে। একটা না একটা অসম্ভব জিনিস বেছে নিয়েই তার পেছনে ছুটবে। আমাকে বাকি দিকগুলো দেখতে কী যে না করতে হয়—'

সুরমাটানা চোখজোড়া স্ফটিক হয়ে ঝিকিয়ে উঠল। নাকের পাটা নিশ্বাসে উঠছে পড়ছে। কুবের বুঝল, এমন ঘনিষ্ঠ দশায় তার লটাপটি এখন বেশ মানানসই হত। কিন্তু ভেবে অবাক হল, আভার কথা তার একটুও মনে ধরছে না। সোঁদালিয়া পেট্রোল ক্যাম্পের ওদিকে এখন লোক ছুটবে। জায়গাজমির দর হুহু করে চড়বে। অথচ টাকাপয়সা বাড়ি তৈরিতে, পুকুর কাটানোয়, নতুন জায়গার বায়নাপত্রে ছড়িয়ে আছে। আরও চিন্তার কথা, ভদ্রেশ্বরের সঙ্গে চড়াবিদ্যা গিয়ে এক লপ্তে অনেকটা চর-ভরাটি জায়গা বায়না করার কথা রয়েছে। কোনদিকে যাবে!

'সন্ধে না পড়তেই ভবেন শী আসবে। অথচ মানুষটার ঘরে ফিরতে রাত হয়ে যায় ভীষণ। আমার খুব ভয় করে কুবের। দারুণ ভয় করে কুবের। হাসি-ঠাট্টা মসকরা করে, চা এগিয়ে দিয়ে লোকটাকে কোনো রকমে ঠেকিয়ে রাখি। কোনো কোনো দিন বাপের আগেভাগে পুঁচকে ছেলেটাও আসে বুড়োর। একগাদা পাউডার মেখে সে এক বেভ্যুল অবস্থা। না দেখলে তোমার বিশ্বাস হবে না কুবের!

'ঢুকতে দাও কেন?'

'সাধে দিইছি। আগের চোতে গুচ্ছের টাকা হাওলাত করে বসে আছে। সুদ তস্য সুদ। আমি এখন তোমার দাদার চক্রবৃদ্ধির ফাউ।'

ঢলঢল করে হাসল খানিক। আভার ঠোঁট ফাঁক হয়ে গেল অনেকটা। বাচ্চা-টাচ্চা হবে না তো শেষে।

'আমাকে দেখার কেউ নেই এখন কুবের—'

আভার কোমরের ওপর অনেকখানি তলপেট বেরিয়ে। এখন দুপুর। এই অজানা জায়গায় আমি কুবের সাধুখাঁ জোর করে আমার একটা শিকড় বসাবার চেষ্টা করছি। ভালো লাগাবার জন্যে কতরকমের

শিকড় ছেড়েছি কতদিকে। নয়ানদের আশুতোষ নস্কর বিদ্যালয়ে টালির চাল ছেয়ে দেওয়ার জন্যে পাঁচশো টাকা চাঁদা দিয়েছি। এখানকার কাপড়ের দোকানের ফরাসে বসে দেশের কথা আলোচনা করি। এই মাটিতে বীরভূমের দুলার ধান কতখানি ফলতে পারে তাই নিয়ে শ্রীগোপাল সার কোম্পানির গোপালবাবুর সঙ্গে বসে চা খেতে খেতে চিন্তা করি। অথচ বছর দু-তিন আগে কস্মিনকালেও আমি কদমপুর আসিনি। কান্তবাবু এপ্রিলে রিটায়ার করেছেন। নয়ান রেল ছেড়ে কয়লার দোকান করবে করবে করছে। বাজারে গিনি সোনার দোকানের ছাদে বিড়ি-তামাকের আড়ত হয়েছে। ফালি মতো ঘরটায় সব সময় রেডিয়ো বাজে। ডজন দুই লোক গানের তালে তালে দুলে দুলে বিড়ি বাঁধে।

'আমাকে নিয়ে পালাবে কুবের? এখনও সুন্দর করে ভুলিয়ে রাখব তোমাকে—' একটু হাসছে মনে হল আভাকে।

'সিনেমা হয়ে যাবে না?'

'হয় হোক। আমি আর পারিনে কুবের—'

'ব্রজদা ফেরে কখন?'

'কোনো ঠিক নেই। চলো এই বেলা। আমি সব ফেলে দিয়ে যাব—'

'ভালোবেসে বিয়ে করেছিলে না? সরস্বতী বউঠানকে কানা করে দিয়ে মানুষটাকে টেনে আনোনি একদিন?'

'বয়স কম ছিল। সব বুঝতাম না। এ মানুষটা কাউকে ভালোবাসে না। শুধু নিজের খেয়ালকে ভালোবাসে কুবের। আমি বলে এতদিন এক সঙ্গে আছি। আমায় নিয়ে চলো—এখুনি যাব আমি।'

'আমি যেতে পারব না আভা। আমার যাবার উপায় নেই—'

আঁচলের খুঁট ডান হাতের বুড়ো আঙুলে জড়িয়ে ফেলল আভা, 'তা ঠিক। যাবেই বা কেন! অমনতর তাজা বউ। দাগ পড়েনি কোথাও। সোনার চাঁদ ছেলে—'

'আমার যাবার উপায় নেই বউদি। আমি ভীষণ জড়িয়ে পড়েছি।'

'অমন জড়াতে পারতাম! তোমার মেয়ের গায়ের রং কার মতো হয়েছে?'

'আমারই মতো। সেকথা বলছি নে। সংসারে আমার টান ভালোবাসা কমে গেছে আভা। চারদিকে জমিজায়গার দলিল-দস্তাবেজে আমি ষোলো আনা বাঁধা পড়ে গেছি। পাশ ফিরবার উপায় নেই। নিলামের সম্পত্তি ডাকি আজকাল। লোক ভাড়া নিয়ে হোমড়াপলতায় আবাদে জায়গা দখল নিতে হচ্ছে। দুনিয়ায় কত জায়গাজমি। তাতে ঘাস হয়, উলু হয়, কাশ হয়। পালম বুনলে পালম ফলে। বীজ ধান গুঁজে দিলে তিন কালির জায়গায় চল্লিশটা অবদি বিয়েন ছাড়ে—তাতে শিষ ধরে, দুধ আসে, লোকে বলে অমরলতা। অথচ এতকাল আধমরা ইট-কাঠের বাড়ির মধ্যে বাঁধা পড়েছিলাম সালকেয়

—’

‘তবে যে বড়ো বাড়ি বানাচ্ছ। ক-দিন পরেই নতুন ঘরে থাকবে। সালকের বাস তুলে দিয়ে পাকাপাকি চলে আসছ—’

‘বুলুর ইচ্ছে। বাড়িঘরদোরে আমার তেমন লোভ নেই। মা বাবা এখানে থাকলে খোলা হাওয়ায় নিশ্বাস ফেলে দু-দিন বেশি বাঁচবে।’

‘আমি মরে যাব কুবের। তুমি আমায় রাখো। যেভাবে ইচ্ছে রাখো। কোনো গোলমাল করব না। যা বলবে তাই করব। আমি আর দম ফেলতে পারছিনে কুবের—’

‘সংসারে অমন হয়ই। মানিয়ে চলো। মনের মতো ঘর-বর সবাই চায়। ক-জন পায়?’

আভা ফুঁসে উঠল, ‘খুব হয়েছে। আর বচন ঝেড়ো না। তোমাদের মতো পুরুষমানুষ আমার খুব চেনা আছে—’

কুবের কোনো কথা বলল না। সালকিয়ায় হরিরাম সাধুখাঁর বাড়িতে এখন বাবা, মা, বড়দা, বড়ো বউদি, ভাইরা, বউমারা সবাই একটা কথা ভেবে মশগুল হয়ে আছে। হরিরাম সাধুখাঁর বংশধর, কুবের সাধুখাঁর একখানা বাড়ি হচ্ছে। বাড়িতে পুকুর আছে, তিনশো লোক বসে খাওয়ার চাতাল আছে, তেতাল্লিশ বিঘের ঝিল আছে। তার ওপর দিয়ে হাওয়া এসে গরম একদম বুঝতে দেয় না।

‘দশটা টাকা দিয়ে যাও। মানুষটা তবিল একেবারে ফাঁক করে রেখে গেছে।’

‘খুচরো তো নেই।’

‘যা আছে দিয়ে যাও।’

কুবের ইনসাউড পকেটে হাত দিয়ে নোটের গোছা থেকে একখানা একশো টাকার নোট বের করে দিল।

‘খুব বড়োলোক হয়ে গেছ তো।’

আভার সঙ্গে কুবের হাসতে পারল না।

এদিকে একবার বন্দর হওয়ার কথা হয়েছিল। শ-খানেক বছর আগের কথা। তখন নানান সাহেব ছুটে আসে। একজন নুনের কারবারে নেমেছিল। সে চোং লাগানো কারখানা বসিয়েছিল। সেই সাহেবও নেই, কারখানাও নেই। জঙ্গলের ভেতর বন ধোঁধলে ঢাকা, ইটের পাঁজা দেখে বোঝা যায় ওখানে একদিন কিছু একটা করার চেষ্টা চলেছিল। এখন শুধু জং ধরা একটা বিরাট চোং কাত হয়ে পড়ে আছে। অনেক জায়গায় মরচে পড়ে গর্ত। হাওয়া দিলে চোং দিয়ে সমুদ্রের শব্দ আসে। সেসব কিছু নেই আর। লোকে তবু বলে কারখানা। আজ পঞ্চাশ-ষাট বছর ধরে লোকে ওই নামে জায়গার নাম দিয়েছে। এখন সেখানে তেল খোঁড়ার টঙ্ আকাশের মাঝে-মধ্যে এক-এক জায়গায় গঙ্গাফড়িং হয়ে বসে আছে।

পিচ রাস্তা থেকে নতুন তৈরি চওড়া মেঠো পথ সাইটে চলে গেছে। ঠান্ডা রাখার বাক্স-বসানো বিরাট বিরাট ঘর। কাচের জানলা। তাতে দুজন সাহেবের মাথা দেখা যাচ্ছে। হয়তো এদেরই কাউকে কুবের সেবার কদমপুর লেভেল-ক্রসিংয়ে ডাব কিনে দিয়েছিল। সারাটা এলাকা ঘুরে এতক্ষণ ব্রজ ফকিরের চিহ্নও দেখতে পায়নি কুবের। ফেরার পথে কারখানা, গাঁয়ের ভাঙা টালির স্তূপে একটা লোকের মাথা দেখা গেল। জটাজুটো, আলখাল্লা তাও ভেসে উঠল শেষে। প্রায় একশো বছরের পুরোনো সাপের আড়তে ব্রজদা কী করছে?

অনেক ঘুরে কুবের সেই কারখানার কবরখানার নীচে এসে দাঁড়াল, ‘এখানে কী করছ?’

‘কে?’ চোখ ঠেলে বেরিয়ে আসছিল ব্রজদার। গলা চিরে গেল। কুবেরকে দেখে শান্ত হল, ‘ওঃ! তুই! আমি ভেবেছিলাম—’

‘কাকে?’

‘তেল খোঁড়ার লোকজন আমাকে এখান থেকে তাড়াতে চায়। কাল রাতে কেরোসিন মাখানো ন্যাকড়ার বলে আগুন দিয়ে ছুঁড়ে মেরেছে অনেকবার। আমি এখান থেকে নড়ব না।’

‘সাপের কামড় এনজয় করছ এখানে তাহলে!’

‘পাগল! আমি আছি এখানে নানান ধান্দায়—’

কুবের তাকিয়ে আছে দেখে ব্রজ ভেঙে বলল, ‘বাবার আত্মজীবনী, অদ্বৈতের পালা, সরল পশুচিকিৎসা—তাবৎ বইপত্রের মিশেল ডাঁই দিয়ে রাখি। গাঁয়ের লোকজন কিনে নিয়ে যায়। কাজে বেরোবার সময় আমাকে দেখলে, আমার এই থান দেখে জোড়া নমস্কার করে। এখন এখানে শুধু একখানা বিগ্রহ বসাতে পারলেই হল। তা হলে কেউ আর ওঠাতে পারবে না। তোর বউদির আসার

কথা ছিল—'

'আসবে কী করে? সেদিন যে লোক পাঠিয়েছিলে আমি দেখেছি।'

'কীরকম।' ব্রজ দত্ত ইট গোছাতে গোছাতে থেমে গেল। একটা মঞ্চ হচ্ছে বোধ হয়। কোনো ঠাকুর-দেবতার থান হবে নিশ্চয়। চারদিকে বুনো লতার ঝাড়। তার মাঝখানে একখানা ছোটো ত্রিপলের ছাউনি। জলের কুঁজো, উনুন—একখানা বড়ো থালা। ভাঙা দেওয়ালে ব্রজ দত্তর জগৎ প্রপঞ্চ মার্কা হাসি-মাখানো একখানা ছবি।

'আমি সেদিন তোমার খোঁজে গিয়ে বেড়িয়ে এসেছি। একটা লোক জিপে চড়ে গিয়ে হাজির। হঠাৎ চিৎকার শুনে ছুটে গেলাম। লোকটা বেরিয়ে এসেই জিপ চালিয়ে হাওয়া হয়ে গেল। বউদি কাঁদছিল। লোকটাকে তখন ধরার উপায় নেই—'

'লোকটাকে পেলে কী করতিস?'

ভেতরে ভেতরে চমকে গেল কুবের। সেও যা করেছে, তাতে আভার পাড়া মাথায় করে কান্নাকাটি করা উচিত। তাকেও ধরা উচিত ছিল। কিন্তু—

'আচ্ছাসে শিক্ষা দিতাম খানিকটা—'

'কী বলতিস?'

নিজের ভেতর তাড়াতাড়ি নেমে গিয়ে কুবের দেখল, লোকটাকে বলার কিছু খুঁজে পাচ্ছে না। সে নিজেও একজন কালপ্রিট। যাকে বলে দাগি আসামি।

'বলতাম ইয়ারকির জায়গা পাওনি? পরস্ত্রীর গায়ে হাত—'

'সবই ঈশ্বরের সম্পত্তি মনে রাখবি। আমরা শুধু মাঝে মধ্যে কেয়ারটেকার—'

'তাই বলে নিজের বউ?'

'আভার সেদিন চলে আসা উচিত ছিল। এলে আমি এতটা অসুবিধেয় পড়তাম না। সস্ত্রীক সাধু একটা হ্যালো সৃষ্টি করে। আচমকা কেউ সাহস পায় না। তার ওপর দখল নিতে সুবিধে। কেউ এলে বলা যায়—আর এগোবেন না মশায়, মেয়েছেলে আছে।'

'তাই বলে তোমার নিজের বউ?'

'নিজের বউ তো আমার এই নতুন নয়। আগেও হয়েছে ক-বার। হয়ত আরও ক-বার হবে। তাই বলে একটা ডিটারমিনেশন থাকবে না। বাই হুক অর ক্রুক আমাদের এখানে একটা ডেরা গড়ে তুলতেই হবে।' ব্রজ দত্তর চোখ ঠিকরে বেরিয়ে এল। কুবের ভেতরে ভেতরে চমকে গেল। সে নিজেও প্রায় একইভাবে জেদ করে যেকোনোভাবে কদমপুরে একটা নতুন বসতি গড়ে তুলতে চাইছে। ক-দিন পরেই গৃহপ্রবেশ। দু-একখানা বাড়ি হয়েছে মাত্র। আলো এল বলে। কিন্তু বুলু এখুনি

আসতে চায় না। মা এক দমকে শ্বশুরকুলের বাড়ি ছেড়ে উঠতে পারছে না।

অথচ কুবের আজ দেড় দু-বছরে প্রায় একটা নগর বসাতে চলেছে। স্বপ্নের, সেই কলবাড়ি বানাতে চলেছে। সম্বচ্ছরের ধান ফলানোর মাঠ, মাছের পুকুর, গোরুর গোয়াল—কত কী! এসবের কোনো হয়তো মানে নেই। কিন্তু চারদিকে আষ্টেপৃষ্ঠে পাকাপোক্ত সব ব্যবস্থা করে চলেছে। একটা জিনিসের অভাব থেকে যাচ্ছে। নগেন বলেছিল, 'সেজদা সবই করছ—কিন্তু একটা শ্মশান করা হল না তোমার। শেষে পাবলিকের সঙ্গে সেই ওল্ড ক্যাওড়াতলা, নয়তো কাশী মিত্তিরের ঘাটে যেতে হবে বুড়ো বয়সে!'

ব্যাপারটা গোড়ায় ভাবাই হয়নি তার। বড়ো দেরি হয়ে গেছে। শ্মশানের জন্যে কেউই জায়গাজমি কোবালা করতে চায় না।

কুবেরের আজকাল এক-একসময় খুব ভয় করে। আমি এখন কী করছি? কী করে চলেছি? সব যদি ফট করে ফেটে যায়—চুরমার হয়ে যায়। তখন বুলু, খোকন, নতুন বাচ্চাটা, আমি—আমরা সবাই কোথায় যাব? আমি তো প্রায় চোখ বুজে এগিয়ে যাচ্ছি। পথটা যদি নদীতে গিয়ে শেষ হয়। তখন কোথায় যাব? একদিন যদি টাকা আসা দুম করে বন্ধ হয়ে যায়। তখন কী হবে?

হঠাৎ খুটখাট আওয়াজ হতেই ব্রজদা একখানা লাঠি নিয়ে নীচের চাতালে লাফিয়ে পড়ল, 'কে রে?'

কয়েকটা লোক দুড়দ্দাড় করে ছুটে চলে গেল।

'দিনের বেলাতেও চোর।' কুবেরকে তাকিয়ে থাকতে দেখে বলল, 'সাহেবের আমলের সব টালি। যে যা পারছে খসিয়ে নিয়ে গিয়ে বেচে দিচ্ছে। আগে গোরুরগাড়ি নিয়ে আসত। বোঝাই দিয়ে গঞ্জে, হাটে চালান দিত। আমি এসে বন্ধ করেছি—' ব্রজ দত্ত হঠাৎ থেমে সামনের একটা লোককে বলল, 'এই যে সাহেব—আসুন।'

কুবের ভূত দেখলেও এতটা চমকে যেত না। এই লোকটাই সেদিন আভার ঘর থেকে ছিটকে বেরিয়ে এসেছিল। আভা চেঁচাচ্ছিল, 'এই কি প্রবৃত্তি! ছিঃ! ছিঃ!'

লোকটার নিশ্চয় কোনো একটা নাম আছে। ব্রজদা ডাকল সাহেব বলে। সাহেব মিত্তির। ব্রজদা বলল, 'কলকাতার কায়েত। সচ্চরিত্র সুপুরুষ। বুঝলি কুবের, দিশি লোকজনের মধ্যে এখানকার সবচেয়ে কঠিন কাজটাই করতে হয় মিত্তির মশায়ের—'

মিত্তির বিনয় করে হাসল। কুবেরদের চেয়ে এক-আধ বছরের বড়ো হবে। হাফশার্টের বাইরে পুরন্ত দুখানা হাত ফেঁপে ফুলে বেরিয়ে আছে। বিরাট একটা হ্যাকসর ওপর ভর দিয়ে মোটা একটা পাইপ কটকট আওয়াজ তুলে মাটির ভেতর সেঁধিয়ে গেল। সেদিকে আঙুল দেখিয়ে সাহেব মিত্তির বলল, 'পাইপ মাটির নীচে চলে গেলে স্পেশাল বন্দুক দিয়ে আমি জায়গা নিরিখ করে গুলি ছুঁড়ি। হিসেব মতো জায়গায় গুলির চোটে পাইপ ফেঠে গিয়ে গ্যাস নয়তো তেল ভুসভুস করে উঠে আসবে। আমি ম্যার্কসম্যান—'

'তিরন্দাজ বলুব।'

কুবেরের রসিকতার আঁচ ধরতে না পেরে লোকটা গবেটের কায়দায় হেসে বলল, 'গোলন্দাজও বলতে পারেন।'

গোঁফ থাকলেই লোকটাকে শিকারি বলা যেত। সেদিন একটুর জন্যে কুবেরের হাত ফসকে বেরিয়ে গেছে। অবশ্য আজ আর হাত ফসকে গেছে বলে ভাবতে পারছে না। যার বউ সে-ই বলছে, আমার নিজের বউ তো নতুন নয়—আগেও হয়েছে ক-বার—আরও হয়ত ক-বার হবে, আসলে চাই ডিটারমিনেশন। কীসের ডিটারমিনেশন? দখলের ডিটারমিনেশন। এই জিনিসটা আমার। এটা দখলে রাখতেই হবে। যেন-তেনভাবে দখলে রাখতেই হবে।

'আপনার হাতে কী হয়েছে?'

কুবের হাত লুকোতে পারল না, 'ও কিছু না—'

মিত্তির হাত বাড়িয়ে কুবেরের কবজি ধরে ফেলল। সাঁড়াশির চেয়েও জোরে ধরেছে। কুবের নিজের হাতখানা বের করে আনতে পারল না।

'ড্রিংকস চলে?'

'তেমন কিছু নয়। মাঝে মাঝে এক আধদিন—তাও কেউ এলে তবে।'

'হাঁটুতে, তলপেটে পরদিন লাল বিজগুরি বেরোয়?'

লোকটা জানল কী করে? খুব অবাক হলেও মুখে শুধু বলল, 'তা বেরোয়।'

বাঁ গায়ের প্যান্ট অনেকটা তুলে ধরে কুবেরকে দেখাল, 'এই দেখুন। আপনার মতো হয়ে আছে। কালচে কালচে ছোপ। আমারও অমন বিজগুরি বেরোত। আমার আপনার লিভার ড্রিংকস নিতে রাজি নয়। তারই ইরাপশন। সেই থেকেই এই কালো ছোপ ছোপ দাগ। ড্রিংকস ছেড়ে দিয়ে তবে এইসব দাগাদাগালির ছড়িয়ে পড়া অ্যারেস্ট করেছি—এ তো এক ধরনের একজিমা। বাড়তে দিলে নিস্তার নেই।'

ব্রজদা নির্বিকার হয়ে শুনছিল। মিত্তিরকে কুবেরের খুব বন্ধু লাগল। এতদিনে একটা দলের লোক পাওয়া গেল। নিস্তার নেই শুনলেই ভেতরটা একদম কেঁপে যায়।

'মিত্তির, এই যে ছেলেটিকে দেখছ—একে একবার আমি মানসপুত্র করেছিলাম—অনেককাল আগে। এখন ছোকরার এত টাকাপয়সা—আমাকে দত্তক নিতে পারে!'

কুবেরের খুব ভালো লাগল না কথাগুলো। বুড়ো দামড়া। সরস্বতী বউদির ওখানে তোমার দু-দুটি ছেলে গোকুলে বাড়ছে। পয়লা বউদির হেফাজতেও তোমার একটি নিজস্ব ছেলে আছে। তারা সবাই বাড়ছে। একদিন তারা বড়ো হবে। সবাই বড়ো হয়ে মাথার ওপর বাবা চাইবে। শেড চাইবে। গ্যারান্টি চাইবে। আর এখন তুমি কারখানা গাঁয়ে একশো বছর আগের বাতিল কারখানার টালি

আগলাচ্ছ!

'আপনার কথা অনেক শুনেছি। ব্রজবাবু প্রায়ই বলেন।'

আমি তোমার কথা শুনিনি কোনোদিন। আমি তোমাকে দৌড়ে পালাতে দেখেছি শালা। এঁটো ডাঁটা না চিবোলে নয়!

'এখানকার কাছাকাছি কিছু জায়গা ধরে রাখুন না। ভালো রিটার্ন পাবেন।'

'আমার আর ভালো লাগে না।'

'টায়ার্ড!'

লোকটা ধরল কী করে? এবার সত্যিই অবাক হবার পালা। মিত্তির কুবেরের হাতের দাগদাগালির মানে করে দিলে এইবার।

'আপনারই মতো—তবে আরও বড়ো সাইজের লোক দেখেছিলাম আঙ্কেলেশ্বরে। সেখানে তখন তেল বেরিয়েছে। আমরা গুটিয়ে চলে আসব। তখন আলাপ। চল্লিশ ক্রশ করে গেছে। কুপার সাহেবের তখন চারদিকে পয়সা। বিয়ে করেনি। বলত—''মিত্তির, ভীষণ টায়ার্ড আমি। কিছু ভালো লাগে না। এরকম মন নিয়ে আমি বিয়ে করতে ভয় পাই—''

বাঃ! লোকটা কতসব বোঝে। অথচ সেদিন—কী ভয়ঙ্কর জ্ঞানপাপী!

'আপনি বিয়ে করেছেন?'

'মনে নেই।' কুবেরকে অবাক হতে দেখে সাহেব মিত্তির বলল, 'বাল্যবিবাহ বলতে পারেন। এখন যাই না। টক লাগে।'

'ওঃ!' কুবের মনে মনে বুঝল, একখানা স্যাম্পেল বটে। বুলুকে তার কেমন লাগে জানতে চাইলে এক ঢোকে বলতে পারবে না। গৃহপ্রবেশের আগেই ঢালাও ফার্নিচারের অর্ডার দিয়ে বসে আছে বুলু। ইলেকট্রিক আসেনি তাতে কী। এ সেই আগের বুলু নয়। কুবেরই মাঝে মাঝে চিনতে পারে না।

বিকেল আসতে দেরি নেই। সাইটের ডায়নামো গর্জে উঠতেই বড়ো বড়ো ডুমগুলো জ্বলে উঠল। তখনও কড়কড় করে পাইপ নামছে আর একটা মোটা লোহার চেন গাঁটে গাঁটে ইস্পাতের দাঁত নিয়ে ওপরে উঠে আসছে। অন্য যে কোনো জায়গায় এখন যেমন সূর্য থাকে, তেমন একখানা সূর্যই দিগন্তে লটকানো। খানিক পরেই ঝুলে পড়বে। মিত্তির বলে ডাকতেই কারখানার কবরখানার ভাঙাচোরা গলি দিয়ে সাহেব তরতর করে নেমে গেল।

'বলতে পারিস তোকে দেখেই আমি চলে এলাম এখানে—'

'এখন ফিলজফি ভালো লাগছে না ব্রজদা। অন্য কথা বলো।'

'সত্যি বলছি। নিশ্বাস কর। আমি তোকে জায়গা দেখাতে নিয়ে এলাম। আর তুই কি না কদমপুরে

মৌরসিপাট্টা করে বসে গেলি! আমি যে কে সেই কলমিলতা?'

'আমি কি এমন হয়েছি ব্রজদা? সবাই এই এককথা বলে। তুমি, নগেন, বীরেনের বউরা। অথচ আমি তো আমিই আছি। দোষের মধ্যে শুধু কিছুটা আরাম দরকার হয় আজকাল আমার। ভিড়ের গাড়িতে চড়তে পার না। বসতে পেলে শুতে চাই—'

'এখানে কিন্তু তোকে শুতে দিতে পারব না। কিছু নেই আমার। তবে মনে হয় সব হবে একে একে—'

'হওয়া মানে কী মনে করো তুমি?'

ব্রজ খুব বিপদে পড়ল। বলতে গিয়ে দেখল লজ্জা করছে। তবু কোনোমতে বলে দিল, 'ধর আমার বংশধর থেকেও তো নেই। বুড়ো হলে বাবা ডাকতেও আসবে না কোনোদিন। তখন আমি—বিশেষ করে তোর বউদি কোথায় যাবে? বাবার আত্মজীবনী লিখলাম। মন্দ কাটছে না। এখন যদি একটা মন্দির কি বিগ্রহের থান করে যেতে পার—তাহলে কোনোদিন ভাবতে হবে না কিছু—। কিন্তু এসবে লাগে প্রচণ্ড ডিটারমিনেশন।'

কুবের দেখল ব্রজ দত্তর চোখের শিরা ফুলে উঠেছে। মাথার বাবরি তামার ঢালাই স্তূপ হয়ে থেমে গেছে। কথা ছিল, আজই বিকেলে ভদ্রেশ্বরের সঙ্গে নৌকোয় মেদনমল্লর ভাঙা দুর্গ দেখতে যাবে। নৌকোয় একরাত। ফর্সা হতেই চোখের সামনে ভোর ভোর জম্বু দ্বীপ ভেসে উঠবে। জেলেরা সমুদ্রের মাছ মেরে সেখানে ফেলে ফেলে শুকোয়। সপ্তমুখী পেরিয়ে এসব কাণ্ড। ভদ্রেশ্বর জায়গা দেখাতে নিয়ে যাবে।

যাওয়া হল না। ফস করে সন্ধে নেমে গেল। দূরে তাল-নারকেলের ঘন আড়াল আরও অন্ধকার হয়ে যাচ্ছে। তার পেছনে বসতির আবছা আবছা লণ্ঠনের আলো এদিক-সেদিক আনাগোনা করছে। কেউ হয়তো গোয়ালে গোরু তুলে দিচ্ছে। কারও ঢেঁকিঘরের পাশে পুরোনো গাদা ভেঙে দু-তড়পা খড় নামানো দরকার। এঁড়ে বাছুরটা ইদানীং রাত বাড়লে খিদেয় ঘন ঘন পা ঠোকে। দোকায় খড় কুঁচিয়ে দিতে হবে। কত লোকের যে কত কাজ। শুধু কুবের এর-ওর-তার খবর কুড়িয়ে কুড়িয়ে বেড়ায়। তার নিজের কোনো খবর নেই।

রাতের শিফটের লোক এসে যাচ্ছে। মাঠের মাঝখানে খানিক জায়গায় আলো। তার মধ্যে ওভারল পরনে এই লোকগুলো মায়াপুরীর পাত্রমিত্র। কাউকে পরিষ্কার চেনা যায় না। ওর মধ্যে সাহেব মিত্তিরও আছে নিশ্চয়।

ব্রজ দত্ত হাতেগড়া রুটির সঙ্গে চোঙের গায়ে লতানো জঙ্গলের বন- ধোঁধলের তরকারি দিয়ে কলাই থালাখানা কুবেরের সামনে সাজিয়ে দিল, 'খেয়ে ফেল—'

'তা তো খেলাম। ওদিকে কদমপুরে একটা মানুষ কী খেলো না খেলো দেখছে কে!' হাতের পাঁচটা আঙুলে রুটির তাড়া প্লেট হয়ে আছে। তার ওপর গরম তরকারি সাজিয়ে ফুঁ দিচ্ছিল ব্রজদা,'তোর খুব চিন্তা হয়? নিয়ে যা না। একটা মানুষ তো মোটে—'

ব্রজ দত্তর চোখের নীচে কান্না কিংবা হাসিতে—নয়তো নিতান্তই ঠান্ডায় খানিক খানিক জায়গা ঝকঝক করে উঠেছে। একেবারে ধরে ফেলার হাসিতে কুবেরকে বলল, 'তোর তো অনেক পয়সা হয়েছে। রেখে দে না একটা লোককে। মোটে তো একটা মানুষ।'

কথাটা খট করে মাথায় লাগল কুবেরের। টিন, নড়বড়ো ইটের থাক দেওয়াল এখুনি তাকে প্রায় ঠেসে ধরার জোগাড় হল। থালায় তখনও একখানা রুটি। একটু তরকারি চাইবে ভেবেছিল। প্রবৃত্তি হল না। সামনের লোকটা রুটিতে তরকারিতে চোয়ালে একটা যে কোনো বড়ো গোরুর কায়দায় জাবর কাটছে। হঠাৎ থালাখানা তুলে ধরল কুবের। দেবে মাথার ওপর এবার ঠাঁই করে বসিয়ে।

'ওকী? মারবি নাকি?'

'হ্যাঁ।'

তখনও নিশ্বাস হয়নি ব্রজ দত্তর। এক ঘা বসাতেই তড়াং করে দাঁড়িয়ে উঠল। তারপর কুবেরকে আচমকা চার-পাঁচটা ঘুষি মেরে কাবু করে ফেলল। শেষে একটা লাথি দিয়ে এই জোড়াতালি দেওয়া ঘরের কোণে ফেলে দিল, 'খুব বেড়েছিস?'

আর একটা লাথি মারতে যাচ্ছিল। থেমে গেল ব্রজ। কুবের কোঁকাচ্ছে। কোথায় লাগল রে বাবা। 'এই কুবের, কুবের—'

ব্রজ একটু ভয় পেয়ে গেল। নীচে ড্রিলিংয়ের একটানা কড়কড় আওয়াজ। তার আস্তানার ভেতর কুবেরের গোঙানি। বেচারা মুখও ধোয়নি। তার চেয়ে বয়সে ছোটো। ইদানীং যে কী হয়েছে ছোকরার! লঘুগুরু জ্ঞান নেই। আচমকা থালা উঁচিয়ে এল কেন?

ড্রিলিং সাইটের কাছাকাছি খালাসিদের তাঁবুতে এক সর্দার নাড়াবুনিয়ার দিশি মোষ পোষে। তার বউকে বলে আধসের দুধ নিয়ে এল ব্রজ। খানিক ফুটিয়ে সাহেব মিত্তিরের উপহারের বোতলটা থেকে কিছুটা বাটিতে ঢেলে দিল, 'নাও বাছাধন খেয়ে নাও। খেয়ে উদ্ধার করো এখন।'

কুবের উঠে বসে সুস্থ হয়ে উঠল। ব্রজ পেছনে ফিরে ঘরকন্না সাজাচ্ছিল। বাইরে উঠোনে একখানা পাথর পড়ে আছে। সিঁদুর মাখানো । ব্রজ ফকির নাম দিয়েছে রেলেশ্বর শিব। রেললাইনের পাশেই কুড়িয়ে পেয়েছে সম্ভবত। পূর্ণিমার দিন জাঁকজমক করে প্রতিষ্ঠা হবে। শুধু আভা বউদির এসে পড়ার অপেক্ষা।

এখন ধাঁ করে লাথিটা বসিয়ে দিলেই হয়। তারপর দে ছুট। নইলে, এটুকু বুঝেছে কুবের, ব্রজ দত্তর সঙ্গে সে সামনাসামনি পেরে উঠবে না। কিন্তু সে নিজে নুনের কারবারি হরিরাম সাধুখাঁর বংশধর। যার নুন খেয়েছে একবার, তাকে পেছন থেকে ঘা দেয় কী করে? সে যে বড়ো মুশকিলের ব্যাপার। হঠাৎ খুব মায়া হল কুবেরের। ব্রজ ফকিরের জন্যে মায়ায় তার মন ভরে গেল। চল্লিশ পার হয়েও থিতু হয়ে বসতে পারল না কোথাও। এখন বিগ্রহ বসিয়ে থান বানিয়ে বউকে সাজাবে। জটা রাখছে। রুদ্রাক্ষ এনেছে। তেল-সিঁদুর মাখাচ্ছে গুচ্ছের আমপাতায়। সামনে আঁটিসার গাছটার ডালপালা বেরিয়ে

পড়ল বলে।

সে যে আজ কোথাকার কোন জগতে এসে পড়েছে। কত লোভ করে দূরের সাহেব নুনের কারখানা বসিয়েছিল। হয়ত হরিরাম সাধুখাঁর সঙ্গে কারবার করতে গিয়ে আলাপও হয়েছিল। শীতকালের আকাশে ছিটকে ছিটকে তারা খসছে। কোথায় কোন মহালোক মরে গেল। আকাশে ঢ্যাঁড়া পড়ে গেল সঙ্গে সঙ্গে। হয়তো পাঁচ জন্ম আগে সে নিজেই সমুদ্র পার হয়ে এখানে কারখানা বসাতে এসেছিল। কিংবা সৈন্ধব লবণের কারবারে নেমে ভরাডুবি মুখে হরিরামের সন্ন্যাস হয়েছিল। কথা দিয়েছিল সাহেবকে, একদিন তোমার কারখানা দেখে আসব—গোলা ফেলে কোথাও যে ঘুরে ফিরে আসব তার ফুরসত মেলে না। কিছুদিন হল সেই হরিরাম নানা জন্ম ঘুরে ব্রজ ফকির হয়ে কারখানা দেখতে এসেছে। দেখে আর নড়ে না। সেখানে এখন নগর বসবে। ব্রজ দত্ত ঠাকুরতলা নয়তো রেলেশ্বর শিবের থান বানাবে।

বয়স বলো, আয়ু বলো—ওই হল গিয়ে যত নষ্টের গোড়া। জিনিসটা এত কম, এত মাপা—সময় হলে ফুরোবেই। অথচ তখন যে কত কী বাকি পড়ে থাকে! এটা আধখানা, সেটা পুরো, ওটা মাঝামাঝি সে এক আজব হাল। হরিরাম নাকি নুনের বড়ো বড়ো চালানের কাগজ পড়তে পড়তে বুকে হাত রেখে তাকিয়ায় হেলে পড়েছিল। তখন গদিতে মাত্র তার ছোটো ছেলে ছাড়া কেউ ছিল না।

হারিকেনের আলোয় ইঁটের পাঁজার ওপর থেকে বইয়ের ডাঁই ঘেঁটে কুবের রজনী দত্তর জীবন ও সময় খুঁজে পেল। হাঁটকাতেই বইয়ের ছত্রিশপাতা খুলে গেল। লাইনের শুরুতেই ব্রজদা লিখেছে—

> 'আকাশে ইদানীং যেসব মেঘ হইতেছে তাহারা আমার বড়ো চেনা চেনা ঠেকে। মনে হয় গত জন্মে ইহাদেরই সঙ্গে সঙ্গে কত শস্যক্ষেত্রে বৃষ্টি হইয়া ঝরিয়া পড়িয়াছি। রৌদ্র উঠিতেই আবার মিলাইয়া গিয়াছি। বিকালের দিকে আষাঢ়-শ্রাবণে দুই দিগন্ত জুড়িয়া রামধনু উঠিবার জন্য জায়গাও করিয়া দিয়াছি। সেই কালের নানা রং এখনও আমার গায়ে লাগিয়া আছে। তাই স্বপ্ন দেখি। মানুষকে ভালোবাসি। ব্রজকে পাই। আশা করি বয়স হইলে ব্রজও স্বপ্ন দেখিবে। সন্ধ্যাতারা আমাদের চোখকে দ্বিতীয় তারায় লইয়া যায়। দ্বিতীয় তারা তৃতীয় তারায় পৌঁছাইয়া দেয়। তৃতীয় তারা আমাদের তারার জঙ্গলে ফেলিয়া পালায়। তখন চারিদিকে হলুদ ছিটানো আগুনের কুচি আমাকে পাগল করিয়া তোলে। ব্রজর গর্ভধারিণী এসবের ধার ধারেন না।'

'বাটনা বাটতে জানিস? আজ তোকে একটা রান্না খাওয়াব।'

কুবের ঝপাং করে দশ বছর পিছিয়ে গেল। কুবের দ্য ফ্রিভলাস। কুবের দ্য ভ্যাগাবন্ড। রিজারভড কুবের। তখন ফুটপাথে করপোরেশনের বকুলগাছ থেকে ফুল ঝরে পড়ে সন্ধের দিকে রুমাল-চাপা গন্ধ দিত। তখন স্যান্ডো গেঞ্জির ওপর ফিনফিনে আদ্দির মোড়কে কুবের সাধুখাঁ কত অল্পে খুশি হয়ে উঠত। গাছের একটা পাতা খসে পড়লে কত মানে খুঁজে পেত তার ভেতর।

'তারার ডালনা?'

‘মানে?’

‘এই যে লিখেছ। ‘‘হলুদ ছিটানো আগুনের কুচি।’’ তারাগুণতির দেশের কথা—’

‘রাবিশ! বইটা রেখে দিয়ে মাথার ওপর থেকে শুকবো লংকার কৌটোটা দে।’

নিচু ক্লাসে কুবের বাংলাদেশের ম্যাপ এঁকেছে। অনেকবার। সবচেয়ে সোজা ছিল সমুদ্রের দিককার রেখাগুলো। পেন্সিল কাঁপালেই দ্বীপ, নদী, সাগর হয়ে যেত। এখন সেই সব জায়গার ভেতর দিয়েই চলেছে কুবের। পাশে ভদ্রেশ্বর গ্রেটকোটের মোড়কের মধ্যে বসে গরম গরম চিংড়িমাছ ভাজা খাচ্ছে। ভাড়া করা লঞ্চ একটার পর একটা শীতের নদী খেঁতলে দিয়ে এগোচ্ছে। সেই কোন ভোরে বেরিয়েছে দুজন। কুবেরের কারখানা-আমলের নাইট ডিউটির কোটটার এতখানি সদ্ব্যবহার কোনোদিন হয়নি। রাক্কোশখালি, দূর্বাচটি, পাথরপ্রতিমা, চড়াবিদ্যা—মৈসিনির চর। এলোপাতাড়ি নদী আর তার মাঝে মাঝে এমন সব জায়গা।

ভদ্রেশ্বরের সঙ্গে লাটঅঞ্চলের জায়গা দেখতে বেরিয়ে কুবের সকাল থেকে অনেক কিছু দেখেছে। ভাটায় নদী শুকিয়ে যেতে লঞ্চ চড়ায় আটকে যাওয়ার জোগাড় হয়েছিল। অনেক কষ্টে ঊর্ধ্বশ্বাসে ফুলস্পিড দিয়ে বড়ো নদীর বুকে এসে ভেসে পড়তে হয়। একচুমুকে চারদিককার জল শুষে যাচ্ছিল। তখন একবার কুবের অবাক হয়ে দেখছিল, কত জায়গাজমি জলে ঢাকা পড়ে আছে। ভাটায় ফাঁকা নদীর বুক হিসেবে ধরলে কত জায়গা পৃথিবীতে। কথাটা ভদ্রেশ্বরকে বলল কুবের। 'এসব জায়গা বায়না করা যায় না?'

লঞ্চের বটবট আওয়াজ, কচুরিপানা ভেসে যাচ্ছে, মাঝে মধ্যে চর জেগে আছে। ভদ্রেশ্বর একটু অবাক হল। সে কুবের সাধুখাঁকে এদিককার জঙ্গল হাসিল জায়গাজমি দেখাতে এনেছে। বাবু এখন কোন জায়গার কথা বলছে?

'কোথাকার কথা বলছেন?'

'নদীর বুক। ভাঁটায় কেমন গা এলিয়ে দিয়ে পড়ে আছে—'

'হাসালেন বাবু। এসব জায়গা ভগবান লীলা করে তৈরি করেছেন। এসব দখলে রাখবেন কী করে? জল শুধু জল। জল শুষে নিয়ে আবার ফেরত পাঠাবেন দুনিয়াদার। আপনার আমার কম্ম নয়।'

কুবেরের মন খারাপ হয়ে গেল। মাঠে মাঠে ধান কাটছে দেখে এসেছে কুবের। এদিককার লাটঅঞ্চলেও ধান কাটা পড়ছে। বাঁকের দু-দিকে আঁটি বেঁধে দুলতে দুলতে ভেড়ি বরাবর চাষিরা চলেছে। পৃথিবীতে কত জিনিসও আছে। ভাবলে মনে হবে যে—কোনো একটা ভালো করে জড়িয়ে ধরলে একেবারে মাটির ভেতরকার রসসুদ্ধ শুষে নেওয়া যাবে, অথচ কত কঠিন!

'কদমপুরে যেখানে আপনি বাড়ি করলেন—সেখানেও একদিন সাগর ছিল। সে হয়তো কত পুরুষ আগে। আমাদের দেখার কথা নয়। তবে আমি বালক বয়সে নদীর সোঁতা দেখেছি ওখানে। আমাদের কর্তাবাবাকে ওখান থেকেই বাঘে তুলে নিয়ে গিয়েছিল—'

ব্রহ্মা, বিষ্ণু, মহেশ্বর—তারপরেই এই ভদ্রেশ্বর। তার নখদর্পণে পৃথিবীর ওলটপালট, জন্মবৃত্তান্ত।

সস্তায় হাসিল-জমি কিনিয়ে দেবে ভদ্রেশ্বর। তা-ই বলে কুবেরকে দিয়ে লঞ্চ ভাড়া করিয়েছে। অথচ কুবেরের আজ এখানে থাকার কথা নয়। দোতলার মেঝেতে পালিশ মিস্ত্রিরা কাজ করছে এখন। জয়পুরের পাথর জোড়ে বসিয়ে নিভাঁজ মেঝে তৈরি হয়েছে—বাথরুমেও পাথর। দোতলার বারান্দায় দাঁড়িয়ে ননী বোসের ঝিল, রেলস্টেশন, নয়ানদের দোতলা, খড়িগোদার ধানখেত সব দেখা যায়।

গৃহপ্রবেশের দিন কুবেরের বেশ লাগছিল। বড়ো বউদি পথ দেখিয়ে নিয়ে যাচ্ছিল। পেছনে কুবের, তার পেছনে বুলু—কাঁকালে এক হাঁড়ি কই মাছ। নতুন বাড়ির চারিদিকে ঘুরে মাছগুলো বুলু বাড়ির পুকুরেই ছেড়ে দিল। একটা মাছ আর যেতে চায় না। ঠাকুরমশাই বললেন, শুভচিহ্ন। চারদিকেই শুভ ব্যাপারেন ছড়াছড়ি। শুধু মা আসেনি। আসতে পারনি। বড়দার চাকরির জায়গায় গিয়ে জ্বর হয়েছে। পিয়োনদের ওপর দেখাশুনোর ভার দিয়ে বড়দা চলে এসেছে। কুবের জানত, এখানেই মার মন পড়ে আছে। সারাদিন খাটাখাটুনির পর বড়দা বলছিল, 'তোদের বাড়ির কথা মা জনে জনে ডেকে বলেছে। শুনছ, আমার ছেলের বাড়ি হয়েছে—পুকুর কেটেছে, সে এক পেল্লায় ব্যাপার।'

বটবট আওয়াজ থেমে গেল। ভদ্রেশ্বর সারেংঘর থেকে কাঠের সিঁড়ি বেয়ে তরতর করে নেমে এল, 'এসে গেছি—ওই দেখুন।'

হঠাৎ এমন নদীনালার মাঝখানে গম্ভীরভাবে পুরোনো দিনের একটা বিশাল স্ট্রাকচার দাঁড়ানো। আগেকার খিলেন গাঁথুনি। লঞ্চ আর এগোবে না। পাটাতন থেকে মাল্লারা ছোটো ডিঙিখানা জলে নামাচ্ছে।

'ভালো করে তাকিয়ে দেখুন। বুনো পেয়ারার ঝাড়—ফলে নুয়ে পড়েছে—পাতা দেখতে পাবেন না। ছোটোবেলা থেকে এ-পথে যতবার গেছি—খালি ভাবতুম এমন সরেস জায়গায় আবাদ হয় না কেন? এখানে কোনোমতে ধান ছড়িয়ে দিলেই মোটা মোটা গোছা ধান মাথা নিয়ে ঠেসে উঠবে। নদীর পলি পড়ে পড়ে এক্কেবারে দলদলে মাটি। এতদিনে আপনার মতো একটা লোক পেলাম। কিছু টাকা ঢালুন —ধান উঠতেই পাঁচ ছ-গুণ হয়ে ফিরে আসবে।'

আইডিয়াটা কুবেরকে গোড়াতেই হিট করেছে। কদমপুরে ক-দিন ধরেই ভদ্রেশ্বর তাকে জপিয়েছে। এখন বাজার হল ধানের। কী মাটি আঁকড়ে পড়ে আছেন! সাহস করে ঝাঁপিয়ে পড়ুন—পয়সা রাখবার জায়গা পাবেন না। কিন্তু একেবারে সামনা-সামনি এসে কুবের ভয় পেয়ে গেল।

আসলে বাংলাদেশের নীচের দিকটায় একটাই নদী—তার মাঝখানে বাংলাদেশ বানানোর সময় ভগবান এলোপাতাড়ি অনেকগুলো ছোটো বড়ো মাঝারি দ্বীপ ছুঁড়ে মেরেছিল। তাই চারদিকে গাদা গাদা নদীর মায়া। সকাল থেকে একটানা ঝকঝকে জলের দিকে তাকিয়ে কুবেরের চোখ ধাঁধিয়ে গিয়েছিল। এতক্ষণে খানিক সবুজ, খানিক পৃথিবীর মতো ঘরবাড়ি দেখতে পেয়ে চোখ একটু ধাতস্থ হয়েছে। কিন্তু এ কী!

পাঁচ ছ-মাইল লম্বা হবে বোধ হয়—আড়েও কম নয়। ঢাউস হয়ে নদীর মাঝখানে মাটি ঠেলে উঠেছে। তার ওপর পাখিদের সঙ্গে সঙ্গে কত ফল-পাকুড়ের বীজ এসে পড়েছে এই জনমানবহীন চত্বরে। অবাধে পাছপালা জন্মেছে, বেড়েছে—মরেও গেছে হয়তো। তার মাঝখান দিয়ে দাঁত বের করে দাঁড়িয়ে আছে ইটের দেওয়াল, পিলার, খানিক জায়গায় জানালা, দরজার খিলান—ছাদ নেই কোথাও। ছোট্ট ডিঙিখানা দুলে উঠল। পাড়ে ওঠাই দায়। ঢেউ সেখানে ননস্টপ আছাড় খাচ্ছে। ছলবল করে জল প্রায়ই মাটি তুলে নিচ্ছে গালে—সেই সঙ্গে দাঁতন গাছের ঝাড়ও খাবলে নিচ্ছে।

'এখানে উঠব কী করে?'

'ঘাবড়াবেন না। লগি মেরে লাফিয়ে পড়তে হবে। কষ্ট না করলে—'

কিন্তু কেষ্ট লাভ করতে গিয়ে শেষে প্রাণ না দিতে হয়। কুবেরকে জড়োসড়ো অবস্থায় দেখে ভদ্রেশ্বর হেসে উঠল। গ্রেটকোটটা খোলেনি বুড়ো। একেবারে অ্যাডমিরাল গোছের চেহারা হয়েছে। বাতাসে মাথার সাদা চুল উত্তরে কাত হয়ে পড়েছে, 'এই করে জায়গাজমি করবেন? ভেবেছেন কী! সব আমি করে দেব।' তারপর সেই এক ফালি ডিঙির ওপরেই টালমাটাল হয়ে দাঁড়াল, 'ওই যে দেখছেন—ওটা হল মেদনমল্লর গড়—প্রতাপরাজার সেনাপতি ছিল—এখানে থেকেই ভারী ভারী জাহাজে চড়ে সমুদ্দুর চষে বেড়াত।'

বহুবার দলিলে লিখতে হয়েছে—পরগনে মেদনমল্ল।

এই সেই মেদনমল্ল আখড়া।

তীরভূমি থেকে মাটি আস্তে আস্তে উঁচু হয়ে দ্বীপের ভেতরে একেবারে পাহাড়প্রমাণ ঢেউ তুলে দুর্গের সিঁড়িতে এসে থেমেছে। উঠতে কষ্ট হচ্ছিল কুবেরদের। ভদ্রেশ্বর পেছপাও হবার লোক নয়। মাল্লাদের নিয়ে কুবেরকে একরকম হিঁচড়ে ওপরে নিয়ে ঠেলে তুলল। হাঁপ ধরে গেছে। সেখানে বসে পড়ে কুবের সারা তল্লাটের একটা ছবি পেল।

তারিখের নম্বর দেওয়া ঘড়িতে চব্বিশ। আজ চব্বিশে ডিসেম্বর। ঘড়ি না থাকলে বেলা বোঝা যেত না। এখন ঠিক দুটো। কুবেরের পেছনে কত বছরের পুরোনো একটা দুর্গের কঙ্কাল হাড়গোড় বের করে কোনোরকমে দাঁড়িয়ে আছে। বাঁ দিকে মেদনমল্লর দিঘি। দাম জমে তাতে জলের মুখ দেখা যায় না। পদ্ম-শালুকের সঙ্গে রকমারি বুনো ফুল ফুটে আছে। সেখানে বিদেশি পাখিরা ঝাঁক বেঁধে পড়ে আছে। রোদ পোহাচ্ছে।

মাল্লাদের তাড়া ছিল। বেলা চারটের মধ্যে লঞ্চ ছেড়ে দিয়ে বড়ো নদীতে পড়তে হবে। জায়গা খারাপ। জীবজন্তু ছাড়াও মানুষের মধ্যে কত জন্তু রয়েছে। সরু নদীতে পেলে রাতারাতি রামদায়ের কোপে টুকরো করে ফেলবে।

'কোথায়? চলুন এবার—'

এই এতখানি জায়গা—এ তো প্রায় নিজের রাজ্য। এতদিনে কেউ খোঁজ পায়নি কেন? একটু অবাক লাগল কুবেরের। এমন সুন্দর মাটি—জল আটকাবার খাঁড়ি—সবই আছে এখানে। পয়সা ঢেলে মাছ ছাড়াও চলে—আবার আবাদও হতে পারে। পয়সা ছড়ানো রয়েছে—শুধু তুলে নিলেই হয়।

একটা ঢিবি পার হতেই ইট-বাঁধানো রাস্তা পড়ল। দেখেই চমকে উঠল কুবের। তারপর সবাইকে পেছনে ফেলে কুবের দৌড়ে চলে গেল। এ তো আমার চেনা জায়গা। ভদ্রেশ্বর, এ তো আমার চেনা জায়গা। কতবার এসেছি এখানে। এই পথ ধরে কতবার ছুটে গেছি। জলের ফেবার ধারায় এরকম কত কথা কুবের সাধুখাঁর বুক তোলপাড় করে এক লহমায় তার ভেতরকার হাড়-পাঁজরের উপর দিয়ে বয়ে গেল।

তখন পেছনে গ্রেটকোট গায়ে একটা বুড়ো এলোপাতাড়ি চেঁচাচ্ছে, ‘ধরো ধরো। ধরে ফেলো তোমরা—আনাড়ি লোক পড়ে গিয়ে হাত-পা ভাঙবে। সাধুখাঁমশাই! ও সাধুখাঁমশাই! কোথায় গেলেন?’

আর সাধুখাঁ। কুবের তখন দু-তিনশো বছর আগেকার সেনাপতি মেদনমল্লর বাঁধানো চত্বরে গিয়ে পড়েছে। অনেকগুলো পাখি সেখানে নিশ্চিন্তে ছোঁ মেরে এসে নামছিল আবার উড়েও যাচ্ছিল। কুবের সেখানে এসে দাঁড়াতেই তারা চলে গেল। শুধু একটা মোটা সাপের কিছু সময় লাগল। বয়স হয়েছে। বেচারি নড়েচড়ে মেদনমল্লর খাজাঞ্চিখানার দিকে চলে গেল।

সামনেই সমুদ্র। এদিকটা কুবেররা আগে দেখতে পায়নি। কোণে দিঘির মাঝখানে বাঁধানো জলটুঙি কালের ভারে ধসে পড়েছে। তার ওপর দিয়ে জলকলমির ঝাড় লতিয়ে লতিয়ে এগিয়ে গেছে। কুবের আর দাঁড়াতে পারল না। কোনো জায়গাতেই স্থির হয়ে থাকতে পারছে না। এক-একটা ফাটল, এক-একটা ভাঙন—সব কুবেরের চেনা জায়গার ওপর দিয়ে ঘটে গেছে। তার ভেতর যা কিছু জানা-চেনা ছিল—সেসব ঠেলে আরও অনেক ভেতর থেকে এই জায়গাটার ছবি আরও জোরে বুড়বুড়ি কেটে ওপরে উঠে আসতে চাইছে। কুবের সে-ঢেউ কিছুতেই ঠেলে দাবিয়ে রাখতে পারছে না।

ভদ্রেশ্বর রীতিমতো ভাবনায় পড়ে গেল। এই ছিল লোকটা। কোথায় গেল! সব জায়গায় এগোনোও যায় না। চিত্তির করা ফুল মেলে দিয়ে কত রকমের বুনো গাছ এই দুর্গের মধ্যে চাড়া দিয়ে উঠেছে। মাথার ওপরে ছাদ নেই। সেখান দিয়ে আলো পড়ে ভেতরটা লতায়-পাতায়, ভাঙা ইটে, শ্যাওলায় কারুকাজ করা ভেলভেট হয়ে পড়ে আছে।

সাহস করে এগোতেই কুবেরকে পেয়ে গেল।

‘ভদ্রেশ্বর, এই আমার শোবার ঘর—’

বলতে ইচ্ছে করছিল, চমৎকার! নিয়ে এলাম আমি আর আপনি বলে দিলেন কোন জিনিসটা কার? কোথাকার? ভালো!

‘এখানে বসে আমি কোটালের বাতাসের দিকে নজর রাখতুম—’

‘হয়েছে। চলুন এবার।’ মাল্লাদের দিকে তাকিয়ে ভদ্রেশ্বর চোখ টিপতেই কুবের ছিটকে ভাঙা খিলানের ধাপ ধরে ওপরে উঠে গেল। এসব আমার ছিল। সেখান থেকে সারা তল্লাট কুবেরের চোখের নীচে ঠিকরে এসে দাঁড়াল। শ্যাওলায় পা রাখা যাচ্ছে না। এখনকার তুলনায় একেবারে পকেট সাইজের ইটের গাঁথুনি। তবে খুব চওড়া। দু-দুটো লোক দৌড়ে যেতে পারে তার ওপর দিয়ে। চারদিকে ইটের শ্রাদ্ধ হয়েছে। ভদ্রেশ্বর নীচে দাঁড়িয়ে হাতজোড় করে বলছে, ‘আমার ঘাট হয়েছে কুবেরবাবু। আপনি ভালোয় ভালোয় নেমে আসুন। আমরা এবার লঞ্চ ছেড়ে দেব। প্রাণটা খোয়াবেন না দয়া করে। বউমাকে আমি মুখ দেখাতে পারব না। দয়া করে নেমে আসুন—’

কুবের একচোট হেসে উঠল। সারাটা দুর্গ কাঁপিয়ে সেই হাসির আওয়াজ দিঘির চত্বরে গিয়ে আছড়ে পড়তেই পুরোনো দামের ওপরের পাখির ঝাঁক একেবারে ছররা খেয়ে আচমকা দিগবিদিক হারিয়ে সাঁইসাঁই করে উড়তে লাগল। কাদার গাঁথুনির পরিগুলো দিঘির দু-ধারে সার দিয়ে দাঁড়িয়ে ছিল। সে সব ঢাকা পড়ে গেল। কত পাখি ছিল তাহলে!

‘নেমে আসুন দয়া করে।’

‘আমার জায়গায় ওরা কারা?’

‘কোথায়?’

‘ওই যে। দক্ষিণের তীরে গুষ্ঠির নৌকো ভিড়েছে—’

ভদ্রেশ্বর পেছন ফিরে তাকিয়েই বুঝল, দূর দূর নদীর জেলেদের কাণ্ড। ছোটোবেলায় এদিকে বিচুলির নৌকোয় চড়ে ঘুরতে এসে দেখেছে, জেলেরা সমুদ্রের অখাদ্য কিম্ভূত সব মাছ পেলে ছাল ছাড়িয়ে দ্বীপের মাটিতে ফেলে ফেলে শুকোত। কলকাতার ব্যাপারীরা সবরকম জিনিসই কেনে।

মুখে বলল, ‘আপনি নেমে এসে বারণ করুন।’ লোকটা যে এত বড়ো একটা পাগল কে জানত! অথচ সব সময় কেমন ভদ্রলোক সেজে বসে থাকে। ঘাড় ঘুরিয়ে আবার জেলেদের দেখতে গিয়েই ভদ্রেশ্বরের গা ছমছম করে উঠল। দিঘির পাড়ে বাঁধানো চত্বরে বিকেলবেলায় রোদ পড়ে ভুল হয়ে যায়—এসব এই বুঝি সেদিনের তৈরি। একটু আগে লোকজন দাসদাসী দিঘিতে জল সরে দুর্গের ভেতর চলে গেছে। এখন সব চুপচাপ। যে কোনো মুহূর্তে সেনাপতি মেদনমল্ল এসে পড়তে পারে। আসার সময় হয়ে গেছে।

দিঘিময় পাখির ঝাঁক এখন দুর্গের উঁচু উঁচু দেওয়ালের মাথায় সার দিয়ে বসে পড়েছে। তাদের ছুটোছুটিতে দু-একটা পালক এখনও শূন্যে। বাতাস ফুঁড়ে কিছুতেই নীচে নামতে পারছে না।

‘কে?’

ভদ্রেশ্বর সামলে নিল নিজেকে। এতক্ষণে লোকটা তাহলে নেমেছে। মাল্লাদুটো কোনদিকে গেল?

‘আমি।’

‘সে তো বুঝতেই পারছি। কী যে পাগলামি জুড়ে দিয়েছেন—’

কুবেরের দিকে তাকানো যায় না। চোখ লাল। সাত-সকালের ঠান্ডা হাওয়া লেগেও হতে পার। চুলগুলো খাড়া খাড়া হয়ে উঠেছে। হাঁটুর কাছে ধুতি ছিঁড়ে গেছে।

‘এসব জায়গা আমার চেনা ভদ্রেশ্বর।’

‘কী যে মন খারাপ করা সব কথা বলেন।’

‘না। আমি এখানে ছিলাম। কবে ছিলাম মনে নেই। কিন্তু ছিলাম। সব চেনা।’

একটু শীতও লাগছিল ভদ্রেশ্বরের। লঞ্চে বসে ভালোমন্দ যা কিছু পেটে পড়েছিল—সব হজম হয়ে এখন নাড়িভুঁড়িসুদ্ধ জ্বলছে।

‘ভালো কথা। চেনা জায়গায় এবারে আবাদ করুন। কিন্তু আমি আর আপনাকে নিয়ে এখানে আসছি নে।’

‘কেন ভদ্রেশ্বর। আমি কী করেছি?’

‘কী করেননি? অমন করে এই কবরখানায় কেউ দৌড়োদৌড়ি করে?’

‘কবরখানা বলছ কেন? আমি এখানে ছিলাম ভদ্রেশ্বর। ওই যে আমার বৈঠকখানা। ওই ঢালু জায়গায় গোরুমোষের বাথান ছিল। এখনও আমি সব চিনে চিনে বের করতে পার।’

‘কাজ নেই। যত্ত গা-গুলানো কথা বলেন আপনি। এই করে আবাদ করবেন?’

ভদ্রেশ্বরের কথার ঝাঁঝে কুবের ফিরে এল। ‘জায়গাটার কোনো খাজনা নেই?’

‘তবে বলছি কী! দশজোড়া মোষের হাল করে কাজে নেমে পড়া শুধু। শীত থাকতে থাকতে লোকজন মালপত্র নিয়ে এখানে এসে নেমে পড়ুন। দখলে রাখুন। তারপর আষাঢ়ের পয়লা হপ্তায় জ্যাঠো রোয়া সেরে দিয়ে ফিরে যান। ধান আর দেখতে হবে না। অমর খন্দ হয় এই মাটিতে। আমি বলছি সাধুখাঁমশাই—আমি জানি—গাছগাছালির পাতা দেখুন। ঘন, সবুজ—অমর খন্দ—’

আর কোনো কথা কুবেরের কানে যাচ্ছিল না। ধানের ভারে সারা তল্লাট নুয়ে পড়েছে। লোকজন দেখা যায় না। কুড়িটা মোষের মাথা ঢাকা পড়ে গেছে। দিঘির ধার দিয়ে পরির সারি আড়ালে চলে গেছে। কুঁজি বেঁধে বেঁধে চাষিরা সংসার করছে। ব্যাপারীদের নৌকোগুলোর গলুইতে আঁকা মাছ, মানুষের চোখ, নোঙরের আঁক—সব কিছু চিকচিক করছে। এক লহমায় কুবের সাধুখাঁ আগামী শীতের চেহারাটা দেখে ফেলল। এখনই বস্তা নব্বই বিরানব্বই টাকা। ধরে রাখতে পারলে—উঃ! ভাবা যায় না!

পাখিগুলো দেখল, খানিকক্ষণের জন্যে যে-চারটে মানুষ তাদের এখানে এসেছিল—এখন তারা হেঁটে হেঁটে নেমে যাচ্ছে। গড়খাই পার হয়ে গেল। এখন আর দিঘিতে বসা যাবে না। দাম ফুঁড়ে ঠান্ডা

উঠছে। দেখা যায় প্রায়।

ভদ্রেশ্বরের পেছন পেছন কুবের সাধুখাঁ ল্যাংচাতে ল্যাংচাতে ফিরছে। মাল্লাদের একজন অল্প জলে বিশ্রী দেখতে একটা মাছ ধরে ফেলেছে।

ভদ্রেশ্বরের মুখ দিয়ে লাল গড়াচ্ছে প্রায়, 'পাঙাস মাছ এখানে পেলি কোত্থেকে বাবারা? বড়ো দামি মাছ। রাঁধলে মাংস হয়ে যায়।'

কুবেরের কানে কিছুই গেল না। সারেঙ সিটি মারার দড়িটা ধরে ঘন ঘন টান দিচ্ছে। আকাশের আধখানা জুড়ে সূর্য এবারে ঢল নেবে। রোদ এলিয়ে পড়েছে। ডিঙিতে পা দিতেই কুবেরের মাথার মধ্যে মেদনমল্লর বাগান, দিঘি, চত্বর, জলটুঙিসুদ্ধ সারাটা দুর্গ চলকে টাল খেয়ে গেল।

বিরাট বাথান। সারি সারি পুরুষ্টু গাইগোরু সারি সারি দাঁড়ানো। ঝকঝকে মাজা পেতলের কেঁড়েতে দুধ দোয়া হচ্ছে। দোকা ভর্তি নানান খাবার। মুগ, অড়হড়, ছোলা, গুড়, কচিঘাস টাল দিয়ে সাজানো। গোরুগুলো আরামে খাচ্ছে। ফোঁসফোঁস নিশ্বাস ফেলছে। বাঁট থেকে দুধের ধারা ক্ষীর হয়ে নামছে। পূর্ণিমার সন্ধে। পালতোলা দুখানা জাহাজ মাঝনদীতে নোঙর ফেলে ভাসছে। ডিঙি নৌকো ডাঙা থেকে খাবার জল বয়ে নিয়ে যাচ্ছিল। জাহাজে তোলা হবে। এমন সময় পরি বসানো দিঘির ধানের চত্বরে মেদনমল্ল এসে দাঁড়াল। পেছনেই দুর্গ। দেখেই চেনা গেল। দেবেন্দ্রলাল সাধুখাঁর সেজো ছেলে কুবের সাধুখাঁ। তবে জুলফি অনেক লম্বা আর মাথায় বাবরি। তখনও দুধ-দোয়ানোর ছনছন শব্দ শোনা যাচ্ছে। জ্যোৎস্নায় সাদা পরিদেহগুলো শুধু ফকফক করছে।

চেনা রাস্তা ধরে কুবের চত্বর থেকে নেমে এল। সবই তার জানাশোনা। শুধু লোকজন নেই কোনো। তাতে বিশেষ অসুবিধে হল না। কুবের লম্বা লম্বা পা ফেলে দুর্গের পেছনে এসে দাঁড়াল। সেখানে দুর্গের অতিকায় ছায়ার মধ্যে রাশি রাশি দুধলি ফুল ফুটে আছে। একটা দুটোয় সামান্য আলো পড়ে জোনাকির ধারা জ্বলে উঠছে। কুবের গায়ের জাব্বাজোব্বা খুলে ফেলল। একটা গুড়গুড়ি পাখি মনের সুখে গুড়-গুড়ড়-ড় করে ডাকছিল। কুবের কোমরের তলোয়ারখানা আলগোছে ঘাসের উপর রাখতেই পাখিটা থেমে গেল। তারপর নদীর মধ্যে নামতে লাগল কুবের। জল সরে যেতে লাগল। বিশাল শুকনো নালার কায়দায় নদীর বুক পেট সব ঠেলে উঠল। কতকাল জলের নীচে ছিল। উলটো দিক থেকে দশখানা হাল টেনে কুড়িটা মোষ আসছিল। লাঙলের ফলার দু-ধারে মাটির চাঙড় উলটে উলটে পড়ছে। জল কেটে আসতে হয়েছে বলে মোষের গা ভিজে।

কুবেরও এগোচ্ছিল। কত জমি। কত জায়গা। এ সব আবাদ হয় না। জল সরে যাওয়ায় হুহু শব্দটা সুন্দরী গাছের জঙ্গলের বাঁক পেরোয়নি তখনও—এমন সময় কুবের স্পষ্ট শুনতে পেল, কে ডাকছে, ‘সেজদা! সেজদা! সেজদা আছ নাকি?’

সালকে থেকে নতুন বাড়িতে উঠে আসা ইস্তক এমনিতেই কুবেরের ভালো ঘুম হচ্ছিল না। চারদিক খোলামেলা । লোকজন নেই। বড়ো বড়ো ঘর ফাঁকা পড়ে আছে। দেওয়ালে গৃহপ্রবেশের দিনের লাল-লাল সিঁদুরের দাগ। খুব অস্বস্তিতে যাচ্ছিল।

আরেক ডাকেই কুবের উঠে বসল। বুলু ঘুমে। কচি মেয়েটা একদিকে ঢলে পড়ে আছে। ছেলেটা আড়মোড়া ভেঙে উঠবে এখুনি।

দরজা খুলতেই নগেনের সামনে পড়ল। এত ভোরে! গৃহপ্রবেশের দিন মা আসেনি। আর আসেনি নগেন। ওভারটাইম ছিল অফিসে।

‘বাড়ি চলো।’

কুবের তো রাগারাগি করে চলে আসেনি। নিজের বাড়ি করে উঠে এসেছে। তরিতরকারি কুটতে অনেক জায়গা লাগে মার। বুলুর বুদ্ধিতে পুবের দিকে ঢালাও একটা বারান্দা বানিয়েছে। মা সেখানে বসে কুটনো কুটবে ইচ্ছেমতো।

মুখ না ধুয়েই, এতক্ষণ নগেনের সঙ্গে কত কথা হয়ে গেছে—এইভাবে কুবের নতুন বাড়ি দেখাতে লাগল নগেনকে। ‘প্রত্যেক ঘরের সঙ্গে অ্যাটাচড্ বাথ—’

‘জামা-কাপড় পরে নাও। তাড়াতাড়ি যেতে হবে—’

ভদ্রেশ্বরের সঙ্গে কুবের মেদনমল্লর দুর্গ দেখে ফেরবার পর ক-দিনই আবাদে ঢালাও চাষে নামার কথা নিয়ে ভাবছিল। একটু-আধটু তৈরিও হচ্ছিল। মাঝরাত থেকেই বাঁ হাতখানা বুকের ওপর। অন্যদিন বুলু নামিয়ে দেয়। বোবায় ধরে এই কাণ্ড।

তখনও কুবেরের দুর্গের ঘোর ভালো করে কাটেনি। নগেন বলল,‘তাড়াতাড়ি নাও। সবাই বসে আছে। তুমি গেলেই রওনা হবে।’

কুবের তখনও নগেনকে বোঝাচ্ছিল, কদমপুরের এই বাড়িতে থাকার সুবিধে কতখানি। ‘তোরা সবাই থাকবি বলে এ-বাড়ি বানিয়েছি। ওই ঘরটায় তুই আর রেখা থাকবি। মা আর বাবা বড়ো ঘরে। বীরেন আর ডলি দক্ষিণের বারান্দা লাগানো ঘরে—’

‘মা নেই।’

‘আমি না হয় রান্নাঘরের কাছ থাকব। কোনো অসুবিধে হবে না—,’ খচ করে থেমে গেল কুবের, ‘কী বললি?’

‘মা নেই।’

‘মানে?—’

‘কাল রাতে বড়দার ওখানে মারা গেছে। সারারাত লরি চড়ে আজ শেষরাতে ডেডবডি এসে পৌঁছেছে—’

‘বাবা?’

‘ভেতরে বসে আছে দেখে এসেছি—’

ট্রেনে বসে নগেন প্রথমে কথা বলল, ‘তোমার বাড়ির কথা যে মা কতজনকে বলেছে। অথচ নিজে দেখতে পেল না।’

কুবের কিছু বলতে পারল না। ভোরের ট্রেনের জানলায় বসে ঘনরাম চাটুজ্যের ইটখোলা দেখা যাচ্ছে। ক-বছর আগে যখন প্রথম প্রথম কদমপুরে আসত—তখনই মা শেষরাতে স্টোভে চা করে

দিয়েছে কুবেরকে কতবার। হরলিকসের শিশিতে ঢেঁড়সের বিচি রেখেছিল গুছিয়ে। কুবেরের জায়গা- জমি হয়ে গেলে খানিক খেত করবে ঠিক করেছিল। ঘাটের সিঁড়ির বজ্র গাঁথতে গিয়ে অসময়ে বৃষ্টি নামল। কাজ পিছিয়ে গেল। নইলে কবে গৃহপ্রবেশ হয়ে যেত। মা অনায়াসে এ-বাড়ি দেখে যেতে পারত।

বুলু বলল, 'যদি একটা বছরও এখানে থাকতেন। থেকে, হাঁটা চলা করে বাড়িটা পুরোনো করে দিয়ে মরলে আমাদের কোনো দুঃখ থাকত না।'

ইটের কামড় বড়ো কামড়। দালান-কোঠা করলে, মাটি পোড়ালে, মাটি খুঁড়লে একজনকে না একজনকে টেনে নেবেই। শেষকালে মায়ের ওপর দিয়েই তা গেল। শেষকালে তুমি সবাইকে হারিয়ে দিলে মা।

ট্রেন সরু পিয়াসলে ছাড়িয়ে গেল। কুবের অনেক কষ্টে মনে করতে লাগল, শেষ কবে মার সঙ্গে দেখা হয়েছে। নগেনের মেয়ের জন্মদিনের দু-দিন আগে? টোয়েন্টিনাইনথ মে? না তারও আগে। তারিখ মনে নেই ঠিক।

কিছুকালই মা বড়দার ওখানে গিয়ে থাকছিল। সেখানে থাকার সুন্দর ব্যবস্থা। বড়দা বিকেলে পাবলিক লাইব্রেরি থেকে বই আনিয়ে দিত। মা বড়দার কোয়ার্টারের সামনে লংকা, বেগুন লাগিয়েছিল। ছাদ ঢালাইয়ের সময় কুবেরের কিছু টান যাচ্ছিল। এদিক-সেদিক টাকা আটকানো। কত লোক ধান নিয়ে গেছে—ফেরত দেয়নি। সে সময় একদিন চিৎপুর ইয়ার্ড থেকে লরিতে কদমপুরে সিমেন্ট নিয়ে যাওয়ার জন্য বাড়িতে টাকা নিতে এসেছে। বুলু ঘুমোচ্ছিল। সামনের দরজায় কড়া নাড়ার আওয়াজ।

পাছে বুলুর ঘুম ভাঙে—কুবের গিয়ে দরজা খুলে দিল। বোঁচকা হাতে মা দাঁড়ানো। রিকশাওয়ালা দাঁড়িয়ে। মা বলল, 'খুচরো পয়সা হবে তোর কাছে? দশ আনা?'

কুবের দিয়ে দিল। 'তুমি একা। রিকশায় করে হাওড়া স্টেশন থেকে এলে কী করে একা একা? বড়দা?'

'মফস্সলে বেরিয়েছে।'

'বলে এসেছ?'

'তোর বড়দা জানত আমি সালকে চলে আসতে পারি। আমি না থাকলে সালকের এ-বাড়িতে রেশন আসে না ঠিক মতো।'

'ভেতরে এসে বোসো।'

কুবের জানত, মা যেখানেই থাক—যত আনন্দেই থাকুক, স্বামীর পিতৃপুরুষের বসতবাড়ির এই আড়াইখানা ভাগের ঘরে তার মন সব সময় পড়ে থাকে।

ডলি বেরিয়েছে। কচি মেয়ে ঘুমোয় না রাতে। রেখা তাই আগাম ঘুমোচ্ছিল। কুবের জল ভরে দিল

কুঁজো থেকে।

'তোর বাড়ির কদ্দুর?'

সময়টা ক-দিন খারাপ যাচ্ছিল তখন। সে সব না বলে সব কিছু ফাইন চলছে—এমন একটা ছবি তুলে ধরেছিল কুবের দি ড্রিম মারচেন্ট—ড্রিম সেলার। সে সব শুনে মার যে কী তৃপ্তি!

লরি পাওয়া গেল না। ঘন্টা চারেক পরে বাড়ি ফিরে দেখল মা নেই। সন্ধের ট্রেনে বড়দার ওখানে ফিরে গেছে। বউমাদেরই একজন গম্ভীর হয়ে ঘর গুছোচ্ছে। বুলু তখনও বিড়ে পাকিয়ে খাটে শুয়ে শুয়ে ঘুমোচ্ছে। একদম অ্যাডভান্সড স্টেজ। কাউকেই তাই ব্যাপারটা কী—জানতে চাইতে পারল না।

নগেনের মেয়ের জন্মদিনের দু-দিন আগে সব কেনাকাটা করতে হল। পয়লা জন্মদিন। কিছু ধুমধাম ছিল। আগাম কাজ সেরে রাখল কুবের। কেননা জন্মদিনের দিন একটা সাত বিঘের জলকর ইজারা নেওয়ার কথা ছিল। সেদিনই সই-সাবুদের দিন ছিল। তাই আগেভাগে কাজ সেরে রাখতে হয়। সেদিন মা ছিল। কুবের যে নগেনের মেয়ের জন্মদিনের ফ্রকট্রক কিনতে গিয়ে সবাইকে সুখী করার জন্যে খাওয়া-দাওয়া হইচই লাগিয়ে দিয়েছিল, তাতেই মা খুশি, গরমে—আনন্দে গায়ের জামা খুলে ফেলল, ফ্যান চালিয়ে দিতে বলল। হরিরাম সাধুখাঁর বাড়ির বউ। একদা যাদের গন্ধেশ্বরীর টাটে সন্ধে হলেই ঘিয়ের প্রদীপ জ্বালানো হত—সে বাড়ির বউ হয়ে এসে ইস্তক মা পুরোনো যা-কিছু, গৌরবের যা-কিছু, সবই আঁকড়ে ধরতে চাইত প্রাণপণে।

তারপর আর মার সঙ্গে দেখা হয়নি কুবেরের। গৃহপ্রবেশের দিন মা না আসাতে কুবেরের খুব মন খারাপ হয়েছিল। মাছ কুটতে দেরি, ডাল সেদ্ধ হচ্ছে না, কলাপাতাগুলো শুকনো—এ সব হতেই পারত না মা থাকলে। কেন যে এল না, এমন শরীর খারাপ ছিল—বিছানায় উঠে বসতে পারেনি। উঃ! যদি বুদ্ধি করে একখানা মোটর ভাড়া করে নিজে গিয়ে কুবের মাকে নিয়ে আসত।

সেদিন নতুন বাড়িতে হইচই—সবকিছুর মধ্যে কুবেরের বারবার মনে হয়েছিল, যে থাকলে সব চেয়ে খুশি হত—সে-ই আসেনি, আসতে পারেনি। মা যা কল্পনাপ্রবণ, হয়তো ফাঁকা কোয়ার্টারের ঘরে বসে বসেই চোখের সামনে এ-সব দেখতে পেয়েছিল। সেদিন কদমপুরে থাকলে মা যা গণ্ডগোল বাঁধাত—এটা হয়নি কেন? ওটা ওরকম কেন? কত কী! তবু, তবু ভালো লাগত কুবেরের।

পরদিন কুবের একখানা চিঠি লিখেছিল। হুবহু মনে নেই। তবে মোট কথা, তুমি না থাকাতে সবকিছু ফাঁকা লেগেছে। ওই দিন তোমারই সব চেয়ে ভালো লাগত। মা কি তার চিঠি পায়নি! পেলে একটা জবাব দিত নিশ্চয়।

কুবেররা পৌঁছোতেই শ্মশানে রওনা হল সবাই। ইলেকট্রিক চুলো খারাপ হয়ে আছে। বেদি করা উঁচু জায়গায় পোড়াতে দশ টাকা বেশি নিল। গঙ্গামৃত্তিকা মাখিয়ে নাইকুণ্ডলি জলে ফেলতে ফেলতে তিনটে বেজে দশ। আগুনের ভেতর থেকে বাঁশ দিয়ে খুঁচিয়ে শেষে নাইকুণ্ডলি পাওয়া গেল। ছাই, পোড়া পোড়া চর্বির গাদ—তার ভেতর ভস্ম মেখে পড়ে ছিল। কুবের কদমপুর থেকে যাতায়াত করে

সালকের বাড়িতে হবিষ্যি করল চারদিন। ঠিক হল শ্রাদ্ধের পরই লরিতে করে মালপত্র নিয়ে নগেন, বীরেন, দেবেন্দ্রলাল—সবাইকে পাকাপাকি কদমপুরের বাড়িতে নিয়ে যাবে। সঙ্গে বংশের নারায়ণ শিলাও যাবে। রাস্তা বাড়বে বলে বাড়িভাঙার নোটিসও পড়ে গেছে এদিকে। সালকেও নতুন হচ্ছে।

লরি ঠিক। রোজান দুধ ঠিক হয়ে গেল নগেনের মেয়ের জন্যে। চার দিনের দিন হবিষ্যিতে বসে নগেন বোমাটা ফাটাল, 'আমরা যাব না সেজদা।'

কুবের আগেই কিছু আশঙ্কা করেছিল।

রেখাকে জিজ্ঞাসা করেছে কুবের, 'ওখানে থাকতে তোমাদের অসুবিধে হবে?'

'অসুবিধে কী? আপনার ভাই থাকলেই আমরা থাকব।'

বীরেনকে জিজ্ঞাসা করেছে, ডলিকে জিজ্ঞাসা করেছে কুবের। এমন করুণভাবে জিজ্ঞাসা করতে হবে জানলে কুবের ঢাউস করে বাড়ি বানাত না। মা গেল না। বাবার শরীর ভালো নয় বলে বড়দা-বড়ো বউদি দেবেন্দ্রলালকে কলকাতার বাইরে যেতে দেবে না। তাহলে বীরেন চলুক, নগেন চলুক অন্তত।

কিন্তু ডলিও যে সেই একই কথা বলে, 'আপনার ভাই গেলেই আমরাও যাব।'

হবিষ্যির সময় কথা বলতে নেই। এ সব জানলে কুবের সাধুখাঁ বস্তা বস্তা সিমেন্ট ঢেলে পেল্লায় বাড়ি ফেঁদে বসত না। দশাসই দিঘি কাটাত না। একখানা একতলা বাড়ির ইট, সিমেন্ট, বালি খরচা করে ঘাট বানাত না। শুধু বুলু আর সে—এই ক-জনার জন্যে এত টাকা মাঠের মধ্যে ঢেলে দিত না। এত সবের পর এখন তোমরা এই পায়রার খোপে বসে বকবকম করে কী সুখ পাবে। একটা নিদারুণ কষ্ট —তা হরফে লিখে ফোটানো যায় না—কুবেরের দুই ভ্রূর মাঝখানে এসে নাক চোখ লাল করে দিল। কথা বাড়াল না কুবের।

বউমাদের একজনের বাড়ির জানালায় দাঁড়ালে কচুরিপানা ঢাকা পুকুর দেখা যায়। বর্ষাকালে কাপড় তুলে এগোতে হয়। ভাড়ার ফালি ফালি ঘর। কী সুখে এরা এখানে পড়ে থাকতে চায়। নগেন-বীরেনের কোনো অসুবিধেই হত না কদমপুর থেকে অফিস করতে।

পরদিন কুবের একা-একাই হবিষ্যি করল কদমপুরের ফাঁকা বাড়িতে। বুলু স্বামীর মনের অবস্থা বুঝে চুপচাপ কাজ করে যাচ্ছিল। আজ খুক করে হেসে উঠলে নির্ঘাত দাবড়ানি খেত। ছেলেটা শুধু বকবক করে যাচ্ছে। পুকুরে ঢিল ছুঁড়ছে। দেবেন্দ্রলাল এর নাম রাখতে চেয়েছিল সৃষ্টিধর।

পিয়োন চিঠি দিয়ে গেল। মা জবাব দিয়েছে। নতুন লোক বলে ঠিকানায় চিঠি পৌঁছোতে এই দেরি। এর আগে মরা লোকের চিঠি পায়নি কোনোদিন কুবের। বাঁধানো ঘাটের চত্বরের কাছেই খামার হয়েছে। আছড়ানো ধানের কিছু ছিটকে এসে পড়েছে। সেগুলো পাখিরা কুবেরের ভয়ে খুব সাবধানে খুঁটে খাচ্ছিল। খামের ওপর চেনা হাতের লেখা। চিঠিখানা খুলে ফেলল—

কল্যাণবর,

বাবা কুবের। আমি এই শনিবার তোমার ওখানে যাইব ঠিক করিয়াছিলাম। কিন্তু ৫/৬ দিন জ্বরে ভুগিয়া বড়ো দুর্বল হইয়াছি। ডান হাঁটুতে ভীষণ ব্যথা। শরীর বড়ো দুর্বল হইয়াছে। তোমার বাড়ি দেখার জন্যও আমার মন বড়ো অস্থির হইয়াছে। এবার সালকিয়ার বাসার থেকে এত মনঃকষ্ট পাইয়া আসিয়াছি। আর সালকিয়া যাইব না। এবার তোমার নতুন বাড়িতে গিয়া লক্ষ্মীপূজা করিব। আমি একটু সুস্থ হইলেই তোমার ওখানে যাইব।

আমার যাইতে ইচ্ছা করে, কিন্তু আমার জন্য হয়তো তোমাদের বিব্রত হইতে হইবে। এই জন্য চিন্তা করি। যাক, যদি সম্ভব হয় তোমার বাবাকে নিয়া যাইও। তোমাদের বড়দা আমাকে ওষুধ আনিয়া দিয়াছে।

সৃষ্টিধর ও কুসুমসখি কেমন আছে? তাহাদের আমার শত চুমু দিও। বুলু ও তুমি আমার আশীর্বাদ নিয়ো। তোমাদের কুশল প্রার্থনা করি।

—আং মা

মহাগুরু নিপাত। গুরুদশার কাছা যে কতকাল কুবেরের গলায় আছে। চিঠিখানা মুড়ে হাতে নিল। বুলু লম্বা চাতালে বসে লোক দিয়ে শ্রাদ্ধের চাল ঝাড়িয়ে নিচ্ছিল। কুঁড়ো তুলে রাখা হচ্ছে। হাঁস খাবে। চিটে ধান নতুন বসানো সুপুরি নারকেল চারার গোড়ায় ছড়িয়ে দেওয়া হচ্ছে। মা দেখলে কী যে খুশি হত!

নতুন কাটা পুকুরে মোচাচিংড়ি ফেলা হয়েছে। মাছওয়ালা জানতে এসেছে, বড়ো সাইজের চারা মাছ ছিল—ফেলে দিয়ে যাবে নাকি। কুবের মাথা নেড়ে দিল। এখন কিছু দরকার নেই। এত কাজের মধ্যেও মা কুবেরের মেয়ের নাম রেখে বসে আছে—কুসুম।

খুব খিদের মাথায় ভাত খেয়ে কুবের আর নড়তে পারে না। হাত-পা অবশ হয়ে যায়। আজ ক-বছর দিন নেই, দুপুর নেই, কুবের মাঠে ঘাটে হরদম ঘুরে বেড়িয়েছে। কোথাও বসেনি। এবার কিন্তু, পরিষ্কার দেখতে পেল কুবের, আর দৌড়ঝাঁপ করতে পারবে না সে। সেরকম দৌড়ানোর আর মানে পাচ্ছে না কুবের। কী দরকার! এখন এই ছাব্বিশ হাজার টাকা ধসানো পুকুর, জলের ধার, বাঁধানো ঘাট ফেলে তাকে যেতেই হবে একদিন।

এতদিনকার ভাবনা চিন্তা, উদয়াস্ত পরিশ্রম সব জলে গেল। কুবের কোনোদিন নিজের জন্যে এত সব করতে চায়নি। তার বিশেষ কিছু দরকারও হয় না। দীর্ঘদিন বেকার থাকার পর এমন একটা সাশ্রয় মেথডে চলবার অভ্যেস হয়ে গেছে—ইচ্ছে করলেই কলের জল খেয়ে তিন দিন কাটিয়ে দিতে পারে। কতরকম স্বপ্ন ছিল। মা আসবে, বাবা আসবে—রেশনে লাইন দেওয়ার চিন্তা থাকবে না। খেতের ধান, পুকুরের মাছ, গোরুর দুধ, মাঠের সবজি—সব কিছুই কুবের গুছিয়ে আনছিল। হরিরাম সাধুখাঁর ভদ্রাসন থেকে বেরিয়ে এলেই সবার হাতের সামনে কুবের এসব এগিয়ে দিত।

এখন এতসব দিয়ে কী হবে? কার কাজে লাগবে! ছেলে, মেয়ে, বুলু, কুবের আর বাড়ির লোকজন

মিলিয়ে ফেলে-ছড়িয়ে সব শেষ করা যাবে না। অথচ মা থাকলে যে কী সুখী হত—কী খুশি হত! মা হাতে ধরে কাউকে কোনো একটা জিনিস তুলে দিলে বাড়ির বউদের কিছুই বলার থাকত না।

ঘাটে বসেই কুবের কেষ্টবাবুর আবাদ, নবীনবাবুর আবাদ-মাড়ানো কোম্পানির ভেড়ির উঁচু পিঠ দেখতে পাচ্ছিল। কোথায় আকাশের অনেকখানি ফাঁকা হয়ে গেছে। সেখানে তাকিয়ে কুবেরের বুকের মধ্যে হুহু করে উঠল। এক দমকে সব মনে পড়ে গেল। মা তুমি কত অল্পে সুখী হতে। একবার ছোটোবেলায় আমি সস্তায় অনেক মুড়ি কিনে ফেলেছিলাম। তুমি নিজের হাতে টিনে ভরে ইট সাজিয়ে খাটের নীচে গুছিয়ে রেখেছিলে। কত যত্ন। অনেক দিন ধরে আমরা সেই মুড়ি খাই।

বুলুকে আস্তে ডাকল। ক-দিনে বুলুও অনেকখানি শুকিয়ে গেছে। কদমপুর চলে আসার সময় একটা পুরোনো ট্রাংকের সঙ্গে মার কিছু কাঁথা, দুটো বাঁধানো মাসিক-পত্রিকা আর কিছু কাগজপত্র চলে এসেছে। পরশু বুলু তার ভেতরে মার একখানা অগোছালো ডাইরি পেয়েছে। হাতের চিঠিখানা কুবের বুলুকে দিয়ে ডাইরিখানা আনতে বলল। চিঠিখানা পড়ছিল দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে। কুবের বলল, 'আগে ডাইরিটা নিয়ে এসো—।' বুলু ডাইরি আনতে যেতেই কুবেরের কাছে ফট করে একটা সত্যি কথা পরিষ্কার হয়ে গেল। বুলু—তার ওয়াইফ, তার সঙ্গে কুবেরের লাইফের হাফটাইমের পর থেকে দেখা হয়েছে। মা সেই হাফটাইমের আগের কথা লিখেছে। কুবেরের ওপরে এক ভাই ছিল। সে মরে গেলে বোধ হয় মা কী খেয়াল হতে এসব কথা লিখেছিল। বুলু ডাইরিটা দিল।

শ্রীগোপাল আয়রন ওয়ার্কস সন উনিশ শো পঞ্চাশে একখানা প্রেজেন্টেশন ডাইরি বাজারে ছেড়েছিল। তারই পাতার পেছনে পেছনে মা লিখেছে—

> বহুদিন প্রায় সাতাশ বছর পরে ডাইরি লিখিতে বসিলাম। দীর্ঘ সাতাশ বছরে বহু পরিবর্তন আসিয়াছে আমার জীবনে। শুধু আমার জীবনে কেন, সমগ্র জাতির জীবনে। সমস্ত পৃথিবীর ইতিহাসে। স্বাধীনতা আসিয়াছে। কিন্তু উৎসাহ-উদ্দীপনাহীন জীবনে এই মুক্তির স্বাদ উপলব্ধি করিতে পারি না। নিজের দুঃখ যখন অসহ্য হয়—সর্বদা মৃত্যু-চিন্তা মনকে অধিকার করে। অধরকে ছাড়িয়ে বাঁচিয়া থাকা নিজের আশ্চর্য মনে হয়। এই তো মানুষের জীবন—কত ক্ষণস্থায়ী, তবু এর জন্য মানুষের আকাঙ্ক্ষার সীমা নাই। পরস্পরের প্রতি হিংসা-দ্বেষের অন্ত নাই। কিন্তু এক মুহূর্তে ইহা শেষ হইয়া গেল। আরও কতকাল বাঁচিয়া থাকিব জানি না। যে জীবন বিদ্যায় বুদ্ধিতে স্বাস্থ্যরূপে এমন উজ্জ্বল হইয়া উঠিয়াছিল—যাহা সর্বদা নিজের কৃতিত্ব মনে করিয়া গর্বিত হইতাম—এক মুহূর্তের ভিতর তাহা ফুরাইয়া গেল। কিছুতেই তাই বিশ্বাস করিতে পারি না। সত্যি ভগবান আছেন কি না—তাহাকে পাওয়া যায় কি না। যদি তিনিই নিয়ে থাকেন, কেন নিলেন? কী অপরাধে নিলেন? কিছুই নাকি নষ্ট হয় না। তবে সেই অবিনশ্বর আত্মা কোথায় আছে? যদি এই মহীবায়ুতে মিলাইয়া থাকে, তবে নিশ্বাসের সঙ্গে বুকের ভিতরে পাই না কেন? যন্ত্রণায় বুক ফাটিয়া যায় কেন? যদি ভগবান ন্যায় বিচারক হইয়া থাকেন, তবে এ আঘাত আমার ন্যায্য প্রাপ্যই ছিল—এ বিশ্বাস মনে স্থান পায় না কেন?
>
> কতবার দক্ষিণেশ্বরে গিয়াছি। পরমহংসদেবের জীবনে মা কালীর দর্শন প্রাপ্তি আমার মনে আশ্চর্য বিস্ময়

জাগায়। তিনি নাকি বহুবার কালীর দর্শন পাইয়াছেন। তাই দক্ষিণেশ্বর আমার এত ভালো লাগে। পঞ্চবটীর সাধনঘর আমার ছাড়িয়া আসিতে ইচ্ছা হয় না। মনে হয় সব ছাড়িয়া যদি এই পঞ্চবটীর তলায় থাকিতে পারিতাম, তবে হয়তো মনে শান্তি পাইতাম।

মনের ভিতর জলস্রোতের মতো চিন্তাস্রোত আমার মনকে আচ্ছন্ন করিয়া রাখে। কতদিনের কত কথা। কত ব্যথা দিয়াছি। ভালো জামা কাপড় দিতে পারি নাই।...

কুবের আর পড়তে পারল না। খাতা বন্ধ করে দিল। এ ভাষা মা কোথায় পেল! তার নিজের ছেলে নতুন বসানো বকফুলের গাছটার গোড়ায় একটা বেড়াল ছানার গলায় দড়ি দিয়ে বাঁধছে। বকতে গেল পারল না। একবার সেই মৃত দাদার কথা মনে করার চেষ্টা করল। তাও পারল না। সব ভুলে গেছে। পরিষ্কার রোদ্দুরে তার হাতের আঙুলের কালো কালো দাগগুলো শুধু চোখের সামনে ভয়ংকরভাবে স্পষ্ট হয়ে উঠল।

একা একা কদমপুরে হবিষ্যি করা যায় না। দুটো ছেলেমেয়ে, একটা বউ, বাড়ির পুকুরে জল টলটল করছে, বাঁধানো পুকুরের চাতালে একটুও ময়লা নেই—সবকিছু এত ফাঁকা, এত কম—দম ফেলা যায় না। কুবের কিছুতেই এখানে হবিষ্যি করতে পারবে না। সাধুখাঁদের পৈতৃক বাড়িতে বড়দা, নগেন, বীরেনের সঙ্গে এক ঘরে বসে হবিষ্যির অন্ন মুখে দিয়ে মনে হচ্ছিল মা বেঁচে আছে। এখুনি রান্নাঘর থেকে সেদ্ধ ডাল হাতায় নিয়ে এসে থালায় ঢেলে দেবে। অথচ সে নেই বলে কত কাণ্ড! মা নেই বলে সব ভাই মিলে হবিষ্যির নামে ক-দিনই যেন পিকনিক করছিল।

ঠিক ছিল শ্রাদ্ধশান্তি হয়ে গেলেই নগেন-বীরেন কদমপুরে উঠে আসবে। অথচ শ্রাদ্ধশান্তির ক-দিন আগেই কুবেরের এতদিনকার সাজানো স্বপ্নটা দুম করে ফেটে গেল। নগেন আসবে না। বীরেনও আসবে না।

মা যে তার কতখানি ছিল—এই এতদিনকার জীবনে কুবের একবারের জন্যেও টের পায়নি। তাকে ঘিরে অল্পদিন হল কিছু ডালপালা বেরিয়েছে। তাদের নাম বুলু, সৃষ্টিধর, কুসুম। অথচ সে নিজে অন্য গাছের ফল। সে গাছের নাম দেবেন্দ্রলাল। সেই গাছের কোনো পাতা, কোনো ফল আর নেই এ বাড়িতে। ফলে কুবের তার নিজের কষ্ট কাউকে বলতে পারল না। বলবে কাকে? বললে কে বুঝবে? ফাঁকা বাড়ি দেখে একবার চিৎকার করে কাঁদতে চেষ্টা করল কুবের। মা, দেখে যাও তুমি—আমি সব সাজিয়ে তুলেছিলাম। কিন্তু কেউ এল না। কেউ গন্ধ নিল না। আমি নতুন বাড়িতে নতুন লোকজন নিয়ে বাড়ির কর্তা হয়ে ওঠার মহলা দিচ্ছি। সেই ছোটোবেলার পর অনেককাল কান্নাকাটির অভ্যেস নেই। চোখে জল আসতেই দেরি হয়ে গেল। ঠোঁট কাঁপছে দেখে কুবেরের নিজের ছেলেই তাকে পাকড়াও করল, 'কী হয়েছে বাবা? অমন করছ কেন?'

কুবের অবুঝ জীবটির দিকে তাকিয়ে থাকল শুধু। এই ছেলেটা লোক হয়ে উঠলে কুবের বুড়ো হয়ে যাবে। কুবেরের বিষয়-আশয়ের ওয়ারিশান। এককালে সেটেলমেন্ট পরচায় নাম উঠবে। পাশে লেখা থাকবে পিতা কুবের সাধুখাঁ। ব্যাটা বাঁচলে হয়। চাদ্দিকে যা সব কাণ্ড হচ্ছে। ক-দিন আগে সরু পিয়াসলে স্টেশনে প্ল্যাটফর্মের গায়ে রেলপুকুরে ঘুনি তুলে মাছ দেখতে গিয়ে ইয়া তাগড়াই এক জোয়ান সাপের চুমু খেয়ে জলে ঝাঁপিয়ে পড়ল। যত কষ্ট তত দাপাদাপি। লোক ভিড় করে দেখল—তবু হাসপাতালে নিয়ে গেল না ট্রেনে করে। মরল, তবে পাড়ে টেনে নিয়ে এল।

ঘাটলায় বসেই পুব-দক্ষিণ কোণের ঢোল-কলমির জঙ্গলে তাকাল কুবের। প্রথম জায়গা মাপতে এসে একটা সাপের সঙ্গে দেখা হয়েছিল। যতক্ষণ মাপামাপি, ততক্ষণ মাথা তুলে তুলে—ঘুরে ঘুরে জায়গা বদলে কুবেরকেই দেখেছিল। আরও কয়েকবার তার সঙ্গে দেখা হয়েছে কুবেরের। ভদ্রেশ্বরের সঙ্গে

প্রথম আলাপের দিন চেনা-পড়শির পোজে তাকে পাশ কাটিয়ে সাপটা ওই ঢোল-কলমির জঙ্গলে তার বাসায় চলে গিয়েছিল। ইদানীং দেখা হলে কুবেরের মনে হয়, সাপটা তাকে ফণা তুলে নমস্কার করে জানতে চায়, কেমন আছেন বাবু? জায়গাটা কেমন? মন টিকছে তো? সাহস করে তাকে কিছু বলা হয়নি কুবেরের। এগিয়ে যেতে পারেনি। হাজার হোক সাপ তো! মানুষের সংস্কার কাটিয়ে উঠতে পারেনি।

বড়ো বড়ো ফোঁটা দিয়ে বৃষ্টি আসতেই কুবের বারান্দায় উঠে এল। চাদর জড়িয়ে আকাশের দিকে তাকিয়ে গুরুদশার ধড়া হাতে ঠেকাল—তখনই বুঝতে পারলে আমরা কি নিঃস্ব হয়ে গেলাম! সেই সময় আকাশ দিয়ে ফাঁপানো কিছু মেঘ দিক পালটাচ্ছিল।

ক-দিন পরেই সোনা-কার্তিকের ঘাটে বড়দা, নগেন, বীরেনের সঙ্গে পাশাপাশি বসে নেড়া হল। পরামানিকের নাম—গয়া। ঘাট-কামানো পেশায় নামায় লোকটার আসল নাম আদিগঙ্গার জলে অনেকদিন ধুয়ে সাফ হয়ে গেছে। তাই নিয়ে খানিক রসিকতা হল। কুবের সবার সঙ্গে মিশে হাসল। হেসে বুঝল, তারই মতো বড়দা, নগেন, বীরেন—কিছু হয়নি ভাবটা ফোটাতে শুধু শুধু হাসছে। ব্যাপারটা বুঝে নগেন, বীরেনের জন্যে কুবেরের কষ্ট হল। এক-দিন ওদের ওপর রাগ করে কদমপুরে একা একা হবিষ্যি করার সময় যেসব কঠিন প্রতিজ্ঞা করেছিল—তার সবই সেই মুহূর্তে কুবেরের মন থেকে ধুয়ে গেল। ইস্কুলে থাকতে কুবেররা ঠিক এইভাবে গোল হয়ে বসে রবিবার দুপুরে চুল কাটত।

হরিরাম সাধুখাঁর ভদ্রাসনের খোপে খোপে শরিকানি সংসার। দেবেন্দ্রলালের স্ত্রীবিয়োগ, অনেকেরই অশৌচ হল ঠিকই। কিন্তু শ্রাদ্ধ করার মতো জায়গা হল না। জিনিসপত্তর নিয়ে কে কোথায় যাবে? পাশ ফেরার বারান্দাগুলোও এক পুরুষে খুদে খুদে সংসারের আস্তানা হয়ে গেছে। কদমপুর বড়ো দূর। অতএব এই সোনা-কার্তিকের ঘাট। দশমীর দিন নাকি এখানে কোন রাজার বাড়ি থেকে শোভাযাত্রা করে সোনার কার্তিক আনা হয়। জায়গাটাই নিশ্বাস করবার জায়গা। পুঁথি, সিঁদুরমাখানো কড়ি, পঞ্জিকা, বটের ঝুরির নীচে মাটির পুতুলে রোহিতাশ্ব-শৈব্যা, স্বামী কোলে বেহুলা—নানান জিনিসে গঙ্গার ঘাটটুকু ঠাসা, তার মধ্যে নিশ্বাস করে ফেলার হাওয়া বইছে সবসময়।

দানের জিনিসে জায়গাটা থইথই করছে। হোমের জন্যে অনেক কিছুর পাশে বাটিতে বাটিতে মায়ের পছন্দসই জিনিসগুলো সাজানো। ইলিশ মাছের কোল, রুই মাছের পেটি, আমসত্ত্ব—কুবের সেদিক থেকে চোখ ফিরিয়ে নিল।

পুরুতমশাইদের লিডার বীরেনকে মন্ত্র গড়াচ্ছে। সংস্কৃত বলে দু-এক জায়গা খট করে গিয়ে মনে লাগে। বীরেন সংস্কৃত বলছে, মা আমার গায়ে যত লোম আছে তুমি তত বছর স্বর্গে গিয়ে বাস করো। বৃষোৎসর্গের ষাঁড়টি একবারেই কচি। স্যাঁতসেঁতে শ্যাওলা-ধরা অন্ধকার পুজো-আচ্চার জায়গায় দাঁড়িয়ে লাফাতে শুরু করেছে। তখনও তিলোৎসর্গের সময়কার একটা মন্ত্রের গোড়ার দিকে পুরুতমশাইদের গলাঝাড়া দেওয়া সংস্কৃত মনে আসছিল কুবেরের—কৃষ্ণা তিথৌ। মা কি অমাবস্যায়

মারা গিয়েছিল? মনে করতে পারল না কুবের। তিথি কী করে তিথৌ হয়?

শ্মশানে নিয়ে যাবার আগে মাকে শুয়ে থাকতে দেখে ধক করে উঠেছিল কুবেরের বুকের মধ্যে। তাহলে মানুষটা নেই। আর কোনোদিন কথা বলা যাবে না। কিন্তু হরিধ্বনি, নামগান, চিতাসাজানো, গঙ্গামাটি মাখিয়ে নাইকুণ্ডলি জলে ফেলে দেওয়া—তারপর গলায় ধড়া পরে বাড়ি ফিরে এসে মনে হচ্ছিল—মা শেষ হয়ে যায়নি। হোম যজ্ঞ, মন্ত্রপাঠ—নানান হইচইয়ের মধ্যে মা ফুরিয়েও ফুরোচ্ছিল না।

কুবের আর নগেনের ওপর গঙ্গার ঘাটে বৃষকাঠ বসিয়ে দেওয়ার ভার পড়ল। সেইটাই এত ক্রিয়াকাণ্ডের শেষ কাণ্ড। শোনামাত্র মন খারাপ হয়ে গেল কুবেরের। বড়ো গঙ্গায় ভাটা। তাই আদিগঙ্গায় শুধু কাদার ময়দা। পা ডেবে যায়। ঘাটে দাঁড়িয়ে পুরুতমশাই বারে বারে সাবধান করে দিচ্ছে—'নরম মাটিতে জোর করে, ধরে চেপে বসিয়ে দিন। তারপর ওদিকে না তাকিয়ে তিনবার জল দিয়ে ওপরে উঠে আসুন। খবরদার পেছনে তাকাবেন না। জোয়ার এলেই ভেসে যাবে।'

ওপরে উঠে আসার সময় কুবের না তাকিয়ে পারল না। বৃষকাঠে খোদাই অস্পষ্ট মুখের ভেতরকার চোখ তার দিকে স্থির দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে। পলক পড়ছে না। চোখ ফেরাতে নগেনের সঙ্গে চোখাচোখি হয়ে গেল। কেউ কথা বলল না। এবারের মতো এই শেষ, আবার বছর ঘুরলে কিছু লোক খাওয়াতে হবে। তখন কুবের দেখল, নগেনের ওপর তার একটুও রাগ বা অভিমান নেই। যা আছে তা ওর জন্য কষ্ট। নগেনের চোখ লাল হয়ে উঠেছে। যে কোনো মুহূর্তে এখন বৃষকাঠ দেখার জন্যে ঘুরে দাঁড়িয়ে পড়তে পারে। কুবের বলল, 'চল ট্যাক্সিতে যাই—এখনও অনেককে নেমন্তন্ন করা বাকি।'

সারারাত যাত্রা দেখে ভোরে বাড়ি ফেরার পথে আলোর মধ্যে গতরাতের সম্রাট, সেনাপতি, মঞ্চ, নর্তকী—কোনো কিছুই মন থেকে একেবারে মুছে যেতে চায় না। সময় নেয়। কিন্তু কুবেরের জন্য কাজের চাপ, কেনাবেচার খুঁটিনাটি, ঢালাও চাষবাসের শতেক কুটকচালি একেবারে ওত পেতে বসেছিল।

হোমড়াপলতা আর চড়াবিদ্যার আবাদে ধান ফেলতে হবে। চারা তৈরি করে আষাঢ়ের পয়লা হপ্তায় জ্যাঠো রুয়ে দিতে পারলে বিঘে প্রতি এক পণের বেশি বীজ লাগবে না। মনে মনে কতকগুলো অঙ্ক কষে কুবেরের মাথার মধ্যে ধাঁ ধাঁ করে আগুন ধরে গেল। পাঁচসের ধান ফেললে বিঘেটাক জায়গা রোয়া যায়। কারকিত করে চাষ করলে এক বিঘে জায়গা নতুন ধরনের বীজে পনেরো মন ধান হামেশা দিচ্ছে। ধানের মন ঘাট টাকা। অতএব—

শ্রাদ্ধশান্তির পর সালকে থেকে কদমপুরে ফেরার পথে রেললাইনের দু-ধারে যত জায়গা দেখেছে—সবটাই যদি চষে রুয়ে দেওয়া যায়। বাব্বা!

ইদানীং ভোরে উঠে তার নিত্যকার কাজ হল একবার কুকুরের ঘরে গিয়ে কুকুর দুটোর গায়ে হাত বোলানো—তারপর গোয়ালে ঢুকে দোহালের সঙ্গে বসে গোরুগুলোর স্বাস্থ্য নিয়ে আলোচনা করা।

রবিবার ছিল। জেলে এসে বড়ো দিঘিতে জাল ফেলে মাছগুলোকে নাড়াচাড়া দিয়ে স্যাদলা কাটিয়ে দিল—তারপর আবার জলের মাছ জলে। নিজে হাতে কুবের মহুয়ার খোল ছিটিয়ে দিল। ঝাঁক বেঁধে মাছের সারি ঘুরে বেড়াচ্ছে। বড়ো মুলতানিটা গাভিন হয়েছে। রোদ পেয়ে ঘাড় ভেঙে নিয়ে চোখ বুজল গোরুটা। বুলু তখনও ঘুম থেকে ওঠেনি। সকালে উঠোনের সামনে গোলার কাছাকাছি গোটা পাঁচেক ঘুঘু পাখি নেমে এসেছে। ধান ছিটিয়ে পড়লেই ওরা ঠিক খবর পায়। বাচ্চারা তখনও বিছানায়। রাখাল খড় কাটার ইলেকট্রিক মেশিনে ঘড়ের তড়পা এগিয়ে ধরছে আর কুচি কুচি হয়ে বেরিয়ে আসছে। মুগচুনি আর গুড়ের গন্ধ পেয়ে ডাঁই পিঁপড়ে সারি দিয়ে গোয়ালের দিকে চলেছে। কুবের সাধুখাঁ বুঝতে পারল, সে খুব একা পড়ে গেছে। এই পৃথিবীতে নিজেই সে এমন একটা পথ বেছে নিয়েছে, যেখানে কোনো বন্ধু নেই, বন্ধু হয় না। চারদিকে শুধু প্রয়োজনের পাহাড়। তার মাঝখানে একটাই ডিউটি কুবের সাধুখাঁর। টাকা জোগাড় করো। টাকা জুগিয়ে যাও। যতগুলো গর্ত আছে—সব টাকা দিয়ে ভরাট করে যাও। আর কোনো কাজ নেই তোমার। তোমার গালের মাংস ঝুলে পড়ুক, মাথা ঝিমঝিম করুক—তাতে কিছু আসে যায় না। ডিউটি ফার্স্ট—ডিউটি লাস্ট।

কদমপুরের খাল পাড়ে এই নতুন পাড়ায় এখন পাঁচখানা নতুন বাড়ি উঠেছে। কুবের রোডের উপর ইট সাজানো সারা। রোডরোলার খোয়ার উপর দিয়ে শক্ত করে এগোচ্ছে। সন্ধেবেলা কুবের রোডের এক ধারে এখন ইলেকট্রিক আলো জ্বলে—অন্য ধারে সেই আলো কুবেরের বসানো নানান ফলের কিশোর সব চারার পাতায় পড়ে জায়গাটা অন্যরকম করে দেয়। অথচ এখানে তার নিজের লোকজন নেই। কুকুররা কুবেরকে ভালোবাসে। গোরুরা কুবেরকে দেখলে লাল মাড়ি বের করে হাসে। বুলু হাজারো জিনিস মারকেটিং করে ফেরার পথে কুবেরের পছন্দ লবঙ্গ নিয়ে আসে পাঁচ ছ-আবার। কুবের পানের সঙ্গে লবঙ্গ খেতে ভালোবাসে।

ভদ্রেশ্বর এসে হাজির। মেদনমল্লর দুর্গ বরাবর চরভরাটি পয়োস্তি জমির দখল কুবের নেবে কি না জানতে এসেছে। একেবারে দলদলে মাটি। নানান সুখ্যাতি করল ভদ্রেশ্বর। বাঁধ বেঁধে নদীর জল ঢুকিয়ে দিয়ে ভেড়ি হতে পারে। কোটি কোটি মাছের ডিম নাকি জলে লুকিয়ে থাকে। কিংবা চাষও করা যায়। অমর খন্দ হবে।

সব শুনে কুবের বলল, 'কার জন্যে করব?'

ভদ্রেশ্বরের বাড়িতে এবেলা ওবেলা নিয়ে কুড়িজনের পাত পড়ে। কুবেরবাবুর মতো লোকজন তার সংসার চালায়। জায়গাজমির খতিয়ান, দলিল, সার্চ—সব ভদ্রেশ্বর মাথায় তুলে নেয়। জায়গা কেনার সময় বহরিডাঙা সাবরেজিস্ট্রি অফিসের বটতলায় বসে কুবের একশো টাকার নোটের গোছা ভদ্রেশ্বরের হাতে গুণে তুলে দেয়। দিয়ে বাসে করে চলে আসে। তখন শরিকদের ভাগের টাকা বুঝিয়ে দিয়ে দু-একখানা নোট নিজের জন্যেও রাখে।

এই ভোরবেলা এমন জবাব পাবে আশা করেনি ভদ্রেশ্বর। বিষয় বিষ—সেকথা ঠিক। ভদ্রেশ্বর তা নিজেই বলে। কিন্তু এই বয়সে কারও কাছে বিষয় বিষ ঠেকলে তাতো ভাববার কথা। খেয়াদার হাটের

চক্কোত্তিদের বড়ো ছেলে গদিতে বসেই ক্যাশবাক্স খুলে, সিন্দুক হাতড়ে টাকাপয়সা তেজারতির কাগজপত্র সব বিলিয়ে দিয়েছিল, ফিরিয়ে দিয়েছিল। সে তো অনেককালের কথা। জোয়ান বয়সে অমন ভুল কালেভদ্রে এক-আধজন করে থাকে। সেই লোক এখনও নাকি কলকাতা করপোরেশনের টিকে দিয়ে বেড়ায়। পেটের জ্বালা বড়ো জ্বালা। আজও অন্নের জন্য চক্কোত্তি বংশের সেই মানুষটা পথে পথে ঘুরে বেড়ায়।

'ওসব ভেবে কি কেউ বিষয় করে সাধুখাঁমশাই?' একটু দম নিয়ে ভদ্রেশ্বর বলল, 'গতবার কারও চাষ হয়নি। দোবারা বুড়ে গিয়ে জমিজায়গা বিলকুল ভেসে গিয়েছে। খড়ের কাহন এখন পঞ্চাশ বাহান্ন। দম ঠুকে নেমে পড়ুন। লক্ষ্মী চাইলে রাজা হয়ে যাবেন।'

'আমি প্রজা থাকতে চাই। কার জন্যে রাজা হব?'

'আপনার জন্যে রাজা হবেন। সবাই নিজের জন্যে হয়।'

'আমার যা আছে খাবে কে?'

'আপনারা খাবেন। বংশধররা খাবে'—

'ছাই। চোখ বুজলে চেল্লাচিল্লি শুরু হয়ে যাবে। ভাগ-বাঁটোয়ারা নিয়ে হুলস্থুল পড়ে যাবে।'

বুলুর স্বপ্ন কিন্তু অনেক। খালপাড়ের উলটোদিকের খানাখন্দ ডোবা-ডাঙা কিনে ফেল। স্টেডিয়াম হোক। এখানে ভালো খেলার মাঠ নেই। ক-দিন আগে মাথার পাকা চুল খুঁজতে খুঁজতে বলছিল, 'কতকাল আর জায়গা জমির হাত বদলে টাকা আসবে। আমাদেরও বয়স হবে। তুমি একটা প্রতিষ্ঠান তৈরি করো। সেখান থেকে নিশ্চিন্ত মাস-মাইনের মতো টাকা আসবে। ছেলেমেয়েরা বড়ো হলে টাকা পাবে। চিরকাল তোমার টাকার ভাবনা ভাবতে হবে না।'

কুবের বলেছিল, 'কী রকম?'

'এই যেমন ধরো গিয়ে একটা সিনেমা হল—কিংবা অন্য কিছু। আমি ঠিক বুঝিয়ে বলতে পারছি না। নিয়মিত টাকা আসবে।'

টাকা আসবে—কথাটা শুনলেই কুবের সব সময় ঝক করে স্টার্ট নেয়। বিছানায় উঠে বসেছিল। দেবেন্দ্রলাল একদিন ট্রেনে এমন বলেছিল—একদিন টাকা আসা যদি বন্ধ হয়ে যায়। বলেছিল,'তোমার কত টাকা কুবের? ও জিনিসের মুখ আমি বিশেষ দেখিনি কুবের। সেজন্যে তোমাদের গর্ভধারিণীর দুঃখের অন্ত ছিল না।'

মা এসব দেখে যায়নি। পালম বুনবে বলে এক কাঠা জায়গা চেয়েছিল। আপন মনেই হেসে ফেলল কুবের। ভদ্রেশ্বর ঘাবড়ে গেল। ড্রিম মারচেন্ট কুবের সাধুখাঁর গর্ভধারিণী এক কাঠা জায়গা চেয়েছিল। মা তুমি কি মানা ক্যাম্পের উদ্বাস্তু ? চাষের জায়গা চেয়েছিলে যে বড়ো! থাকলে না কেন আর কিছুদিন?

ভদ্রেশ্বর আজ সকালে মাথা বোঝাই করে আরও অনেক কিছুই খবর এনেছিল। সোঁদালিয়ায় তেল খোঁড়ার জায়গা ফেলে মাইল দুয়েক কদমপুরের দিকে এগিয়ে এসে অনেকেই টাকা ফেলে জায়গা ধরে রাখছে। গত বছর চাষ হয়নি। এবার হালগোরু, ঘটিবাটি, জায়গাজমি মবলক বন্ধক রাখবে অনেকেই। কলকাতার বাবুরা গাড়ি থেকে নেমে জায়গা দেখে বলে, কী সুন্দর—হাউ নাইস—গাছপালার রূপ দেখে দেখে মরে যায়। ভদ্রেশ্বরও মনে মনে খেপে ওঠে তাদের ভাবভঙ্গি দেখে। বাবু, তালগাছ আর নারকেল গাছের কী এমন রূপ পেলেন? কিন্তু মুখ ফুটে বলতে পারে না। মক্কেল। তারা যা ইচ্ছে দামে জায়গা কেনে। কিন্তু কুবেরের জন্যে সস্তায় জমি বন্ধক রাখার খবর এনেছিল আজ। সময়ের কড়ার করে দরকার মতো টাকা দিতে পারলে এক বন্ধে আট বিঘের একটা দাগ সতেরোশো টাকায় এসে যাবে। সঙ্গে সঙ্গে ভদ্রেশ্বরেরও কিছু আসবে।

'মেদনমল্লর জায়গা আপনি দখল নিন। যা টাকা ঢালবেন লোকজনে, চাষবাসে—তার চৌগুণ উঠে আসবে ফসলে। বুক ঠুকে নেমে পড়ুন।'

'জোর পাই না ভদ্রেশ্বর—'

'বুড়ো হয়ে গেলেন।'

'হইনি। হয়ে যাব বোধহয়।' এখানকার সমবয়সীরা কুবেরের সঙ্গে মেশে না। কুবেরও মিশতে পারে না। কান্তবাবুর মেজভাই গাঁয়ের ভেতরে থাকেন। তার বড়ো ছেলে শশীর কুড়িয়ে বাড়িয়ে সাতটি ছেলেমেয়ে। পঞ্চাশ বছর বয়স হয়েছে। সে-ও আজকাল কুবেরকে দাদা ডাকে। কুবের তাকে সাংসারিক পরামর্শ দেয়।

'হলধরের নাম শুনেছেন'?

'কোন হলধর'?

'মহাভারতের'—

কুবের ঠিক চিনতে পারল না। রামায়ণেও থাকতে পারে—মহাভারতেও থাকতে পারে। মুখে বলল, 'খুব চিনি। সে আর বলতে'—

'দেখুন সাধুখাঁমশাই—যুধিষ্ঠির ফৌত, অর্জুন ফৌত—সংসার করতে এসে সবাই কত দুঃখ পেলেন। যুদ্ধ কান্নাকাটিতে মহাভারতখানা গরম। দেখুন টিকে থাকলেন শুধু হলধর। তিনি চাষবাস করতেন। কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধও তাঁকে ছুঁতে পারেনি'।

'কী বলতে চাও ভদ্রেশ্বর'—

'আপনি দুর্গের দিঘি থেকে নদীর গা অবধি দখল নিন। চাষ করুন। ফসল ঘরে তুলে বলবেন—নাঃ! ভদ্রেশ্বর একটা বুদ্ধি দিয়েছিল বটে'।

'তাহলে চাষে নামব'?

‘নামুন। দ্বিধা করে কম্বল জড়িয়ে বসে থাকবেন না’।

বুলু রাখালের হাতে কফির পট ট্রেতে সাজিয়ে পাঠিয়ে দিয়ে নিজে আসছে।

বোরো চাষে কার সাধ্যি চাষ করে। সারাদেশ উদোম করে গোরু ছেড়ে দেবে সবাই। গোরু তাড়াবে, না চাষ করবে? একেবারে ন্যাংটা জায়গা। তাই কদমপুরে বোরো চাষে নামার ভরসা হয়নি কুবেরের। কিন্তু ভদ্রেশ্বরের কথায় মেদনমল্লর দ্বীপে হুড়হুড় করে গুচ্ছের টাকা ঢেলে বসল চাষবাসে। সেখানে গোরু সামলানোর ঝক্কি নেই।

'বড়োবিল' আর 'ডাহুক'—দু-দুটো লঞ্চ বোঝাই হয়ে বস্তা বস্তা সার, বীজধান—কয়েক টিন পাম্প চালানোর পেট্রোল আর পোকা মারার ওষুধ দ্বীপে চলে গেল। মোষের হাল দশটা। মাঠের পর মাঠ জমি ওলটপালট হয়ে যাচ্ছে। চুচকো ঘাস পাম্পের জলে মাটিতে মিশে সুন্দর পচানি হচ্ছে। মাটি দিয়ে গন্ধ উঠলেই কলা করা বীজধান ছড়িয়ে দেওয়া হবে। দুর্গের সামনে দাঁড়িয়ে সারাটা দিন কুবেরের তদারকিতে কেটে গেল। তারপর 'ডাহুক'-এ চড়ে কুবের সন্ধে সন্ধে কদমপুর পাড়ি দিল। ইদানীং কুসুম তার বড়ো আকর্ষণ। সৃষ্টিধর ব্যস্ত-সমস্ত কুবেরকে পায় না। বুলুর হাজারো কাজকর্ম। তাকেও কাছে পায় না ছেলেটা। তাই কখনো গোয়ালে—নয়তো পুকুর ধারে একখানা লাঠি হাতে অনাথ হয়ে ঘুরছে সবসময়।

এসবের মাঝখানে কুবেরের তাই ভীষণ ছন্নছাড়া লাগে। লোক নেই, জন নেই। পুঁচকে একটা সংসার ঘাড়ে নিয়ে ভীষণ হালকা মনে হয়। কোনো ভার নেই। দুশ্চিন্তা নেই। অথচ এই চাষবাস, জমিজায়গা, ঘর-বাড়ি, পুকুর-গাছগাছালি, গোয়াল-দোহাল, হাঁস, কুকুর, সৃষ্টিধর, বুলু, কুসুমকে নিয়ে—বাইরে থেকে দেখলে—তাকে ঘোর সংসারী বলে ভুল হবে। আরও, আরও করে আজ তিন-চার বছরে জমি-জিরেত বেড়েছে অনেক। ব্যাংকের নানান ঝকমারিও শিখে ফেলেছে। নিজের টাকা নিজে তুলবে—তাও অষ্টগণ্ডা সই চাই।

চাষের মরশুমের জন্যে ভাড়া করা লঞ্চ। 'ডাহুক'-এর সারেংঘর থেকে ভদ্রেশ্বর তরতর করে নেমে এল, 'সাধুখাঁমশাই, আপনি কালে কালে চকদার বনে যাবেন।'

কুবের না বুঝতে পেরে তাকিয়ে আছে দেখে ফিরে বলল, 'কিয়ৎকালের মধ্যে আপনার মতো চাষি এই ভূমণ্ডলে আর কেউ থাকবে না।'

ভদ্রেশ্বরের ভাব এলে ভাষা সাধু হয়ে যায়। বুঝিয়ে বলল, অনেক জায়গা নিয়ে চাষ-আবাদ করলে তাকে চকদার বলে। এতখানি জায়গা নিয়ে এই দক্ষিণ দেশে কেউ নাকি চাষবাস করেনি এর আগে। কথাটা শুনে কুবেরের বুক ফুলে ওঠার কথা। কিন্তু তা হল না। রোয়া বাকি। সার নিড়েন, জল দিতে হবে। ফসল না ওঠা অবধি কত বিপদ। মজুরদের গুড়লবাঁশে কয়েকটা বনমুরগি মারা পড়েছিল। তার ঝলসানো মাংস খেতে খেতে কুবের দেখল হ্যাজাক বাতির আলোয় ভদ্রেশ্বর প্রায় কষের দাঁত বের

করে বুড়ো মুরগিটার পোড়া দাবনা চিবোচ্ছে, চাটছে—বাগে আনতে পারছে না কিছুতেই।

চারদিকে কুয়াশা, লঞ্চের একঘেয়ে আওয়াজ, পেছনে মেদনমল্লর দুর্গ, দ্বীপ—দুই-ই পড়ে থাকল। কুবেরের খুব ইচ্ছে হল, দরজা জানালা আটকে দিয়ে সৃষ্টিধর, কুসুম, বুলুকে নিয়ে লেপ মুড়ি দিয়ে শুয়ে থাকে। কিন্তু কাল ভোরের আগে কদমপুর পৌঁছোনো যাবে না।

পরদিন খুব ভোরে 'ডাহুক' এসে লঞ্চঘাটায় নোঙর ফেলল। কুবের তখনও ঘুমে। ভদ্রেশ্বর ভোরের ট্রেন ধরে কদমপুর যাবে বলে কুবেরকে জাগাবার চেষ্টা করল। সুবিধে হল না। সারেংকে বলে নেমে গেল।

তার একটু পরেই কাউকে কিছু না বলে লঞ্চে যে উঠল, তাকে সারেং চেনে না। মাল্লারাও না। যে চেনে সে ঘুমোচ্ছিল।

ধাক্কা খেয়ে কুবের চোখ খুলল। প্রথম দমকে চিনতে পারেনি। সুরমার টান দেখে এক ঝলকে চেহারাটা ফুটে উঠল। 'তুমি?'

'আজ তোমার লঞ্চ ভিড়বে জানতাম। ভোরের ট্রেনেই চলে এসেছি। মোটে তো বিশ মিনিটের পথ—'

'তাই বলে একা? এই সকালে?'

'চলে যাব?'

'তাই বলেছি!' এর বেশি কিছু বলতে পারল না কুবের। কিছুকাল চাষবাসের নানান ভেজালে দিনগুলো হুহু করে কাবার হয়ে যাচ্ছিল। একটু নিশ্বাস ফেলার সময় নেই। তার মাঝখানে কুবের শুধু একজনের মুখ দেখতে পেয়েছে, সেই একজন শুধু একটা কথাই বলছে, 'কী হবে এসব দিয়ে আমাদের? তুমি এবারে থামো।' সেই একজনের নাম বুলু।

বেলা এগারোটা নাগাদ টাটকা মাছের ঝোল, নতুন চালের ভাত পেটে পড়তেই কুবের গরম হয়ে উঠল। পাটাতনে লেপের মধ্যে বসে সিগারেটে সুখটান দিতে দিতে আভাকে কাছে ডাকল। নদনদে কাদা ভেঙে দূরের চালানি নৌকোয় কুলিরা বরফের চাঙ্ তুলছে। মাছ আসবে বড়ো নদী থেকে। ক-দিন ধরে সব কিছু ফাঁকা লাগছিল। তার ভেতরে আভা এসে দাঁড়াতেই কী একটা ভর্তি হয়ে যাচ্ছে।

মাল্লাদের একজন বালতি বালতি জল তুলে দিচ্ছিল নদী থেকে। আভা নিজের বাড়ির উঠোনের মতো করে পাটাতন মুছে দিচ্ছিল। কেবিন বলতে বড়ো ঘরখানা এতদিন ভদ্রেশ্বরের দখলে ছিল প্রায়। কুবের ডাকতেই উঠে আসেনি আভা। সেই আভা—প্রথম কদমপুরে এসে যার পায়ে খড়ম দেখেছিল কুবের, গলায় ডুমো ডুমো কালো পাথরের মালা।

'ওদের দিয়ে পান আনিয়েছি। নাও ধরো।'

ভাত খাওয়ার পর পান, এই শীতে সঙ্গে সিগারেট। ফাইন। কুবের সারেংকে দুপুর দুপুর লঞ্চ ছাড়তে বলল।

‘কোনদিকে যাবেন?’

কুবের ফট করে কিছু বলতে পারল না। কোথায় যাবে, সে নিজেও জানে না। মুখে বলল, ‘ইঞ্জিন গরম হোক তো আগে—’

আভা বলল, ‘এই লঞ্চখানা তোমার?’

‘না। ভাড়া নিয়েছি। আরও একখানা আছে।’

‘কোথায়?’

‘আমার দ্বীপে—’

‘তোমার দ্বীপে?’

‘ওই হল। মেদনমল্লর দ্বীপে। চর বললে ছোটো করা হয়। কয়েক মাইল লম্বা হবে, চওড়া মাইল দুই। কেউ কোনোদিন যায়নি সেখানে—মানে ইদানীং বিশ-পঞ্চাশ বছরেও তো কেউ যায়নি—’

‘বুলু বলছিল তুমি সেখানে চাষ-আবাদে নেমেছ। জেএলআরও অফিস থেকে নিজের নামে খাজনা করে নেবে পরে—’

‘বুলুর সঙ্গে দেখা হল কবে?’

‘বাঃ! ও তো তোমার দাদার রেলেশ্বর শিব দেখতে প্রায়ই যায়।’

কুবের মাসখানেক বাড়ির কোনো খবরই রাখে না। রাখতে ইচ্ছে করে না। বাড়ি নাকি ওটা! তার চোখের সামনে হরিরাম সাধুখাঁর ভরভরাটি পরিবারের ছায়া সব কিছুকে ঢেকে আছে। ‘তুমি আর কদমপুরে থাকো না?’

‘কবে চলে গেছি! সেখানেই তো ছিলাম।’ থেমে গিয়ে ফিরে আভা বলল, ‘থাকা যায় না—’

কুবের চুপ করে থাকল। কেন থাকা যায় না? অসুবিধে কী? ব্রজ দত্ত কেমন আছে? তার ঠাকুরতলা বানানোর কদ্দুর? কোনো কিছুই জানতে চাইল না কুবের। এ ক-দিন তার মাথার মধ্যে শুধু ধানের ঢিবি পাহাড় হয়ে উঠছিল। ধান ফেলা প্রায় সারা। চারা হলে তুলে তুলে রুয়ে দেওয়া শুধু। তারপর একদিন পাকবে। আছড়াতে হবে। বস্তা বোঝাই হয়ে চরের ফসল লঞ্চঘাটার বাজারে আসবে শেষে।

আমি কুবের সাধুখাঁ। বয়স চল্লিশের দিকে যাচ্ছে। এই মাঝবয়সে আমার কেউ নেই।

‘জানো আভা, একদিন আমি তিরিশ টাকার একটা চাকরি পেয়ে খবরটা দিতে বাড়ি ফিরলাম। মা ঘুমোচ্ছিল। ঘুম ভেঙে মার কী কান্না! আনন্দাশ্রু! তখন আমি দোরে দোরে ঘুরি কাজের জন্যে! এখন!’

‘কিন্তু এতটা ঝুঁকি নিলে কেন কুবের। এদিকে ফসল সবাই ঘরে তুলতে পারে না। মুছে নিয়ে যায়।’ আরও অনেক চিন্তার কথা ছিল আভার মনে। কিন্তু কুবেরের মুখ দেখে বলতে পারল না। কথাগুলো

হল: কুবের, বাজারও তো পড়ে যেতে পারে। ডাকাতি হতে পারে। আর সবচেয়ে বড়ো কথা, এত সব দিয়ে কী হবে তোমার? পুরুষলোকের একটা জিনিস আভা কিছুতেই ধরতে পারে না। ব্রজর ভেতরেও এ-জিনিসটা দেখেছে। যখন আর দরকার নেই—তখনও ছুটছে। স্বস্তি কাকে বলে চেনে না, জানে না। রেলেশ্বর শিব প্রতিষ্ঠান নামে, ঠাকুরতলা বানানোর জন্যে কী না করে চলেছে। শেষকালে তাকেও প্রায় নিলামে তুলেছিল।

'আর তো কোনো ঝুঁকি নেই আভা। আমি তো জমির ব্যাবসা ছেড়ে দিয়েছি। এত সরল কারবার। খুব সরল। চাষ করো আর ফসল ঘরে তুলে নিয়ে যাও!'

'কত টাকা লাগিয়েছ চাষবাসে?'

'আমার সর্বস্ব। হাজার বিঘের ওপর চাষ'। তারপর কী মনে হতে দূরে বসা আভাকে একরকম হাত ধরে কাছে টেনে নিয়ে এল এক ঝটকায়।

অরক্ষিত মেয়েমানুষ সবসময় যে কোনো পুরুষেরই প্রিয় জিনিস।

ইঞ্জিন গরম হয়েছে অনেকক্ষণ। 'ডাহুক' এখন বটবট করে সামনের খুদে চরটা বাঁয়ে ফেলে বড়ো নদীর দিকে এগোচ্ছে।

আর কোনো আড়াল থাকল না।

আভা কুবেরের গায়ে ঠেসান দিয়ে এক-একটা নদী দেখায়—আর কুবের তার নাম বলে। প্রায় খুকিটি সেজে আভা একেবারে কলকল করে কথা বলে গেল অনেকক্ষণ। এতখানি নিশ্চিন্তের স্বাদ কতকাল পায়নি। তখনও এক-একবার তার মাথার ভেতরে ড্রিলিংয়ের লোহার চেন কড়-কড়-কড়-কড় আওয়াজ তুলে গভীরে নেমে যাচ্ছিল। আর বিটকেল দেখতে একটা বন্দুক হাতে সাহেব মিত্তির তারই বুক লক্ষ করে এক চোখ বুজে টিপ নিচ্ছিল।

'কী করে এলে এখানে?'

'পরে বলব'খন। সে অনেক কথা।'

কুবেরেরও খুব জানার ইচ্ছে ছিল না।

সারেং এসে বলল, 'পূর্ণিমে সাহেব। একটানা চালালে মাঝরাতেই দ্বীপে পৌঁছে যাব।' কুবের মাথা নেড়ে সায় দিতে লোকটা চলে গেল। পয়সা হওয়ায় ভদ্রেশ্বর এদানী তাকে সাধুখাঁমশাই বলে ডাকে।

'পূর্ণ চাঁদের মায়ায়'—বামুন কায়েত বাড়ি অনেক মেয়ে হারমোনিয়ম খুলে বসে এসব গান গায়। নদীনালার পথে রাতবিরেতে পূর্ণিমা যে কী জিনিস, তা একবার দেখলে ওসব গান গাইত না। একবার দ্বীপ থেকে ফেরার পথে কুবের আর ভদ্রেশ্বর পূর্ণিমার মধ্যে পড়েছিল। গা ছমছম করে। চরের গাছপালা তখন ফটফটে জ্যোৎস্নায় ডালপালা মেলে দিয়ে জেগে ওঠে। একটু হাওয়া পেলে তো কথাই নেই। সরসর আওয়াজ লেগেই থাকে।

পূর্ণিমার নাম শুনে আভা অনেকদিন পরে কুমারী হয়ে গেল একেবারে। লঞ্চঘাট থেকে এই মেয়েলোকটি আজ সকালে যখন একটা বোঁচকা হাতে নিঃশব্দে 'ডাহুক'-এ উঠে এসেছিল—তখন কে জানত এত জিনিস তার সঙ্গে ছিল!

সূর্য ঢলে পড়তে 'ডাহুক' তিন-তিনটে নদী কেটে বেরিয়ে গেল। আভা কুবেরের সামনেই মাথার খোঁপা ভেঙে বিনুনি বাঁধতে বসল—একদম পা ছড়িয়ে। কতকাল এমন মেয়েলোক দেখেনি কুবের।

আভা দাঁতে বিনুনি কামড়ে চাপা গলায় বোঁচকা থেকে ব্লাউজ বের করে দিতে বলল।

কুবের বেছে বেছে যেটা বের করে দিল, আভা দেখে নাক কুঁচকে আপত্তি করল।

'কেন? পরো না।'

'কত পুরোনো। ছিঁড়ে গেছে জায়গায় জায়গায়—'

'ওতেই হবে।'

'বলছ!'

কুবের মাথা নাড়ল। সে এই জামাটা চেনে। কতকাল আগে—সেই প্রায় সত্যযুগে আভা এই লেস-লাগানো ব্লাউজ গায়ে খালপাড়ে মাছ কিনতে গিয়েছিল চাঁদের আলোয়। এখন সে জায়গার নাম কুবের রোড।

ব্লাউজটার বোতাম পেছনে। কুবের আটকে দিল। থ্যাঁতলানো বেণিটা পিঠে পড়ে আছে। মাথা, ছোটো মতো চিবুক। কুবের আলগোছে হাত রাখল পিঠে।

চিরুনির মাথা দিয়ে সিঁথিতে সিঁদুর ঘষে আভা ঘুরে বসল। 'এইবার বলো কেমন দেখাচ্ছে। তোমার বউর চেয়ে ভালো?'

'ও কথা বললে কেন? বুলু আমার ছেলেমেয়ের মা। তাকে আমি সবসময় ভালোবাসি।'

'বারণ করেছে কে? যত ইচ্ছে ভালোবাস।' একটু থামল আভা, 'তার কতখানি জানো তুমি? তুমি তো জায়গাজমি চাষবাস নিয়ে মজে আছ।'

'তোমারই বা কতটুকু জানি আভা!'

'যা জেনেছ বেশ জেনেছ। নাও সরে বোসো—,' আভা বেশ লেপটে তোশকের ওপর বসে পড়ল। খানিক আগেও চাঁদের একখানা ছাপ আবছা হয়ে আকাশে লটকে ছিল। এখন তার ভেতর দিয়ে আলো গলে পড়ছে। সারেং জানে পূর্ণিমার রাতে সাধুখাঁ সাহেব লঞ্চের হেডলাইট জ্বালানো পছন্দ করেন না। আভার মনে হল, লঞ্চটা কোনোদিকে না তাকিয়ে নদী দিয়ে, খাল দিয়ে শুধু চাঁদের দিকেই ছুটছে।

কুবেরের নেড়া মাথায় ভেলভেটের চেয়েও পুরু হয়ে চুল উঠেছে। তাকে কেমন দেখতে সে নিজে

জানে না। অন্তত বছর তিন-চার এসব নিয়ে ভাবার ফুরসত হয়নি তার। তাকিয়ায় ঠেস দিয়ে কাত হয়ে বসেছিল। আভা আচমকা ঘুরে বসে শব্দ করে একটা চুমো খেল তার ঠোঁটে।

‘এসব কী হচ্ছে?’

‘কথা ছিল না। তাই না?’

কুবের সোজা হয়ে বসে বলল, ‘ওই দেখো—হাত তিরিশেক হবে না এখান থেকে—ওই ধবধবে জ্যোৎস্না-মাখানো জঙ্গলে বাঘ আসে—’

‘সত্যি!’

‘লঞ্চ ভিড়াতে বলব? নেমে আলাপ করে আসবে—’

‘দোহাই তোমার। অনেক গুণ আছে তোমার। ওসব আর দেখাতে হবে না।’

কুবেরের গা ঘেঁষে বসতেই একবার ইচ্ছে করল জাপটে কাছে টেনে নেয়। কিন্তু কী মনে হতে বুঝল, এসব করে লাভ কী! হয় কী তাতে? শীতকালে জড়াজড়ি মন্দ জিনিস না। কিন্তু তারপর সব তো সেই একই ব্যাপার।

নদীটা ছোটো ছিল। দু-ধানের জঙ্গল পরিষ্কার দেখা যায়।

এসব দেখে দেখে কুবেরের চোখ পচে গেছে। আভা কিন্তু গিলছিল। বুলু আর কুবেরের মাঝখানে এখন কয়েকটা নদী, কয়েক মাইল মাঠ, গোটা কয়েক স্টেশন চাঁদের মায়ার মধ্যে পড়ে লুটোপুটি খাচ্ছে। মা আর তার মধ্যে যে এখন কত যোজন যোজন মাঠ, বিল, নদীনালা পড়ে আছে কে বলতে পারে। এখন সে চকদার কুবের সাধুখাঁ। মুশকিল! এত সব খাবে কে? লোক কোথায়!

তবু আজও কুবেরের ইচ্ছে হচ্ছিল, জগৎ জুড়ে যদি আবাদ করা যেত। এক-একটা মাঠ কী বিরাট! কার কতখানি, আগে আগে ভাগ করা আছে। কুবের সব এক করে নিয়ে চষে ফেলতে চায়। তারপর ধান ছড়িয়ে দেবে। চারা বেরোবে। তখন বীজ ভেঙে রুয়ে দেবে শুধু।

টাটকা মাছ যেভাবেই রান্না হোক খুব স্বাদু। কুবের আভাকে কিছুতেই চাঁদের আলোয় খেতে বসতে দিল না।

রাগে রাগে কেবিনে গিয়ে খেতে বসল আভা। ‘কী হয় জ্যোৎস্নায় খেতে বসলে?’

‘ভূতে ধরে।’

‘তুমি যে বসে আছ দিব্যি। নিজের ছায়ার মধ্যে বসে খাচ্ছ?’

‘আমার ভূত-ভবিষ্যৎ কিচ্ছু নেই। আমি আগে ছিলাম লাভ-মেশিন, এখন মানি-মেশিন—আই মিন্ট মানি—’

জ্যোৎস্নার নিরালায় যেসব হাওয়া উঠে গাছপালা, নদীর জল সবই কিছুটা নেড়ে দিয়ে যায়—তারই

খানিকটা উঠল। যথারীতি গাছপালাও হাওয়ায় ঢলে পড়ে সায় দিল। সরসর আওয়াজ। সঙ্গে লঞ্চের একটানা বটবট। আভা কিছুই শুনতে পেল না, 'কী বলছ?'

'ও তুমি বুঝবে না—'

'তোমরা সব পুরুষই ওই এক কথা শিখেছ।'

'খেয়ে নাও।'

'নুন কোথায় তোমার?'

কুবের এগিয়ে দিল।

'আমি কিন্তু খেয়ে-দেয়ে আবার পাটাতনে গিয়ে বসব।'

'যত ইচ্ছে বোসো। আমি গিয়ে ঘুমোব।'

কুবের জিভে কামড় খেল। খেতে খেতে কথা বললে এই দশা।

'বুলু বোধহয় তোমার কথা বলছে এখন। দূরের মানুষ মনে করলে অমন হয়।'

কুবের খাওয়া থামিয়ে সোজা আভার দিকে তাকাল, 'আর কী কী জানো তুমি?'

আভা একটুও অপ্রতিভ হল না। সোজাসুজি বলল, 'আসলে আমি দেশগাঁয়ের মেয়ে। কিছুকাল শহর ঘেঁষে আছি। তখনই তোমার দাদার সঙ্গে বিয়ে। তেল পড়লে টাকা আসে, পা চুলকোলে ভ্রমণ লেখা আছে কপালে—এসব ছোটোবেলা থেকেই শিখেছি কুবের।' দম নিয়ে বলল, 'বুলুর কথা বললেই অমন গম্ভীর হয়ে চোখ গোল করো কেন? আমি তোমার বিয়ে করা বউ নই—সে আমি জানি।'

এখন আভা ঠোঁট ফুলিয়ে কাঁদতে পারলে সিনটা কমপ্লিট হত। কিন্তু জ্যোৎস্নার আলোয় বিদেশি জায়গার ভেতর দিয়ে লঞ্চটা যাদের পাটাতনে বসিয়ে নিয়ে যাচ্ছিল—তাদের কেউই আনকোরা নয়। অনেকদিন আগে থেকেই এরা শোলার মালা হয়ে জলে ভাসছে। ভাসানের দিনক্ষণ কারোরই মনে নেই।

কুবের আবার জানতে চাইল, 'আর কী কী জানো তুমি?'

'তুমি একটি পয়লা নম্বরের ভীরু। ষোলো আনা ইচ্ছে থাকলেও ক্ষমতা নেই বলে তাই—'

'তাই কী আভা—থামলে কেন? বলে যাও।'

'খেয়ে উঠে বাকিটা বলব।' খাওয়া আর হল না আভার। তোলা জলে আঁচিয়ে নিয়ে লঞ্চের সরু মাথায় ইস্পাতমোড়া নোঙর বাঁধার জায়গায় গিয়ে আভা ধপ করে বসে পড়ল।

কুবের ঘাঁটাল না। ড্রিম মারচেন্ট সাধুখাঁ সাহেব এখন কুবের চকদার। ভীতু লোক স্বপ্ন দেখে না। খুব জোর হিস্টিরিয়ায় ভুগতে পারে। ভীতু লোক চাষবাসে নামে না। এত বড়ো বদনাম দিয়ে দিল আভা।

‘বুলুর কী জানো তুমি?’

‘কী জানি না কুবের? আমায় ঘাঁটিয়ো না—’ ধমকে উঠল আভা। এতক্ষণে এই রগচটা ভঙ্গিটা কুবেরকে আকর্ষণ করল। আন্দাজ নিচ্ছিল, ওখান থেকে পাঁজাকোলে তুলে কেবিন পৌঁছোতে ক-সেকেন্ড লাগবে। কিন্তু একটা জিনিস সে কিছুতেই সুবিধে করে উঠতে পারে না কোনোকালে। কথায় বলে মেয়েমানুষের মন। সে জানে না, এখন আভা কতখানি মেজাজে আছে। দিব্যি ঠান্ডায় পোজ দিয়ে বসেছে লঞ্চের ডগায়। হালে মেয়েমানুষ নিয়ে নাড়াচাড়া করা একরকম ভুলে গেছে। ভুলভাল হয়ে যায়।

সারেং মেদনমল্ল দ্বীপের তীর ঘেঁষে লঞ্চ নোঙর করল। তবু ডাঙা থেকে বেশ দূরে। বলা যায় না, এই নিশুতি রাতে বেপট জায়গায় কোনো কিছু ডেকে উঠে আসে যদি।

বোরো চাষের কামলারা ছোটো ছোটো কুজির ভেতর এখন অঘোরে ঘুমোচ্ছে। জঙ্গল হাসিল বুনো গাছের ডালপালা জড়ো করে কারা আগুন দিয়েছিল। তার নিবু আগুনে মেদনমল্লর পোড়ো দুর্গটা ঠায় দাঁড়ানো। কেবিনে ঘুমন্ত কুবের এক ঝটকায় জেগে গেল। ক্লা ক্লা শব্দ তুলে একটা মাছখেগো পাখি এই ঝকঝকে জ্যোৎস্নায় বেরিয়ে পড়েছে। বুঝতে পারেনি, রাত শেষ হয়নি। অন্ধকার ঘরে কুবেরের খুব ভয় ধরে গেল। আনপড় মেয়েমানুষটা জ্যোৎস্নার ঘোরে পাটাতন থেকে পড়ে যায়নি তো! শীত চলে গিয়ে হপ্তাখানেক খুব হাওয়া দিচ্ছে। কপালে লেগে হাওয়াতেই প্রায় নেশা ধরে যাওয়ার জোগাড় হয় এক-একসময়।

ভয়ে ভয়ে বেরিয়ে এসে ডেকে দাঁড়াল। দ্বীপের দক্ষিণ দিকে 'বড়োবিল' নোঙর করে পড়ে আছে। 'ডাহুকের' সামনেই চাঁদ আকাশের কোণ বেছে নিয়ে ঝুলে পড়েছে। লঞ্চের ডগায় খানিক অন্ধকার স্তূপ হয়ে আছে। কুবের এগিয়ে গেল। তারপর সাবধানে পাঁজাকোলে তুলে ফেলল।

কেবিনে ঢোকার মুখে আভার ঘুম ভেঙে গেল, 'আমি কোথায়? তুলে আনলে কেন?'

'না আনলে ঢুলতে ঢুলতে জলে পড়ে যেতে কোন সময়!'

'গেলে যেতাম!' তারপর বিছানায় বসে বলল, 'দু-বার ঘুরে গেলাম—তুমি ভোঁসভোঁস করে ঘুমোচ্ছিলে। জাগাইনি আর। লঞ্চের গলুইতে বসে মনে হচ্ছিল—আমি বুঝি সবার আগে, তোমাকেও পেছনে ফেলে নদীর পর নদী পার হয়ে যাচ্ছি।'

কুবের গায়ে কাঁথা টেনে দিল, 'পা ঢেকে বোসো।' কী মনে হতে বলল, 'গলুই কখনো আগে যেতে পারে আভা? নৌকো, লঞ্চ—কাঠকুটো, হাল, পাল, মাস্তুল সবই একদিন হারায়—ধসে যায়, পড়ে যায়, ডুবে যায়—পড়ে থাকে শুধু গলুই।'

'কীরকম?'

'ঝড়ঝাপটার কথা ভেবে মিস্ত্রিরা এই জায়গাটুকু লোহা দিয়ে মুড়ে দেয় একেবারে। বছর বছর রং হয়। আমাদের ওখানে পুকুর কাটতে গিয়ে সাত হাত মাটির নীচে মাছ আঁকা রুপোর পাতে মোড়া একখানা গলুই উঠেছিল। আগে নদী ছিল ওখানে। দেড় দু-শো বছর আগে কারো নৌকাডুবি হয়েছিল। সব ধুয়ে মুছে গিয়ে গলুইটা পড়েছিল—'

'ওটা কী কুবের?' বলতে বলতে কুবেরের বুকের মধ্যে চলে এল। কুবের চমকে গিয়ে পেছনে

তাকাল, ‘কই? কোথায়?’

‘ওই যে—’

‘ওটা তো মেদনমল্লর দুর্গ। পেল্লায় দিঘি আছে সামনে। দামে ঢাকা বলে এমন জ্যোৎস্নাতেও রং ফোটেনি। নইলে—’

‘চিকচিক করত?’

কুবের নিজেকে সামলাতে পারল না। এমন পোড় খাওয়া মেয়েমানুষটা কী করে জলের সামনে, আলোর সামনে খুকিটি হয়ে যায়। আর পাঁচজন পুরুষে যা করে, কুবের তাই করল। আলিঙ্গন ওরফে জাপটানো, তারপর বিছানায়। প্রথম রাতটা ঘুমিয়ে কুবেরের নাক মুখ চোখে নেশাভাঙা একটা আরাম লেগেই ছিল। ভোররাতেই ফুরফুরে হাওয়ায় সব কিছু সহজ হয়ে গেল তার কাছে। আভা আজ আর বলল না, ‘শেষে এ তুমি কী করলে—’

বরং আভা ফরফর করে ধরে উঠল, ‘নইলে চিকচিক করত? নদীর মতন? দিঘির সামনেই দুর্গ?’

‘ভোর হলে দেখতে পাবে—’

‘আমায় যেতে দেবে ওখানে? দিঘির সামনে? নেমে দেখব?’

‘এত ভয় করো আমায়?’

‘তোমার দাদা নিজে কোনোদিন কিছু দেখায়নি। শুধু বলত, বিকেলের আকাশে তাকিয়ে দেখো—যা ভাববে, তেমন ছবি হয়ে মেঘ ভাসছে। বলো কুবের, রোজ আকাশ দেখা যায়? শেষে আমায় সাহেব মিত্তিরের সঙ্গে জুতে দিয়েছিল। লোকটা আমার গন্ধে গন্ধে ফিরত।’

‘বলো, ভালো লাগত। লুকোচ্ছ কেন!’

‘না কুবের—আমি কিছু লুকোব না। আমার যা বয়স তাতে কোনো কিছু আর লুকোনোর মানে হয় না। আমার বিচ্ছিরি লাগত। আমায় নিয়ে শ্যাল-কুকুরের মতো টানাটানি লেগে গেল একদিন। আমিও একটা মানুষ—আমারও ঘোর লাগত, নেশা ধরে যেত এসব দেখে, কিন্তু কুবের—’

‘থামলে কেন?’

‘শুধু আমার জন্যে কেউ বসে আছে—এটা ভাবলেই ঘোর লেগে যেত। হাজার হোক আমি মেয়েমানুষ।’

চাঁদ যাওয়ার আগে খুব আলো দিচ্ছিল। কুজি থেকে লোকজন বেরিয়ে পড়েছে। মাল্লাদের একজন চা নিয়ে এল। লেপে পা ঢেকে গরম চা মুখে দিতেই কুবেরের পরিষ্কার মনে হয়, আভার সঙ্গে তার পরিচয় অনেকদিনের, মানুষটা বড়ো আপন তার।

রোদ বেরোতেই ‘ডাহুক’ থেকে কাঠের পাতলা স্লিপার ফেলে দিল পাড়ে। তার ওপর দুলতে দুলতে

টাল সামলে কুবের আর আভা মাটিতে গিয়ে পৌঁছোল। সামনেই মেদনমল্লর দুর্গ। আভা মাটিতে আটকে গেল। এতবড়ো একটা জিনিস এই নদীপথে কতকাল দাঁড়িয়ে আছে। তারপর কুবেরকে পেছনে ফেলে ছুটে গেল। সেই দিঘি, পরির সারি, দামভরা পুরু আস্তরণের ওপর পাখিরা বসে। আভাকে দেখে তারা একটুও নড়ল না।

কুবের পেছনে পড়ে গিয়েছিল। চত্বরে এসে দাঁড়াতে আভা বলল, 'এত পরিষ্কার—কাল বিকেলেও এখানে লোক ছিল মনে হয়।'

কথাটা কুবেরের কানে গেল না। নদী থেকে পাইপ বসিয়ে দশ ঘোড়ার পাম্পের সঙ্গে লাগানো হয়েছে। চার ইঞ্চি মোটা নল দিয়ে জল এসে পড়বে মাটিতে। ভিনদেশি কামলারা হালে মোষ জুতে ফেলেছে। জমি তৈরি হচ্ছে। আবাদ হবে।

মাথার ওপর বিনবিন আওয়াজ শুনে ওপরে তাকাল কুবের। তার সঙ্গে সঙ্গে আভাও তাকাল। উঁচু খিলান থেকে একটা বুনো গাছের শেকড় ঝুলে পড়েছে। তার আষ্টেপৃষ্ঠে বড়ো সাইজের একটা মৌচাক ঝুলে আছে। খানিক জায়গা তার পোড়া পোড়া। চাকের চারপাশে মৌমাছিরা দল বেঁধে পাক খাচ্ছে।

'কাল পূর্ণিমা ছিল। কামলারা হয়ত আগুন দিয়ে মধু বের করে নিয়েছে—'

'বারণ করোনি কেন কুবের? মৌচাক সুলক্ষণ। ভরভরাটি করে তোলে সবকিছু।'

এখনও সংসারের নেশা লেগে আছে মেয়েটার চোখে। কুবের পরিষ্কার কিছু বলল না। শুকবো চাকের চারদিকে মাছিগুলো ঘুরে মরছে। কুবের আভাকে সেখানে দাঁড়াতে দিল না, মিথ্যে মিথ্যে বলল, 'মধু নেই—এখন দেউলে মাছিগুলো যাকে পাবে কামড়াবে—চলে এসো।'

ক্যাম্প-খাটানো তাঁবুর ঘরে ঢোকার আগে আভাকে সামলানো দায় হল। ফাঁকা বিরাট চত্বর থেকে নড়তে চায় না। দুর্গের সামনের দিঘির দিকে তাকিয়ে চুপ করে বসে থাকল। বোধ হয় কুবেরকে লুকিয়ে দু-বার চোখ মুছল। কুবের যতবার উঠে আসতে বলে ততবারই আস্তে আস্তে বলে, 'এমন জায়গাও ছিল কুবের! এমন জায়গাও আছে—'

জায়গার কথা শুনতেই কুবের খচ করে স্টার্ট নিল। 'জানো আভা, পৃথিবীটা জায়গায় জায়গায় ভর্তি। তুমি যত চাইতে পারো তার চেয়েও বেশি জায়গা আছে—'

আভা চত্বরে দাঁড়ানো কুবের সাধুখাঁর মুখের দিকে তাকাল। চোখ লাল হয়ে উঠেছে। চুল উড়ো-উড়ো। মুখটা ফুলে উঠছে। এ কার কাছে সে বসে আছে? মুখে বলল, 'আমাদের পোড়াতে কতটুকু জায়গা লাগে কুবের?'

কুবের তার নিজের কথার তোড়ে বলতে যাচ্ছিল, 'জায়গা থাকলে কী হবে? আসল হল দখলে রাখা।'

আভার কথায় ঘাবড়ে গেল। প্রথমে কোনো জবাবই দিতে পারল না। শেষে বলল, ‘ভোরবেলা কীসব আজেবাজে বকছ। তাঁবুতে যাবে তো চলো—’

‘তুমি এগোও। যাচ্ছি। আরেকটু দেখে যাই—’

দুপুরের মধ্যে সারা তল্লাট জমজমাট হয়ে উঠল। সত্তর-আশিজন কামলা চুচকো ঘাস তুলে তুলে পাহাড় করে ফেলল। জমির মধ্যেই তা আস্তে আস্তে পচে সার হয়ে যাবে। দুটো পাম্প মেশিন নদীর অফুরন্ত জল তুলে জমির উপর উগরে দিচ্ছে। খাঁড়িতে কারা লাফা বসিয়েছিল। তাতে হরেক মাছ ধরা পড়েছে। কুবের কিছুটা নজর পেল।

ভাত খেয়ে উঠে আভা হরীতকীতলায় গিয়ে পাখিদের ঠোকরানো একটা হরীতকী পেল। ধুয়ে মুখে দিতেই মুখের ভেতরটা আজব কষে খুব সুস্বাদু লাগতে লাগল। চারদিক খোলা, জোয়ারের জল মাটির ওপর অনেকটা উঠে এসেছে, কুবের রোদে পিঠ দিয়ে একমনে মৌজা ম্যাপ দেখছিল।

‘চলো কোথাও ঘুরে আসি—বেশ অজানা জায়গা দিয়ে—যে পথে কেউ কোনোদিন যায়নি।’

কুবেরের ওঠার ইচ্ছে ছিল না। জেএলআরও অফিসে মেদনমল্ল দ্বীপের একটা সরকারি বিলিব্যবস্থার চিঠি আদায় করতে কুবেরের কম ঘোরাঘুরি করতে হচ্ছে না। কাগজপত্র নিয়ে বসেছিল। এতবড়ো জায়গা কম্পাউন্ডওয়াল দেওয়ার কথাও ওঠে না। কিন্তু একখানা সরকারি কাগজ হাতে থাকা দরকার। মালিকানার একটুখানি চিহ্ন অন্তত।

‘তুমি ঘুরে এসো। দুর্গের ভেতরটা ঘুরে ঘুরে দেখতে পার—’

‘একা আমার ভয় করে। হঠাৎ যদি ভয়ংকর চেনা বলে ঠেকে যায়!’

কথাটায় কুবেরের ভেতর-অবদি একেবারে গুড়গুড় করে ডেকে উঠল। অবাক হল। আভা জানল কী করে? এইসব জেনে ফেলে বলে পরের বউ হলেও আভা ফট করে তার নিজের মেয়েমানুষ হয়ে গেছে।

কুবের প্রথমে উঠল না। উঠতে পারল না। মৌজা ম্যাপের ভেতর দিয়ে নদীর দিকচিহ্ন ধরে ধরে তার চোখ এই মেদনমল্ল দ্বীপ খুঁজে ফিরছিল। কোমরের নীচে, পেছনে হাড়ের ভেতর আজকাল ওঠা-বসার সময় মড়মড় করে আওয়াজ হয়। গালে, কপালে কালো কালো ছোপ ছড়িয়ে পড়েছে। ভদ্রেশ্বর বলে, ‘ওসব কিছু নয় সাধুখাঁমশাই। নোনা মাটির দাগ বসে যাচ্ছে গায়ে-গতরে। পয়সা হলে কিছু খেসারত মা লক্ষ্মী নেবেনই।’

কুবেরও নিজেকে বোঝাতে চেয়েছে—আমার গায়ে কোথায় কীসের দাগ-দাগালি হল, তা নিয়ে আর মাথা ঘামানোর বয়স নেই। আমার তো আর ফিরে বিয়ে হচ্ছে না। পুরুষমানুষের ওতে কী আসে যায়। তাছাড়া এই দেহটা এখন তো পাবলিকের। গালাগালি, হিংসে, শীত-গ্রীষ্ম—সবই এর ওপর দিয়ে এতদিন বয়ে গেছে—আরও যাবে।

হঠাৎ তার নিজের নাম অনেক উঁচু থেকে ভেসে আসছে শুনতে পেয়ে কুবের উঠে দাঁড়াল।

আভা দুর্গের চওড়া দেওয়াল ধরে অনেক উঁচুতে উঠেছে। সেখান থেকে নামতে পারছে না। হাওয়ায় শাড়ির আঁচল পতপত করে অনেকখানি উড়ছে। একটা দৃশ্য বটে। কুবের স্পষ্ট দেখল, দিঘির ধারের একটা পরি প্রাণ পেয়ে উঁচুতে উঠেছে।

এইসব ছেলেমানুষি আজকাল একদম বরদাস্ত হয় না কুবেরের। কীসব ছেলেমানুষি!

'নেমে এসো।'

'ভয় করছে।'

'খুব পারবে।'

'একা ভয় করছে। তুমি এসো—'

কুবের টের পেল, এখন আভা পড়ে গেলে তার খুব কিছু যাবে আসবে না। আভা যে ভোররাতে 'ডাহুকে' উঠে এসেছে—সেকথা কেউ জানে না। এত বড়ো দ্বীপের যে কোনো জায়গায় মাটি চাপা দিলেও কেউ জানতে পারবে না। শুধু কুবেরের কদমপুরে গিয়ে চুপ মেরে থাকতে হবে।

দুর্গের ভেতরে ঢুকে কুবের অনেক কষ্টে আভাকে নামাল। নেমে ফেরার পথে সেই খিলানের ভাঙাপথ, শূন্য বাগান, দিঘির দাম ফুঁড়ে সিঁড়ির ধাপ নেমে গেছে। সেই প্রাচীন শূন্যতার মধ্যে কুবের আভাকে প্রাণভরে একটা চুমো খেল, 'বাঃ! বেশ মিষ্টি গন্ধ তো।'

'হরীতকী খেয়েছিলাম একটু আগে—তোমার দ্বীপের গাছের—'

'গরম জামা আনোনি কেন?'

কুবেরের কোলের মধ্যে ঝুলন্ত অবস্থায় আঁটোসাঁটো গড়নের মেয়েমানুষটি খুব রস করে বলল, 'নাগো। এইতো বেশ নরমে-গরমে আছি—'

কুবের ধপ করে নামিয়ে দিল। দক্ষিণ থেকে হাওয়া উঠে এই ফাঁকা ভাঙাগাঁথুনির বিশাল কাঠামোর মধ্যে পড়ে লতাপাতা, গাছগাছালির কচি ডাল ধরে সরসর করে বয়ে গেল। তখন কুবের ভীষণ জোরে আভাকে আগের চেয়েও শক্ত করে জড়িয়ে ধরল। বুকের মধ্যে যত দূর পারে ঠেসে ধরে কুবের বলল, 'বিশ্বাস করো—এসব জায়গা আমার ভীষণ চেনা আভা। আমি বোধহয় এখানে ছিলাম কোনোদিন। আমি সব বুঝতে পারি—'

'উঃ লাগে না? ছাড়ো বলছি।

আভার কুঁচকে ওঠা নাক মুখ চোখ দেখে ঠিক এই সময়ে কুবের একেবারে সিধে তার নিজের নাকের ওপর একটা ধাক্কা খেল। কী বিশ্রী দেখতে হয়ে গিয়েছিল আভার মুখ।

নিমেষে দুজনের কাটান-ছাড়ান হয়ে গেল। বাইরে দিঘির ধার দিয়ে আভা তাঁবুতে চলে গেল, একা

একা কুবের সিঁড়ির ধাপে বসে পড়ল। তার ঘাড়ে গলায় এখন অনেক মাংস। চোত-বোশেখে গিলে করা আদ্দির পাঞ্জাবি চড়িয়ে এখনও সে সন্ধের ফুরফুরে হাওয়ায় কলকাতার রাস্তায় ঘুরতে পারে, প্রেম করতে পারে, এসব ভালোভাবে করার রেস্তও তার হয়েছে। অথচ কীসের মায়ায় জমিজায়গা চাষ-আবাদের পিছনে ছুটোছুটি করছে নাগাড়ে কয়েক বছর।

হাল থেকে ছাড়া পেয়ে গোটা চারেক মোষ দিঘির ধারে নেমে এসেছে। এত ঘাস, এত পাতা এর আগে পায়নি বোধহয়। দূরে জেলেদের নৌকো ভিড়ছে। এবারে বড়ো বড়ো ছুরি দিয়ে কিম্ভূত সব সামুদ্রিক মাছের গা চিরে চিরে রোদে শুকোনোর জন্যে টানিয়ে রেখে যাবে। এদেরই দেখতে পেয়ে কুবের প্রথমদিন দুর্গের মাথার ওপর দাঁড়িয়ে চটে উঠেছিল।

পাখিরা আর ক-দিন পরেই উড়ে যাবে। কিছু চলে গেছে। তাদের ভাঙা বাসায় নতুন নতুন পাখি এসে বসছে। এরা ওপর দিয়ে যাবার সময় কোথাকার কী জিনিস—ঠিক ঠিক বুঝতে পারে, চিনতে পারে।

পৃথিবীর এক জায়গায় শহর, এক জায়গায় কারখানা, খানিক জুড়ে নদী, গাছপালা, জঙ্গল। আমরা যে কোনো একটার ভেতরে বসে থাকি বলে অন্যগুলো ঠিক ঠিক চিনতে পারি না। ভদ্রেশ্বরের ফেলে যাওয়া সিগারেটের একটা ফাঁকা প্যাকেট মেদনমল্লর চত্বরে পড়ে আছে। এমন জায়গায় এ জিনিসটা একদম মেলে না। বুড়ো দিনের বেলায় দিঘির ধারেই কাটাত। রোজ পাখির মাংস না হলে চলত না।

কামলাদের ঠিকেদার বলে গেল, নতুন ধাবের খানিক বীজ ফেলা বাকি ছিল। ভালো অঙ্কুর বেরিয়েছে। এবারে ভিজে ধান বস্তা বোঝাই দিয়ে মুখবন্ধ হাঁড়ির ভেতরে রাখা ছিল চারদিন। রাতে শিশির, দিনে রোদ খাইয়ে সুন্দর কলা বেরিয়েছে। কুবের তার সঙ্গে সঙ্গে গেল।

বিঘে দেড়েক জায়গা জুড়ে পচা গোবর, নানান সার ফেলে মাটির হরেক কারকিত করা হয়েছে। চারদিকে জল বের করার নালা। একজন সমান তালে ধান ফেলতে লাগল। হাতের মুঠোর ভেতর থেকে ছররা হয়ে ধান ছিটিয়ে বেরিয়ে আসছে—আর নরম কাদায় পড়ে গেঁথে যাচ্ছে। লোকটার পেছন দিয়ে শুধু চষা মাটির মাঠ—যতদূর দেখা যায়—শুধু তাই—তার পরেই জল, নদী—দূরে দূরে আর অন্য কোনো দ্বীপের জঙ্গল, গাছপালা।

আভা অনেকক্ষণ কুবেরের পেছনে এসে দাঁড়িয়েছে। গায়ে সস্তার একটা আধা-গরম কাপড়ের ব্লাউজ। কাঁধে চাদরের মতো একটুখানি মোটা কাপড় পড়ে আছে।

‘এসব, ধান হবে একদিন?’

‘রীতিমতো ধান। একটা চারা থেকে দশ বারোটা বিয়েন বেরোবে আভা—’

‘বুলু জানে এসব?’

‘কানে নেয়নি কোনোদিন। ও বলে, এসব নাকি আমার নেশা।’

‘মেয়েটা কিন্তু ভালো।’

‘তা আমার চেয়ে আর কে বেশি জানে।’

‘আমিই জানি! তুমি তার কতটুকু বোঝো?’

কথায় কথা যে কোন দিকে যাবে, তা বলা যায় না। আভা সাবধান হয়ে গেল। কারখানা গাঁয়ে তেল খোঁজার আড্ডায় বুলুকে দেখে আভা প্রথমদিন চমকে উঠেছিল। রেলেশ্বর শিবের কাছে মানত করতে এসেছিল বুলু। রেলেশ্বর শিব নাকি ভয়ংকর রকমের জাগ্রত। সেখানকার দুটি জাগ্রত সেবক আভার নিদারুণ পরিচিত—একজন ব্রজ দত্ত, অন্যজন সাহেব মিত্তির। সেই সাহেব বুলুকে এনেছিল।

‘তুমি কী জানো বুলুর? সত্যি করে বলো। আমি সব জানতে চাই।’

‘রহস্যও বোঝো না! নিজের বউকে চোখে চোখে হারাও। অথচ পলকে পরের বউ কবজা করে বসে আছ!’

আভা ফিরে যাচ্ছিল। পেছনে কুবেরকে দেখে তাঁবুর পাশ কাটিয়ে উত্তরের নিচু জলাভূমির উঁচু পাড়ে গিয়ে দাঁড়াল। সেখানে হাওয়া কিছু বেশি ঠান্ডা। এখন তাকে কেউ আবার কোলে তুলে নিক। আচ্ছাসে জাপটে ধরুক। এই নিশ্চিন্ত ভাবনাহীন বিচ্ছিন্ন দ্বীপে কতকালের স্বপ্নের আনন্দ, ভালোবাসা, চারদিকে ছড়িয়ে আছে। কোথাকার বিশাল পৃথিবীর ঝুলকালি দিয়ে এটুকু সে কিছুতেই নষ্ট হতে দেবে না। তবু পরিষ্কার বুঝতে পারল, তার মাথার ভেতর দিয়ে ড্রিলিংয়ের পাইপ নেমে যাচ্ছে। লোহার চেন কড়কড় করে ওপরে উঠে আসছে। আর দুর্গের চাতালে দাঁড়িয়ে সাহেব মিত্তির একটা কিম্ভূত বন্দুক বাগিয়ে ঠিক তার বুকের মাঝখানে টিপ করে নিরিখ করছে। হয়তো গুলিতে বুকটা ফেটে গেলেই সেখান থেকে গলগল করে তেল বেরিয়ে পড়বে। সেই তেলের জন্য কতলোক কতকাল মাটিতে উবু হয়ে বসে আছে। তাই আভাকে সেদিন ব্রজ প্রায় নিলামে তুলেছিল।

‘আমি জানি আভা—তুমি রহস্য করোনি। তুমি এমন কিছু জানো—যা আমাকে বলতে চাইছ না। একথা বুঝতে পেরেই আমার বুকের মধ্যে তোলপাড় হয়ে যাচ্ছে—হাত দিয়ে দ্যাখো।’

আভা হাত রাখল, ‘শার্টের বোতাম লাগাও না কতদিন?’

‘যতদিন এই জমিজায়গা চাষ-আবাদের পেছনে ঘুরছি—’

‘পড়ে যাবে। সাবধানে দাঁড়াও—’

টাল সামলে নিল কুবের। বড়ো বড়ো জলের পোকা শ্যাওলা মেখে এক-একবার ভেসে উঠছে—আবার ডুবে যাচ্ছে, ‘পড়ব না। তুমি বলো আভা—আমি সব জানতে চাই। বিশ্বাস করো আমি ভীষণ একা। আমার কেউ নেই। আমার যা আছে সবই জঞ্জাল। তা শুধু জমে যায়। জায়গা আটকে রাখে। অথচ ভেতরে তাকাও, আমার চোখে তাকাও, সেখানে হলহল করছে—একদম ফাঁকা—’

‘আমায় ফেলে দেবে নাকি? পাগলের মতো কোথায় উঠে এসেছ দেখ একবার। দুজনেই নীচে পড়ে যাব একসঙ্গে—’

কুবের নেমে এল। আভাও এল।

তখনও সেই লোকটা সমান মাত্রায় ধান ফেলছে। অঙ্কুরের জট খুলে ধানগুলো ছিটকে গিয়ে নতুন মাটিতে গেঁথে যাচ্ছে।

'আমার স্বামীর নামে রাস্তা হয়েছে। তাঁর ধারণা আরও অনেক কিছু হওয়া বাকি—একে একে হবে।'

'যেমন?'

'ধরুন রেল স্টেশন, রেডিয়ো স্টেশন—'

সাহেব মিত্তির মজা পাচ্ছিল। বলল, 'মানে কুবের স্টেশন। রেডিয়ো কুবের! দারুণ আইডিয়া। এভাবে তো কেউ আজকাল ভাবে না—'

'ওইরকম আজগুবি মানুষ। না দেখলে বিশ্বাস হবে না। আপনার সঙ্গে আলাপ হলে বুঝতেন।'

'আলাপ হয়েছে। এই এখানেই। তখনও আপনাদের ব্রজদা রেলেশ্বর শিব বসায়নি। একদিন এসেছিলেন। জায়গাজমির দর কেমন—তাই বোধহয় জানতে। এমনিতে তো দেখে কিছু বোঝা যায় না?'

বুলু রেলেশ্বর শিবের স্বপ্নাদিষ্ট মন্দিরের জন্যে চাঁদা দিতে এসেছিল। কিছুকালই এখানে আসে। ব্রজ দত্ত যত্ন করে বসায়। খাওয়ায়। আভা থাকলে বাড়াবাড়ি রকমের যত্নও হয়েছে তার। সে নাকি এখন বড়োলোকের গিন্নি। হপ্তা দুই হল আভা নেই। কোথায় গেছে জানারও উপায় নেই। ব্রজ ফকিরের সমাধির মতো একটা কিছু হয়েছে আজ তিন-চারদিন। বিশেষ কথাবার্তা বলছে না লোকটা। আশপাশের গাঁয়ের লোক এসে ভিড় করে মানত করে যায়। তার মধ্যে ভাঁটার দৃষ্টি তুলে ব্রজ দু-একবার বুলুকে দেখেছে। সে যে চেনা লোক—তেমন কোনো লক্ষণ ব্রজর চোখে ফোটেনি।

'সাহেববাবু, আপনি তাঁকে দেখে একটুও বুঝতে পারবেন না। নিভাঁজ ভালো মানুষের মুখ। অথচ দেখুন তো আমি এদিকে কী বিপদে পড়ে আছি—'

'আবার কী হল?'

'কুবের স্টেডিয়ামের স্টোনচিপ, লোহা, বালি, সিমেন্ট—সব কিছু এসে জমা হচ্ছে। অথচ মানুষটাই নেই এখানে। কে করবে এতসব? কে দেখবে? আমি একলা পারি?'

'কোথায় আছেন এখন?'

'সে কী জানি ছাই, শুনেছি চাষবাসে মজে আছে। লঞ্চদুটোও সেখানে আটক পড়ে আছে। ভদ্রেশ্বর আসছে না কিছুদিন—'

সাহেব মিত্তির একমনে বুলুর মুখের দিকে তাকিয়েছিল। সে গোলন্দাজ লোক। তিরন্দাজ বলেও নিজের পরিচয় দেয়। সতেরোশো আঠারোশো ফুট নীচে পাইপের গায়ে নিরিখ করে সে গুলি করে

থাকে। গ্যাস থাকলে গ্যাস—তার পেছন পেছন তেল মাটি ছুঁড়ে পাতাল থেকে এক ঝলকে উঠে আসে। এখন ধক করে খানিক রক্ত তার বুকে এসে দলা পাকিয়ে গেল। বুলুর কোনো কথাই তার কানে যায়নি এতক্ষণ। ধীরস্থির একজন চিন্তিত রমণীর মুখে যদি সুন্দর ঠোঁট, সামান্য চাপা নাক আর ঘনপক্ষ ঢাকা চোখ থাকে তাহলে সাহেব মিত্তিরের আর দোষ কী!

বুলুর এতক্ষণে খেয়াল হল। দশ চাকার লরিগুলো অয়েল টাউনের জন্যে মালমশলা বয়ে আনছে। বিরাম নেই। রেলেশ্বর শিবের স্বপ্নাদিষ্ট মন্দিরের অনেকটা উঠেছে। বুলু টের পেল, ব্রজদার বাবার আত্মজীবনী লেখার দিনগুলো এই হোম, যাগযজ্ঞ,মন্দির প্রতিষ্ঠার চাপে কোথায় তলিয়ে গেছে। তাকেও আর কোনোদিন কুবের আচমকা সন্ধেবেলা ফিরেই ট্যাক্সিতে কলকাতার রাস্তায় নিয়ে ছুটবে না, সিনেমায় যাবে না। সেদিন বিকেলের ডাকে পাঠানো ব্রজ দত্তর বাবার আত্মজীবনী 'রজনী দত্তর জীবন ও সময়' মন দিয়ে পড়ছিল বুলু। সেসব দিন কোথায় গেল! তখন হরিরাম সাধুখাঁর ভদ্রাসন থেকে বেরিয়ে এক সন্ধেয় সিনেমা দেখাও কত কঠিন ছিল। অথচ এখন—উত্তরের বারান্দায় কৃষ্ণপক্ষের সন্ধের পর প্রায়ই প্রোজেক্টর চালিয়ে পুরোনো বাংলা ছবি দেখে বুলু। পুকুরের ওপিঠে সাদা স্ক্রিন টাঙানো হয় তখন। ডলি বলে, ''বুলুদির ভাগ্যই আলাদা।'' রেখা বলে, ''আপনি গুছিয়ে থাকতে জানেন না বুলুদি। কত জিনিস পড়ে পড়ে নষ্ট হচ্ছে।''

আরও একটা জিনিস এই মুহূর্তে টের পেল বুলু। সাহেব মিত্তির তার দিক থেকে চোখ ফেরাতে পারছে না। এই মানুষটাকে আভা বউদিই পরিচয় করিয়ে দিয়েছিল। দেবার সময় বলেছিল, 'দেখিস ভাই! তোর হাতে তুলে দিয়ে নিশ্চিন্ত হলুম!'

তখন কথাটা সাধারণ মেয়েলি রসিকতার চেয়ে বেশি কিছু কানে ঠেকেনি বুলুর। অনেকদিন দাড়ি কামানো ফিটফাট একাগ্র পুরুষ তার চোখে পড়েনি। ইদানীং কুবের সাধুখাঁ নামে তার দখলদার যে পুরুষটিকে সে দেখে আসছে—তার জামাকাপড়ের ঠিক থাকে না, সারাদিন পরে শোয়ার আগে সে জমাখরচের হিসেব খাতায় তুলে রাখে।

দূর শহর থেকে পাকাপাকি ইলেকট্রিকের তার টেনে আবার পর এখন ওয়ার্কসাইট একটা ভব্য চেহারা পেয়েছে। সরকারি মালি এসেছে—অফিস ঘরের সামনে অনেকটা জুড়ে বাগান তৈরি হচ্ছে। সেখানকার নরম ঘাসের ওপর দিয়ে হাঁটতে হাঁটতে সাহেব মিত্তির আবদার ধরল, 'এখানে একটু বসতেই হবে আপনাকে। অন্তত এক মিনিটের জন্যেও। তখন আপনার পাশে বসে থাকব। কোনোরকম বিরক্ত করব না কথা দিচ্ছি।'

এমন কাতর কথা কোনোদিন শোনেনি বুলু। ছেলেমেয়ে ড্রাইভারের সঙ্গে দূরে বড়ো রাস্তার ওপর মোটরের মধ্যে বসে। পরিষ্কার আকাশে অনেক রকমের তারা ছিটিয়েছিল। কোনোটা লাল কেরোসিনের হারিকেনের চেয়েও ময়লা—কোনোটা খুব কাছের থেকে শুধু তাদেরই দিকে তাকিয়ে জ্বলছে।

'এইটুকু বসে আপনার লাভ?'

'আপনি যেমন ইচ্ছে কথা বলবেন—আমি কোনো জবাব দেব না—কিছু জানতে চাইব না। আপনার গলার স্বর শুনব চোখ বুজে—'

কড়া আলোর অনেকটা এ পর্যন্ত ছড়িয়ে পড়েছে। তাতে মানুষজন দেখা যায়—কিন্তু চেনা যায় না। গত পৌষে পঁয়ত্রিশ পার হয়ে গেছে বুলু। মাটিতে বসতে বসতে বুলু বলল, 'খালি চোখে উড়ন্ত মহাকাশচারীদের দেখা যায় না। ওরা কখন যে ওপরে ওঠে—কখন যে নেমে আসে টের পাওয়ার উপায় নেই—'

'তার চেয়েও দূরের জিনিস দেখা যায় খালি চোখে।'

বুলু তাকিয়ে আছে দেখে সাহেব মিত্তির ফিরে বলল, 'তারার কথা বলছি। ওরা মৃত্যুর পরেও অন্তত আমাদের জন্যে টিকে থাকে। মুছে যাবার আগে শেষবারের মতো পাঠানো আলো—আমরা হয়তো এই এখন দেখতে পাচ্ছি, তারাটা কিন্তু শেষ হয়ে গেছে কবে।'

'বাসি ফুলের গন্ধের মতো—'

সাহেব মিত্তির চমকে উঠল। পদ্মবীজও এত ঘন, এত স্বাদু, এত সুগন্ধী হয় না। গলার স্বর কী মিষ্টি! দুলসুদ্ধ কানের পাশ, ভারী খোঁপা, নাকের একদিককার ওঠানামা—শুধু এইটুকুই সাহেব মিত্তির দেখতে পাচ্ছিল। গয়নার দোকানের ক্যালেন্ডারে এমন মেয়েমানুষের ছবি থাকে।

হেসে বলল, 'টাটকা তারাও আছে। চিনিয়ে দেব আপনাকে?'

সেই মুহূর্তে বুলুর একবারও মনে পড়ল না, কদমপুরে জমিজায়গার দলিলে শতবার লেখা হয়েছে—গ্রহীতা, বুলু সাধুখাঁ। জওজে কুবের সাধুখাঁ। পেশা গৃহস্থালি। সাকিন কদমপুর। পরগনে মেদনমল্ল। সাবরেজিস্ট্রি অফিস বহরিডাঙা। কুবের সাধুখাঁ এখন ইচ্ছে করলেই হস্তান্তর করতে পারবে না। জোতজমা—সবই তার নামে। দাখিলাও কাটা হয় তারই নামে। এত সবের মাঝখানে কুবের একটা ফালতু মাত্র। ওকালতি বুদ্ধি দিয়ে তাকে নিমেষে ঝেড়ে ফেলে দিতে পারে বুলু।

'তারাও চেনেন? আমি মনে রাখতে পারিনে। গুলিয়ে যায়—'

'সব চিনি। জ্যান্ত তারা। মরা তারা।'

'আমার এক-একসময় মনে হয় সারা ছায়াপথটাই তারাদের কবরখানা—'

সাহেব মিত্তির কান খাড়া করে বুলুর গলার স্বরটুকু মাথার ভেতরে, শরীরের ভেতরে একেবারে শুষে টেনে নিচ্ছিল। শুধু বলল, 'ওই তারাটা চেনেন?'

গলির মোড়ে স্টেশনারি দোকানও এত অবহেলায় কেউ আঙুল দিয়ে দেখায় না।

'তারাটার নাম জানেন?'

বুলু মাথা নাড়ল।

'কুবের।'

ঝুঁকে বসেছিল বুলু। গায়ের গন্ধ পাচ্ছিল সাহেব। তার মধ্যে পাউডার, তেলখোঁড়ার এই কবরখানা গাঁয়ের গন্ধও ছিল। তার কথায় বুলু সরে বসল, 'জ্যোতিষ্ক বানিয়ে ফেললেন মানুষটাকে! আসলে কিন্তু খুব সিম্পিল।'

'যতটুকু শুনেছি—যা দেখেছি, তিনি একজন কীর্তিমান পুরুষ। জ্বল-জ্বল করছেন। পৃথিবীর নাম পালটে এসব লোকের নামে ডাকা যায়। নিদেনপক্ষে মহাসাগর, মহাদেশের নাম কুবের রাখা যায়—'

বুলু মজা পাচ্ছিল, 'তাহলে তাবৎ ভূগোল বই ফিরে লিখতে হবে যে।'

সাহেব বলতে যাচ্ছিল—অ্যাটলাস, ম্যাপ বই, ফিজিক্যাল জিয়োগ্রাফি—দরকার হলে সবই কারেক্ট করে নিতে হবে। তার বদলে ফট করে বলে দিল, 'আমি কোনোদিন কিছু করতে পারিনি। অ্যাচিভমেন্ট বানানটাই ভুল হয়ে যায়। শুধু পাতালে গুলি চালাই আজ বিশ বছর। তার আওয়াজটুকু সেখানেই হারিয়ে যায়—'

মানুষটা যে কেন এতখানি ক্লিষ্ট, কুণ্ঠিত—তার কোনো হদিস করতে না পেরে বুকের যেখানটায় মাছ-আঁকা লকেটটা পড়ে থাকে—তার দু-ইঞ্চি নীচে হাড়-মাংসের ভেতরে একটা মোচড় দিয়ে উঠল বুলুর।

'আমি কোনোদিন কোথাও পৌঁছোতে পারিনি।'

বুলু কিছু না হলেও মেয়েমানুষ। সে এটুকু জানে এর নাম একরকমের যন্ত্রণা। বইয়েতে যাকে বলে প্রেম, ভালোবাসা। অথচ জিনিসটা ঠিক ঠিক তাও নয় একেবারে। আভা বলেছিল, লোকটার বউ আছে। খানিক মেয়েন্যাংলা মানুষ। স্বভাব ভালো নয়। বুলু বউয়ের কথা তুলতেই বলেছে, টক লাগে। কুবেরদের নতুন গোরুগুলোর জন্যে পুরোনো খড় কিনতে হয় ফি-বছর। নতুন খড় খেলেই দাঁত টকে যায়।

রাতের শিফটের ওভারল পরা কিছু লোক অগোছাল আলোয় লম্বা লম্বা ছায়া ফেলে ঘোরাঘুরি শুরু করেছে। দোতলা ক্রেনের বক্সে বসে একজন পাউরুটি কামড়ে খাচ্ছে। অয়েল-টাউনের নতুন পাকা রাস্তা বেয়ে লরির পর লরি সারি দিয়ে দাঁড়ানো। একটা গোরুর গাড়ি মাঠে নেমে গেল।

'আপনার বন্ধু কোথায় পৌঁছোতে পেরেছে?'

'তা জানি না। তবে কুবেরবাবু কোথাও একটা এগিয়ে যাচ্ছেন। তালেগোলে গড়িয়ে গড়িয়েও এগিয়ে যাচ্ছেন—'

'সব সময় ভীষণ কষ্টে ভুগছে। কোনো রাস্তাই তাঁর কাছে কঠিন নয় সাহেববাবু। পরিষ্কার বলে—বুলু, রোজ আমি ঘুম থেকে উঠে দেখতে পাই খসে পড়া গাছের পাতার মতো একশো টাকার নোটের

বান্ডিল দোরগোড়ায় ছড়িয়ে আছে। সেসব ঝাঁটপাট দিয়ে পরিষ্কার করে আমাকে সেদিনকার মতো পথ ঠিক করে নিতে হয়। টাকা কোনো প্রবলেম নয় আমার। আমার মুশকিল—কোন পথে যাব? কোথায় যাব? আমি একদম জানি না। কিছু করার নেই আমার—'

'কষ্টটা কীসের?'

'সে বললে হাসবেন আপনি।'

'বলুব না।'

'তাঁর মা আসতে পারেনি কদমপুরে। মারা গেলেন। ভাইরাও এল না। ইচ্ছে ছিল, আমার শ্বশুর, শাশুড়ি—দেওররা সবাই আসবে। সারাদিন খাওয়া-দাওয়া হবে। দুপুরে দরজা আটকে নাক ডেকে ঘুমোবে সবাই। বিকেলে বেড়াবে। আবার খাবে এবং ঘুমোবে। কোনো চিন্তা থাকবে না। কারো। কেউ কোনোদিন মরে যাবে না। তার মধ্যে সময়-সুবিধে মতো সবাই মিলে পৃথিবীর উন্নতি করবে। আচ্ছা, বলুব তো আজকের দিনে এসব পাগলামি নয়?'

'কেন?'

'সব সংসারের যৌথ পরিবার ধুয়ে মুছে ভেঙে যাচ্ছে। আর তিনি একজন সবাইকে নিয়ে জড়িয়ে থাকার জন্যে মাথা কুটে মরছেন। আমি তাঁর বউ—ভালো কথা। স্পষ্ট বলেন—আছ, থাকো। কিন্তু আমিও নাকি আসলে বাইরের লোক! বুঝুন ব্যাপারটা! অ্যাবসারড নয়?'

আজকের সন্ধেটা খানিক আগেও সাহেব মিত্তির ভেবেছিল, একেবারে তারই। ব্রজ ফকিরের রেলেশ্বর শিবের সামনে থেকে এর আগে অনেককে সে ভাগিয়ে নিয়ে কেটে পড়েছে। কিন্তু কিছুকাল ধরে লম্বা চোয়ালের এই মেয়েমানুষটির ধীর পায়ে এসে দাঁড়ানো, ব্রজ ফকিরের সামনে বসে পুজোর জোগাড়যন্ত্র করানো, দূরদেশের স্বামীর কল্যাণে বেল পাতায় চন্দন ছিটানোর কাণ্ডকারখানা—তার শরীরে সবটুকু রক্ত একত্র করে একেবারে মুখোমুখি কে নিশ্ছিদ্র লোহার দরজা তুলে দিয়েছে। সে শুধুই মাথা দিয়ে, ঘুষি মেরে দরজাটা খোলার চেষ্টা করে যাচ্ছে। এর আগে কোনো মেয়েমানুষকে এত সহজ—এত কঠিন লাগেনি।

সাহেব এইমাত্র টের পেল, এমন রাত্তির একেবারেই তার নয়। সেই গোঁয়ারগোবিন্দ ধরনের লোকটা দূরদেশে বসেও তার চেয়ে কোথায় অনেকখানি উঁচু হয়ে বিরাট একটা ছায়া ফেলেছে। মাসখানেক আগেও নিশুতিরাতে এই মাঠের মধ্যে দাঁড়িয়ে ব্রজ ফকির আর সে—দুজনে দু-দিক থেকে একটা জিনিস নিয়ে টানাটানি করেছে। সে জিনিসের নামও মেয়েমানুষ ওরফে আভা। সাহেব মিত্তির সেদিন নেশার ঝোঁকে চিৎকারে সব কিছু চিরে ফেলছিল। ব্রজ ফকির লাল চোখ করে নিঃশব্দে দাঁত ঘষছিল। আভা সন্ধে থেকেই কাঁদছিল। খালি বলছিল, 'আমায় ছেড়ে দাও তোমরা—আমায় যেতে দাও—আমি ইচ্ছেমতো চলে যাই কোথাও। পায়ে পড়ি তোমাদের—আমায় ছেড়ে দাও। আমার তো আর কিছু নেই, তোমরা তো সব জানো।' তখনও কোনো ছায়ার সামনে তার নিজেকে ছোটো লাগেনি।

ব্রজ ফকিরের সমাধি বোধহয় ভাঙল। উঁচু ধাপের ওপর দাঁড়িয়ে মালা ঘোরাতে ঘোরাতে বুলুকে ডাকছে। সাহেবের ইচ্ছে ছিল না, বুলু এখন ওদিকে যায়। কী বলে আটকাবে। তাই নিজেও সঙ্গে সঙ্গে গেল।

কবরখানা গাঁয়ের সব কিছু এক এক চমকে পালটে যাচ্ছে। শুধু পুরোনো ইট আর টালির স্তূপে ভরাট এই জায়গাটুকু বদলাতেই যা সময় নিচ্ছে। স্বপ্নাদিষ্ট মন্দিরের চুড়ো একদিন ড্রিলিং টাওয়ারকে হার মানাবে নাকি। ব্রজ ফকির জেগে জেগে এই স্বপ্ন দেখে। আর স্বপ্নের ভেতরের আদেশ তো এই গ্রাম দেশের দিকে দিকে চাউর হয়ে গেছে। স্বয়ং শিবের আদেশ। সাতাশি ফুট মন্দির চাই। সামনের বছর মাঘী পূর্ণিমায় মন্দির শেষ করতে হবে। স্বপ্নাদেশের কথা ঘরে ঘরে। জ্বরজ্বারি, রোগভোগে সেরে ওঠার পরই সবাই কিছু না কিছু দিয়ে যায়।

একটা ভিজে বেলপাতা বুলুর হাতে দিয়ে ব্রজ বলল, ‘বাড়ির কালো গোরুর শিঙে রবিবার রবিবার তেল সিঁদুর মাখিয়ে দিয়ো। আর শনিবার নিজেরা খানিকটা বেগুন পোড়া খাবে—’

বুলুর মুখে ভক্তি-শ্রদ্ধার ছায়া পড়তেই সাহেব মিত্তির ভেতরে ভেতরে জ্বলে গেল। এই নবীন শৈবসাধক ব্রজ ফকিরের সঙ্গে তার এখন অলিখিত চুক্তি অনুযায়ী শান্তি বজায় আছে। কিন্তু দু-তরফই যে-কোনো সময় কেঁপে উঠতে পারে। সেদিন রাত্তিরের পর দুজনের কেউই খুব খোলাখুলি করে কথা বলতে পারেনি। তার কয়েকদিন পর থেকেই আভা নেই।

‘তোমার স্বামীর ইষ্ট কে?’

বুলু মনে করতে পারল না, কুবের কোন দেবতাকে ভক্তি করে। দেবেন্দ্রলাল বংশের শালগ্রাম কুবেরকেই দিয়েছে। দু-বেলা পুজো হয়—রাতে শয়ান দেওয়ার আগে আরতি হয়। বৈশাখে শীতল দেওয়া হয়। কিন্তু কুবের কোন দেবতাকে ভক্তি করে, ভালোবাসে?

শেষে বলল, ‘আমার শাশুড়িকেই ভাবেন খুব—’

‘তবে তাঁর ছবি পটে বসিয়ে দাও। সধবা গেছেন—ফটোতে ১০৮টা রুদ্রাক্ষের মালা পরিয়ে দিও। দেখে কিনবে—কোনো রুদ্রাক্ষে যেন ফুটো না থাকে। নিজে মালাটা গেঁথে নেবে। চান করে উঠে পটের সামনে রোজ খানিকটা সন্দেশ বা ক্ষীর দেবে বাড়ির গোরুর দুধের। দেখবে তিনি নিজে এসে খেয়ে যাচ্ছেন—’

সাহেব আর থাকতে পারল না। বলল, ‘দেখা যাবে তিনি আসছেন?’

‘দেখার মতো চোখ থাকলে নিশ্চয় দেখতে পাবে—’, একথা বলে ব্রজ ফকির এমন সব কথা বলতে লাগল—যা এমনিতে খুব সোজা, কিন্তু দু-দুটো মানে হয়। তার ভেতর আবার কিছু কথা দেহতত্ত্বের। খুব ভাব দিয়ে যে কেউ বললেই খুব রহস্যজনক লাগে।

সাহেবেরও কিছু অবাক লাগছিল। কদমপুরের সেই ব্রজ দত্ত আর রেলেশ্বর শিবের সেবায়েত ব্রজ

ফকির—দেড় দু-বছরের তফাতে একই লোক কেমন ভিন্ন ভাষায় কথা বলছে, কেমন পালটে যাচ্ছে। এর সবটাই বোধহয় ভালো নয়। পাটে বসে বসে ব্রজ ফকিরের রগে কিছু অভ্যেস বসে গেছে। হাসিখানা মোহান্ত প্যাটার্নের হয়ে দাঁড়াচ্ছে।

'আমার পিতাঠাকুরের একখানা আত্মজীবনী কিনবে?'

বুলু মনে করিয়ে দিল, 'আপনার ভাইকে তো একখানা সালকের বাড়িতে ডাকে পাঠিয়ে দিয়েছিলেন। সেখানাই আমরা এখনও পড়ি।'

'নতুন ছাপা হচ্ছে। এত চাহিদা হবে কোনোদিন ভাবিনি। কয়েক জায়গা পালটাতে হল। মন্দিরের টাকা বাদে আর ছটা টাকা রেখে যেয়ো—বই বেরোলেই পাবে।'

সাহেব বড়ো রাস্তা অবদি এগিয়ে দিতে গেল বুলুকে। সেই অনেক আগে—বিয়েনও আগে পাড়ার ক্লাবে কোরাস গানের পর রাত হয়ে গেলে বিভূতি তাকে এগিয়ে দিয়ে যেত। তখন হাতে হাত লাগলেই গায়ে কাঁটা দিয়ে উঠত।

সাহেব একটা গর্ত লাফিয়ে টপকে গেল। পেছন থেকে বুলুর মনে হল, লোকটার কাঁধে খুব একটা কিছুর ওজন পড়ে ভীষণ ব্যথা হয়েছে। মাথা তুলতে পারছে না।

'আর এগোতে হবে না আপনাকে। আমি পারব।'

সাহেব রাজি হল না কিছুতেই, 'আরেকটু তো পথ। যাই না আপনার সঙ্গে—'

ভীষণ কাকুতির মতো শোনাল। পুরুষ লোক এতও পারে। গাড়ির সামনে এসে দুজনেই দেখল, কাচ তুলে দিয়ে ড্রাইভার, ছেলেমেয়েরা—সবাই ঘুমোচ্ছে। বুলুর মন অনুতাপে ভরে গেল। সে এতক্ষণ ওখানে কাটিয়েছে—আর ছেলেমেয়ে বসে থেকে থেকে ঘুমিয়ে পড়েছে।

'এই গাড়িটা কিনলেন?'

'আমার ইচ্ছে ছিল না। বলেছিলাম লঞ্চে গাদাখানেক ভাড়া টেনে লাভ কী? তার চেয়ে লঞ্চ দুটো কিনে নাও। তোমার তো সেই লাগবেই। তা শুনবে না—'

'কেন?'

'আর কিছু বাড়াতে চায় না আপনাদের বন্ধু। জিনিসপত্র বলে ভীষণ বেড়ে যাচ্ছে—জমে যাচ্ছে। অথচ গুচ্ছের টাকা ভাড়া গুনছে। সবটাতে উলটো বুদ্ধি—'

কথা বলতে বলতে বুলু থেমে গেল। দেখল, সাহেব মিত্তির কিছু শুনছে না। এক মনে তার মুখে তাকিয়ে আছে। নিজে দেবী হয়ে উঠতে কোন মেয়ের না ভালো লাগে। বুলু নিজেই সাহেবের হাত দুখানা নিজের হাতের মুঠোয় টেনে নিল, 'মন খারাপ করবেন না। নিজের কাজ করে যান মন দিয়ে—'

তারপর সাহেব মিত্তিরকে একটা কথাও বলার সময় দিল না। হুট করে দরজা খুলেই ভেতরে বসে গেল। কুসুমকে কোলে টেনে নিয়ে ড্রাইভারকে এক ধাক্কায় জাগিয়ে দিল, 'জোরে চালাও—অনেকটা পথ যেতে হবে।'

হকচকানো ড্রাইভার স্টার্ট দিল। কাচের ওপিঠে প্রায় ভূতগ্রস্ত সাহেব দাঁড়ানো। মূর্তিটা মিলিয়ে যেতেও সময় নিল না মোটে। বুলু ইচ্ছে করলে ঘাড় ঘুরিয়ে দেখতে পারত। কিন্তু তিন প্যাঁচের এই হারটায় এমন সব সোনার পুঁতি বসানো—মাথা ঘোরালেই গলার চর্বিতে খাঁজ কেটে বসে গিয়ে ব্যথা দেয়।

তবু আন্দাজে শব্দ শুনে বুঝল, ক্রেনের লম্বা শুঁড় প্রায় মাটিতে নেমে ভারী কিছু একটা তুলছে। লোহার চেনগুলো ভারে কড়কড় করে উঠছে। তবু তুলতে হবে।

রাস্তার দু-পাশের জায়গা পালটে যাচ্ছে। টিনের ঘরে ঘরে লেদ মেশিন নিয়ে দুনিয়ার লোকজন বসে গেছে। কত চায়ের দোকান বসেছে। লরি থামিয়ে চাকা পালটাচ্ছে দুটো লোক। ক-বছর আগে এ-তল্লাটে কুবেরের সঙ্গে প্রথম এসে এসব জায়গা কী ফাঁকা লাগত তার। তখন একটা নেশার ঘোরে ঘুরেছে দুজন।

তখন কুবেরের চোখের মণি কত উজ্জ্বল ছিল। হাসলে দাঁতের কোনা বেরিয়ে পড়ত। এমন মানুষের বউ হয়ে তার খানিক গর্বও হত। কতবার মনে হয়েছে, কুবের কোনোদিন বুড়ো হবে না। চামড়া কী টানটান! চ্যাটালো বুক। অন্যমনস্ক হয়ে সিগারেট খেতে খেতে এমন করে তাকাত! কতকাল ফিরে চায় না সেই মানুষটা। ছোটোবেলা থেকে নানান ব্রত করে পাওয়া স্বামী।

অথচ সাহেব কী একাগ্র। হয়তো আজই বিকেলে ঘুম থেকে উঠে দাড়ি কামিয়েছিল। খানিক পরেই বড়ো রাস্তা ছেড়ে গাড়ি কুবের রোডে উঠবে।

ব্রজর হাত ভীষণ শক্ত। আঙুলের হাড় সাঁড়াশি হয়ে তার হাতে চেপে বসেছে। আভা ছাড়াতে পারল না। অন্য হাতখানা ধরে সাহেব টানছে। 'তখনই বলেছিলাম সাহেব আমাকে এসব খাইয়ো না। আমার সহ্য হয় না। মুখ দিয়ে গরম হাওয়া ছোটে—তোমরা যে কী ধাতের মানুষ—'

ব্রজ দাঁতে দাঁত ঘষছিল। অনেক রকমের গালাগালি এসে তার মুখ বোঝাই হয়ে গেছে। কিন্তু চেঁচাবার উপায় নেই। শিব প্রতিষ্ঠার পর এখানে সে আপনা-আপনি সেবায়ত—আপনা-আপনি মোহান্ত। দূর গাঁয়ের লোক আজকাল শিবতলার মোহান্ত বাবাও বলে। তার পক্ষে জ্ঞানহারা হয়ে চেঁচানো বেঠিক কাজ হবে। আশপাশের হাটুরে লোক শুনতে পেলে কী ভাববে!

তাই বলে এই তেলখোঁড়ার আড্ডার একেবারে গায়ে গায়ে এসব কী বেলেল্লাপনা? একেবারে চোখের সামনে। আর একবার জোরে টান দিল আভাকে। ব্রজর হাতের মধ্যে কয়েকটা কাচের চুড়ি মুটমুট করে ভেঙে গেল শুধু।

আভা সঙ্গে সঙ্গে চিৎকার করে কেঁদে উঠল, 'ভাঙলে তো শেষে।' কথা জড়িয়ে যাচ্ছিল, 'এই সাহেব —তোমার সাধের সাহেব ছাইপাঁশ কী সব গিলিয়েছে—তখনই বারণ করলাম ওগো—কথা কী শোনে তোমার সাধের সাহেব!' এর পর ডুকরে কেঁদে উঠল আভা।

এতটা হবে সাহেব ভাবতে পারেনি। তারও কিছু নেশা হয়েছিল। ব্রজর গলা ধরে বলতে যাচ্ছিল, 'তুমি তো মোদক খাওয়াতে দাদা! আমি এই একটুখানি—'

গলায় হাত পড়তেই ব্রজ এক ঝটকায় সাহেবকে সরিয়ে দিল। ধাক্কা খেয়ে মাটিতে পড়তেই আভার চিৎকার শুনতে পেল। ভ্যাবাচ্যাকা খেয়ে গেল সাহেব। কিছু বুঝে ওঠার আগেই দেখল, ব্রজ ফকির আভাকে মাটি আঁচড়াতে আঁচড়াতে টেনে নিয়ে যাচ্ছে।

এই পর্যন্ত আভা অনেক পরে পরপর সাজিয়ে মনে করতে পেরেছিল। তখন সে নেশায় পাথর হয়ে ছিল। তার পরেরটুকু মনে করতে কোনো কষ্ট হয়নি। কেননা, ততক্ষণে আভার নেশা ছুটে গিয়েছিল। ব্রজ পরিষ্কার বলেছিল, 'এই জাগ্রত শিবের সামনে সত্যি কথা বলো। মিথ্যে বললে জিভ খসে পড়বে —'

হাত আলগা হতেই আভা সোজা হয়ে দাঁড়িয়েছিল, 'শিব কোনোদিন ঘুমোয় না গো। আমি কোন দুঃখে শিব সাক্ষী রেখে দিব্যি গালতে যাব?' তারপর থেমে থেমে বলেছিল, 'এমন তো আগেও অনেকবার গেছি—কদমপুরে থাকতেই—তখন তো একবারও বারণ করোনি।'

এইবার ব্রজ যা করল, তার চেয়ে আভাকে ধরে আচ্ছাসে চড় কষালে পারত। তা না করে দিব্যি

হাউমাউ করে কেঁদে উঠল। এজন্যে তৈরি ছিল না আভা। নেশার বাকিটুকুও ফরসা হয়ে গেল। আভা তখন একেবারে তিরিক্ষি, 'এতদিন জেগে জেগে ঘুমোচ্ছিলে?'

'কোনো উপায় ছিল না আভা—' এমন করেও কাঁদতে পারে ব্রজ—তা একদম জানা ছিল না আভার। তখনও খটখটে গলায় বলেছিল, 'কিন্তু এখন যে অনেক দেরি হয়ে গেছে—,' এর চেয়ে সেদিন বলতে পারত—কিন্তু গাড়ি যে চলে গেছে ব্রজ—ফের সেই বিকেলবেলার আগে আর কোনো ট্রেন নেই। কিংবা ওরকম ধাঁধা-মাখানো আরও অন্য কিছু বলতে পারত আভা। কী করে যে অমন কথা বেরিয়ে এল মুখ দিয়ে!

বেলপাতা, চন্দনমাখানো পাথরখানা তারই দিকে তাকিয়ে ছিল। আভা সেইদিনই অল্পক্ষণের জন্যে তার ভেতরে আবছায়ায় চোখের আভাস পেয়েছিল। তবে ত্রিনেত্র নয়। মানুষেরই মতো দুটো চোখ তাকেই দেখছিল।

আর একবার বমির ভাব আসতেই আভা জোরসে ডাঁশা পেয়ারাটা কামড়ে ধরল। দ্বীপের গাছের ফল। মেদনমল্লর বাথানের গায়ে কালই বিকেলে গাছটাকে পেয়েছে। গা-গুলোনো ঝোঁকটা কিছুতেই কাটানো যাচ্ছে না। অথচ এখন বেলা মোটে ন-টা দশটা। এখানে কুবেরের টাইমপিস দেখে কাজকর্ম চলে, সূর্য ওঠে। দিঘির সামনের চত্বরে মাদুর বিছিয়ে রোদ পোহাচ্ছিল দুজনে। কুবের পেছন ফিরে অনেকক্ষণ এক মনে কী একটা বই পড়ছিল। আভা যে তারই পাশে বসে আছে—তা একটু ভ্রূক্ষেপও নেই।

আজ হপ্তা দুই পাখিরা চলে গেছে। মাঘ প্রায় শেষ। রোদের তাত বাড়তেই পদ্মর বোঁটাগুলো নেতিয়ে যাচ্ছে। দিঘির জল যে কতকালের! এসব কথা ভাবতে গিয়ে কারখানা গাঁয়ের সেই সন্ধেবেলায় চলে গিয়েছিল আভা। ফিরেও এল এক লহমায়।

কুবেরের হাতের খোলা বইয়ের সামনেই অনেকগুলো ধানচারা তুলে এনে কামলারা বিছিয়ে রেখে গেছে। কুবের পড়ছে আর মাঝে মাঝে চারাগুলো দেখছে। মুখ তুলে ম্যাগনিফাইং গ্লাসটা জলচৌকির ওপর থেকে নিতে গিয়ে দেখল, আভা খুব মন দিয়ে তারই দিকে তাকিয়ে আছে।

'কী ব্যাপার?'

'তোমাকেই দেখছি!'

কুবের খুব অনেকক্ষণ এমন একজনকে চাইছিল, যাকে সে এখুনি বলতে পারে—আজ হাতের বইখানায় সে কী ভীষণ একটা জিনিস জানতে পেরেছে! ধানগাছ মানুষেরই মতো ব্যবহার করে। বসন্তে আকাশ-বাতাস মানুষের মধ্যে কী সব করে দেয়—তেমনি আলো, হাওয়া ধান-চারারও অনেক কিছু করে দেয়।

মাটির রস, আলো, রোদের তাত, হাওয়ার দুলুনি—সব মিলে ধানচারাগুলো রসস্থ হয়ে ওঠে। তিন-চার কলি চারা পুঁতে দিয়ে তা থেকে মাসদেড়েকে চল্লিশ-পঞ্চাশটা বিয়েন ছাড়ে। একে একে

বিয়েনগুলো গোল হয়ে ফুলে ওঠে। দিশি ভাষায় বলে, থোড় এসেছে। তারপর থোড় ফেটে শিষ বেরোয়। সবুজ শিষের গায়ে সাদা ফুলের ঝুরি লেগে থাকে। হাওয়ায় ধাবের খোলের মুখ খুলে যায় এক সময়—আর ফুল গিয়ে তার ভেতরে পড়ে।

ফুল পড়ে শিষগুলো ক-দিনেই ফুলে ঢোল হয়ে ওঠে। একেবারে শক্ত হয়ে ওঠার আগে টিপলে দুধ ছিটোয়। যে খোলে ফুল পড়ে না—তার নাম চিটে। আছড়ানো ধান হাওয়ার উলটোদিকে ধরলে চিটেগুলো ফুরফুর করে উড়ে যায়। নিষ্ফলা।

এসব চাষিও জানে।

'জানো আভা, সকাল আটটার আগেই এই বিরাট কাণ্ডটা হয়ে যায়। তারপরে যেই তাত বেড়ে যায় রোদের—'

'কোন কাণ্ড?'

'ভোরের দিকে ধাবের খোল আপনা-আপনি খুলে যায়—হাওয়ায়-হাওয়ায় ফুলগুলো ভেতরে ঝরে পড়ে—পড়তেই ধাবের খোল বুজে যায়—'

আভা কুবেরের মুখখানা দেখছিল। কপালে, চোখের নীচে, বাঁ কানের লতিতে কালো একটা ছোপ ছড়িয়ে পড়েছে। 'কদমপুরে যখন প্রথম এসেছিলে তার চেয়ে কত কালো হয়ে গেছ কুবের।'

'আমার কথা ছাড়ো। আমি আবার একটা মানুষ নাকি।'

'এত অভিমান?'

কুবের বুঝতে পারল, আভা তার কথা একদম বুঝতে পারেনি। এখন আভা তার প্রেমে গড়াগড়ি যাচ্ছে। অথচ কুবের—

অথচ কুবের কোথাও পুরোপুরি মন বসাতে পারছে না। এই ক-মাসে দ্বীপে আন্দাজে আভাকে নিয়ে কেমন একটা সংসার তৈরি হয়ে গেছে। সারা দিনরাতে খানিকক্ষণ তারা দুজনে প্রায় স্বামী-স্ত্রী হয়ে যায়। কখনো লাভমেশিন কুবেরের দিব্যি ষোলোআনা লাভার হয়ে উঠতে হয়।

'সত্যি তুমি অনেক কালো হয়ে গেছ! কী করে হলে কুবের? নোনা হাওয়ায়?'

কুবের ভেতরে ভেতরে গুড়গুড় করে ডেকে উঠল। ডান হাত দিয়ে বাঁ হাতখানা শক্ত করে চেপে ধরল। প্রায় কাঁপছিল হাতখানা। বলতে শুরু করতে পারত, জানো আভা—আমার জীবনে খুব একটা স্যাড ঘটনা—এক্সপিরিয়েন্স বলতে পার—

কিছুই বলা হল না। ক-দিনই সতেজ ধানচারাগুলোর ডগা লালচে হয়ে যাচ্ছে। কামলারা বলে, লালি ধরেছে বাবু। সে নাকি একটা রোগের নাম। লোক লাগিয়ে ব্লাইটক্স আর এনড্রিন জলে গুলে ছিটিয়ে দিয়েছে গাছে গাছে। মারাত্মক বিষে পথ-ভুলো কিছু সাপ ডাঙায় উঠে ছটফট করে মরেছে। শেষে সেগুলো এক জায়গায় জড়ো করে আগুন দিতে হল। অথচ পোকার দেখা নেই। মাজরা পোকা শিষের

ভেতরে নেমে গিয়ে থোড় খেয়ে ফেলে কুরে কুরে। তখন শুধু চিটে শিষ বেরোয়। সে পোকারও সন্ধান পাওয়া যায়নি। এত বিষেও তবে কোন পোকা টিকে থাকতে পারে?

পাতা উলটে উলটে কামলারা এক ধরনের পোকা তুলে নিয়ে এল মাঠ থেকে। ধানের পাতা লালায় মুড়ে ঘোমটা বানিয়ে তার ভেতরে গুটি পাকিয়ে পড়েছিল। বেশ বড়ো—প্রজাপতি হওয়ার আগেকার চেহারা। পোকাগুলোর পাতার মোড়ক এমনই যে বাইরের কোনো ওষুধ তাদের গায়ে লাগে না।

একটা পোকা কুবের হাতে নিতেই পাক খুলে লম্বা হয়ে গেল। সারা গায়ে পাতার সবুজ ছোপ আলগা করে মাখানো। কুবেরের চোখে জল এসে গেল। হয়তো এদেরই জন্যে সে পথে বসবে। এত খরচের চাষ—ঠিক ঠিক ফলন না হলে সে ডুববে। সর্বস্ব ঢেলে বসে আছে এই ঢালাও চাষে।

একটু আগে বইতে এই পোকার ছবি দেখেছে। নীচে লেখা আছে—কেস ওয়ার্ম। ঘোমটা দিয়ে এরা পাতার আড়ালে ঘাপটি মেরে থাকে। আসল নাম অবশ্য অন্য।

'জানো আভা—এ পোকাগুলোর নাম কী?'

'ফেলে দাও—হাতে নিয়ো না। ঘেন্না করছে—'

'নিপুলা ডিপাংটালিস। এদের তুমি এমনিতে মারতে পারবে না। পাতার ঘোমটার ভেতরে ওষুধ পৌঁছোয় না—'

আভা তাকিয়ে আছে দেখে কুবের বলল, 'মাটি, গাছ খাবারের কায়দায় শুষে নিতে পারে এমন কোনো ওষুধ ঢালা খেতময় ছড়াতে হবে। গাছগুলো সেই ওষুধ টেনে নিয়ে খাবারটুকু রেখে দেবে—আর সঙ্গে সঙ্গে বিষটুকু নিশ্বাসে নিশ্বাসে ছড়িয়ে দেবে। তখন গাছের ভেতরকার মেদমজ্জা যাই মুখে দেবে—পোকাগুলো পটাপট মরবে—তার আগে ওদের কিছু করা যাবে না।'

আভা শুনতে শুনতে ঘোমটা তুলে দিল, মাথায়, 'আমায় কি তোমার ওই নিমপুল না কি তাই দেখাচ্ছ! আমাকে তুমি কী দিয়ে মারবে? বলো না, কোন বিষে ওগো!' ঘোমটার মধ্যে গোটানো মুখখানা, তার পেছনে দূরে ধুধু জল চড়ায় এসে আছড়ে পড়ছে, একটানা ছলাৎ ছলাৎ শব্দ, মাথার ওপরে বেলাবেলির রোদ—কুবেরের বুকের ভেতরে ধড়াস ধড়াস শব্দ হতে লাগল। ইংরাজি রাপিড রিডার গ্রিক টেলসে পড়া নিমফ্—প্রায় জলপরির কায়দায় ঘোমটা-মোড়া আভার মাথাটুকু জলের ব্যাক গ্রাউন্ডে জেগে আছে শুধু। তখনকার মতো কুবেরের চোখে বাকি সব কিছু মুছে গেল।

এখানে এখন নোনা হাওয়ায় ফাল্গুনের আগাম বাতাস। কুবের খুশি হয়ে উঠতে পারত। মেদনমল্লর দুর্গটা ঢাউস ছায়া ফেলে দাঁড়ানো। তার ভেতরে আভাকে পাশে বসিয়ে মনের সুখে বইয়ের পাতা খুঁটে খুঁটে মাটির স্বভাব, পোকার চরিত্র—রহস্যময় আরেক জগতে ডুবে ছিল খানিকক্ষণ। কিন্তু গায়ের রঙ কালো হয়ে যাওয়ার কথা শুনেই মনের মধ্যে একদম দমে গেল। জিনিসটা তারও চোখ এড়ায়নি। সেই আদ্দিকালে একদিন কারখানা-ফেরত কুবের ট্রেনের জানলায় বসে তারই জাতের একজন লোকের মুখে শুনেছিল, 'আমাদের মতো লোকের সবচেয়ে বড়ো শত্রু রোদ্দুর। চামড়ার ভালো

দানাগুলো রোদে ক্ষয়ে যায়।’

আভা। আমার অসুখ আরও বড়ো। ইদানীং আমি পরিষ্কার টের পাই—গতকালও আমার শরীরে যে জায়গা সুন্দর ছিল, আজই সকালে তা কালো হয়ে যাচ্ছে। একদিন শুধু চোখের মণি, দাঁত, হাত-পায়ের আঙুলের নখ যে যার পুরোনো রং নিয়ে কোনোরকমে টিকে থাকবে। আভা, ইদানীং আমি পরিষ্কার টের পাই—আমার মেরুদণ্ডে হাড়ের চাকতির বলবেয়ারিং মজ্জা শুকিয়ে যাওয়ায় তেল-মবিলের অভাবে খচখচ করে ওঠে। আমাকে আর কিছুতেই চালু রাখতে চায় না। কেননা, একটা স্যাড ঘটনায়—এক্সপিরিয়েন্স বলতে পার—আমার মাথার ভেতরে ঘিলুর পরতে পরতে মনে করে রাখার সিঁড়িগুলো একদিন ঘটাং করে মুছে যেতে পারে। যদি মনেও পড়ে, কথা বলতে পারব না। উপায় থাকবে না কোনো। থাকলেও মনে হবে অন্যের কথা।

‘অমন করে তাকিয়ে আছ কেন?’

‘তোমাকে দেখছি—’

‘ও কী দেখার ছিরি! চোখ নামাও। কুবের—’, আভার গলা চিরে গেল। তবু কুবেরের চোখ নামল না। মণি গলে গেলে বোধহয় এমনভাবে তাকায় মানুষ। দারুণ ঘোলাটে। কুবের নিজেকে মূর্তির কায়দায় আভার কাছে তুলে নিয়ে গেল। তারপর খুব আলগোছে আভার গালে ঠোঁট ছোঁয়াল।

‘তোমার কী হয়েছে কুবের?’

দিঘির দিকে তাকিয়ে বলল, ‘জানি না।’ তারপর বলল, ‘খুব কালো হয়ে যাচ্ছি?’

‘কে বলল? নোনা হাওয়ায় এমন হয়ই—,’ দু-হাতে আভা কুবেরকে খুব করে ধরে ফেলার চেষ্টা করল। পিঠে হাত বোলাতে গিয়ে আদর ঢেলে দিল, ‘আমার একটা মোটে কুবের।’ তারপর গদগদ হয়ে গেল, ‘কে বললে কালো। তুমি হাজার দিকে মাথাটা খাটিয়ে হাঁপিয়ে হাঁপিয়ে উঠেছ। কী দরকার এত সব? যা দেখতে পারবে না—রাখতে পারবে না—তার পেছনে শুধু শুধু ছুটে কী লাভ!’

কুবেরের চোখের সামনে যতদূরে দেখা যায়—বোরো ধানের সবুজ গোছ মাথা ঠেলে উঠেছে। ক-দিনের মধ্যে সারাটা তল্লাটে আরও সবুজ হয়ে কালো মেঘ হয়ে উঠবে। তাদের গায়ে গায়ে বোশেখ মাসে আকাশ চলকে এসে পড়বে। এখনই কিছু কিছু বিয়েনকাঠি বেরিয়ে পড়েছে। দু-একটা গোল হতে শুরু করেছে। একটা থুঁত থেকে যাচ্ছে। মাঠময় সবুজের মধ্যে পাতার আলগা শ্রী গায়ে মেখে ঘোমটা-পোকাগুলো লুকিয়ে আছে। তাই গাছের ডগায় লালি ধরেছে।

টিনের মধ্যে এনড্রিন কালো জল পড়ে থাকে। খুব কড়া বিষ। জলে গুলে দিলে সাদা হয়ে যায়। তাতে গা-গুলোনো গন্ধ। পয়েন্ট থ্রি পেট্রোল ইঞ্জিন বসানো স্প্রেয়ারের ট্যাংকে ওষুধ ভরে নিয়ে কামলারা কাপড়ে নাক মুখ বেঁধে নেয়—তারপর ওষুধ ছিটোয়। ধানখেতের জলে ওষুধ পড়ে। সে জল গর্তে গিয়ে সাপের বাসায় পৌঁছোয়। কত সাপ যে এই করে সাবাড় হয়ে গেল!

মাটির শরীর ভালো রাখার জন্যে ভগবান কেঁচো দিয়েছে—হরেক রকমের পোকা দিয়েছে। তারা সময়-সুযোগ মতো খুঁচিয়ে খুঁচিয়ে মাটি ওলটপালট করে। নীচের মাটি ওপরে আসে—ওপরের মাটি নীচে যায়। ভগবানের তাবৎ কেঁচো—তাবৎ পোকা এনড্রিনের বিষে ফিনিশ।

কামলাদের রান্নাবান্নার ধুন্দুমার, রোজ রোজ গুড়ল বাঁশের গুলি খেয়ে পাখিগুলো বোধহয় আগেভাগেই কেটে পড়েছে। এখান থেকে কুবেরকে অন্তত তিরিশ হাজার মন ধান রেলস্টেশনের লঞ্চঘাটায় নিয়ে তুলতে হবে। নইলে এ খরচ পোষানোর কোনো পথ নেই। ব্যারেল-ব্যারেল পেট্রোল হাওয়া হয়ে যাচ্ছে। পাম্প থেমে নেই। এরই মধ্যে মাটি ফেটে চৌচির। কত জল যে আরও লাগবে তার ঠিক নেই।

সে এখন কুবের চকদার। কিছুকাল আগেও ছিল ড্রিম মারচেন্ট কুবের সাধুখাঁ। অনেক—অনেক আগে ছিল কুবের দ্য ভ্যাগাবন্ড। অনেক বছরের তফাতে প্রথম দেখাতেই সনৎ বলেছিল, 'তোর সেই হ্যাগার্ড লুকিং চেহারাটা কোথায়? খুব রেসপেকটেবল হয়ে গেছিস!'

মা, তুমি পালম বুনতে এক কাঠা জায়গা চেয়েছিলে!

আজ কুবের চকদারের পায়ের নীচে হাজার হাজার বিঘে জায়গা।

'কী হয়েছে কুবের? আমার গায়ের ওপর সবটুকু ভর দিলে আমি পারি? হাজার হোক তুমি পুরুষমানুষ তো। তোমাদের কাঠামোই আলাদা—'

কুবের তখনও সারা শরীরের ভার আভার বুকের ওপর ছেড়ে দিয়ে একখানা মূর্তি হয়ে কাত হয়ে পড়েছিল, 'আমার কী হয়েছে বলতে পার?'

'সে কথাই তো বলছি। অমন করে তাকাচ্ছ কেন? আমায় বলবে না?'

'তুমি আমার কে, যে বলতে হবে! এই যে বলছিলে—কী বিষ দিয়ে মারবে গো!'

'নাও ওঠো। পড়ে যাব। তোমার লোকজন মোষ চান করাতে জলে নেমেছে। ওরা উঠে এল বলে—'

কুবের সরে এল, 'আমি নিজেই বিষপাথর আভা। কোথাও তিষ্ঠোতে পারি না।' বাকিটুকু বিড়বিড় করে বলল। ডাঙায় আমার একটা বউ আছে। সৃষ্টিধর আছে। কুসুম আছে। এখানে আবাদে অন্যের বউ ভাগিয়ে নিয়ে পড়ে আছি। আমি কলবাড়ি বানাতে এসে জটের মধ্যে জড়িয়ে যাচ্ছি। চেয়েছিলাম মা, বাবা, বড়োবৌদি, নগেন, বীরেন ওরা আসবে। সব হাতের কাছে এগিয়ে দেব। ভদ্রেশ্বরও আমাকে ছেড়ে গেল। আমি আর ডাঙায় যাব না।

আভা। আমি তোমার শরীরে রোজ বিষ ঢেলে দিচ্ছি। তোমার আর নিস্তার নেই। কোনদিকে তুমি পা ফেলবে? সব জায়গায় আমার শরীরের রক্ত বয়ে যাচ্ছে।

সাক্ষাৎ যমের বাহন—মোষগুলো দল বেঁধে জল থেকে উঠে আসছে। সারি দিয়ে কুবেরদের বাঁয়ে রেখে এগিয়ে গেল। ভিনদেশি কামলাদের চোখে কুবের কখনোও বড়োবাবু, কখনোও ভগবান। তারা

ঠিকই করতে পারে না—এ লোকটার কত টাকা আছে। এতগুলো লোকের হপ্তা দেয়। হালের কাজ কবে শেষ। এখন নিড়েন চলছে, ওষুধ চলছে। সারও ছিটোনো হয় ক-দিন অন্তর।

ধান কাটার আগে দুর্গের ভেতর খানিক জায়গা পরিষ্কার করে নিতে হবে। রোজকার আছড়ানো ধান সেখানে তুলে রাখা হবে। সেদিকটা গোডাউন করে নিতে ত্রিপল চাই বড়ো বড়ো। 'ডাহুক' সেসব জিনিস আনতে রেলস্টেশনের লঞ্চঘাটায় যাবে। আরও পেট্রোল আনতে হবে—কেরোসিনও দরকার। ভদ্রেশ্বর কতকাল আসে না।

তাঁবুর ঘরের পেছনে পোড়া ছাইয়ের ডাঁই—সিগারেটের খালি প্যাকেট আর পাখির পালক ছড়ানো। ট্রানজিস্টারের কিছু বাতিল ব্যাটারিও পড়ে আছে। কুবের বুঝল, সবই মানিয়ে যাচ্ছে যতক্ষণ নদীর মাথা ঠান্ডা থাকে। জল খেপে উঠলে কী দশা হবে বলা যায় না। একটা বর্ষা এখানে কাটালে তবে বোঝা যাবে।

'পেয়ারা পেলে কোত্থেকে?'

'খোঁজ থাকলেই পাওয়া যায়—,' বলতে বলতে আধখাওয়া পেয়ারাটা আভা আঁচলের নীচে সরিয়ে নিল। কুবের বলতে যাচ্ছিল, পইপই করে বারণ করেছি আভা—এই অজানা জায়গার কোনো ফলপাকুড় আন্দাজে মুখ দেবে না। এ জায়গার সবটা এখনও আমারই দেখা হয়নি। খুব কম জানি এই দ্বীপের কথা। কিন্তু ফলটা লুকিয়ে নেওয়া, মাথা নীচু করে আভার হাসি—এসব দেখে ভেতরটা একটা টানা সুর তুলে ঝনাৎ করে থেমে গেল। ভাবল, তা নিশ্চয় হয়নি।

'আভা! আমার দিকে তাকাও।'

আভা মুখ তুলল না। কুবের কাঁপতে কাঁপতে বলল, 'মাথা তোলো। আমার একটা কথা আছে।'

'বলো না—শুনতে পাচ্ছি।'

'যা ভাবছি—হয়েছে?'

এবারে মুখ তুলে তাকাল। কুবের কোনো মানে করতে পারে না মেয়েমানুষের। যখন পুরোনো ব্যথায় ভেতরটা চুলকে ওঠে—তখনও ওরা কিছুই হয়নি ভাব দিয়ে হাসবে। 'কী ভাবছ, আমি জানব কী করে! হাত গুনতে জানি?'

কুবের দুই হাতে আভার কাঁধ জোর দিয়ে ধরল, 'এখন ইয়ারকির সময় না—হাসি রাখো—,' আভার দুই কাঁধের হাড় কুবেরের হাতের মধ্যে প্রায় মটমট করে উঠল।

হাসি নিবিয়ে আভা খিঁচিয়ে উঠল, 'আঃ! ছাড়ো বলছি। লাগে না!'

কুবের নিজেই বুঝল, তার গলার স্বর করুণ হয়ে উঠেছে, আবেদনের চেয়েও নিরুপায়, 'লক্ষ্মীটি—নষ্ট করার সময় নেই এখন। সত্যি কথা বলো। জানো আভা, আমি জেনে-শুনে আর একজনকেও এই এখানে আনতে চাই না—কিছুতেই না আভা। তুমি একটু কাইন্ড হও—ইচ্ছে করলেই পার—আমার

সবটাই ঘুণ ধরা কাঠ—গুঁড়িতে, শেকড়ে—ডালপালায় সব জায়গায় পোকাগুলো কুরে কুরে খাচ্ছে—'

শুনতে শুনতে আভা অবাক হয়ে তাকাল। সামান্য একটা ব্যাপার। তা নিয়ে এত লেকচার। কী হয়ে যাচ্ছে মানুষটা। আস্তে কুবেরকে ধরল, 'তোমার কী হয়েছে বলো তো?'

কুবেরের কথার তোড় বন্ধ হয়ে গেল। শেষে আস্তে বলল,—'তুমি তো সব জানো আভা। বলে দিলেই পার।'

'হুঁ। তাতে এত চিন্তা কীসের?'

জেতা লটারির টিকিট হারিয়ে লোকে এইভাবে বসে পড়ে। কুবের কোনো কথা বলতে পারল না। কামলারা দ্বীপে আসার আগে ডাঙা থেকে অনেক জিনিস সঙ্গে এনেছিল। তার মধ্যে মোটাসোটা একটা কালো বেড়ালও ছিল। ক-দিন খায়-দায় আবার জঙ্গলে গিয়ে হারিয়ে যায়। কী খেয়াল হয় ফিরেও আসে। দিঘির ওপারে যে একটা সজনে গাছ ছিল, এতদিন চোখেই পড়েনি। বসন্ত শুরু না হতেই ক-দিনের ভেতর ডালে ডালে ফুল সাজিয়ে গাছটা একটেরে পোজ দিয়ে দাঁড়িয়েছে। ফাটা ফাটা বাকলে ঢাকা গাছের গা বেয়ে বেড়ালটা ওপরে উঠতে চাইছে। এসব দেখে দিঘির এপার থেকেই কুবেরের গা শিরশির করে উঠল—তারই গায়ে সে থাবা বসিয়ে মাথায় উঠতে চাইছে। কষে কান মোচড়ানো তারযন্ত্রের কায়দায় টাইট হয়ে বসে আছে কুবের—এক বিন্দু ধুলো পড়লেই টং করে বেজে উঠবে। নানান ধারার মাংস পার হয়ে তার শরীরের মোটা মোটা হাড় গোড়াসুদ্ধ সরু একটা ব্যথায় চুলকোতে শুরু করে দিল।

'এই কুবের—'

পটাং করে উঠে দাঁড়াল মানুষটা। ভোরবেলা থেকেই এমন মানানসই সকালটা আস্তে আস্তে কোনদিকে যে যাচ্ছে—আভা কিছুতেই ধরে উঠতে পারছে না।

'এ তুমি কী করলে—'

দাঁড়ানো কুবেরের কথায় আভা কিছুই বলতে পারল না। চারিদিকের চেনা চত্বর, দিঘির ধাপ তারই বিরুদ্ধে চাপচাপ নিষ্ঠুর হয়ে পড়ে আছে। কারও কিছু বলার নেই।

'সবই তোমার হাতে ছিল আভা। তুমি সব জানতে!'

ক-মাস এমন অসম্ভব সুখের মধ্যে দিয়ে যাচ্ছিল। এদানী আভা আরামের মাথায় বিকেলবেলায় মেঘচাপা রোদ্দুরের আলোও দেখতে পেত। নোঙর করা 'ডাহুক', নয়তো 'বড়োবিলের' ডেকে চাঁদনি রাত দেখে নিজের হাতে বিছানা সাজিয়েছে কতদিন। সন্ধে হতেই কুবেরের দ্বীপের দুধলি ফুল তুলে বিছানায় ছড়িয়ে দিত। অমাবস্যার রাতে সাদা সাদা বুনো ফুল মাথায় গুঁজে তাঁবুর বাইরে হ্যাজাক বাতির কড়া আলোয় কারণে- অকারণে এটা ওটা আবার নামে বেরিয়ে পড়েছে আভা।

'সবই তোমার হাতে ছিল আভা—'

আভা বলতে যাচ্ছিল, কচি খোকা নও তুমি। আজকাল সে সুখের এ-পিঠ ও-পিঠ দেখতে পায়। সুখ তার বেলায় ভীষণ পাতলা।

‘কোথায় চললে—’

কুবের কোনো জবাব দিল না। হনহন করে চত্বর পার হয়ে, দিঘি পেছনে ফেলে মেদনমল্লর দুর্গের ভেতর চলে গেল।

আভা তখনও ডাকছিল, ‘কোথায় গেলে? দেখতে পাচ্ছি না যে—’,

এমন সব আরও অনেক কিছু বলছিল আভা। খানিক দূর শুনতে পেল কুবের। তারপর চওড়া চওড়া দেওয়াল ফুঁড়ে বাইরের পৃথিবীর কোনো কথাই ভেতরে গেল না। তখনও কুবের এগোচ্ছিল। দিনের আলো বাইরে পড়ে থাকল। নেহাত বেগে হেঁটে যাচ্ছিল—না হলে কুবের এতটা যেতে পারত না।

এখানে এখন আলো নেই—অন্ধকারও নেই। পরিষ্কার না হলেও কুবের কিছুটা দেখতে পাচ্ছে। আর এগোলে যদি দেওয়ালে ধাক্কা খায়। অনেক উঁচুতে আলোসুদ্ধ আকাশের খানিকটা দেওয়ালের ফ্রেমে ধরা পড়েছে। মেঝে ফুঁড়ে একটা আকন্দ গাছ ডালপালা মেলে ছড়িয়ে আছে। বাতাস নেই বলে নিস্তব্ধ। মেটে আলোয় জায়গাটা স্থির হয়ে পড়ে আছে। কুবের আর এগোতে পারল না। এখানকার ধুলো, এখানকার ঘাসে—কতকাল মানুষের পা পড়েনি। অথচ হয়তো এখান থেকেই জলপথে বেরোনোর খুঁটিনাটি ঠিক হত। খাবার জলের বড়ো বড়ো কলসি হয়তো ভরে রাখা থাকত।

কুবেরের সন্দেহ হল—আর কোনোদিন এই ঘরের পর ঘরের জঙ্গল ফুঁড়ে সে বাইরের আলোতে বেরোতে পারবে না। কেন যে হনহন করে ভেতরে চলে এল। এখন কোনদিকে যাবে। বাইরে মাঠময় ধানের গোছ। শিষ বেরোলে না-জানি কেমন দেখাবে। এখনও অনেক কাজ বাকি। দ্বীপের উত্তরদিকটা জঙ্গল হাসিল করে একে একে চাষে আনতে হবে। এক বছরে হবে না। অনেক সময় এক জীবনেও হয় না। সামনে তাকালে এখন কুবেরের সামনে শুধুই ভবিষ্যৎ। জমির পর জমি। যত দূর দেখা যায়—মাঠগুলো ঢেউ তুলে পড়ে আছে। শুধু তার ওপর দিয়ে হেঁটে যাওয়া বাকি। গেলেই দখলে এসে যাবে। পালটা দাঁড়াবার কেউ নেই। এমন কোনোদিন আসবে, যখন চাঁদ থাকতে থাকতে বেরিয়েও কুবের নিজের দখলের জায়গাজমি দিনের আলো ফুরোবার আগে হেঁটে কাবার করে উঠতে পারবে না।

অথচ এই সময় মেদনমল্লর চওড়া চওড়া দেওয়ালের গোলকধাঁধা ছাড়িয়ে যদি বাইরে বেরোতে না পারে—তাহলে কী হবে? এ আমি কোথায় পড়ে গেলাম? ‘আভা। আমি এখানে। শুনতে পাচ্ছ—এই যে আমি—’

চেঁচিয়ে দেখল, শুধু নিজের গলাই শোনা যাচ্ছে। এখনও অনেক যে বাকি। ‘আভা—আমি এখানে—’, কুবের মরিয়া হয়ে উঠল, ‘সাড়া দিচ্ছ না কেন আভা?’

একবারও খেয়াল হল না, সে নিজে নিজেই এই অন্ধকারে চলে এসেছে। বাইরে থেকে আর কিছু

শোনারও উপায় নেই। ঠিক তখনই আরেকজন খুব সাবধানে ভেতরে আসছিল। কুবেরেরই মতো সে-ও কোনোদিন দুর্গের এতটা ভেতরে আসেনি।

সৃষ্টিধর তখন বুলুর কোলে। কুবের লোহার কারখানায় কাজ করে। একদিন নাইট ডিউটির পর সকালে ফিরে বুলুর শাশুড়ির সঙ্গে পাশাপাশি বসে কুবের ছবি তুলেছিল। সে-সব দিনগুলো কোথায় গেল। বুলু পরিষ্কার বুঝতে পারে, বেশ ভালো ছিল তখন।

সেদিন ছবি তোলার কথা না। দোতলায় শোনার বড়ো ঘরের দেওয়ালে মায়ের সঙ্গে পাশাপাশি বসে কুবেরের ফটো টাঙানো। সালকের বাড়ি থেকে কয়েক মাইল পুবে এগোলেই গাঁয়ে চলে যাওয়া যায়। কোনো মেলা ভাঙার পর ছবিওয়ালা ঢাকনা দেওয়ার কালো কাপড়খানা কাঁধে ফেলে মালপত্র মাথায় নিয়ে ভোর-ভোর রাস্তা দিয়ে যাচ্ছিল। কারখানা- ফেরত কুবের লোকটাকে ডেকে বারোয়ারি উঠোনে এনেছিল। অনেক ছবি তোলার পর মায়ের সঙ্গে বসে ওই ছবিখানা তোলে। কে জানত! পরে এই ফটোই বুলুর শাশুড়ির শেষ ছবি হবে।

তখন কুবেরের মাথায় চুলের ঢাল কী কালো ছিল! অনেকখানি। মরা লোকের পাশে জলজ্যান্ত মানুষটা বসে আছে।

বেশি ভাবার সময় নেই বুলুর। লোকটা সেই যে ঘাপটি মেরে আছে—আর এদিকে আসার নাম নেই। ইদানীং কেমন হয়ে গেছে। হিসেব আর হিসেব। অথচ আগে কত মেলামেশা ছিল। একটু যে বসে দু-দণ্ড পেছনে ফিরে যাবে—ভেবে ভেবে পুরোনো দিনগুলো তুলে এনে দেখবে—তার ফুরসত নেই।

শীতকালে মাছের গায়ে একরকমের শ্যাওলা হয়। জাল ফেলে সেই শ্যাওলা ভেঙে না দিলে মাছ বাড়ে না—মরে যায় শেষে। বেড় জাল ফেলে জেলেরা শ্যাওলা ভাঙছে মাছের। দোতলার বারান্দায় দাঁড়ালেই এসব চোখে পড়বে।

লালচে মুলতানি গাইটা ক-দিন মুখে কিছু দিচ্ছে না। নতুন একজন দোহাল এসেছে। নাম গণেশ। গোরু-মোষ নাড়াচাড়া করে থাকে। খালের ওপারে নিজের খাটাল ছিল। ছেলেমেয়ে বউ নিয়ে খড়ে-গোবরে বেশ জড়িয়ে-মড়িয়ে ছিল। বাচ্চা হতে গিয়ে বউ কাবার। কুবেরের কাছে পাঁচশো টাকা চেয়েছিল। মোষ আনবে। সংসার চলছে না। রোজান দুধ গাহিকদের দিতে পারছে না। বলছে, 'বাবু টাকা দিবেন বলেছিলেন। দেখা করতে পারলাম না। আমি লোকটা কেমন শুধোবেন পাঁচজনের কাছে। গণেশ কারও চুংলি-চাপটি করে না।'

অর্থাৎ কারও নিন্দে করে না। চুগলি খায় না। অতএব সবাই তাকে ভালো বলবে।

ভালোরে জগৎ! বুলু কথা বাড়াতে দিল না। দেরাজ থেকে পাঁচখানা একশো টাকার নোট এনে দিল। গণেশ গলে যায় প্রায়। নুয়ে নুয়ে কৃতজ্ঞতা জানাল। কীভাবে টাকাটা ফেরত দেবে—কতরকম কিস্তি—সব বলল। বুলুর কানে কিছু গেল না। সে শুধু বলল, 'আমাদের এই নতুন গাইটা কিছু খাচ্ছে না

গণেশ—'

'ও ঠিক পানহাবে—এখুন বাঁট শুকিয়ে আছে। একটা শরবত করে খাওয়ান।'

শরবতের ফিরিস্তি দিল। আধসের ঘি, আধসের জিরে, আধসের গুড়—পাঁচ পোয়া জলের সঙ্গে ফুটিয়ে ভোরের বেলা খাইয়ে দিতে হবে। বাঁট দুধে সুলসুলাবে।

আজই ভোরে কুবেরকে বারবার মন থেকে তাড়াতে হচ্ছে বুলুর। এতদিনে সে কুবের, সৃষ্টিধর, কুসুম মিলে কদমপুরে প্রায় একটা প্রতিষ্ঠান হয়ে উঠেছে। কাগজে ব্যাংকের বিজ্ঞাপনে লেখা থাকে—আপনার আমানতের নির্ভরযোগ্য প্রতিষ্ঠান। হরিরাম সাধুখাঁর বংশ-পরম্পরায় কদমপুরে ছিটকে আসা সাধুখাঁদের এই টুকরোটুকু একটা প্রতিষ্ঠানই বটে।

কুবের একদিক থেকে ছড়িয়ে রেখে গেছে। বুলু অন্যদিক থেকে গুটিয়ে তুলতে পারছে না। গত বর্ষায় জানলার গ্রিলের এনামেল উঠে গেছে। জং ধরছে দু-চার জায়গায়। দিঘির ঘাটে ঘোরানো সিমেন্টের বেঞ্চ সারাদিন ফাঁকা পড়ে থাকে। চড়চড়ে রোদে কয়েক জায়গা ফেটেছে। দুটো কদমচারা বসানো হয়েছিল। ডালপালা মেলে ছায়া দিলে সখের ঘাটকে রোদের হাত থেকে বাঁচানো যাবে। একটা গাছ বাঁচানো যাবে না বোধ হয়। শুকিয়ে যাচ্ছে। কে বলেছিল, নীচে ধেড়ে ইঁদুর বাসা বেঁধেছে—সেগুলো তাড়াতে হবে।

হাঁটতে হাঁটতে বুলু কুবের স্টেডিয়ামের চত্বরে গিয়ে পড়ল। বিরাট কাণ্ড। অথচ লোকটা আজ ক-মাস বেমালুম গায়েব। গোড়ায় রাগ হত। কিছুদিন কান্নার মতো একটা জিনিস ন্যাকড়ার দলা হয়ে গলায় পাকিয়ে যেত। এখন কিছু হয় না। বিয়ে হয়ে ইস্তক দেখে আসছে—বাই উঠলে হল—তখন ফেরানো যাবে না কিছুতেই—কুবের তখন একটানা ঘোরে থাকে।

স্টেডিয়ামের কাজ বন্ধ হয়ে আছে হপ্তা দুই। সিমেন্টের ওয়াগন আসেনি। রাজগঞ্জপুরে নাকি স্ট্রাইক যাচ্ছে। ভালোই হয়েছে বুলুর পক্ষে। শুধু ভিত কাটানোর পর ঢালাইয়ের ওপর থেকে চার রদ্দা ইট গেঁথে তুলে ঠিকেদারমশাই থেমে আছেন। গাঁথুনির সেই গোল চক্করের মাঝে ইটচাপা ঘাস মুক্তি পেয়েই ফ্যাকাসে চেহারা নিয়ে রোদে ভাজা ভাজা হচ্ছে। ভিত না উঠতেই বিরাশি লরি ইট শেষ। চালানে যে কতবার সই হয়েছে বুলুর!

কাল রাতেও সাহেব অনেকক্ষণ ছিল—ঠিক ওই জায়গাতে।

বুলু অনেকবার বলেছে, 'এখান থেকে ওঠো। সাপ-খোপ থাকতে পারে।'

আগে লোকটাকে বুলু 'সাহেববাবু' ডাকত। কিছুদিন 'মিত্তিরদা'ও বলেছে। এখন কিছুই বলে না। সাহেব কখনো তাকে আপনি বলে, কখনো তুমি।

'সাপ আমাকে কামড়াবে না। তারা চেনে—'

'কীরকম!'

সাহেব একটুও থামল না। গড়গড় করে বলে দিল, 'এত ছাইপাঁশ কাজ করেছি সারাজীবন—বিষে আমার সারা গা ভর্তি।'

'এবার তুমি আবোল-তাবোল বলতে শুরু করবে জানি। আমি বরং উঠি—তুমি বসে থাকো।'

বলেও উঠতে পারল না বুলু।

হেসে ফেলল সাহেব, 'প্রায়ই পৃথিবীর বুকে গুলি করি আমি। পৃথিবীর গায়ে নানান জায়গায় গুলি করেছি—আঙ্কেলেশ্বরে, নাহারকাটিয়ায়—তেল উঠেছে গ্যাসের পেছন পেছন। রাস্তা দিয়ে মোটর গেলে ভাবি আমারই গুলি করা মরা-তেলের জোরে গাড়িটা ছুটছে। অথচ জানো—আমি মার্কসম্যান সাহেব মিত্তির জীবনের এক সন্ধেয় বাঁকুড়ার গাঁয়ে বিয়ের পিঁড়িতে বসে এমন গুলি খেলাম—আজও মরছি না, শুধুই এদিক-ওদিক যন্ত্রণায় আছাড় খেয়ে বেড়াচ্ছি—প্রাণটুকু বেরোয় না।'

'তখন তোমার বয়স কত ছিল—'

'কী আর এমন। সতেরো—জোর আঠেরো। বাঁকুড়া শহরের কলেজে পড়ি, হস্টেলে থাকি। ইয়ারকির মাথায় ফট করে প্রায় বাল্যবিবাহে বসে গেলাম। উপায়ও ছিল না। শুশুনিয়া পাহাড়ে গরম পড়তেই খরগোশ মারতে যেতাম ফি বছর। সন্ধেরাত। টর্চের আলো পড়তেই সাদা, নধর জিনিসটা থমকে দাঁড়াল। গুলি করলাম। গেমের পেছনে ছুটতে ছুটতে কতটা এসেছি খেয়াল নেই। কারও পোষা খরগোশ যে ষোলো বছরের একটা মেয়ে কাঁদতে কাঁদতে এসে হাজির। অসাবধানে তাকেও গুলি করে বসতাম। আমি তখন শিকারের আনন্দে শিকার করে বেড়াই। কমলার অভাবে পাকা টমেটো মুখে গুঁজে কতদিন সারাটা দুপুর দারুকেশ্বরের তীরে তীরে পাখির পেছনে ছুটেছি। ঝলসানো ঘুঘু বটপাতা দিয়ে ঘসে পোড়া লোম তুলে ফেলতাম—একা ঠিক দুপুরে বটতলাতেই কাগজ পেতে খেতে বসতাম—'

'তোমার বাবা মা—'

'আমার মাকে দেখিনি। বাবা ফিরে বিয়ে করে অকারণে অপরাধী হয়েছিলেন সারাটা জীবন। আমার দু-নম্বর মা কোনোদিন অযত্ন করেনি। আর আমি তো স্কুল লাইফ, কলেজ লাইফ হস্টেলেই কাটিয়ে দিলাম। কতটুকু আর তার কাছে ছিলাম। বাবাও থানায় থানায়—শেষ বয়সে এসআই থেকে ওসি হয়েছিলেন—রিটায়ারের বছর দুই আগে ডাকাতির তদন্তে গিয়ে আর ফেরেননি। সরকারের কত কাজ—একজন দারোগা কোথায় গেল, তার খোঁজ নেয় কে!'

'আর ফেরেননি?'

'অনেক ঘুরে আমি পেয়েছিলাম। তখন আর চেনা যায় না। ভাগ্যিস কোমরের বেল্টটা ছিল। নইলে চিনতে পারতাম না! শ্রাদ্ধ-শান্তি করে সেই যে ফিরে এসেছি—আর যাইনি। এমন মূর্খ ছিলাম জানেন—বাবাকে টাকা পাঠিয়ে মেসের ঘরের জানলায় মানি অর্ডারের রসিদ একটা পেরেকে লটকে রাখতাম। আমি তাঁর একমাত্র সন্তান—কীর্তিমান ছেলে রিসিট রেখে ডাকযোগে ভালোবাসা পাঠাত।'

‘তোমার মা?’

‘নিঃসন্তান বিধবা স্বামীর পেনশন পাওয়ার আগেই ভাইয়ের সংসারে মারা গেলেন। খবর পেয়ে কালীঘাটে নেড়া হলুম। ছুটি ছিল না বলে যেতে পারিনি। এখন শুধু এক জায়গাতেই টাকা পাঠাই। রসিদ রাখি না।’

বুলু তাকিয়ে আছে দেখে বললে, ‘কমলা মিত্তিরকে—আসলে কমলা বীরসা। ওর পৈতৃক পদবিতেই মানি অর্ডার করি। আগে গাঁয়ের লোক ধরে ধরে ইনিয়ে-বিনিয়ে চিঠি লেখাত। একবার শ্বশুরমশাই আমাকে ধরে নিয়ে যেতে এসেছিল। পুকুর আছে, ঘোড়া আছে, গোরু আছে, মুরগি আছে—কী নেই তার সংসারে। জমিজিরেতও খারাপ না। অনেক লোভ দেখিয়েছিল।’ একটু থামল সাহেব, সিগারেট ধরাল, ‘বাইশ-তেইশ বছর হয়ে গেছে। কমলার ছেলেপিলেও হয়েছে এতদিনে—’

বুলু ঝাঁকুনি খেল, ‘কার বললে?’

‘কমলার! ওদের ঘরে মেয়েমানুষ এতদিন পুরুষ ছাড়া থাকে না। ছেলে বয়সে আমি একটা ভুল করে বসেছিলাম বলে ও তার বোঝা বইবে কেন? বয়স থাকতে থাকতে অন্যজনের ঘরে উঠেছে—অবিশ্যি বলতে পারেন লিগালি কমলা এখনও হানড্রেড পারসেন্ট আমারই ওয়াইফ।’

‘টাকা নেয়?’

‘নেবে না কেন? আর বাজার যা পড়েছে। ওর ছেলেপিলের বাপকে দিয়ে একখানা চিঠিও দিয়েছিল। লোকটা বোধহয় শহরগঞ্জে চাকরি-বাকরি করে থাকবে। লিখেছিল—গমের কেজি এক টাকা তিরিশ। বাবুমশাই আপনি যদি বুঝসমঝ করে দশটা টাকা বাড়াই না দেন এ বাজারে পাঁচটি ছানাপোনা নিয়া শুখা পেটে মরিব। আমার পরিবারের ও-পক্ষ খুব বিবেচক। তাই না?’

‘আমার ও-পক্ষটি কিন্তু মোটেই বিবেচক নন। এ অবস্থায় দেখলে তোমাকে আগে, তারপর আমাকে বলি দেবে।’

‘কোথায়! আমি তো এমন কিছু করিনি। আজ মোটে আপনার কোলে মাথা রেখে শুয়েছি—’

‘মোটে?’

‘তা ঘাসে শাড়ি অমন একটু-আধটু নষ্ট হয়ই। আর আমি যে সাইট থেকে এতখানি ছুটে এসে গায়ের সবটাই ঘাসে রেখে মাথাটুকু তোমার কোলে রেখেছি বুলু—’

‘মাথা আবার এর চেয়ে বড়ো হয় নাকি সাহেব? সব মাথাই এতটুকু।’

সাহেব তড়াক করে উঠে বসল, ‘বুকে রেখে দেখো—অনেক বড়ো লাগবে।’

বুলু বাধা দিতে পারল না। সাহেব বাইরে বাইরে অনেকদিন ঘুরছিল। ভেতরে যাওয়ার পথ কোনদিকে জানে না। দেখলেও চিনতে পারে না। তাই সামনা-সামনি যতটুকু ছোঁয়া যায়, ধরা যায়—তার ওপরেই নিজেকে সবটা ঢেলে দিল। নিষ্ঠুর, স্থির, নিখুঁত লাগত বুলুকে। সেই শান্ত মুখের ওপরে ঠোঁট

খুঁজে নিয়ে সাহেব শেষ হয় না এইভাবে নিজের ঠোঁট অনেকক্ষণ চেপে রাখল।

'হয়েছে। এবার তো শান্তি!'

সাহেব ঘাসের ওপর আধো বসা অবস্থায় বুঝতে পারল না, বুলু চটে গেল—না, মেয়েলোক যেমন করে—ইন্টারভ্যালের জন্যে সময় দিয়ে রঙ্গ করে উঠে গেল।

'ওখানেই বসে থাকবে। খবরদার উঠবে না। আমি বাড়ি পৌঁছোলে তবে সোজা তোমার কাজে যাবে—,' বলতে বলতে বুলু প্রায় ছুটে চলে গেল। সাহেব দেখতে দেখতেই বলল, 'আমি সারারাত এই এখানেই বসে থাকব। আলো নিবিয়ে তুমি শুয়ে পড়লে তবে যাব।'

বেশ অনেকটা দূরে ঢালাইয়ের মশলার মিকশ্চার মেশিনটার পাশে বুলু দাঁড়িয়ে পড়ল—পাশেই কুবের রোড, তারই ছায়া সেখানেও লম্বা হয়ে পড়েছে, জোরে কথা বলা যাবে না, এই কুবের নগরের অধীশ্বরী তাই দাঁতে দাঁত চেপে বলল, 'আমি এই দাঁড়িয়ে আছি—চোখ ভরে দেখে নাও। দয়া করে ঠান্ডায় পড়ে থেকে কষ্ট পেয়ো না সাহেব—আমার শুতে শুতে অনেক রাত হবে। যত ইচ্ছে দেখে নাও আমাকে—', কান্নার কাছাকাছি একটা জিনিস আবার অনেকদিন পরে গলা বেয়ে উঠে আসছে, পরিষ্কার টের পেল বুলু।

এই সামান্য ব্যাপারে এত কান্নাকাটির কী আছে সাহেব একদম আন্দাজ পেল না। কিছু একটা গুরুতর হয়ে থাকবে। বুলুকে দেখা যাচ্ছে। ঘাসে আলো পড়ে সারা ব্যাপারটা কিন্তু একরকমের মনোহারি হয়ে উঠেছিল। পুরোনো অভ্যেস। চুমোটোমো না খেলে তেমন জুত হয় না। বুলুকে চোখে রেখে সাহেব লম্বা লম্বা পা ফেলে কুবের স্টেডিয়ামের ঢালাও চত্বর পার হয়ে গেল।

আগে যা ইচ্ছে তাই করা যেত। এখন আঙুলটুকু নাড়তে হলেও ভাবতে হয়। নয়ানের বউ বুলুদি বলে মাঝে মধ্যে আসত। কিছুকাল হল সেও আসে না। মাঝখানে কয়েকটা টাকা হয়ে চেনা মানুষজনের মাঝখানে একটা করে দাগ টেনে দিয়েছে। ইচ্ছেমতো চেঁচানোও যায় না।

স্টেডিয়ামের বাইরে মাটির উঁচু ঢিবিটা পার হতে ভোরের রোদে কুবের ভবনের সামনে দুটো জিনিস এক সঙ্গে দেখতে পেল বুলু। সৃষ্টিধর বুড়ো বক্সার কুকুরটার পিঠে স্কুলের ব্যাগ চাপিয়ে গোরুজ্ঞানে হেট হেট করছে—আর একখানা এক্কাগাড়ি এসে থামল।

গাড়িতে ব্রজ ফকির। চোখে গগলস। মোটা বেতের লাঠিতে ভর দিয়ে নেমে পড়ল। ইদানীং এদিক-সেদিক যাওয়ার জন্যে গাড়ি দরকার হয়। তেলপুকুরের বাছাড়বাড়ির বড়ো তরফ ব্রজ ফকিরের একজন এক নম্বর ভক্ত। গাড়িটা সম্ভবত তারই দান। রেলেশ্বর শিব আর তার সেবায়েতের শ্রীবৃদ্ধির খবরাখবর কদমপুর অবদি এসে পৌঁছোয় আজকাল।

বুলু তার স্বামীর এককালের ব্রজদাকে ঘরে নিয়ে বসাল। লোকটার সেই উড়োনচণ্ডী চেহারা আর নেই। পরতে পরতে চর্বি। রোদ পড়ে চিকচিক করছে। কাঁধের ঝোলা থেকে ভেলভেট-বাঁধাই একখানা বই বের করে টেবিলে রাখল, 'টাকা দিয়ে এসেছিলে—তাই নিয়ে এলাম। তুলে রাখো।'

বুলু বইয়ের নতুন চেহারা দেখে অবাক হল। আগে এর তুলনায় অনেক সাদামাঠা চেহারা নিয়ে বইখানা বেরিয়েছিল। রজনী দত্তর জীবন ও সময়।

'কুবের ফেরেনি?'

বুলু চুপ করে থাকল।

'আর তোমাদের দরকার কী? অনেক তো হল। এবারে ঘরে ফিরে জিরোতে বলো।'

'দেখা হলে আপনি বলবেন।'

'আমার কথা কুবের আগে কিন্তু খুব শুনত। একেবারে ওঠবোস করত।' থেমে গেল ব্রজ ফকির, তারপর ফিরে বলল, 'সেই যে কদমপুরে বেড়িয়ে যেতে বললাম—আর এখন! আমিই কদমপুরের বাইরে চলে গেছি। কুবেরও বিষয়-আশয়ের ঘোরে পড়ে কদমপুরের বাইরে বাইরেই কাটায়। আমরা যে যার ছড়িয়ে পড়লাম।'

'আপনি তবু শিব নিয়ে আছেন—'

'সেজন্যেই এলাম। মন্দির হয়ে এল প্রায়। মাসেককাল পরে নবগৃহে ঠাকুর-প্রতিষ্ঠা। অথচ আমার সাধিকা আজও বেপাত্তা—'

'কোনো খোঁজ পাননি বউদির?'

'একদম না। কোথায় যে গেল! ভাবলুম ঘুরে যাই—তোমার এখানে এসে যদি উঠে থাকে।'

বুলু জানে তার স্বামী দ্বীপে চাষ-আবাদে গেছে। সময় হলেই ফিরবে। কিন্তু নিজের বউ কোথায় গেছে জানে না—অথচ এতদিন চুপচাপ বসে থাকে। কেমন ধারার লোক। আগের দু-দুটোপক্ষের ছেলেমেয়ে দু-জায়গায় ছড়িয়ে আছে।

'পুলিশে খবর দিলেন না কেন?'

'লাভ নেই বুলু। আভা নিজে না ফিরলে কেউ তাকে ফেরাতে পারবে না। ভালো কথা—কুবেরের লোকজনও এদিকে আসেনি?'

'পেট্রোল আর পোকা মারার ওষুধ কিনতে লোক এসেছিল।

ঘরে বসে কথা বলা যাচ্ছিল না। রেফ্রিজারেটর কোম্পানির এস কে বোস জায়গা কিনেছিল কুবেরদের কাছ থেকে। এখন সেখানে ভিতের কলম ঢালাই হচ্ছে। লোকটা ক-তলা বাড়ি করবে কে জানে! জায়গার চেহারা এত তাড়াতাড়ি পালটে যাচ্ছে। মিকশ্চার মেশিনে সিমেন্ট, বালি, স্টোন চিপ জল দিয়ে মাখানো হচ্ছে। তার আওয়াজ সর্বত্র।

ব্রজ ফকির ঘুরে ঘুরে বাড়িটা দেখতে লাগল। কুবেরের ছবির সামনে খানিকক্ষণ দাঁড়িয়ে গেল। শেষে বলল, 'কলেজে পড়ার সময় আরও অন্যরকম ছিল। তবে ওর চোখ চিরকালই এমন—স্বপ্নে ভেসে

আছে সব সময়—কোনো কিছুর ছায়া পড়ে না—'

'বলুব মুক্তপুরুষ!'

খচ করে ঘুরে দাঁড়াল ব্রজ,' তোমার এত অভিমান কেন বুলু? পুরুষ মানুষ আগের দিনে দিগ্বিজয়ে বেরিয়ে কখনো আদৌ ফিরত না। রাজার সঙ্গে যুদ্ধে গিয়ে কত বীর বেঘোরে মারা পড়ত। আর তুমি তো ধান উঠলেই খবর পাবে—'

বুলু কোনো কথা বলল না। ব্রজ কুসুমকে দেখে কোলে তুলে নিয়ে বলল, 'সুলক্ষণা।'

তারপর বলল, 'কাল সাহেব এসেছিলেন?'

কোনো জবাব না পেয়ে ফিরে বলল, 'কখন গেল?'

এবার একটা যাহোক বলতে হয়। তাই বুলু বলল, 'যেমন যায়—'

'প্রায়ই আসে তাহলে—'

বুলু চুপ করে থাকল। এই মানুষই সাধ করে কুবেরদের কদমপুরে একদিন জমি দেখাতে নিয়ে গিয়েছিল। তারই সামনে কুবের সাধুখাঁ একে একে পালটাতে পালটাতে এখন এই আধখানা নগরের পত্তনদার। একেবারে ময়দানবের কাণ্ড। জেলেরা জাল তুলে তুলে পোনামাছের শ্যাওলা ভেঙে দিচ্ছে। সারি সারি দোকায় মুখ নামিয়ে দুধেল গাইগোরুগুলো তৃপ্তিতে চুনিভুসি মাখানো কুচো খড় খাচ্ছে। আলু খেতে নেমে সৃষ্টিধর মাটি সরিয়ে আলু তুলে আনছে। এই মানুষটাই জানে কুবের কোথায় ছিল আগে—এখন কোথায় পৌঁছে গেছে।

'মেসোমশায় আসেন না?'

'মাঝে মাঝে। শ্বশুরমশায় বিগ্রহের সোনার বেড় পরাতে আসবেন শনিবার। রবিবার অভিষেক ঠাকুরের।'

হঠাৎ দুখানা হাত চেপে ধরল ব্রজ, 'বিপদে পড়ে এসেছি বুলু। তোমরা আমার পুরোনো বন্ধু। তোমাদেরই সব বলা যায়।'

বুলু হাত ছাড়িয়ে বসতে বলল।

'বাইরে থেকে আমায় বোঝার উপায় নেই। অথচ ভয়ংকর দুশ্চিন্তায় ভুগছি কিছুকাল। কী হবে—কী করব, কিছুই ঠিক করতে পারছিনে।'

'খুলে বলুব না।'

'বলছি। কাউকে বলবে না—এই আমাকে ছুঁয়ে প্রতিজ্ঞা করো।'

বুলু ব্রজ ফকিরের গা ছুঁয়েই হাত সরিয়ে নিল। চন্দনের গন্ধ বেরোচ্ছে ভুরভুর করে। আতরও থাকতে পারে। জটা মাথায়—কিন্তু আগাগোড়া পরিষ্কার। ঠাকুরতলা বানানোর পর থেকে ব্রজ দত্ত ধীরে ধীরে

অনেক গোছালো হয়ে উঠেছে।

'বড়ো বিপদে পড়েই এসেছি আজ। কেউ জানে না—আমাদের রেলেশ্বর শিব উধাও—'

'কী বলছেন?'

'যা বলছি সত্যি। মন্দির তৈরি প্রায় শেষ। নতুন করে শিব বসবেন। অথচ কোথায় শিব! আভা চলে যাওয়ার পর দু-তিনদিন কোনোদিকে তাকাতে পারিনি। একটু সামলে নিয়ে পুজোয় বসতে গিয়ে দেখি রেলেশ্বর শিব উধাও!'

'সর্বনাশ!'

'শুধু সর্বনাশ! কোথায় খুঁজব? রোজ ভেবেছি—ঠাকুর গেছেন—নিজে নিজেই ফিরে আসবেন। বসে থেকেছি। ধ্যানে—ঘোরে—বাবা বাবা বলে কত ডেকেছি—তারপর ব্যাপারটা চাপা দেবার জন্যে ফুল, বেলপাতা, চন্দনে জায়গাটা পাহাড় করে রেখেছি। বাইরে থেকে বোঝার উপায় রাখিনি। কে আর ঘেঁটে দেখতে যাচ্ছে।'

'কিন্তু শিব প্রতিষ্ঠান দিন কী হবে?'

'তাই ভেবেই তো মরে যাচ্ছি।'

'যেখান থেকে পেয়েছিলেন—সেই কোন বাবার আশ্রম থেকে—তারা যদি এসে ফেরত চায়?'

এবার ব্রজ দত্ত সাবধান হয়ে গেল। ভগবান ঘেঁটে ঘেঁটে সে এখন অনেক সাংসারিক হয়ে পড়েছে। রেললাইনের পাথরের মধ্যে ওই বেঢপ খণ্ডখানা পেয়ে নিজেই নাম দিয়েছিল, রেলেশ্বর শিব। ঠিক মজা-পিয়ালির বুকের ওপর রেলব্রিজে উঠতে লক্ষ লক্ষ পাথরের মধ্যে টুকরোটা মাথা উঁচু করে পড়েছিল। পাগলা পিয়ালির ঢেউয়ের মাজা ভেঙে দিয়ে আগে কতবার রেলপুল বাঁচানো হয়েছে। সেজন্যে এককালে বড়ো বড়ো পাথরের চাঁই ফেলতে হয়েছে অনেক। নদী শুকিয়ে গিয়ে তার বুকে চাষ হচ্ছে। সেইসব পাথর টেনে টেনে পাড়ে তুলে ফেলা হয়েছে অনেক। তারই কোনো টুকরো হবে। নিজেই রটিয়ে দিয়েছিল শ্রী শ্রী ১১০ বাবার আশ্রম থেকে তার ওপর শিবসেবার ভার পড়েছে। সেই পাথরের টুকরোটাই তাকে এত দিয়েছে—দিচ্ছে।

'দানের বিগ্রহ ফেরত হয় না বুলু।'

তখন ব্রজকে কে আবার বিগ্রহ দেবে। নিজের নেই চালচুলো। এখন হলেও হতে পারত। তাই সেদিন নিজেই নাম দিয়েছিল, রেলেশ্বর শিব। ব্যাপারটা জানত আভা—আর খানিকটা সাহেব। দুজনের কে সরাতে পারে। শিব সরিয়ে কার লাভ—এটা কিছুতেই বুঝে উঠতে পারে না ব্রজ।

পষ্টাপষ্টি বলাও যায় না বুলুকে। ব্রজ দত্ত এখন দূর দূর তল্লাটের শিব সেবায়েত—তার ঘোর হয়, সমাধি হয়—লোকে বলে খ্যাপা মোহান্ত। অথচ শিবই নেই। সাধিকাও উধাও। কী বিপদ!

'সাহেব কিছু বলেছে তোমায়?'

'না তো!'

'অবিশ্যি একেও আমি বলিনি কিছু।' তারপর বুলুর দিকে তাকিয়ে পরিষ্কার বলল, এক দমকে, 'আমার জীবন যে কী হয়ে যাচ্ছে—অথচ কী ছিল! এখন আর আগের মতো দৌড়ঝাঁপ করতে পারি না। শতেক ঝামেলা। কেউ একজন পাশে থাকলে যে কত সুবিধে ছিল।'

'আগে বোঝেননি কেন! ঘরের মুড়ো ঝাঁটারও দাম আছে। ফেলে দিলে, হারালে কদর বোঝা যায়—'

'যা ইচ্ছে বলতে পারো বুলু। আপত্তি করব না। কিন্তু এখনকার মতো একটা পথ বলে দাও—কোথায় যাব? কী করব? কিচ্ছু ঠিক করতে পারছিনে—'

'আমি সামান্য মেয়েমানুষ। আমি কী করে বলব। ঠাকুর যেমন এসেছিলেন তেমন গেছেন। বুঝলে আবার ফিরে আসবেন।'

খুব ভয় ধরে গেল ব্রজর। কোনোদিন ঠাকুর-দেবতা নিয়ে নাড়াচাড়া করেনি। কিছুকালের অভ্যেস একদম পালটে গেছে। শেষদিকে রেলেশ্বর শিব স্বয়ং পাথরের ওপর তিন-তিনটে চোখ জ্বালিয়ে তার দিকে তাকিয়ে থাকত। চন্দন মাখানোর সময় খরখরে গা মোলায়েম লাগত ব্রজর। গরম পড়লে বেলপাতার পাহাড় সরিয়ে যাতায়াতের পথ করে দিয়েছে কতদিন। ভোগ সাজিয়ে দিয়ে দূরে বসে থাকত চুপচাপ। এই ঠাকুর এলেন—এই পিঁড়ে পেড়ে নিয়ে বসলেন, মুখে দিলেন। স্পষ্ট বুঝতে পারত—ব্রজ নিজেও অনেককাল শিবঠাকুরের চেলা। গাঁজা টিপে টিপে তার আঙুলের ডগা আসল রঙ হারিয়ে বসে আছে অনেকদিন।

লোহার চেন ক্রেনের মুখ থেকে মাটির নীচে নেমে যাচ্ছিল। ড্রাইভার একটা ভাঙা পাইপ এবার চেন টাইট করে ওপরে তুলবে। তেল খোঁজার পাইপ প্রায়ই এমন ভেঙে গিয়ে ভেতরে পড়ে থাকে। সেটা তোলা এক ঝামেলা। তখন লোকগুলোর দৌড়ঝাঁপ বেড়ে যায়। আজ আর কিছুতেই পাইপ উঠছে না। চেন কড়কড় করে আপত্তি জানাল। তারপর অনেকখানি মাটি ফেটে গিয়ে যা বেরোল—তা দেখে ব্রজর চক্ষুস্থির! চেনের শেষে তারই শিব। তবে আগের চেয়ে অনেক গায়ে-গতরে লেগে গেছে। মাটির নীচে পাথর ফুলে যায়? হবেও বা। ব্রজ নতুন বাঁধানো মন্দিরের চত্বর থেকে নীচে নেমে গেল এক দৌড়ে, 'আমার—মশাই শুনছেন—ও আমার শিব।'

ধড়মড় করে উঠে বসল ব্রজ। সন্ধে রাতে হাওয়া দিচ্ছিল। তাই কম্বল মুড়ি দিয়ে শুয়েছিল। ঘেমে জল। কোথায় শিব? বেলপাতার পাহাড় হয়ে আছে। ওর মধ্যে শিব নেই তা জানে ব্রজ। এ তল্লাটের লোকজনই শুধু জানে না।

জীবনে কোনোদিন ব্রজ খুব কাছাকাছি গিয়ে ঠাকুর-দেবতা এর আগে কখনো নাড়াচাড়া করেনি। ব্যাপারটায় যে এত মজা আগে জানা ছিল না। পাথরের গায়ে চন্দনের দাগ দিতে দিতে ব্রজ কতদিন একমনা হয়ে গেছে তার ঠিক নেই। আভা ফোড়ন কেটে বলত,'ভালোরে ভালো। মায়া পড়ে গেল?'

ব্রজ প্রথম প্রথম কিছু বলতে পারত না। তার এই নতুন ভালোবাসার কথা লোকজনের সামনে বলতে তার কেমন লজ্জা হত। এসব কি জোরে বলা যায়! একদিন বলেছিল, 'এ তুমি বুঝবে না আভা—'

'খুব বুঝি।'শেষে গুমোরে গুমোরে পা ফেলে ভাঙা চিমনিটার ওপরে গিয়ে বসেছিল আভা, তখন বোধ হয় সকালবেলা ছিল, ফট করে ব্রজকে বলে ফেলল, 'ছেলেপুলে যে পেটে ধরিনি খুব ভাগ্যি। না হলে কপালে শতেক হেনস্তা ছিল।'

'একথা বলছ কেন আভা? যে জিনিস আমার আর ভালো লাগে না—যাতে আর স্বাদ নেই তা কেমন করে করি। তুমিই বলো?'

খুব তীক্ষ্ণ গলায় আভা ফুঁসে উঠেছিল, 'ওরে আমার কচি গোঁসাইরে।'

মেয়ে লোকটা গেল কোথায়? এখন মাঝরাত। বাতিল চিমনির ভেতর দিয়ে হাওয়া বয়ে যাচ্ছে শব্দ তুলে। বন-ধোঁধলের জঙ্গলের আর কিছুই নেই। লোক চলাচলে এককালের নুনের কারখানার কবরখানায় হাঁটাপথের একটা আবছা ছাপ পড়েছে। এই মেটে জ্যোৎস্নাতেও তা চোখ এড়ায় না।

ব্রজর ভেতরটা হুহু করে উঠল। বাইরে বেরিয়ে এসে তেল খোঁড়ার বাতিঘরের কড়া আলোর মধ্যে পড়ে গেল। একেবারে খরখর করে চোখে লাগে। সামনেই স্বপ্নাদিষ্ট মন্দির। প্রায় শেষ। শিব আমদানি

থেকে মন্দির তৈরির জন্যে স্বপ্নে আদেশ পাওয়া—সারা ব্যাপারটাই কেমন গুজব আর মিথ্যের মিশেল দিয়ে পরপর খাড়া করে ফেলেছিল ব্রজ—কোথাও আটকায়নি। অথচ শেষে রেললাইনে কুড়িয়ে পাওয়া সেই পাথরখানা নিয়ে এত টান ভালোবাসায় পড়ে যাবে আগে কোনোদিন ভাবতে পেরেছে! রেলেশ্বর শিব নামটা দিয়ে নিজেই খুব একচোট হেসে নিয়েছিল মনে মনে। তারপর স্বপ্নে মন্দির প্রতিষ্ঠার আদেশ। আসলে নিজের জন্যে এই পৃথিবীর মাটিতে একটা পাকাপাকির দাগ টেনে নিতে চেয়েছিল বলেই এত কাণ্ড। না হলে আর এসবে তার আর কী দরকার ছিল!

রজনী দত্ত চেয়েছিল তার ছেলে থিতু হোক কোথাও। ব্রজ থিতু হয়েছে। কাঁহাতক আর ঘুরে ঘুরে বেড়ানো যায়।

'দু-জায়গায় সংসার পেতে আমার বেলায় ফুরিয়ে গেলে কচি গোঁসাই?'

এসব আভার শুধুই ঠাট্টার কথা নয়। কখনো খ্যাপা মোহান্ত বলেও ডাকত। ওই নামেই সে ইদানীং পরিচিত। আভা ফুট কেটে বলত, 'যে যাই বলুক—যে নামেই লোকে ডাকুক—আমি তো তোমায় সেই দুপুরবেলা থেকেই জানি। আমি ওসবে ভুলছি নে। সংসারে নামিয়েছ তুমি—এবেলায় সরে পড়লে চলবে কেন?

ব্রজ দত্ত জবাব দিত না বড়ো একটা। কী হবে দিয়ে? আভা, তুমি আমার ভেতরে ভেতরে বদলানোর কতটুকু জানো। আমি বদলাচ্ছি আভা। রোজ পালটে যাচ্ছি। পুরোনো কথা তুলে আমাকে পোড়াও। আমি আর গায়ে গা লাগিয়ে মাংসে, ঘামে একাকার হয়ে স্বাদ পাই না, সুখ পাই না। আগে আগে যা হয়েছে সব ভুলে যাচ্ছি।

'ব্যাঙাচির লেজ খসলে ব্যাং হয়—মোহান্ত হয় না গো বুঝলে!'

এমন তরল করেও হাসতে জানে মেয়েমানুষ। যা বলবে, ঠিক ওই চিমনিটার ওপর উবু হয়ে বসে বলা চাই। আর কি কোনো জায়গা নেই? তুমি শিব-সেবায়েতের বউ। রেলেশ্বর শিবের সাধিকা। সে কথা ভুলে যাও কী করে !

'আমি আভা। শুধু আভা, আগেকার সেই আভাই আছি। তোমার ওষুধ ছিল সরস্বতীদি।'

'গত জন্মের কথা তুলো না গো। পায়ে পড়ি গো। কী হবে ওসব কথায়। তোমার তো কোনো লাভ নেই। আমি নানান সংস্কারে জড়িয়ে ছিলাম। এক একটা গেরো আলগা হয়ে যাচ্ছে। কষি আলগা পড়তেই গায়ের ওপরে আগেকার সব দাগ হাতে ঠেকছে বটে—তবু ভুলেও যাচ্ছি, মিলিয়েও যাচ্ছে —'

'তবে আমাকে গোড়া থেকে এভাবে বানালে কেন?'

কেটে পড়ার আগে আভা এই ধারায় কথা চালাচালি করত খুব। নিশুতি রাতে বেপট জায়গায় দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে ব্রজ দত্ত মনের ভেতরে একা একাই চাপান-উতোর কাটছিল। কিন্তু একা কতক্ষণ পারা যায়!

আগেকার বউগুলো একে একে হারিয়ে গেল। এককালে ম্যাজিক দেখাতাম আমি। এসব সময়ের হাত সাফাই। টাইম দি মাস্টার ব্রেইন। মাস্টার ম্যাজিশিয়ান।

একবার নোবেল প্রাইজ পাওয়ার জন্যে ইংরাজিতে উপন্যাস লেখা শুরু করেছিলাম। সে বছর নোবেল প্রাইজের ছড়াছড়ি। রোজ সকালে কুবের ডিকটেশন নিতে আসত। মুখে মুখে বলে যেতাম। তখন চোখে ফলস চশমা থাকত সব সময়—ভারী ফ্রেম, পুরু কাচ। তখন আমি প্রফেসর দত্ত। 'জ্ঞানাঞ্জনী' নাম দিয়ে টিউটোরিয়াল খুলেছি মির্জাপুরে। এগারোখানা ঘরের পুরো বাড়ি। তিন শিফটে ক্লাস চলে। ঢালাও টাকা আসে। খরচাও দু-হাতে। সকালে ঘুম ভাঙবে ভালো কোনো বাজনা শুনে। তাই একজন দুস্থ সেতারি অ্যাপয়েন্ট হয়ে গেল। আমার কোর্ট মিউজিসিয়ান। তার বাজনায় ঘুম ভাঙত। সেতার থামিয়ে ছেলেটা গাঁজা টিপে দিত। তখন ঘোরে থাকতাম। মাস্টারদের মাইনে বাকি—বাড়ি ভাড়াও সাতমাস বাকি। এরকমই এক রাতে লেটারহেড, সিল, চাবি নিয়ে কেটে পড়লাম। কুবের জানে।

তখনই সরস্বতী আসে। তারপর থেকেই কত গেরো যে আলগা করে করে বেরিয়ে আসছি।

কিন্তু এখন এই একখণ্ড পাথরের টানে পড়ে এখানে হড়কে বসে আছি। অথচ টুকরোটা উধাও। মন্দিরের অয়ারিং শেষ। কানেকশন দিলেই ইলেকট্রিক আলোয় বেলপাতার পাহাড় ঠেলে রেলেশ্বর শিব উঁকি দেবে। ব্রজ তার ইট-সাজানো ঘরের খোপে ঢুকে গেল। নিবু হারিকেন কিছুতেই নেবাতে পারল না। কল ঘোরে না। তখন রাগে রাগে উলটোদিকে ঘুরিয়ে আলো করে ফেলল ঘরখানা। মেঝে থেকে প্রায় এক মানুষ সমান বইয়ের থাক। নতুন বাঁধাই হয়ে এসেছে। বাবার আত্মজীবনী। রজনী দত্তর জীবন ও সময়।

হাঁটকাতেই বাইশের পাতা খুলে গেল—

> 'জীবন জিনিসটি জীবনে একবারই ভাঙানো যায়। বারে বারে ভাঙাইলে তাহা খুচরার আন্ডিলে পরিণত হয়। তখন হাতে অর্থ থাকিবার নিশ্চিন্ত মনোভাব হারাইয়া যায়। বরং অর্থ বোঝা হইয়া দাঁড়ায়। চতুর্দিকে মন আছড়াইয়া ফেরে। তাই আমাদের নিজের নিজের মনকে একশো টাকার একখানি নোটের কায়দায় সযত্নে চারভাঁজ করিয়া রাখিতে হইবে। ঠিক করিব, সহজে এই ভাঁজ খুলিব না। খুলিলে ভাঙাইতে হইবে—ভাঙাইলে ফুরাইবে। আমি মন ছড়াইয়া পড়িবার বিপদের কথা বলিতেছি। একটি মনকে বন্টন করিলে তাহা শক্তি হারাইবে। বরং তাহাকে একত্র রাখিয়া এক জায়গায় নিয়োজিত করিলে শতগুণ কাজ দিবে। ব্রজর গর্ভধারিণী এই দিকটি বুঝিলেন না। জীবনে একটি রং-ই প্রবল। সেই রংটিকে দীর্ণ করিয়া একটি আলোক প্রজ্বলিত করাই শ্রেয়ঃ। তাঁহার মাথায় কিছুতেই এই সত্যটি আসিল না। আমি চাহিয়াছিলাম, সারাটা শীতকাল ঘানির সরিষা তেল ব্রজকে ভোলা ভোলা করিয়া মাখাইয়া ছাদে উপুড় করিয়া ফেলিয়া রাখি। তাহাতে শিশুর মাংসপেশী শক্তি অর্জন করে। স্বাস্থ্যই সর্বাগ্রে। তিনি বুঝিলেন না। বেবিসোপ নামে একটি খারাপ জিনিসেই তাঁহার গভীর আস্থা।'

সেইসব কাল কবে কেটে গেল। বাবা বলতেন, দেশবন্ধু গেলেন—আশুতোষ গেলেন—রবীন্দ্রনাথের

বয়স হয়ে যাচ্ছে। বাংলাদেশ খাঁ খাঁ করছে। কোনদিকে এগোব জানি না। এমন সময় সুভাষচন্দ্র এলেন। ব্রজ নিজেও সুভাষচন্দ্রকে দেখেছে। কী গায়ের রং! কী তেজ! এঁরা কেউ কি ভাবতে পেরেছিলেন—কলকাতার এত কাছে কদমপুরের কয়েক মাইলের মধ্যে দিশি সরকার একদিন পেট্রোলের খোঁজে মাটি খুঁড়তে লোক পাঠাবে! তাঁদের কাল আর এখনকার কাল—মাঝখানে অনেকগুলো বছর পড়ে আছে।

নতুন অয়েলটাউনের চেহারা এখান থেকেই খানিক বোঝা যায়। রাস্তা তৈরির বড়ো বড়ো রোলারগুলো জায়গা জায়গা জমাট অন্ধকার হয়ে পড়ে আছে। রাতেও লরি থেমে নেই। ঠিকেদারদের লোহা আসছে, বালি আসছে, পাথর আসছে। তবে সবই কুয়াশায় আবছা।

সাইটে হঠাৎ দপ করে আগুন ধরে উঠল, গ্যাস বেরোচ্ছে। আগুনের মাথা আট দশ ফুট উঁচুতে উঠে গেছে। উলটোদিক থেকে লোহার চেনে বেঁধে ঢালাই সিমেন্টের একখানা ভারী প্লেট টেনে এনে আগুনের মুখ চাপা দেওয়া হল। ব্রজ দেখতে পেল, সাহেব দাঁড়িয়ে। অনেকদিন কোনো কথা নেই দুজনে। সেদিন রাতে ব্রজ এক ঝটকায় ফেলে দিয়েছিল সাহেবকে। আভাকে কী সব খাইয়ে একবারে ঢিলে করে ফেলেছিল। তার পরে-পরেই মেয়েমানুষটা যে কোথায় গেল! শিবও নেই!

সকালেই সাহেবকে পেয়ে গেল। পুজোর দূর্বা, বেলপাতা আনতে গিয়ে সাইটের সামনে পোড়ো মাঠে দেখা। সাহেব চোখ ফিরিয়ে নিচ্ছিল।

'একা ক-টা জীবন নষ্ট করবে সাহেব?'

নাইট ডিউটির পর চা খেয়েই কাগজ আনতে গিয়েছিল। এখানে শহর ভালোভাবে গজালে বাড়িতেই কাগজ পাওয়া যাবে।

লাল চোখ তুলে ব্রজকে দেখল। ভারী একখানা মুখ। চিবুক, চোখের নীচে ভরাট গাম্ভীর্য দানা বেঁধে আছে। এইসব লোককে দিনেকালে লোকে সফল বলে। এই মানুষটিকে সাহেব নানান বর্ণে দেখেছে। এখনকার চেহারাটাই তার ভীষণ রকমের তড়িৎ বলে মনে হয়, 'সকালবেলা ফ্রেস মাইন্ডে এখন আমার কথা বলার ইচ্ছে নেই—'

ব্রজ এগিয়ে গিয়ে পথ আটকে দাঁড়াল, পায়ে খড়ম, হাতে ফুলতোলার সাজি, 'কদমপুর যাওয়া-আসা কতদিনের?'

সাহেব রুখে দাঁড়াল, হাতে হাতুড়ি থাকলে ব্রজর মাথা বরাবর সিধে বসিয়ে দিত। কিছুকাল সে নিজে দারুণ একটা স্নিগ্ধ নেশায় বিনবিন করে উড়ে বেড়াচ্ছে। তার নিজের পাখনা পাতলা একটা সুখে প্রায়ই আজকাল জড়িয়ে যায়, বুকের মধ্যে সবসময় কী হবে কী হবে ভাব। আগে কোনোকালে এমন হয়নি সাহেবের, 'কেন? তোমায় জবাবদিহি করতে হবে?'

'তোর হাত ধরে বলছি সাহেব—কুবেরকে আমি অনেককাল জানি। মানুষটা ভয়ংকর একা। বাইরের জিনিসপত্র অনেক কিছু বোঝে না। বড়ো সরল। জেনেশুনে তার কোনো সর্বনাশ করিসনে। ছেলেটা

আমাদের মতো নয়রে। কোনো ধাক্কাই সামলাতে পারবে না।'

সাহেবের কাছে কুবের এখন একটি দূরের পাহাড়। আবছা দেখা যায়, কাছে যেতে হলে হাঁটতে হবে অনেক। সেই পাহাড়ের একটি জলধারায় এখন সে আছে, 'এসব আমাকে বলার অর্থ?'

'সবই তুমি জানো বাছা। আমার আর তোমার মতো পোড়া গোরু ত্রিসংসারে তৃতীয়টি নেই।'

'আমাকে তোমার দলে টানছ কেন?'

'একই গোয়ালের বলে। আপত্তি আছে?'

সাহেব মিত্তির পাশ কাটিয়ে বেরিয়ে যেতে গেল।

ব্রজ ছাড়ল না। সামনা-সামনি দাঁড়িয়ে গেল, 'আরও একটি কথা আছে ভাই।'

'পথ ছাড়ো বলছি।'

'ছাড়ব, নিশ্চয় ছাড়ব। তার আগে কথা সেরে ফেলি। আমাদের কতদিনের আলাপ-পরিচয়! সে কি আজকের! তা ভাই যা বলব, তা কাউকে বলতে পারবে না—'

সাহেব খুব রেগে উঠেছিল। এবারে তেরিয়া হয়ে একটা কাণ্ড করে ফেলত। কিন্তু ব্রজ ফকিররের ঠান্ডা মোলায়েম গলায় অবাক হল। কী কথা থাকতে পারে তার সঙ্গে? আভা যে এখানে নেই, সে তো অনেকেই জানে।

'আমার স্ত্রীরত্নের কথা বলছি না। যেখানেই থাক একদিন ফিরে আসবেই। আমি অন্য কথা বলছি—'

সাহেব ভেতরে ভেতরে অধীর হয়ে উঠছিল। বুলুর কথা আর কী জানতে চাইতে পারে? যে তারায় আমি কোনোদিন যেতে পারব না—যে আলোয় আমি জেনেশুনে নেশাভরে তাকিয়ে থাকব শুধু—তার কথা আমি কী জানি?

'আমার রেলেশ্বর শিব উধাও হয়েছেন।'

'মানে?'

'পাওয়া যাচ্ছে না। সাহেব এ আমার বউ নয় যে, থানায় ডাইরি করে খোঁজাখুঁজি শুরু করব।' ব্রজর চোখে জল এসে যাচ্ছিল বোধ হয়, চোখ মুছে নিল, 'শেষ বলো, শুরু বলো, জীবনে আমার এখন এই একটাই নেশা সাহেব। ভগবান নিয়ে আগে তো কোনোদিন নাড়াচাড়া করিনি। ব্যাপারটা কী জানতামও না—'

'সব জেনে ফেলেছ?'

'তা আর বলি কী করে! মুখ্যু মানুষ। শাস্ত্র কী জানি না। নিজের মতো করে চন্দনে দাগাতাম। বেলপাতা চড়াতে চড়াতে কী যে হয়ে গেল সাহেব—'

সাহেব এক ধাতানিতে অন্যমনস্ক ব্রজকে ধাতে ফিরিয়ে নিয়ে এল, 'তোমাদের শিব-শিবানীর কাণ্ডে আমাকে জড়াচ্ছ কেন? আমায় যেতে দাও।'

ব্রজ এবার আটকাল না। কিন্তু এমন কথা বলল—সাহেব আর এগোতে পারল না, দু-পা গিয়েই মাটিতে গেঁথে গেল। 'সাহেব আমি আগে না জেনেশুনে অনেক ভালো জিনিস নষ্ট করেছি—শুধু শখের বশে, নেশার ঝোঁকে—কিন্তু কোনোদিন জেনেশুনে কারও ক্ষতি করিনি। আর তুই?'

সাহেব ফিরে দাঁড়াল।

'সাহেব তুমি একটি আস্ত শয়তান। নিজের খেয়াল মেটাতে শুশুনিয়ার পাহাড়ি গাঁয়ে বিয়ে করে বসলে। সাহস নেই যে বাপকে বলবে। সে বউও ঘরে তুললে না কোনোদিন। তারপর থেকেই জেনে-শুনে কত মেয়েকে যে ভুলিয়ে-ভালিয়ে কাছে টেনে এনেছ—ফেলে দিয়েছ, তার ঠিক নেই।'

'এই ভোরবেলা এসব বলার মানে? সেয়ানা ভাম কোথাকার!'

'যত গালাগালিই দাও সাহেব—আমি তোমার মতো জেনে-বুঝে এত শয়তানি কোনোদিন করিনি।'

ব্রজ ফকির উঁচু ঢিবির ওপর দাঁড়ানো। লাল আলখাল্লায় মহাপুরুষের পোজে খাড়া হয়ে আছে। এই সব লোক সবসময় সাহেবের পাশে পুরোনো ক্যালেন্ডার হাতে দাঁড়িয়ে পড়ে। পুরোনো তারিখগুলো এরা দাগিয়ে দাগিয়ে রাখে। কবে পূর্ণগ্রাস ছিল, কবে সাহেবের জীবনে রাহুমুক্তির প্রথম আলো ছড়িয়ে পড়ল—সবই এদের মুখস্থ। আমি যে এখন কী করি!

'আমিও বা জেনে-শুনে কবে কী করলাম ফকির সাহেব! আভাকে তো তুমি জেনেশুনেই—'

'শুধু ওই একটা কথাই ধরে বসে আছিস!'

'আর কোনটা ধরব বলো? সব কী আর জেনে-শুনেই করেছি! আমিও এক ঘোরে থাকতাম। ফলস্ ব্রাভাডো বলতে পার। কী দেমাক! ডাক দিচ্চি—আসছে। নাচতে বলছি—নাচছে। কম মজা! বলো? তুমি একজন পুরুষমানুষ—না হয় এখন মোহান্ত হয়েছ। বুকে হাত দিয়ে বলো তো তুমি হলে কী করতে?'

'মানুষ বদলায় সাহেব। ভগবানও বদলায়।' বলতে বলতে ব্রজ ফকির একটা কাণ্ড করে বসল। ঢিবির ওপরে দাঁড়িয়ে রাতজাগা লালচোখে আঙুল দেখিয়ে বলে বসল,'উঠে এস বলছি।'

সাহেব ভ্যাবাচ্যাকা খেয়ে গেল, 'কোথায়?'

'এই এখানে। আমার লেভেলে উঠে আসতে পারবে?'

ঢিবির ওপরে লাফিয়ে সহজেই উঠতে পারত সাহেব। কিন্তু 'লেভেলে'?

ব্রজ তখনও কথা বলে যাচ্ছে, ক্রেনের টঙে তোলা শুঁড় বরাবর চোখ। 'মনের এখানে দাঁড়িয়ে তুমি খোসা ছাড়ানো আলো অবধি দেখতে পাবে। আলোর গায়ের ছাল উঠে গেলে তা কত সুন্দর। ছাল-

ছাড়ানো আলো পরপর পুবে, দক্ষিণে, উত্তরে, পশ্চিমে টাঙানো—'

'নাটক হচ্ছে! রেলেশ্বর শিবের কাছে আমি তো মানত করতে আসিনি—'

'এসব দেখতে মানত লাগে না সাহেব। এসব দেখার চোখ আস্তে আস্তে তৈরি হয়। ভেতরে ভেতরে বদলে গিয়ে সেই চোখ ফোটে—'

বদলের কথা ব্রজ কতটুকু জানে। সাহেব তা নিয়ে আর টানাটানি করল না। তবে একথা ঠিকই, একটা লোক পালটায়। ওলটপালট হচ্ছেই। সূর্যের আঙটায় ঝোলানো এই দুনিয়াও প্রদক্ষিণের সঙ্গে সঙ্গে নিজেও ঘুরে নিচ্ছে। সেসব কথা ভূগোলেই আছে। কাঁটা বেছে মাছটুকু তুলে নেওয়ায় মতো প্রায় মানুষকেই সাহেব আলাদা করে ফেলতে পারে। আড়াইশো গ্রাম অভিমান, তিরিশ কেজি মাংস, হাড় —বারো কেজি আটশো। কিন্তু বুলু প্রায় সবটাই কোনো গভীর কিছুর নির্যাসেই ষোলো আনা তৈরি। তা বেছে বেছে আলাদা করা যায় না।

সেই উঁচু 'লেভেলে' ব্রজকে ফেলে সাহেব এগিয়ে গিয়েছিল খানিকটা। নিজে নিজেই ফিরে এল। 'বউদির কোনো খোঁজই করোনি? বেঘোরে কোথাও—'

'কপালে থাকলে হবে। আমার কি এখানে এসে শিবতলা বানানোর কথা ছিল?'

'তাও তো শিব উধাও। সত্যি কার এত বুকের পাটা? শেষে শিব লোপাট।'

অনেক দিন পরে সাহেব ব্রজর ঘনিষ্ঠ হয়ে পড়ছিল। মোহান্তর সমস্যা অনেক। বউ বেপাত্তা—শিব নিখোঁজ। এরই মধ্যে ব্রজ খুব আত্মীয়ের গলায় বলল, 'আমি বলি কী সাহেব—তুমি না হয় কদমপুর যাওয়া বিলকুল ছেড়ে দিলে। কী হয় না গেলে? মেয়েমানুষ কম তো ঘাঁটোনি।'

সাহেবের গায়ে ফোসকা পড়ে গেল। ফের এক কথা। কিছুই হয়নি—এইভাবে সাহেব চলে গেল। ব্রজ বাইরে ঢিবির ওপর সাত সকালে পড়ে থাকল। কিছু একটা যদি বলত সাহেব!

মেয়েদের কত সুবিধে। হাঁটতে শিখেই ব্রত, উপোস। পুণ্যের নামে কষ্ট করতে করতে অচলা ভক্তির আবহাওয়ায় গিয়ে পড়ে। তখন ভগবান দাও, ছেলে দাও, স্বামী দাও—সব কিছুর মধ্যেই একটা মানে খুঁজে পায়। পুরষলোক হয়ে ব্রজ দত্ত শুধু অবিশ্বাস করতেই অভ্যস্ত ছিল। কতবার কত ঢঙে কত রঙে নিজে নিজেই সাজল—অন্যদের বিশ্বাস করাতে চাইল, অথচ নিজে তখন আদৌ বিশ্বাস করে না। ম্যাজিশিয়ান ব্রজ, ব্রজ দি সেলসম্যান, নোটমেকার ব্রজ, প্রফেসর ব্রজ দত্ত, ডিরেক্টর ব্রজ।

ব্রজ কী! শেষে নিজেরই একটা মনগড়া সাজানো ব্যাপারে এমন জড়িয়ে গেল। এমন হবে আগে ভাবতেও পারেনি। কবে যে রেল লাইনে পাথরখানা কুড়িয়ে পেয়েছিল, তা আর মনে নেই। এখন শিব সেবায়েত ব্রজ মোহান্তর নামে মানিঅর্ডারে টাকা আসে। লোকে লাউটা মুলোটা দেয়। গোরুর দুধও আসে। এক্কায় চড়ে মাঝেমধ্যে এদিক-ওদিক যেতেও হয় ব্রজকে।

শিবসাধিকা আভা তো এই চেয়েছিল। নিশ্চিন্তি আর নিয়ম। না হয় কপালময় চন্দন মেখে সারাটা দিন

এলোচুলেই বসে থাকতে হত। আগের মতো তো দুশ্চিন্তার আর কিছু ছিল না আভার। সরকারি লোকজনও আর ধর্মস্থানে ঘা দেবে না। যতদিন আয়ু, শিবই সব জোগাবেন।

ব্রজ দেখতে পাচ্ছে, সাহেব তার নতুন কোয়ার্টারের বারান্দায় বেরিয়ে এল। এতদূরে হাওয়ায় গুঁড়োগুঁড়ো হয়ে সাহেবের গলার এক কলি গান এখানেও উড়ে এসে পড়ছে। কী যে হল ছোকরার!

সিঁড়ির নীচের রেক থেকে সু বের করে নিল সাহেব। কালি, তারপর বুরুশ। অবাক হয়ে গেল, জুতোয় বুরুশ বুলোনোর তালের সঙ্গে যে রবীন্দ্রসঙ্গীতই গায়—সব মিলে যায়। ক-টাই বা জানে। বাঁ গায়ের জুতোতে কালি দিয়ে বুরুশ হাতে নিয়েই গলা ছেড়ে দিল—'মনে রবে কি না রবে আমারে—সে আমার মনে নাই মনে নাই।' কথা গুলিয়ে গেল কিনা বুঝতে পারল না। কতকালের গান। বাঁকুড়ায় ক্রিশ্চিয়ান কলেজের হস্টেলে গরমকালে সন্ধেবেলা এসব গান গাইত। তখন চাপা গরম চিরে একরকমের হাওয়া বেরিয়ে পড়ত। গানেরও বয়স হল। একথা মনে হতেই সাহেবের শরীরের ভেতর দিয়ে সুর উঠে এল। তাতে এইমাত্র ভাবা কথা ক-টি বসিয়ে নিল সাহেব—আমার গানেরও বয়স হল। মরি মরি এ যে কতদিনের—আমার গানেরও বয়স হল। বুরুশ থেমে নেই। চলন্ত ট্রেনের চাকায় যেমন সুর থাকে—একেবারে তাই এসে গেছে বুরুশে। সেই সুরে যে গান ইচ্ছে বসিয়ে নাও। দু-পাটি জুতোর নাকই চকচক করছে। ঘরে ঢোকার একপাশে বারান্দায় আলগোছে জুতোজোড়া রাখল সাহেব। বেশ পূজনীয় দূরত্ব দিয়ে যাওয়ার সময় আরেকবার জুতোর দিকে তাকাল। একবার কুবের রোডে পা দেওয়া মাত্র ধুলোয় ভরে যাবে। কিছু করার নেই।

কোনোদিন দেখেনি এমন অনেক গাছ, ফুল, লতায় এই দ্বীপ ভরে আছে। ডাঙা থেকে পাখিদের সঙ্গে সঙ্গে অনেক চেনা গাছপালার বীজও এখানকার মাটিতে এসে পড়েছে। একটা অচেনা গাছই কাটা হচ্ছিল। ফুলগুলো মাদার ফুলের চেয়েও লাল। এসব কুবেরের অচেনা ডাঙার গাছপালা। এতদিন জানত—শুধু উত্তর থেকেই পাখি আসে। তা নয়। দক্ষিণ থেকেও আসে নিশ্চয়। নাহলে এইসব ফুল, এইসব ফল আসবে কোত্থেকে? কামলাদের একজনকে সাপে কেটেছে। কুবের চেয়েছিল—পেট্রোল মাখিয়ে জ্বালিয়ে দেওয়া হোক। শেষে ওদের ইচ্ছেই থাকল। ডাঙার মতো এখানেও দাহ। তাই গাছটা কাটা হচ্ছে। কুবের একটা সাপকে চেনে। কদমপুরে প্রথম জায়গা মাপার দিন সাপটা সারাক্ষণ ছিল। তার গর্তও চেনে। ভদ্রেশ্বরের সঙ্গে আলাপের দিনেও সাপটা এসেছিল।

শেকড়সুদ্ধ ওপড়াতে বিকেল হয়ে গেল। রসে ঢবঢবে হয়ে আছে গাছটা। তাতেই পেট্রোল মাখিয়ে আগুন তৈরি হল। জিনিস চড়িয়ে দিয়ে ওরা গুনগুন করে গাইছে—না, বোধ হয় মন্ত্রই পড়ছে কিংবা সুর দিয়ে কান্না—অনেকগুলো লোক উবু হয়ে বসে। কুবের তাঁবুর সামনে দাঁড়িয়ে সবই দেখছিল।

সন্ধ্যার অন্ধকারে বুকে খানিক জায়গা লাল আগুনে দাগানো। সে-দাগ বাতাসে গা ঢেলে দিয়ে এদিক-ওদিক অনেকখানি জিভ মেলে দিচ্ছে—আবার গুটিয়েও নিচ্ছে। কোন দূর দেশের লোক অচেনা জায়গায় এসে মাটি নিল। মেদনমল্লর দুর্গের গায়ে কত যে লতাপাতা, জানা-অজানা গাছের শেকড়—তাতে আগুনের আলো, কিছু অন্ধকার পড়ে প্রায়ই একটা রাজকীয় চেহারা নিচ্ছে। ওসব গাছগাছালিই অলংকার হয়ে উঠেছে। মাঝে মাঝে কুবেরের ধানের মাঠও আলো হয়ে যাচ্ছে।

এখন হাজার বিঘের ওপর জায়গা গাভিন-ধানচারায় ভরাট হয়ে আছে। একটা হিসেব ছিল কুবেরের। প্রতি গোছে কুড়ি-বাইশটা বিয়েন ধরলেও তার মধ্যে অন্তত বারো-চোদ্দোটা শিষ ছাড়লেই যথেষ্ট। বইয়ের অঙ্ক বলে—শিষ প্রতি একশো দশটা ধান চাই। গোছ প্রতি অন্তত বারোটা এমন শিষ চাই। বিঘে প্রতি ছেষট্টি হাজার গোছ চাই। তা হলেই ধানে ধানে ছয়লাপ হয়ে যাবে।

ফলন বাড়াতেই হবে। নাহলে ভরাডুবি। মজুর খাটানোর সময় কিছু আলগা দিয়ে কুবের ভুল করেছে। যেখানে জনপ্রতি দশগন্ডা বীজ ভাঙার কথা—কম হলেও সাত গন্ডা রোয়ার কথা—হাতে কলমে কিন্তু তা হয়নি। ফলে পড়তায় পোষাবে না। এক ফলন ভালো হলেই সব পুষিয়ে যায়।

নিড়েনই আসল। চারা বয়সে গাছের গোড়া খোয়ালি দিয়ে জখম করে দেওয়ার কথা ছিল। যত খোয়ালি তত বিয়েন। খনা বেঁচে থাকলে তাঁর বচনগুলো এখনকার মতো করে ফিরে লিখতেন। সেই নিড়েন সব জায়গায় সমান পড়েনি।

তারপর অনেক জায়গা হুড়ে গেছে। আনতাবড়ি ইউরিয়া পেয়ে গাছগুলো বেমক্কা বেড়ে গেছে। ঘন

কালো হয়ে উঠেছে। তাতে আর শিষ ধরবে না। শুধুই খড়। আবার অনেক জায়গা ডেবে গেছে। সেসব জায়গায় বেঁটে বেঁটে শিষ ধরেছে। ভালো করে লাঙল দেয়নি। মাটি শক্ত হয়ে যাওয়ায় ধানচারা শেকড় ছড়াতে পারেনি।

তবে আগাগোড়াই শিষের গায়ে নোলকের স্টাইলে সাদা রেণু রেণু ফুল ঝুলে আছে। এখন সবসময় মন্দ মন্দ বাতাস চাই। শিষগুলো এদিক-ওদিক দুলবে। ভোরের ঠান্ডা হাওয়ায় ভবিষ্যতের ধানের খোল আলগা হয়ে মুখ খুলবে। তার ভেতরে ফুল ঝরে পড়বে। তাই ঝড়-জল এখনকার শত্রু।

দক্ষিণ থেকে বাতাস উঠলে মেদনমল্লর দুর্গ তার বন্ধু। অনেকটা হাওয়া দুর্গ একাই বুক দিয়ে আটকাবে। ধীরে সুস্থে ফুল পড়ে পড়ে ধানের শিষের খোলগুলো ভরে যাক। তারপর যত ইচ্ছে বাতাস ওঠে উঠুক। কোনো পরোয়া নেই। কিন্তু এখন?

ধানের কথা ভাবতে গিয়ে কুবেরের মাথার ভিতরে আগুন ধরে গেল। তিরিশ হাজার মন। লঞ্চঘাটার বাজারে সুবিধে দরে ছেড়ে দিলেও—ওরে বাবা! ভাবা যায় না। অনেক টাকা। ষাট টাকার নীচে নিশ্চয় মন নামবে না। অত টাকা একসঙ্গে গঞ্জ জায়গায় নাড়াচাড়া করাও খারাপ। খুব ময়লা জামা-কাপড় পরে ঘুরে বেড়াতে হবে। কোনোক্রমে টাকাটা একবার কলকাতায় নিয়ে গিয়ে ব্যাংক ছড়িয়ে দিলেই হল। তারপর ধীরে-সুস্থে নাড়াচড়া করো। পৃথিবীতে কোথাও কোনো মনের মতো সিন্দুক পায় না কুবের। ব্যাংকের এত গর্ব। বিজ্ঞাপনে লেখা থাকে—নিরাপদ আমানতের জন্য। যদি কলকাতায় ভূমিকম্প হয়? তাহলে মাটির নীচের সিন্দুকগুলো কোন পাতালে চলে যাবে। ব্যাংক সারা জীবনেও তা হলে খদ্দেরদের দেনা শুধে উঠতে পারবে না।

এই এত বড়ো দ্বীপ সামলানোর লোকবল কুবেরের নেই। দ্বীপে কাঠ ছিল, মধু ছিল, জলে মাছ। দলদলে মাটিতে যা বসাও, তাই ফলবে। আসলে জায়গাটা তোমার নিজের। হেঁটে বেড়াও—নিজের জায়গায় হাঁটছ। হরিরাম সাধুখাঁর সঙ্গে কুবেরের পরিচয় হয়নি। পাঁচ পুরুষের ব্যবধান। দেখা হলে কয়েকটা কথা জেনে নিত কুবের। মশায়, আপনি কত সব করে গেছেন। একবারও ভেবেছেন, চোখ বুজলে সেসবের গতি কী হবে? অবিশ্যি ওকথা ভাবলে কিছু হয় না। আজ যদি নগেন, বীরেন তার পাশে থাকত। নিজের লঞ্চ। গঞ্জে গিয়ে তিন ভাই মিলে কারবার করত। একা কত দিক দেখবে। তবু ওরা আসবে না। সেই পায়রার খোপ। অফিস থেকে ফিরে চান করে ড্রেসিং টেবিলের আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে পাউডারের পাফ বুলানো। পৃথিবীর সবচেয়ে সস্তা আমোদ—সিনেমার দুখানা অ্যাডভান্স টিকিট পকেটে করে বউ নিয়ে অন্ধকার ঘরে বসে ছবি দেখা। খবরের কাগজে শীত কতটা পড়ল, গরম কতটা বাড়ল, রেল অ্যাকসিডেন্টে কতজন সাবাড় হল—ভোরের চায়ের সঙ্গে তাই পড়তে পড়তে প্রাতঃকৃত্য, দাড়ি কামানো। একেবারে সোপকেস লাইফ! অথচ কুবেরের মাথার মধ্যে সবসময় একটা না একটা ব্যাবসার বুদ্ধি ফরফর করে ধরে উঠছে। টাকা কোনো প্রবলেম নয়—প্রবলেম লোক। কুবেরের নিজের লোক বলতে একদম নেই।

অবেলায় ঘুমিয়েছিল আভা। ট্রানজিস্টর বন্ধ করতে ভুলে গিয়েছিল। ইংরাজিতে কীসব বলছে।

বাইরে দাঁড়িয়ে কুবেরও শুনতে পেল। 'ওয়েদার ইন দ্য বে'। বাকিটা কানে গেল না। ঢবঢবে আভা খুব ঢিলে গলায় জানতে চাইল, 'শেষমেশ আগুনেই দিলে? আমার কথাটা রাখলে পারতে।'

আজ সকালে গাছে কুড়োল বসানোর আগে আভা বাধা দিয়েছিল। ক-দিন আগে গাছটার আধখানা বাজ-পড়ে শুকিয়ে গিয়েছিল। কিন্তু বাকি আধখানায় রসের জোর ছিল। তাই মরতে মরতেও বেঁচে উঠছিল। এই অবস্থায় কুড়োল বসানো আভা চায়নি। তার কথা—সাপে কেটেছে। বেশ তো জলে ভাসিয়ে দাও। আয়ু থাকলে জেগে উঠবে।

'হাঙর-কুমিরে খাওয়ার চেয়ে আগুনে খাক।'

কুবেরের কথায় আভা চোখ বড়ো করে তাকিয়েছিল, 'তোমাদের কোনো দয়ামায়া নেই।'

'দয়ার শরীর তোমার একার।'

কোন কথায় কুবের এ কথা বলছে—আভা জানে। কুবের অনেকবার বলেছে—'দয়া করো আভা। আমাকে একটু দয়া করো। আচমকা আমার বাচ্চা পেটে ধরার কোনো দরকার ছিল না তোমার। ইচ্ছে করলেই কলকাতায় গিয়ে মুক্ত হয়ে আসতে পারতে।'

আভা রাজি হয়নি। এখন তার পা, কোমর ভারী হয়ে এসেছে। বিকেলে অন্ধকার কেমন করে একটু একটু করে আলো গিলে খায়—ছড়িয়ে পড়ে—তা স্পষ্ট দেখতে পায়। গাছগাছালির সবুজ পাতায় ধুলো পড়লে টোকা দিয়ে সরিয়ে দেয়। সবসময় একটা রসস্থ নেশা তাকে ঘিরে আছে। তার ভেতরে বসে কোনো দুশ্চিন্তাকেই আমলে আনবে না আভা।

এই কিছুকাল আগেও সন্ধে রাতে জ্যোৎস্নায় দুর্গের ভাঙা খিলানের নীচে দাঁড়িয়ে কুবের দুই হাতে তাকে টেনে নিয়েছিল—বিশাল ঘুমের সাগর ঠেলে কুবের সাধুখাঁ মাথা তুলে দাঁড়াল সবে—তারপরেই তাকে নিয়ে লঞ্চের পাটাতনে দুধলি ফুল-ছড়ানো বিছানায়—সবই জলছবি হয়ে একের পর এক আভার বুকের ঠিক দু-ইঞ্চি গভীরে ছাপা হয়ে পর পর পড়ে আছে। তখন আভা জীবনে প্রথম সুখের দেওয়ালগুলো একে একে পার হয়ে যাচ্ছিল। মনে হচ্ছিল, এর পরেও কিছু আছে—আরও আছে। কোনো শেষ নেই।

কেন যে সেইসব দিন শেষ হয়ে গেল। কত অল্পদিনের জন্য সেসব দিন এসেছিল। একা দুর্গের চত্বরে ঘুরে বেড়াতে বেড়াতে আভা মেদনমল্লর প্রায় পৌরাণিক বাথানের গায়ে পেয়ারা গাছটাকে পেয়েছিল। সে গাছ কেউ কোনোদিন নাড়া দেয়নি। ফল হয়, পাকে—পাখিরা ঠোকরায়—একদিন পেকে পড়েও যায়। আভাই সেদিন প্রথম ডাঁশা দেখে একটা ফল নিয়েছিল। তাতে কীসের থেকে কত কাণ্ড। আজকাল আর তেমন গা গুলোয় না। ব্যাপারটা তার সয়ে এসেছে।

কুবেরের ভেতরটা কিন্তু সবসময় কুরে কুরে খেয়ে যাচ্ছে। মুখ দেখেই বুঝতে পারে আভা। অনেক বুঝিয়েছে, 'তাতে কী কুবের—তোমার তো কোনো অসুবিধে নেই। কুকুর-বেড়ালের মতো আমিও না হয় একটা বাচ্চা ধরলাম পেটে। কে জানবে কার ছেলে! কাউকে না বললেই হল! এত বড়ো পৃথিবীর

কোথাও থেকে যাবে।' দম নিয়ে ফিরে বলেছে, 'যতদিন বয়স আছে—সে ক-টা দিন তো এমনিই থাকতে দেবে!'

এখানে আভা খোলা-চোখ কুবেরের দৃষ্টির নীচে গিয়ে মুখ তুলে ধরেছে, 'আমায় একটা চুমো খেয়ে দেখো—গা ছুঁয়ে দেখো—আমি এখনও টাটকা। বিকেলে গা ধুয়ে চুল বেঁধে দাঁড়ালে তোমার লুকিয়ে হলেও ফিরে ফিরে দেখতে হবে। চোখ ফেরাতে পারবে না—,' এসব জায়গায় আভার গলা ফেটে কান্না বেরিয়ে পড়ত।

কিন্তু ও-তরফ থেকে কোনো সান্ত্বনা আসেনি। কুবের একটা কথাই ফিরে ফিরে বলেছে,'দয়া করো—আভা ইচ্ছে করলেই তুমি পারো। দয়া করো।'

'ভয় নেই। তোমাকে বাবা ডাকবে না।'

'তোমাকে তো মা ডাকবে—'

একটা তেকোনা পাথরের সবখানি তির হয়ে শরীরের ভেতর গেঁথে গেলেও আভা এতটা ব্যথা—এতখানি সুখ একই সঙ্গে পেত না। 'তোমার তো আরও ছেলেমেয়ে আছে। আমি এ জিনিস আগে কোনোদিন পাইনি। থাকলই বা আমার!' তারপর না থেমেই কুবেরকে সোজাসুজি বলেছে,'পুরুষমানুষ আমি চিনি কুবের। কখন আমাকে নিয়ে নাচে—তাও জানি। বয়স হলে তাড়িয়ে দিয়ো। তখন একটা জায়গা ঠিক করে নিতে পারব।' মুখে আর কিছুতেই বলতে পারল না—সেদিনও নিশুতি রাতে চলন্ত লঞ্চের ডগা থেকে আমায় ঘুমন্ত অবস্থায় পাঁজাকোলে তুলে এনেছিল।

'তুমি নিজেই তো তোমাকে রাখতে বলেছিলে। কদমপুরের বাড়িতে। মনে নেই? সেই একদিন দুপুরবেলা—সাহেব মিত্তিরের কী ছুটোছুটি—'

'সব মনে করে রেখেছ!'

ভুলিনি বলেই তো যত মুশকিল। আমার সৃষ্টিধর আছে—কুসুম আছে। আমি নেহাত জাল অনেক ছড়িয়ে ফেলেছি—গুটিয়ে তুলতে পারছিনে বলেই তাদের কাছে যেতে পারছি নে।' এরপর কুবের নিজের মনের মধ্যেই নিজেকে বার বার ছিঃ! ছিঃ! বলল। এইবার মনে হচ্ছিল—যা বিষয়-আশয় হয়েছে—সৃষ্টিধর, কুসুমকে দিলে দু-ভাগ হবে। তারপরেও নতুন কেউ এলে তেভাগ। তখন সৃষ্টিধর বঞ্চিত হবে কিছুটা, কুসুমও হবে।

বাতাসে গা ভাসিয়ে পেট্রোল-মাখানো আগুন এদিক-ওদিক লাফাচ্ছিল। তাই কখনো ছায়ায়—কখনো আলোয় কামলাদের গুনগুনানো কান্না—দলবেঁধে বসার জন্যে দলাপাকানো এক স্তূপ মানুষ—সব কিছুই শোনা যাচ্ছিল, দেখাও যাচ্ছিল। আজ সারাটা দিন কুবের আলে আলে ঘুরেছে। কোথায় জল বেশি, কোথাও একদম নেই—নিজেই দেখে ফিরেছে। মাইনে করা লোকের ওপর—দিনমজুরির কামলাদের ওপর সব কিছু ভার দিয়ে চোখ বুজে বসে থাকা যায় না। এই লোকগুলো কত সস্তা। আসলে মানুষ কত সস্তা। দিনমজুরির টানে কোন সেই শালবনি, চন্দ্রকোনা আরও ওপাশের লোক

একটানা মাস চারেক কাজের লোভে এতদূরে ছুটে এসেছে। তবুও পৃথিবীতে রোজ লোক হচ্ছে, জন্মাচ্ছে। এই অবস্থায় সে আর একবার বাবা হয় কী করে? সব ব্যাপারটাই গণ্ডগোলের। নিজের ছেলে বলতে কুবের বোঝে সৃষ্টিধর। তার একটা ভালো নাম একদা দিয়েছিল। সে নাম আজ তার নিজেরই মনে নেই। নিজের মেয়ে বলতে কুবের বোঝে কুসুম। বউ বলতে বোঝে বুলু। কতদিন এদের দেখিনি। আমি কী করতে এসেছিলাম এ-তল্লাটে। সবাইকে নিয়ে নিশ্চিন্তে থাকব। আজ কেউ আমার জন্যে বসে নেই। আমার মতো করে ভাবারও কেউ নেই।

আভা দেখল, কুবের নয়—তার পাশে কালো রঙের একখানা পোড়া কাঠ দাঁড়ানো। রোদে রোদে কুবেরের আর কিছু নেই। আগুনের আলোয় পরিষ্কার দেখা যাচ্ছে, মানুষটার গায়ে কালচে শ্যাওলা ধরেছে আগাগোড়া। মাথার চুলগুলো খাড়া খাড়া, চোখ লাল—বড়োসড়ো একটা প্রাণীর মতো লম্বা লম্বা বিশ্বাস নিচ্ছে, ফেলছে। ইদানীং এত কাছের মানুষকেও আভা ঠিক চিনে উঠতে পারে না।

'আজও তুমি দুর্গে থাকবে? বিকেল থেকেই কেমন হাওয়া দিচ্ছে দেখেছ।' আভা বাকিটুকু বলতে পারল না। জোর বাতাসে তাঁবুর ছাদ শব্দ করে ওপরে ওঠে আর নামে। জলের চেহারা ভালো নয় বলে দুপুরবেলাতেই 'ডাহুক' আর 'বড়োবিল' বাঁকের মুখে খাঁড়ি দেখে কিছু ভেতরে গিয়ে নোঙর ফেলেছে। আর আজই সাপেকাটা মানুষটাকে এই তাঁবুর সামনেই পোড়ানো হল। হাজার হোক আমি মেয়েমানুষ।

কুবের যেদিন জানল, আভার ভেতরে আর একজন মানুষ আসছে—সেদিন থেকেই, আভা বুঝতে পেরেছে, কুবের তাকে রাস্তার মাঝখানে বসিয়ে দিয়ে স্টেশনে ফিরে যাচ্ছে। সে আর যাবে না। গোড়ায় বিশ্বাস হয়নি আভার। আগাগোড়া এমন সুখে ভেসেছিল। ক-দিন পরে সুতোয় টান দিয়ে দেখে ছিঁড়ে গেছে কোথাও। রাতে কামলাদের ক-জনের তাঁবুর সামনে শোয়ার ব্যবস্থা করে সেই যে কুবের দুর্গের ভেতরে গিয়ে ঢুকেছে—মাঠে নামার সময় বেরোয় শুধু। আভা বলে যে কেউ এখানে আছে, কুবেরের মুখ দেখে তা বোঝারও উপায় নেই।

'আজও তুমি দুর্গে থাকবে? রাতে ভীষণ ভয় করে আমার—'

কুবের বিড়বিড় করে কী বলল। হাওয়ার দাপটে কিছু শোনার উপায় নেই। ঠিক এখুনি আবার কুবেরকে ঘাঁটাতে ভরসা হল না। সেদিন ভরদুপুরে আভার মুখে তার নিজের সুখের খবরটা শুনে এমন দড়িছেঁড়া বেগে মেদনমল্লর দুর্গের ভেতরে ছুটে গেল। খানিক পরে ভাঙা খিলান, থাম, তিনদিক ফাঁকা একাকী দাঁড়ানো একখানা বড়ো দেওয়ালের পেছনের অন্ধকার ঠেলে কুবেরের থ্যাঁতলানো গলা ভেসে এসেছিল। ভয় ধরে গেলেও আভা বসে থাকতে পারেনি। আন্দাজে গলার আওয়াজের পথ ধরে গিয়ে কুবেরকে পেয়েছিল।

মেঝের ফাটল দিয়ে একটা বড়োসড়ো আকন্দ গাছ ঠেলে উঠেছে। অল্পস্বল্প আলোয় বেগুনি রঙের ফুল না ফল—কীসের পাতলা গুঁড়ো-মাখানো নিথর পুরু পাতাগুলোর মধ্যে একটু একটু জ্বলছিল।

সেই ভাঙাচোরা মেঝের ওপর কুবের হাল ছেড়ে দিয়ে বসে আছে। আভার হাঁটুতে কুবেরের গা লেগে গেল। তবুও লোকটা চমকালো না। আন্দাজে কুবেরের মাথায় হাত রাখল। বাড়ির পুকুরে ভাসানের পর লক্ষ্মী-সরস্বতীর পরচুলাও এত সহজে খুলে আসে না। কুবেরের মাথা থেকে আভার হাতে পটাপট কয়েক গুছি উঠে এল, 'কী হচ্ছে এখানে বসে বসে—'

আভা কোনো জীবন্ত প্রাণী নয়। দিঘির ধারে সারি দিয়ে পরিরা এভাবে দাঁড়িয়ে আছে। কুবের কোনো স্তব্ধ জিনিস ধরে ধরে উঠে দাঁড়াল। আভা তার চোখ চিনতে পারল। এত তাড়াতাড়ি দৃষ্টি কী করে ঘোলা করে ফেলে। অন্যসময় আভা তার সব কিছু নিয়ে কুবেরের হাতে পড়লে ব্যাপারটাকে ভালোবাসার ঘাঁটাঘাঁটি বলে ধরে নিত। লোকে তাই নেয়। তাতে সুখ থাকে। এখন যেভাবে কুবের তাকে ছুঁয়ে ছুঁয়ে হাতড়াতে হাতড়াতে ওপরে উঠে এল—তাতে শুধু ভয়ই ধরে গেল।

'আমার জীবনে একটা স্যাড ঘটনা—স্যাড এক্সপিরিয়েন্স বলতে পারো—তখন বয়স কম ছিল, কিছুই বুঝতাম না। আমি গোড়া থেকে বলছি আভা—'

'হয়েছে। এখন বাইরে চলো তো—'

'আমাকে বলতে দাও।'

'পরে বলবে। এখানে অন্ধকারে বসে বসে চেঁচাচ্ছিলে কেন?'

'আমি পথ হারাতে চাচ্ছিলাম আভা। আসলে পথ পাচ্ছিলাম না। যেদিকে যেতে চাইনি—সেদিকেই চলেছি। এখনও ধানে দুধ আসেনি। কত কাজ পড়ে আছে। অথচ তুমি কোনদিকে নিয়ে যাচ্ছ আমাকে। বাঁচাও আমাকে আভা। ইচ্ছে করলেই দয়া করতে পারো—'

আর কোনো কথা বলতে না দিয়ে আভা ভূতগ্রস্ত কুবেরকে একরকম টানতে টানতে খোলা চত্বরে এনে ফেলেছিল। সামনেই দিঘি। আলো ফেটে গিয়ে সেখানে সব কিছু জ্বলজ্বল করছিল।

কুবের পরিষ্কার আলোয় আভার গলায় হাত রাখল। দশ ঘোড়ার পাম্পের সাকসন পাইপ। টেঁটিয়ার মতো সিধে হয়ে সেই পাইপ মাথাটা তুলে ধরে আছে। সেই মাথায় নাক, চোখ, কান লাগানো। আভার কানের দুল, মাথার বেণি দুর্গের ভেতরকার পড়ন্ত আলোর সঙ্গে ঝুলে পড়েছে। ভাঙা খোঁপার ভেতরে এই বেণিটাই ছিল। সব সময় দেখা যায় না।

'কী করছ? লাগে না গলায়?' মাথা ঝাঁকিয়ে আভা তার গলা কুবেরের থাবার ভেতর থেকে বের করে নিল, 'কী হয়েছে তোমার! অমন পাগলের মতো তাকাচ্ছ কেন?'

'তুমি বুলুর কী জান?'

'কিচ্ছু না! অমন কথার পিঠে কত কথা বলে লোকে। তাই তুমি ধরে বসে আছ এখনও। আমি আর দাঁড়াতে পারছি না। শরীর ভালো নেই।'

অন্য দিনের মতো আভা সহজেই যেতে পারেনি। দুজনে অনেকক্ষণ সেইভাবে দাঁড়িয়েছিল।

কুবেরের সাজানো খেতখামার, অনেক আশার চাষাবাদ—কয়েক সেকেন্ডে একটা আস্ত ব্যর্থ কাণ্ডকারখানার চেহারা নিয়ে ফেলেছে।

সেই থেকে কুবের দুর্গের চত্বরে থাকে। মাথার ওপরে তাঁবু—তিন দিকে দেওয়াল—সামনেই দিঘি।

রেডিয়োতে বেশ বলে—ফেয়ার ওয়েদার। স্লাইট রাইজ ইন নাইট টেম্পারেচার। এখানে খ্যাপা হাওয়ার সঙ্গে পাল্লা দিয়ে ট্রানজিস্টর সারাক্ষণ চেঁচায়। তাতে গান থাকে,বাজনা থাকে, খবরও বাদ যায় না—মাঝে মাঝে আবহাওয়ার বিজ্ঞপ্তি। কুবের লক্ষ করেছে, কিছুকাল একজন মাত্রাতিরিক্ত চন্দ্রবিন্দুর মিশেল দিয়ে খবরাখবর বলে। সেদিন বলছিল—মাদৃভাষা, আদমো-জিগমাবা। একের নম্বরে বেতার কৌমুদি!

আভা তখনও দাঁড়িয়ে। কুবের এই বাতাসে দুর্গের পুরু দেওয়ালের আড়ালে থাকবে, না বাতাসে তোলপাড় তাঁবুর ভেতরে গিয়ে আভার সঙ্গে রাত কাটাবে? এই জিনিসটি পরের বউ। দশ ঘোড়ার পাম্প—যেমন আছে, যে জায়গায় আছে—সেখান থেকে বারো চোদ্দো মনের জিনিসটা বাতাসে উপরে তুলতে পারবে না। ধানচারাগুলো নুয়ে নুয়ে পড়বে ঠিকই—কিন্তু শেকড় উপড়ে তুলে বাতাসে তাদের ছন্নছাড়া করতে পারবে না।

‘আমি দুর্গেই থাকব আভা। সামনেই আছি—ভয় কীসের?’

‘তাই বলে আমি এই ঝোড়ো রাতে একা একা তাঁবুতে কাটাব?’

‘শেষ রাতে সেদিন লগুঘাটায় স্লিপার বেয়ে বেয়ে ডাহুকে উঠে আসতে তো আটকায়নি?’

‘তুমি মানুষ!’

‘কে বলল! আমরা কেউ কি আর মানুষ আছি! কোনোদিন ছিলাম হয়ত!’ তারপর আগুনের দিকে আঙুল তুলে কুবের বলল, ‘লোকটার ঘরবাড়ি,বউ, ছেলেমেয়ে আছে নিশ্চয়ই। দিনমজুরি খাটতে এসে কাবার হয়ে গেল।’

আভার মুখে একসঙ্গে অনেক কথা এসেছিল। বাতাসের দাপটে দাঁড়ানো যায় না। তাঁবুর ভেতরে চলে গেল। সবই তো বোঝো বাছা। তোমার আয়ু সাত মাস। মাথায় কাজ নিয়েছ সতের বছরের। আশার শেষ নেই। লোভের শেষ নেই। তাঁবুর ভেতরে একটুও হাওয়া ঢোকে না বলে বাতির শিখা যাকে বলে একেবারে নিষ্কম্প। ঢাকা দেওয়া খাবার গরম করে নেয় রোজ। আজ আর উঠতেই ইচ্ছে হল না আভার।

মেদনমল্ল অনেক ইট দিয়ে দুর্গটা গেঁথেছিল। কাদায় মশল্লায় এখানকার চেয়ে অনেক খুদে খুদে ইট অনেক বর্ষার জল খেয়ে পাথর হয়ে আছে। বাইরের বাতাস সেখানে আমল পায় না। কুবের শুয়ে শুয়ে তাঁবুর ফাঁক দিয়ে এক চিলতে আকাশে তাকিয়ে ছিল। মাঝে মাঝে তারা খসে পড়ছিল। কোথায় কে মারা গেল! বাবা কেমন আছে কে জানে! জনকপুরী খয়ের আর সাদা তামাক দিয়ে পান খায়

দেবেন্দ্রলাল। কুবেরের কাছে একটা ভালো হামানদিস্তে চেয়েছিল। দাঁত প্রায় নেই। পান আজকাল ছেঁচে খায়। পাতলা ঠোঁট লাল হয়ে থাকে।

কিছু বেশি রাতে কুবেরের ঘুম ভেঙে গেল। বাতাসের দাপাদাপি সুবিধের ঠেকছে না। সাত ব্যাটারির বন্দুকমার্কা টর্চ জ্বেলে দেখলে, সদ্য সদ্য সাদা ফুল-ধরা ধানের শিষ খেতময় পাগলা বাতাসের সঙ্গে লুটোপুটি খাচ্ছে। কুবেরের বুকের ভেতরটা ছ্যাঁত করে উঠল সঙ্গে সঙ্গে। সর্বনাশ! সব গেল!

কামলারা ঘুমোচ্ছে। এখন ডাকলেও সাড়া দেবে না। কী একটা সন্দেহ হল। টর্চ নিভিয়ে একা একাই খেতের গা ধরে ধরে নদীর মুখোমুখি গিয়ে দাঁড়াল। যা সন্দেহ করেছিল ঠিক তাই। বহু দূর ধরে জল খেপে উঠে অনেকটা ওপরে উঠে এসেছে। আর হাত দুই উঠলেই বাঁধ ফেটে গিয়ে জল ঢুকে পড়বে মাঠময়। কষের চেয়েও অন্ধকার বেশি ঘন। হাওয়ার মুখোমুখি রুখে দাঁড়ানো যায় না। অন্যদিনের মতো আজও রাতে পাম্প দুটো চলছিল। রাতে চললে ইঞ্জিন কম গরম হয়। জোরে হাঁটলে পা হড়কে যেতে পারে। পেট্রোল ট্যাংকে কাঠি ঢুকিয়ে দেখল। অন্ধকারে ঠিক বোঝা যায় না। তবু মনে হল, তেল বড়ো বেশি পুড়ছে। স্পার্কে টিনপ্লেট চেপে ধরতেই বটবট করে পাম্প থেমে গেল। হাওয়ার গতি ভালো নয়। বৃষ্টির ফোঁটা বড়ো বড়ো হয়ে পড়তে পারে। তখন গরম ইঞ্জিনে জল পড়ে যে কোনো কাণ্ড ঘটতে পারে। দুটো পাম্প বন্ধ করে দিয়ে ত্রেপল চাপিয়ে দিয়ে ফিরে আসছিল কুবের, 'তুমি? এখানে?'

'টর্চের আলোর ঝলক দেখেই বুঝেছি—তুমি উঠেছ—'

'তাই বলে অন্ধকারে এতটা এসে ঠিক করোনি।'

'ভেবেছিলাম অতবড়ো গাছটা চিতায় জ্বলছে—সহজে নিববে না, আলো পাব। যা হাওয়া কিছুই টিকছে না—'

কুবের এখন একটা বিরাট সর্বনাশের নিরুপায় দর্শক। ভোরের রোদে যেসব ফুল ধানের খোলে পড়ে ক-দিনেই দুধ হয়ে যেত, গাছ শুকিয়ে হলুদ হলে পাকা ধান হত—তার সবই বোধহয় আজ রাতে খ্যাপা হাওয়ায় ঝরে যাবে। এত কাঠখড় শুধু শুধুই পোড়ানো হল।

'কিছুই আর থাকবে না আভা। শেষ অবদি বিঘে পিছু হাঁড়িমাপা ধান হয় কিনা সন্দেহ।'

'কিছুই থাকবে না? বলেছিলে, হাওয়ায় হাওয়ায়, পাখি নয়তো ফড়িংয়ের ঠোঁটে, নখে, পায়ে ফুল গিয়ে ধানের ভেতরে পড়ে—ধান হয়।'

'এ তো হাওয়া নয়। এ যে ঝড়! কিছু থাকবে না আভা, সব ঝরে যাবে। ধানে দুধই ধরবে না—'

কুবেরের চোখ দেখতে পাচ্ছিল না আভা। তবু বুঝতে পারল, কুবের ভেতরে ভেতরে কী হয়ে যাচ্ছে! আগে বালি নষ্ট হলে একখানা ইট অসাবধানে ভেঙে গেলে কুবের মনে মনে কিউবিক, হাজারের দর নিয়ে অঙ্ক কষে দেখত—কত পয়সা গেল। তারপর আস্তে আস্তে কুবেরের একটা অভ্যেস হয়ে গেছে।

চুপচাপ গচ্চা খেতে পারে। নিঃশব্দে সর্বনাশ বুক পেতে নিতে পারে। কারবারে ওঠাপড়া আছেই। এতকাল এই কথাটাই নিজেকে বুঝিয়ে এসেছে কুবের, কিন্তু আজ—

এই নিশুতি রাতে, অচেনা দ্বীপের বুকে দাঁড়িয়ে কুবের বারবার বুঝতে পারছে—এই নদী, এই মাটি—বাতাসের দাপাদাপি, ভগবানের পোকামাকড়—সবকিছুর হাতে সে শুধুই একটা পুতুল। তার শুধু কাজ করে যাওয়া ছাড়া কোনো উপায় নেই। কোনো রাস্তা নেই।

যা ভেবেছিল—সেই বৃষ্টিই এল। দূরে এক সঙ্গে কোথায় নদীর বুকে কোটি কোটি জলের দানা, শিলের কুচি পড়ে খই হয়ে ফুটছে। অন্ধকারেই কুবের দাঁড়িয়ে পড়ল। ছবিটা তার চেনা। কদমপুরের বাড়িতে দোতলার বারান্দায় দাঁড়িয়ে কতবার দেখেছে।

আভা দাঁড়াতে দিল না, 'ছুটে এসো। ভিজবে নাকি এখানে দাঁড়িয়ে—'

'তুমি যাও।'

'পাগল নাকি! তোমায় ফেলে যাব আমি? চলো বলছি। এই শরীরে দাঁড়ানো যায় না কুবের।'

সেদিন দুপুরের পর থেকে কুবের আভাকে খানিক ঘেন্না দিয়েই দেখতে শুরু করেছিল। আসলে হয়তো ঘেন্না নয়। তার সব কাজের মাঝখানে মূর্তিমতী বাধা একেবার। একরকমের আক্রোশ তৈরি হচ্ছিল আভাকে নিয়ে। ভেতরে ভেতরে সে সব সময় ছুঁসছিল।

আভার পেছনে কুবের তাঁবুতে এল। বাইরে এত দাপাদাপিতেও আলোটা ঠায় জ্বলছে। তাঁবুর ওপরে এখন অকালের বৃষ্টিধারা হয়ে ভেঙে পড়ছে। বাইরে ছুটে গিয়েও কুবের এখন দ্বীপজোড়া সর্বনাশের এতটুকুও আটকাতে পারবে না। দামে ভরাট দিঘির মাঝখানে পদ্মপাতাগুলো নিশ্চয় বাতাস পেয়ে উলটে উলটে যাচ্ছে। মেদনমল্লর দুর্গ-ধোয়া জল আগাগোড়াই বাগানের ঢালু গা বেয়ে তোড়ে নাবাল জমিতে গিয়ে পড়ছে। এই সর্বনাশটুকু তার জন্যে এতদিন ওত পেতে বসেছিল। ক-দিন আগেও আকাশের গায়ে এতটুকু মেঘের চিহ্নও দেখা যায়নি।

বাইরে তাকাতে পারল না কুবের। এখন তার সাধের চাষ-আবাদের ষোলো আনা বাতাসের পায়ের নীচে, জলের দয়ায় পড়ে আছে। কত জায়গায় বিঘের পর বিঘে ধানের গোছ কোমর ভেঙে শুয়ে পড়েছে। ঝরা ফুলগুলো এবার ফড়িং খুঁটে খুঁটে খাবে। জল শুকোলে পোকামাকড় উঠে আসবে। কামলারা এতক্ষণে উঠে বসেছে। আপাতত খানিক ছাদের জন্যে তারা মোটা খিলানের গায়ে একমাত্র দাঁড়ানো বিরাট দেওয়ালটার আড়ালে গিয়ে মাথা তুলে তুলে আকাশের ভাবগতির আন্দাজ নিচ্ছে।

ভিজে সপসপে জামাটা কতকাল গায়ে আছে কুবের জানে না। অনেক দিন পরে আভা আজ আবার এই নিশুতি রাতে দিব্যি তরতর করে চলাফেরা করছে। এতদিন পরে কুবের যে আবার তাঁবুতে আসবে—তাও প্রায় এক ডাকেই—আভার একদম বিশ্বাস হচ্ছিল না, 'নাও এই শাড়িটা পরে নাও।'

আভার বোঁচকায় কী আছে কী নেই—কেউ বলতে পারে না। আদ্যিকালের সেই ব্লাউজটার লেসের

ঝালর-বসানো একটা হাতা বাইরে ঝুলে আছে। কুবেরের একটা আমলের সাক্ষী এই ব্লাউজ। ড্রিম মারচেন্ট থেকে চকদার—কুবের সাধুখাঁর এই লম্বা রাস্তার অনেকখানিই আভা সঙ্গে সঙ্গে আছে। আজ কিছুকাল এই মেয়েমানুষটি তার সঙ্গিনী।

কলকাতার কোনো ফ্ল্যাটের সন্ধেবেলা—এইভাবে, প্রায় কিছুই হয়নি পোজে আভা মাথা ঘষে, শাড়ি পালটে আলোর সামনে চুল বাঁধতে বসল। বাইরে তখন, কুবের একেবারে নিশ্চিন্ত হয়ে গেল, কোনো শিষেই দুধ ধরবে না—সব ফল ঝরে যাবে, এখনই যাচ্ছে, কিছুই থাকবে না। হাজার হাজার মন ধানের হাতছানি দেখতে দেখতে কুবের এতটা পথ এসেছে। ভদ্রেশ্বর তাকে এই রাস্তায় নামিয়ে দিয়ে সেই যে কবে কেটে পড়েছে! ধানের দর এবার আরও পড়তে পারে। এতদিনকার ড্রিমসেলার কুবের সাধুখাঁ এবার নিজেই ধানের ঘোরে পড়ে, টাকার স্বপ্নের মাথায় দুলতে দুলতে কদমপুর থেকে মেদনমল্লর দ্বীপে এসে পড়েছে।

‘পা মুছে শুয়ে পড়ো। সারারাত দাঁড়িয়ে থাকবে নাকি! চুল বাঁধা হয়ে গেলেই আলো নিবিয়ে দেব।’

কুবেরের মুখে কোন কথা এল না। সারাটা দিন, তারপর এই টানা রাত—সবটাই কুবেরের খারাপ যাচ্ছে। কাপড় পালটে সবে দাঁড়িয়েছে, আভা বলল, ‘পুঁটুলিটা দাও না গো—’

কুবের ভেতরে ভেতরে ক্ষয়ে যাচ্ছিল। হাওয়া কমলেও বৃষ্টির ধারা পড়ছে তো পড়ছেই। ভদ্রেশ্বরের সঙ্গে একদিন এই দ্বীপে নেমেই মনে হয়েছিল, দুনিয়া কী বিরাট! যত দূর যাও সবটাই তোমার! তবে মজা খাটিয়ে মুঠোয় ধরে রাখা চাই। দাপটে রাখতেই হবে। তখন আলোর মধ্যে সূর্যরশ্মি শিমুল ফলের ধারায় ফেটে গিয়ে পেঁজা আলো গুচ্ছ গুচ্ছ ছড়িয়ে দিত। পৃথিবীতে যে কত আনন্দ ছিল! সেই ঢালাও দ্বীপে ছোটো হতে হতে এখন এই তাঁবুর ঘরের মধ্যেই দিব্যি ধরে গেছে। কুবের তার বাইরে যেতে পারছে না কিছুতেই।

‘এইভাবে কেউ জিনিস দেয়?’

কুবের লজ্জা পেল না। কেননা এই মেয়েমানুষটির সঙ্গে সে আর কোনোরকমের যোগাযোগ বোধ করছে না। তাই পুঁটলিটা দিতে গিয়ে কাপড়-চোপড়সুদ্ধ একরকম ছিটকে গিয়ে বিছানায় পড়েছে। নিচু হতে গেলে কুবেরের মেরুদণ্ডে লাগে। সেখানকার চাকতিগুলো শুকিয়ে খটখট করছে। কিছুদিন কী হয়েছে, ভোরবেলার কথা দুপুরে ভুলে যায়। কোনটার পর কী করতে হবে—পরপর সাজিয়ে নিয়ে ভাবতে পারে না। কুবের তার সারাজীবনের টাইমপিসটা নিজে নিজেই মেরামত করতে বসে—আগাগোড়া খুলে পরের পর খাপে খাপে বসিয়ে তুলতে পারছে না কিছুতেই। ফলে অনেকগুলো বছরের গাদাখানিক জিনিসপত্তর জট পাকিয়ে তারই দিকে তাকিয়ে আছে।

আভা বাইরে এতখানি জলকাদা ভেঙে এসে অনেক আশা করে চুল বাঁধতে বসেছিল। কুবের কতদিন পরে তাঁবুতে। পুঁটুলিটা দেওয়ার কায়দা দেখে তার মাথা আরও নিচু হয়ে গেছে, হাতের আঙুলগুলো বেণি ধরে থেমে আছে—এবারে গুটিয়ে আলগা খোঁপা পাকানো দরকার, আভার মনে নেই—চোখে

জল এসে দাঁড়িয়ে আছে।

'আমার পায়ের রক্ত খারাপ আভা। তোমার শরীর এতদিনে বিষে ভরে গেছে—'

আভার মন কুবেরের কথা ধরে ধরে সেদিকেই গেল না। শুধু বলল, 'তুমি তো এমন ছিলে না কুবের—'

'যেদিন থেকে খারাপ রক্তে আমি ভরে গেলাম—'

'খারাপ রক্ত তুমি পাবে কোথায় কুবের? সুস্থ ছেলেমেয়ে হয়েছে তোমার—'

'তোমার বিশ্বাস হবে না আভা—আমি জানতাম। একটা স্যাড ঘটনায়—খুব অল্প বয়সে—'

'আবার ভুল বকতে শুরু করেছ।'

'আমার পিঠে ফি বছর একরকমের বিদঘুটে ব্রণ বেরোয়। আন্দাজে চুলকোতেই গলগল করে পাতলা রক্ত বেরিয়ে পড়ে। দেখেই বোঝা যায় পানসে, ফ্যাকাশে, দোষে ধরেছে—'

'বুঝেছি। এক কাজ করো তো—আমার বালিশের নীচে এই পুঁটুলিটা দিয়ে দাও—আজকাল এক কাতে শুয়েই রাত শেষ হয়ে যায়। নিচু বালিশ বলে মাঝে মাঝে ঘাড়ে ব্যথা হয়—'

'আমি সবই প্রায় ভুলে যাচ্ছি আভা। জানি না সেই বিষ শরীর বেয়ে বেয়ে মাথায় গিয়ে জমা হচ্ছে কিনা—'

'থামবে। আমি আর জেগে বসে থাকতে পারছিনে কুবের।'

পুঁটুলিটা তুলতে গিয়ে কুবেরের এবারে বেশ ভারী ঠেকল। টিপে দেখতে গিয়ে শক্ত কী হাতে লাগতেই জামাকাপড়ের বোঁচকাটা বিছানায় নামাল। গিঁট খুলতেই কাপড়, ব্লাউজ, সুরমাদানি, পুঁতির মালার ভেতর থেকে জিনিসটা বেরিয়ে পড়ল।

'এটা কী আভা?'

'কিছু না—'

'তার মানে! এ যে দেখছি চন্দনে দাগানো।'

এবারে আভা চুপ করে থাকতে পারল না, 'তোমার দাদার শিব। রেলেশ্বর শিব! ইনি এসে ইস্তক তোমার ব্রজদার হাল ফিরেছে—,' তার পরেরটুকু এইভাবে বলা উচিত ছিল, সেদিন মাঝরাতে উঠে কেটে পড়ার আগে শিবতলার খ্যাপা মোহান্তকে না জানিয়ে বেলপাতা ঘেঁটে অন্ধকারের মধ্যেই এই পাথরখানা তুলে এনেছি। সে জানে, যাঁর জন্যে স্বপ্নাদিষ্ট মন্দির গড়ে তুলছিল ব্রজ দত্ত—সেই পাথরখানা তার আগে মজা-পিয়ালির বুকে ওঠার মুখে রেলপুলের গোড়ায় বহুকাল পড়েছিল।

'এই শিব নিয়ে ব্রজদা ঠাকুরতলা বানাচ্ছিল?'

‘বানাচ্ছিল কী! বানিয়ে বসে আছে।’ তারপর আভা বাইরের জলেভেজা ভাঙাচোরা নিশুতি রাতের একদম পরোয়া না করে খুব খানিক হেসে নিল, অনেকদিন পরে বসা-চোখের নীচে, তেরিয়া গলার ভাঁজে সেই হাসির ঝাঁজ এসে প্রায়ান্ধকার এই তাঁবুর ভেতরকার আলো মেয়েমানুষটির সারাটা কাঠামোর সামনে উসকে দিল, ‘তুমি তো এতসব কিছুই দেখে আসনি। কত পুজো, কত মানত-ভক্তের কামাই নেই। ফকির শেষে শিব, সেবায়েত! মোহান্ত! তোমার আভারানিও শিব-সাধিকা সেজেছিল—’ এখান থেকে কাঁদতে শুরু করে দিলে আভা। বাইরে বৃষ্টিতে পেট্রোল-মাখানো আগুন হেরে গিয়ে নিবে গেছে।

বাইরে বৃষ্টি ধরে এসেছে। কামলাদের গলা পাওয়া যাচ্ছে। কুবের বুঝল, আর ফেরার উপায় নেই কারো। ভীষণ দেরি হয়ে গেছে। কোথায় কদমপুর, কুবের রোড, হরিরাম সাধুখাঁর ভদ্রাসন। মা নেই। নগেন একবার ছোটোবেলায় পুকুরে ডুবতে ডুবতে উঠে আসার পর ওর সারাটা বুক লাল হয়ে উঠেছিল। আমার পিতা শ্রীদেবেন্দ্রলাল সাধুখাঁ কোনোকালেও টাকার মুখ দেখেননি। সেই মুখ খুব বেশি করে দেখতে এসে এ-কোথায় পড়ে গেল কুবের!

‘লোকটার সারাজীবনের সাধ মিটে আসার মুখে মুখে এ তুমি কী করলে আভা?’

‘ঘুমোচ্ছিল পড়ে পড়ে। নইলে লোকটার চোখ উপড়ে নিয়ে আসতাম কুবের—’

‘তাই বলে সাধের শিব—’

‘শুধু নিজের স্বপ্নটুকুই চেনে তোমার ব্রজদা। আমার যে কী হল কেউ দেখেনি কোনোদিন। আমি একটা মানুষ—কতকাল কোণে পড়ে আছি। আমায় যে সাজিয়ে-গুজিয়ে সাধিকা বানিয়েছিল খ্যাপা মোহান্ত!’

বড়ো বক্সার কুকুরটাকে পনেরো দিন অন্তর দুটো করে ক্যাপসুল সন্দেশের ভেতর গুঁজে দিয়ে খাওয়ানো হত। তারপর নিত্যবরাদ্দ দুধের সঙ্গে ছ-আউন্স ক্যাস্টর অয়েল। ধারাস্নান তো আছেই। তবু শ্রীমানের গরম যায় না। সন্ধেবেলা ফুরফুরে হাওয়া দিতেই বেরিয়ে পড়বে রোজ। কুবের না থাকলেও কুকুরদের, গোরুদের যত্ন কমেনি। এসব তার স্বামীর জিনিস বলে হাজার ঝক্কি সামলাতে সামলাতে বাড়ির পোষা প্রাণীর কাজে কোথাও কোনো ত্রুটি রাখেনি বুলু।

একদিন সন্ধেবেলা কীসের থেকে কী হল—বড়ো বক্সার কুকুরটা উধাও! খোঁজ খোঁজ পড়ে গেল। কেউ বলল, কদমপুর বাজারে দেখেছে। কেউ বলল, 'এইমাত্র তাকে ডাকঘরের সামনে অন্য একটা কুকুরের সঙ্গে খেলতে দেখলাম।' কিন্তু পাওয়া গেল না কোথাও।

পরদিন সকালে নয়ানের বাবা কান্তবাবুর কাছে আসল খবর পাওয়া গেল। সন্ধেবেলা তিনি স্টেশনের ধারে বেড়াচ্ছিলেন। এমন সময় দেখেন, কুকুরটা ক্রসিং-ট্রেনের সামনে দাঁড়িয়ে। ফেরাবার চেষ্টা করতে গিয়ে কান্তবাবু প্রায় কামড় খান আর কী! তবু ধরবার জন্যে বেড় দিয়েছিলেন। কিন্তু শঙ্খ বাজিয়ে রাত আটটা এক মিনিটের ইলেকট্রিক ট্রেন ছাড়তেই শ্রীমান একলাফে ফার্স্ট ক্লাসে উঠে বসেছে।

দ্বীপে পাঠাবে বলে বুলু ভদ্রেশ্বরকে ডাকিয়েছিল। অনেক কাল কোনো খবর নেই। একবার ঘুরে আসুক। কিন্তু সামনে যা বিপদ তাতে কুবেরের খোঁজে পাঠানো গেল না। ভদ্রেশ্বরকে শেয়ালদায় পাঠানো হল।

ভদ্রেশ্বর ভেবেছিল, না জানি কী কাজ আছে। অনেককাল সাধুখাঁমশাইয়ের বাড়ি যাওয়া হয় না। মেদনমল্ল দ্বীপের কাগজপত্র তৈরি করে জেএলআরও অফিসে তত্ত্বতালাশ করার কথা ছিল। কুবেরবাবু আসবেন। দুজনে একসঙ্গে যাবে। কিন্তু কোথায়! ভোঁ ভা! চকদার বনে গিয়ে এদিকে আসার কথাই ভুলে গেল। ভদ্রেশ্বর জানে ধানের নেশা বড়ো নেশা। এই পৃথিবীতে নেশার বস্তু যে কত—তার ঠিকঠিকানা নেই। লোকে গাছপালা লতাপাতা বসায়—ফলটা পাকুড়টা ঘরে বসে পাবে বলে। নদীর জলে মাছের ডিম কোটি কোটি ভেসে বেড়ায়। ভেড়ি বাঁধ দিয়ে সেই জল কোটালে টেনে নিয়ে ডাঙায় ধরে রাখতে পারলে দেদার মাছ। ধান ছড়ালে দেদার ধান। মাটিই সব দেয়—জলই সব দেয়। কত জিনিস বোঝে ভদ্রেশ্বর। বহরিডাঙা আদালতের থার্ড মুন্সেফবাবু কিন্তু ভদ্রেশ্বরের অবস্থা একদম বোঝেন না। আজ সাত বছর ধরে ষোলো বিঘের একটা দাগের মালিকানা নিয়ে মামলা চালাচ্ছে ভদ্রেশ্বর। এ জমি ষোলো আনা তার। ভেতরে তিন বিঘের দিঘি আছে। মাছ চিংড়ি বেচলেও সম্বচ্ছরে তিন-চার হাজার টাকা আসে। কিন্তু সব বন্ধ। সেই থেকে ভদ্রেশ্বরের অবস্থা খারাপ যাচ্ছে। জমিটা

ফিরে পেলে ছেলে, মেয়ে, জামাই, আত্মীয়কুটুম্ব নিয়ে এমন মুখ শুকিয়ে আসার দশা হত না তার। কিন্তু মুন্সেফবাবু বোঝে কোথায়?

'সাধুখাঁমশাই আর আসেননি?'

'আপনি তো আমাদের কোনো খবরই নেন না। জানবেন কী করে লোকটা এখানে এল কি ফিরে গেল দ্বীপে?'

তা জানে না ভদ্রেশ্বর। কিন্তু একসঙ্গে লঞ্চঘাটায় এসেছিল। ঘুম না ভাঙিয়ে একা-একাই ভোর রাতে নেমে গিয়েছিল। কিন্তু সেবার ফেরেনি তাহলে? কে জানে? কী ভাবে কথাটা পাড়বে? এমন লোক বেশি দেখেওনি ভদ্রেশ্বর। পয়লাবার দ্বীপে গিয়ে মেদনমল্লর দুর্গের উঁচু দেওয়ালে চড়ে কী বেগটাই না দিয়েছিল কুবেরবাবু! নামতে চায় না। কথাবার্তা এমন বলে—যেন কতকাল দুর্গে আছে, তাবৎ তল্লাট সাধুখাঁমশায়ের বাপকেলে সম্পত্তি। তবে হ্যাঁ, ভদ্রেশ্বর স্বীকার করে—লোকটা ডাকাবুকো আছে। দাপট লোকটার রক্তে রক্তে। এমন মানুষই বিষয়-আশয় করে। কুবেরের খবরাখবর আর ঘাঁটিয়ে জানতে সাহস হল না ভদ্রেশ্বরের। তাহলে সাধুখাঁমশাই সেদিন একদম ফেরেননি কদমপুরে!

'একবার শেয়ালদায় গিয়ে খোঁজ নিন। বাঘা অত লোকজন দেখে হকচকিয়ে গেছে নিশ্চয়। দু-বেলা সময়মত খাওয়া-দাওয়া করা অভ্যেস—'

'বলছেন যাচ্ছি। কিন্তু পাওয়া কি যাবে?' কুবেরবাবুর খোঁজ পাবে বলে এসেছিল। এখন তার কুকুরের খোঁজে ছুটতে হবে। আলিপুরে জজকোর্টে কাজ আছে ভদ্রেশ্বরের। সেখান থেকে তিন নম্বর বাসে সোজা শেয়ালদা যাবে। কিন্তু এইভাবে কুকুরের পেছনে ঘোরা যায়! বেনামার গভীর জল থেকে দাগ ধরে সে জমি উদ্ধার করতে পারে ঠিকই। রাতারাতি একবারনামা বানিয়ে কোবালা রেজিষ্ট্রি বন্ধ করে দিয়ে বেচাল খদ্দের শায়েস্তা করতে পারে। কিন্তু শেকল হাতে নিয়ে এত বড়ো কলকাতায় অবলা জীবের সন্ধানে কোথায় ঘুরবে! আর বাঘাকে সে ছোটোমতো দেখেছে। এখন কেমন চেহারা কে জানে!

'আমাদের বোধহয় খারাপ সময় শুরু হল—'

'ও কথা বলছেন কেন? ঘরে আর পাঁচটা প্রাণীর সঙ্গে ছিল। অসুখ-বিসুখে মরেও তো যেতে পারত।'

'আমার খুব কুলক্ষণ মনে হচ্ছে। এতদিন এসেছি—বাঘা একদিনের জন্যেও রাতে ঘুমোয়নি। কান খাড়া করে পাহারা দিয়েছে। কেন যে এমন কুমতি হল—'

সাধুখাঁমশাইয়ের কাছে অনেক নুন খেয়েছে ভদ্রেশ্বর। জমিজায়গার হাত-ফেরতে টাকা তো পেয়েছেই। উপরন্তু আজ মেয়ের ঘরের নাতির ভাত, কাল চাল বাড়ন্ত—পরশু মামলা আছে বলে দফে দফে অনেক টাকাই নিয়েছে কুবেরের কাছ থেকে। কোনোদিন না বলেনি। চাইতেই পেয়েছে।

ভদ্রেশ্বর বেরিয়ে যাচ্ছিল। খবরের কাগজ হাতে দেবেন্দ্রলাল ঘরে ঢুকল। 'তিন-তিনটে মাস কোনো

খবর নেই। আমাকে তো জানাবে।'

'বাবা এলেন কবে?' ভদ্রেশ্বর প্রণাম করল।

বুলু বলল,'এত চিন্তার কিছু নেই বাবা। তেল-মবিল নিতে সেখান থেকে লোক এসেছে মাঝে মাঝে। খারাপ কিছু হলে জানিয়ে যেত তারা।'

দেবেন্দ্রলাল অনেকদিন পরে এসেছে। বড়ো ছেলের অফিসে প্রোমোশন হওয়ায় বড়ো বউমা নারায়ণের জন্যে সোনার বেড় তৈরি করে শ্বশুরের হাত দিয়ে পাঠিয়েছে। নারায়ণের অভিষেক হবে। হাতের সামনে ভদ্রেশ্বরকে পেয়ে কিছু রেগেই গেল দেবেন্দ্রলাল,'এই তোমাদের মতো লোকজনের লাভের লোভ মেটাতে গিয়ে আমার ছেলেটা শেষে বেঘোরে প্রাণ দেবে। ওদের মা বেঁচে থাকলে একসঙ্গে এতদিন কুবের দ্বীপে গিয়ে গায়েব হয়ে থাকতে পারত না।' তারপর সোজাসুজি বুলুর দিকে ফিরে তাকাল দেবেন্দ্রলাল, বউমা বিয়ের পর থেকে অনেক বদলে গেছে, বোঝা যায় এইসব মেয়ে হুকুম দিয়ে লোক খাটায়, 'তুমি তার বউ। পরিষ্কার কোনো খবর না জেনে এমন গ্যাঁট হয়ে নিশ্চিন্তে বসে থাকো কী করে? ছেলেমেয়েরা অবদি বাপ দেখেনি কতকাল—'

কথাটায় কিছু সত্যি ছিল। নিজের বাড়িতে—নিজের জায়গায় বসে বুলু কোনোদিন এমন বকা খায়নি। দেবেন্দ্রলালের একটা জিনিস তার কোনোমতেই অস্বীকার করার উপায় নেই—সে কুবেরের বাবা।

এমন অস্বস্তিকর অবস্থার ভেতর বুলু ভদ্রেশ্বরকে একরকম হট হট করে তাড়িয়ে দিল, 'সব কিছু খোঁজ নিয়ে আজই জানাবেন। আমাদের সময় কেমন খারাপ যাচ্ছে—একা কিছুই ঠিক করতে পারছিনে।'

বুলুর চোখে তাকিয়ে ভদ্রেশ্বর কিছু বুঝতে পেরেছে। এ-তল্লাটে এখন সাধুখাঁমশাইকে যে যাই বলুক, যত পয়সাওয়ালা লোকই ভাবুক—অবস্থা যতই বদলাক, ভদ্রেশ্বরের চেয়ে ভালো আর কে তাদের জানে। প্রথম প্রথম সাধুখাঁমশাই সস্ত্রীক জায়গা দেখতে আসতেন। খালপোলের ওপর দিয়ে যাওয়ার সময় ভদ্রেশ্বরের চোখে পড়েছে। তখনও আলাপ হয়নি। কী সুন্দর দেখাত—জোড় বেঁধে স্বামী-স্ত্রীতে জায়গাজমি কিনতে বেরিয়েছে। লক্ষ্মী সঙ্গে নিয়ে বাণিজ্য। সেসব ক-বছর হয়ে গেল।

ভদ্রেশ্বর চলে গেল। দেবেন্দ্রলাল তখনও রাগে গরর গরর করছিল। ভোরে দোয়ানো দুধে একটা ডিম ফাটিয়ে মিশিয়ে নিয়ে এল বুলু। তার শ্বশুর দুধের গ্লাস হাতে নিলেন ঠিকই, চোখও সকালের কাগজে —কিন্তু মন নেই বোঝাই যাচ্ছে।

বুলুর আরও একটা জিনিস ভদ্রেশ্বরকে বলার ইচ্ছে ছিল। এদেশে ডাকাতির জন্যে প্রায়ই বেঁটে দেখে খেজুরগাছ কেটে নেয়। ঢেঁকির কায়দায় সে জিনিসটা কয়েকবার দোল খাইয়ে ডাকাতরা বড়ো দরজায় ঘা মারে। এইভাবে দরজা ভেঙে ভেতরে ঢোকে। কাল সকালে দেখছিল, পুকুরপাড়ের খেজুর গাছটা কারা কেটে নিয়ে গেছে। লক্ষণ খারাপ। দেবেন্দ্রলাল এসে পড়াতে তা আর বলতে পারেনি। ঠিক এই সময় বাঘা উধাও। ডাকাতরা কেউ লোভ দেখিয়ে ট্রেনে তুলে নিয়ে যায়নি তো!

দেবেন্দ্রলাল চোখে ভালো দেখেন না। স্টিমার কোম্পানির চাকরি নষ্ট হওয়ার পর বাঁ চোখে ছানি

পড়েছিল। পেকে উঠলে কুবের কাটাবার ব্যবস্থা করে। তারপর ডান চোখে নেত্রনালি হয়। এবার ডাক্তার বলেছে, ওষুধ দিয়ে ঠেকা দিয়ে যেতে হবে—আর কাটাকুটির বয়স নেই। বিয়ের পর পঞ্চাশ বছর পার করে দিয়ে বউ মারা গেছে।

বুলু বুড়োর মন ঘুরিয়ে দেবার জন্য বলল, 'ড্রাইভারকে বলি—আপনি বেড়িয়ে আসুন। এতদিন পরে এলেন, চারদিক ঘুরে দেখুন—'

দেবেন্দ্রলাল সকালে গ্যারেজ ঘর দেখেছে, 'সব মিলিয়ে চারজন লোক তোমরা। তিন-তিনখানা মোটরের কী দরকার বুলু—'

'সে আপনার ছেলেকে দেখা হলে বলবেন। কোথায় কোথায় টাকা দিয়ে বসে আছে। কোম্পানির লোকগুলো ভুজুং দিয়ে বুঝিয়ে কিনিয়েছে। আমি বিন্দুবিসর্গও জানি না। ডেলিভারি দিতে এলে তবে জানতে পারি—'

'লক্ষ্মীকে অভক্তি করলে বিপদ হয় বউমা—'

ঘরের জানলা দিয়ে স্টেডিয়ামের অতিকায় কাঠামো চোখে পড়ে। এ জিনিসটা কী—দু-বার জানতে চেয়েছে দেবেন্দ্রলাল। বুলু বুঝিয়ে বলেছে।

কুবেরের এখানকার জীবন বুলুর অভ্যেস হয়ে গেছে। অসুবিধে হয় তার শ্বশুরবাড়ির লোকজনের। জমিজায়গা বিষয়-সম্পত্তি করতে গিয়ে কুবেরের আগেকার জীবন আগাগোড়া ওলটপালট হয়ে গেছে—সে কথা বুলুই জানে সবচেয়ে ভালো করে। তাই, এতদিন কুবের আসেনি—দ্বীপে আছে—এ নিয়ে যে ভাবার কিছু আছে, বুলুর তা একদম মনেই আসেনি। এখন সে আর কুবের—দুটো আলাদা কোম্পানি—তবে যৌথ নিশ্চয়। দেখা-সাক্ষাৎ হলেই সব ঠিক হয়ে যাবে।

'জানো বুলু, ছোটোবেলা থেকেই কুবের অন্যরকম। ক্লাস সেভেনে থাকতেই ভাত খেতে বসে ওর মাকে বলত—মা, তোমার নামে ইস্কুল করব—আর, বাবার নামে বাজার বসাব। হাটবারে ব্যাপারীদের কাছ থেকে তোলা কুড়োব।'

এই বিরাট কাণ্ডকারখানার মাঝখানে দাঁড়িয়ে দেবেন্দ্রলালের বুক ফুলে ওঠে ছেলের জন্যে। কতটুকু মানুষ! এই বয়সেই কত কী করে বসে আছে। মাথার ওপরে কেউ নেই। চারদিকে কত বিপদ-আপদ। কত একা। আজ যদি ওদের মা বেঁচে থাকত। একবার দেখে যেতে পারত!

নিজেকে খুব স্বার্থপর লাগল দেবেন্দ্রলালের। ছেলে টাকাপয়সার নেশায় কোন মাঠে-ঘাটে ঘুরে বেড়াচ্ছে। আর সে এখানে নিশ্চিন্তে বসে দুধ ডিম গিলছে। কী দরকার ছিল এতসব জিনিসের। মানুষের জীবনে কতটুকুই বা লাগে! শেষ অবধি দেহ রাখতে চার-পাঁচ হাত জায়গাই যথেষ্ট। বাকি সবকিছু পেছনে পড়ে থাকে।

কুসুমের মুখখানি তার ঠাকুরমার মতো। স্বভাবও তাই। দেবেন্দ্রলাল এই কয়েক ঘন্টায় লক্ষ করেছে

—তার নাতনিটা এই হাসে, এই ঠোঁট ফুলিয়ে কেঁদে পড়ে। আবার কী কথায় হেসেও ওঠে। এই ধারার মানুষ বড়ো হয়েও জানতে পারে না—কী জন্যে পৃথিবীতে এসেছে। এরা খুব কষ্ট পায়।

কুসুম ঘরে ঢুকেই বলল, 'দাদু আমি গ্লিছারিন মেকেছি।'

'তাই নাকি?'

খুব গম্ভীর হয়ে কুসুম তার দাদুকে একটা খবর দিল,'গ্লিছারিন মুখে মাখে এবং কিন্তু মিষ্টি—'

'ও! তুমি গালে জিভ বুলিয়ে চেটে দেখেছ?'

এতক্ষণে বসার ঘরের গুমোট হাসির ঝরনায় কেটে গেল। অনেকদিন পরে দেবেন্দ্রনাথ, বুলু একসঙ্গে হেসে উঠল।

বুলু অনেককাল হাসে না। বিয়ের আগে সে অন্য জগতে ছিল। সেখানে টিউশনির টাকা জমিয়ে বারো-তেরো টাকার শাড়ি কেনার দিনগুলো ছিল উৎসবের। বিয়ের পরে কুবেরকে অফিস যাতায়াতের জন্যে ট্রামের মান্থলি বাদে বাস ভাড়া বাবদে গোনাগুনতি যাতায়াত বাইশ পয়সা দিত। তারই ফাঁকে দুজনে একসঙ্গে সিনেমা দেখার দিনগুলো ছিল খুবই উল্লেখযোগ্য। তারপর কদমপুরে জায়গা দেখতে এসে কীসের থেকে কী হয়ে গেল। তখন আর টাকাপয়সা কোনো প্রবলেম নয়। প্রবলেম হল টাইম। একদম সময় পাওয়া যায় না। আজ রেজিষ্ট্রি, কাল ম্যাপ বানাতে যেতে হবে, পরশু অমুক আসবেন—জায়গা নিতে পারেন—অতএব ঘরদোর পরিষ্কার রাখা চাই। এত কাণ্ডের ভেতরে দুজনে একটু আলাদা হয়ে যে কিছু করবে, কোথাও যাবে—তার সময় কোথায়? শেষে সে পাটও চুকল। কিন্তু ততদিনে তার চেনাজানা কুবের সাধুখাঁ আগাগোড়া বদলে গেছে। গায়ে তেল মাখে না। মাথা আঁচড়ায় না, দাড়ি কামায় না—পারলে এই বয়সেই গলাবন্ধ কোট গায়ে দিয়ে ক্যাশবাক্সের সামনে কোনো গদিতে কুবের বসে যায়। তবে এসব তার সয়ে এসেছে।

এখন এক অজানা আনন্দ—দুশ্চিন্তাও বলা যায়—সাহেব মিত্তিরের চেহারা নিয়ে তার কাছে ছুটে আসে —সে নিজেও মাঝেমধ্যে ছুটে যায়।

সৃষ্টিধর ছোটোবোনকে সরিয়ে দেবেন্দ্রলালকে দখল করল। তখন কুসুম খুব সহজ পথে তার প্লাস্টিকের পুতুলগুলোকে খাওয়াতে শুরু করল। মাথার কাছে জোড়ের জায়গা কয়েকদিনের ক্রমাগত চেষ্টায় টানা-হ্যাঁচড়া করে খুলে ফেলেছে। সেখান দিয়ে পুতুল ছেলেমেয়েদের পেটে বালি, স্টোনচিপ ভরে দিয়ে তাদের পেট ভরিয়ে ফেলল।

দেবেন্দ্রলালকে বারান্দায় টেনে নিয়ে গিয়ে সৃষ্টিধর কী দেখাচ্ছে। বুলু জানে মন্ত্র পড়ে বিয়ের নিয়মমতো এই শ্বশুর, ছেলে সবই তার নিজের জিনিস। এসব জিনিস সে কিছুতেই অস্বীকার করতে চায় না। কুবের কষ্ট পাক—তাও বুলু চায় না। কিন্তু তবু—কিংবা কুসুম এইমাত্র যেভাবে বলেছিল, ঠিক সেইভাবে বলতে গেলে না বলে উপায় নেই—সাহেবের সঙ্গে মেলামেশা করে থাকি এবং কিন্তু ভালোই লাগে। বুলু জানে এই ভালো লাগাটা কিছুকাল আগেও তার মনের মধ্যে একটা ভারী যন্ত্র

হয়ে চেপে বসেছিল—যার নাম যন্ত্রণা! অথচ এখন আর তেমন কিছু মনে হয় না। হয় না বলেই পেছনে তাকাতে তার ভীষণ ভয় হয়।

কুবের সাধুখাঁ নগর বসিয়ে গেছে। সেই নগর এখন আধখানার বেশি তৈরি হয়ে এসেছে। দু-একঘর লোকও বসে গেছে। নতুন নতুন বাড়ির জানলায় নতুন নতুন পর্দা। তাতে সকালের চোখ ঝলসানো রোদ পড়ে ভয়ংকর সুন্দর চেহারা নিয়েছে। সৃষ্টিধরের বাবা থেকেই এই সবের শুরু। অথচ মানুষটা হিসেব, অঙ্ক, চাষাবাদের পাহাড়ে আধখানা ঢাকা পড়ে আছে। যেটুকু দেখা যায়—তাও শুধু কাজ আর কাজে ভর্তি। এইটে বাকি—ওটা এখনও করা হয়নি। এমন কত কী! কুবের একদিনের জন্যেও তাকে কোনো একটা আসবে বসিয়ে একটু দূর থেকে ঘুরে-ফিরে দেখেনি। কুবেরের চোখে সে যে কেমন, আজও তা জানে না বুলু। এইটুকু জানে—জায়গা কেনার সময় লেখা হয়—

গ্রহীতা :-

শ্রীমতী বুলু সাধুখাঁ।

জওজে শ্রীকুবের সাধুখাঁ।

হিন্দু, পেশা গৃহস্থালি।

সাকিন কদমপুর।

বিক্রি-বাটার সময়েও 'দাতা' বলতে দলিলে এই একই কথা লেখা হয়। উপরি বলতে তখন বহরিডাঙা সাবরেজিস্ট্রি অফিসের সামনে মুহুরিদের সেরেস্তায় বসে মাথায় ঘোমটা টেনে বুলু দলিলের পাতায় পাতায় পরিষ্কার করে লিখে দেয় শ্রীমতী বুলু সাধুখাঁ, পিতা শ্রীদেবেন্দ্রলাল সাধুখাঁ, সাং—কদমপুর।

এমন সময় উঁচু খালপাড়ে কুবের রোডের ওপর একখানা মুখ ভেসে উঠল। বুলু ভয়ে কাঁটা হয়ে গেল। সাত সকালে সাহেব কী মনে করে? দূর থেকে সে-ও জানালায় দাঁড়ানো বুলুকে দেখতে পেয়েছে। দেখে খুশি চাপতে পারছে না।

এসটিসি থেকে কেনা বিলিতি গাড়িখানা ব্যাক করে গ্যারেজ থেকে বেরিয়েই এক মোচড়ে খালপাড়ে উঠে গিয়ে ব্রেক নিল। সৃষ্টিধরের কাণ্ড। নেপাল ড্রাইভারের ভোরের দিকে বাতের আড় ভাঙে না। দু-পায়ে ঝিঁঝি ধরে পড়ে থাকে। তাকে সিটে বসিয়ে দেবেন্দ্রলালকেও রাজি করিয়েছে সৃষ্টিধর। দাদুকে সারা তল্লাট দেখানো চাই।

দেবেন্দ্রলালের জানার কথা নয়, সাহেব মিত্তির কে? কেন সে সোঁদালিয়া ক্যাম্পের তেল খোঁড়ার জায়গা থেকে এতদূর আসে? রোজ, না মাঝে মাঝে আসে? তবু বুলুর মনে হল দেবেন্দ্রলাল এক্ষুনি সাহেবের কাছ থেকে সব জেনে ফেলবে। তাই, সামনে আর কোনো কিছু ধরে দাঁড়াবার না পেয়ে বুলু জানালার গ্রিলে লোহার তারা ফোটানো কিছু ধারালো রেখায় বিশ্বাস বন্ধ করে হাত, বুক চেপে ধরল —ব্যথা লাগলেও ভ্রূক্ষেপ নিল না।

রাস্তা করে দিয়ে সাহেব কুবের রোডের একপাশে নেমে দাঁড়িয়ে ছিল। গাড়ি সেখানে গিয়ে ঘ্যাচ করে থেমে গেল। ছেলেটা একের নম্বরের বাঁদর হয়েছে। নিশ্চয় সৃষ্টিধর থামিয়েছে। একখানা ছোটো হাত জানলা দিয়ে বেরিয়ে এসে সাহেবকে টানল। সৃষ্টিধর আজকাল সাহেব মামা ডাকে। বুলুর শেখানো। আজই প্রথম মনে হল এসব ডাকাডাকি স্রেফ জাল। এতক্ষণে সবকিছু দেবেন্দ্রলালের চোখে জলের চেয়েও পরিষ্কার হয়ে গেছে। কান পেতে ছিল বুলু, সাহেব আর সৃষ্টিধরের কথা এতদূর থেকেও কিছু শোনা যায় যদি। ঠিক সেই সময়ে পুজোর ঘর থেকে ঘণ্টা বেজে উঠল। এই বাড়িটা নিয়মের রাজত্ব। মেথর নিঃশব্দে এসে বাথরুম, বারান্দা,চাতাল ধুয়ে দিয়ে চলে যায়। দোহাল সকাল-বিকেলে শিস দিয়ে দিয়ে গোরুগুলোকে ভুলিয়ে-ভালিয়ে দুধ দোয়। ঠাকুরমশাই সিগন্যালম্যানের মতো এসে প্রদীপ ধরায়, নৈবেদ্য দেয়, ঘণ্টা বাজায়—রাত হলে নারায়ণের শয়ান দেয়—কখন আসে কখন যায়—খোঁজ না নিলে জানার উপায় নেই। সাহেবকে জায়গা দিয়ে নেপাল স্টিয়ারিং থেকে সরে বসল। সর্বনাশের ষোলো আনা। গাড়ি খালপোল পার হয়ে গেল।

এতবড়ো বাড়িতে এখন সে বলতে গেলে একেবারে একা। আজ কোন কথায় সাহেব যে কোথায় গিয়ে হাজির হবে, গাড়ি চালানো হালকা চালে থাকতে থাকতে দেবেন্দ্রলালকে যে কী বলে বসবে তার ঠিক নেই। ঝকঝকে সকালবেলার এক কোণে একটুখানি কালো হয়ে উঠছিল গোড়া থেকেই। সেই কালোটুকু এখন ধাঁ ধাঁ করে সারা আকাশ ছেয়ে ফেলেছে। আসলে সেই কালো ভাবটা তার ঘরের ভেতরকার সব কিছু আবছা করে দিচ্ছে। হঠাৎ মনে পড়ল, মাঘের শেষে তো একটা বৃষ্টি হওয়ার কথা ছিল। তা হয়নি। শেষে তেমন কিছু হবে না তো আজ? আচ্ছা, দেবেন্দ্রলাল হয়তো পেছনের সিটে বসে বলছে—

'তুমি কে? বউমার ভাইদের কারো নাম তো সাহেব ছিল না—'

'আজ্ঞে, আমি আপনার ছেলে কুবেরবাবুর বন্ধু—'

'তাহলে মামা কেন? কাকা ডাকবে তো ওরা?'

'সেই সুবাদে ওদের মায়ের সঙ্গেও আলাপ পরিচয়—'

'ও! তা কতদিনের?'

'মাঝেমধ্যে এসে থাকি।'

বুলু জানালা ছেড়ে নড়তে পারেনি। সেখানে দাঁড়িয়েই সাহেব আর দেবেন্দ্রলাল দুজনের হয়ে আলাপ করছিল। আর ভাবতে পারল না। এর পর দেবেন্দ্রলাল আর কী বলতে পারে?

আসলে কিন্তু তখন সাহেব স্টিয়ারিং-এ বসে রাস্তার দু-ধারে মাত্র কয়েক বছরে কতটা বদল হয়েছে, কী কী কারখানা বসছে—তাই দেবেন্দ্রলালকে বলছিল। 'এসব জায়গা কী ছিল আগে! আমরা তেল খুঁড়তে এসেও প্রথম প্রথম দেখেছি—এদিকটায় সন্ধের পর লোকজন বেরোত না। শুধু এক কুবেরবাবু তখন থেকেই খালপাড় কেটে রাস্তা বানাচ্ছেন, নতুন নতুন লোক এনে বসাচ্ছেন—'

সৃষ্টিধর আর জবাবের অপেক্ষায় না থেকে, যা যা জানে—পরপর বলে যাচ্ছিল। তাকে কোনোক্রমে থামিয়ে দেবেন্দ্রলাল বলে ফেলল, 'কুবেরকে তুমি শেষ দেখেছ কবে?'

'তা বেশ কিছুদিন হবে—'

'বছরখানেক হয়ে গেল আমি একবারও দেখিনি।' ছেলেটিকে দেবেন্দ্রলালের ভালো লেগেছে। দু-ধারে মাঠ, মাঝে মাঝে খুচরো সব কারখানার শেড, বড়ো বড়ো গাছতলায় লরির আড্ডা—সাহেবকে বলেই ফেলল কথাটা, 'দিন তিনেক আগে দুপুরবেলা স্বপ্ন দেখলাম, কুবের নেই। এই বুড়ো বয়সেও ঘুমের মধ্যে চোখ জলে ভরে গেল—,' সাহেব গাড়ি থামিয়ে ফেলেছে, দেবেন্দ্রলাল বোধ হয় বুঝতে পারেনি, তাই থামল না, 'উঠে বসে দেখি ঘরে কেউ নেই। মাথার বালিশ ভিজে গেছে। নিজেকে বোঝালাম—শুক্লপক্ষে দিনের বেলার স্বপ্ন কখনও ফলে না—'

কুবেরের কথা সাহেব মিত্তির সবটুকু জানতে চায়। কিছু পড়ে থাকতে দেবে না। বুলুর কথায়-বার্তায় মনে হয় কুবেরের সে কিছু জানে না। আজ একজন ভালো লোক পাওয়া গেছে। ইনি কুবেরবাবুর বাবা। সাহেবের কাছে একটি জিনিসই সবচেয়ে বড়ো রহস্য হয়ে দেখা দিয়েছে। বুলুর তাপের মধ্যে পৌঁছোতে গিয়ে সে বারবার পিছলে নীচে পড়ে যাচ্ছে। কখনও নিষ্ঠুর, কখনও অভিনব মনে হয়। অথচ কী বা ওজন হবে বুলুর! বড়োজোর আট, সাড়ে আট স্টোন। পলকা—কিন্তু মুট করে ভাঙাও যায় না। এমন জিনিসের মালিক হয়ে ঘরেই ফেরে না—সে কেমন ধারার মানুষ! চাষাবাদ, জায়গাজমিতে কীসের যে এত নেশা থাকে, সাহেবের মাথায় তা কিছুতেই ঢোকে না।

'আমার এই ছেলেটাই সবচেয়ে একা—'

সাহেব অনেকদিন পরে একজন বাবা দেখল। সামনেই গাড়ির কাচে দেবেন্দ্রলালের চোখ-নাকের খানিকটা ভেসে উঠেছে। সাহেব বেল্ট দেখে নিজের বাবার ডেডবডি আইডেন্টিফাই করেছিল।

'তোমরা কুবেরকে একটু দেখো। আমরা কেউ এখানে থাকি না—'

তিন নম্বর ওয়েলে কাজ হচ্ছিল। গাড়িতে বসেই দেখতে দেখতে দেবেন্দ্রলাল জানতে চাইল, 'ও মন্দির কীসের?'

'রেলেশ্বর শিবের। সেবায়েত আপনাদের ব্রজ ফকির—'

'কোন ব্রজ? সেই ম্যাজিক দেখাত যে—'

সাহেব চুপ করে আছে দেখে দেবেন্দ্রলাল বলল, 'এখন সেবায়েত হয়েছে তা হলে—' কুবেরের মা এই লোকটির সংস্পর্শে যেতে কুবেরকে বারণ করেছিল। স্পষ্ট মনে আছে দেবেন্দ্রলালের।

'আপনার ছেলের বন্ধু হন খুব। ডাকব? আলাপ করবেন?'

'থাক, দরকার নেই।'

'ওঁনার তো খুব পসার এখানে। কত ভক্ত শিষ্য যায় আসে—'

‘তাই নাকি!’

ফেরার পথে নেপাল স্টিয়ারিং-এ বসল। সাহেব থেকে গেল। অন্যমনস্ক দেবেন্দ্রলালকে আর কী কথা বলবে সৃষ্টিধর। বলল, ‘এবার বাবা এলে আর যেতে দেব না।’

‘দাও কেন? ধরে রাখতে পারো না—’

সৃষ্টিধর কথার নেশায় কথা বলছিল, ‘এবার বাবা এলে তার সঙ্গেই আমি চলে যাব।’

কলকাতায় সেদিন লাইনের ওপর দাঁড়িয়ে তিন-তিনখানা ট্রাম পুড়ছিল। লোকজন ছুটোছুটি করছে। জজ কোর্টের দিকে যাওয়া গেল না। শেয়ালদায় রেলপুলিসের অফিসে পৌঁছে ভদ্রেশ্বর দেখল পুলিস আসছে যাচ্ছে—ছুটছে। তারই ভেতরে কোনোরকমে ঢুকে একজন নরমমত লোককে দেখে বলল, 'আমাদের একটা কুকুর হারিয়েছে। এদিকে দেখেছেন—'

লোকটা ধমকে উঠল। তাকে থামিয়ে দিল পাশের চেয়ারের ঢিলেঢালা মোটা আরেকজন দারোগাবাবু, 'কী হারিয়েছে বললে? কুকুর? কেমন দেখতে ছিল—'

ভদ্রেশ্বরের বুকে সাহস এল, 'আজ্ঞে, হারাবার কথা নয়। দুধে-ভাতে ছিল। কী যে মতি হল—'

'পোষা কুকুর বেরিয়ে গেল?'

'আজ্ঞে, মুনিব বাইরে থাকেন। দেখাশুনোর কোনো গাফিলতি হয়নি। বাঘা বলে ডাকলেই ছুটে আসত।'

'দেখলে চিনবে?'

'খুব স্যার! গুটি আষ্টেক গোঁফ ছিল। ডান গালে একটি তিল আছে। কী যে মতি হল—রাত আটটা-একের ট্রেনে ফার্স্ট ক্লাসে উঠে বাবু ইদিকে এসেছেন।'

একজন কনস্টেবল দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে সব শুনছিল। সে বলল, 'খুব বয়স হয়নি—সব সময় চনমন করছে—'

'শিশু বলতে পারেন। গত সনের দোলপূর্ণিমেই জন্ম—সকালবেলা।'

'বাচ্চামতো। আমি ধরেছিলাম। ভাবলুম এত বড়ো শহরে হারিয়ে যাবে। লাস্ট ট্রেনে সরু পিয়াসলে ফিরছিলাম। সঙ্গে ধরে নিয়ে গেলাম। ট্রেন থামতেই লাফিয়ে ছুট—'

মোটা দারোগাবাবু বললেন, 'কড়েয়া থানায় যাও। পেলে ওখানেই পাবে—'

ভদ্রেশ্বর ভেবে দেখল, এত বড়ো পৃথিবীর কোথায় বাঘাকে পাওয়া যাবে! বলিহারি জীব! ছিলি আরামে—পালাতে গেলি কেন! এখন বোধ হয় ধর্ম রাজার সঙ্গী মনস্তাপে অচেনা জায়গায় শুধু ঘেউঘেউ করছে। কোথায় খুঁজবে। যেমন মুনিব তেমন কুকুর। আজ কতদিন সাধুখাঁমশাইয়ের সঙ্গে দেখাপত্তর নেই। রাস্তায় বেরিয়ে দেখল, ট্রামবাস সব বন্ধ। ফাঁকা ট্রামলাইন দিয়ে পুলিসভ্যান একা একা যাচ্ছে। কলকাতায় যা হয়ে থাকে। লোকজন সবসময় ভীষণ রেগে আছে। স্বাধীনতার মুখে মুখে আর সবার সঙ্গে ভদ্রেশ্বরও ভেবেছিল, আর চিন্তা নেই—এবার সবকিছু ভালো হয়ে যাবে। কোথায়!

ফাঁকা পথ ধরে হাঁটতে হাঁটতে কড়েয়া থানায় গিয়ে হাজির হল। বেলা দুটো-তিনটে হবে। নাল-লাগানো পাম্পসু পায়ে খটখট করে থানার বারান্দায় উঠল ভদ্রেশ্বরও। সেখানেও প্রথমে পাত্তা পেল না। শেষে বুঝিয়ে বলতে একজন পুলিস তাকে ভেতরের দিকে লোহার জাল লাগানো একটা বড়ো আটচালার পাশে এনে দাঁড় করিয়ে দিলে, 'দেখুন আছে কিনা—'

ভদ্রেশ্বরকে দেখেই আশি নব্বইটা হারানো কুকুর একসঙ্গে ঘাড় ফেরাল। তারপর একই সঙ্গে তাদের সে কী কান্না। কুঁই-কুঁই—কুঁই-কুঁই। থামতেই চায় না। কেউ রাস্তা ভুল করে, কেউ রেগেমেগে এখানে এসে পড়েছে। 'দাঁড়া রে বাবারা—মন খারাপ করিস নে। আজ বাইরে যাবি কীরে—কলকাতায় গুলিগোলা চলছে। সময় হলেই বাড়ি যাবি—,' বলতে বলতে ভদ্রেশ্বর ওদের গাল দেখছিল। ডান দিকে তিল আছে, না নেই? কিন্তু এতগুলো মুখ?—তবে বাঘার সারা গা হলদেটে। নাঃ, তেমন কপাল করে আসেনি ভদ্রেশ্বর। ভেবেছিল শেয়ালদায় পেয়ে গেলে গলায় চেন পরিয়ে নিয়ে সন্ধে-সন্ধে সাধুখাঁমশাই-এর বাড়ি গিয়ে হাজির হবে। অনেক নুন খেয়েছে। একটুখানি শোধ হয়ে যেত। ঝুলপকেটে আধসেরি লোহার শেকল বিড়ে পাকিয়ে পড়ে আছে। ওজনে ঘাড়ের কাছাকাছি পাঞ্জাবি ছিঁড়ে যায়-যায়! তা হলে সরু পিয়াসলেই একবার ঢুঁ মারতে হবে।

ফেরার সময় আর শেয়ালদায় ফেরা যায় না। ঢিল পড়ছে, মোড়ে মোড়ে জটলা, দূরে দুমদাম আওয়াজ। কী রে বাবা! বাঘার খোঁজে বেরিয়ে শেষে বেঘোরে প্রাণটা খোয়াবে নাকি! যে পথেই এগোয়—লোকে বলে, 'আর এগোবেন না মশাই।' সন্ধের সঙ্গে সঙ্গে কারা ঢিল মেরে রাস্তার আলো ফাটিয়ে দিল। ফাল্গুন মাস পড়তেই জলের দাঁত ভেঙে গেছে। শীত নেই বলতে, নেই। কিন্তু রাস্তাঘাট একেবারে পৌষ মাসের বিকেল হয়ে আছে। এমন দিনে সাধুখাঁমশাই একা একা মেদনমল্লর দ্বীপে কী এত ধান করছে। একবার তো এদিক এলেও পারে। শেষে জঙ্গল হাসিলে নেমে পড়েনি তো। যা একখানা লোক!

কোনোক্রমে শেয়ালদায় এসে সাতটা বাইশের ট্রেনটা ধরে ফেলল। প্যাসঞ্জার নেই। আজ সারাদিন খাওয়া হয়নি ভদ্রেশ্বরের। ইদানীং প্রায়ই হচ্ছে না। ভোর হলে দু-পালি চাল চাই। এ ছাড়াও অন্য বাজার দোকান তো আছেই। বড়ো ছেলেটা খালে মাছ ধরে বসে বসে। যেদিন বড়োসড়ো একটা পেল তো বাড়িতে মোচ্ছব। শনিবার একটা পেয়েছিল। মুড়োটা ভদ্রেশ্বরের পাতে দেওয়া হয়। চুষতে চুষতে ষোলো বিঘের দাগে বড়ো দিঘির কথা বারবার মনে পড়ছিল। বারো ভূতে সেখানকার মাছ চিংড়ি লুটেপুটে খাচ্ছে। বহরিডাঙার আদালতে আজ সাত বছর মামলা ঝুলছে। ও তরফ শুধু ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে দিন নিচ্ছে। কাগজ ভদ্রেশ্বরের দিকে। থার্ড মুন্সেফবাবু যদি একটু বুঝতেন! রায় যদি তাড়াতাড়ি বেরোত—তা হলে এ বাজারে এতগুলো পেটের আহার জোগাতে ভদ্রেশ্বর ভোর-রাত থেকে মধ্যিরাত অবধি কাগজ নিয়ে, দলিল নিয়ে, ডেমি নিয়ে পড়ে পড়ে ঘাঁটাঘাঁটি করত না।

ইদানীং লোকজন জমিজমা কেনাকাটাও ছেড়ে দিয়েছে। আগে ধান উঠলে যাত্রার রিহার্সেলে পাড়া সরগরম হয়ে থাকত। এখন সবাই ভ্রূ কুঁচকে আছে। সাধুখাঁমশাই থাকতে জায়গাজমি কেনাবেচার

সময় ভদ্রেশ্বরের হাতে কিছু পয়সা আসত। সে পাট বন্ধ। চকদার বনে গিয়ে কুবেরবাবু সবকিছু ভুলে বসে আছে। ধানের নেশা বড়ো নেশা।

দুটো লোক এক কোণে বসে কী সব বলাবলি করছে। সরু পিয়াসলে আসতেই ভদ্রেশ্বর নেমে পড়ল। চায়ের স্টলে এক গ্লাস চা আর খান দুই নোনতা বিস্কুট দিয়ে পিত্তি রক্ষা করল প্রথমে। তারপর জিজ্ঞাসা করে একটা আন্দাজি খবর পেল। চিটু দাশ বলে সেখানকার এক বাবু অনেক কুকুর পুষে থাকেন। থানার কাছেই বাড়ি। চা-ওয়ালা দেখেছে—একটা নতুন কুকুর আমদানি হয়েছে।

আর দেরি না করে পকেট থেকে চেন বের করল। তারপর সরু পিয়াসলের সবেধন বাঁধানো পিচ রাস্তা ধরে এগোতে লাগল ভদ্রেশ্বর—হাতে চেন। কোন বাড়িটা চিটু দাশের তা ঠিক করতে পারল না। সারাদিন ঘুরে আর পা চলছে না। শরীর খারাপ বলেই যেন জেদ ধরে গেল। প্রথমে খুব আস্তে, তারপর একটা বিদঘুটে গলায়—'বাঘা! বাঘা! বাঘা রে—' বলে ভদ্রেশ্বর ডেকে উঠল। শরীর বোধ হয় কাঁপছিল। তাই হাতে-ঝোলানো ভারী চেনটা ঝনঝন করে উঠল। ডান হাতের একটা অফিস-বাড়িতে ঢং ঢং করে আটটা বাজাল কে। সামনে অন্ধকার তেতলা বাড়িটার ঘরে ঘরে ইলেকট্রিক আলো জ্বলে উঠল। 'বাঘা!বাঘা!' একজন লোক খুব তাড়াতাড়ি তেতলা থেকে চটি ফটাস ফটাস করে নীচে নেমে আসছে।

ঠিক তখন কদমপুরে দোতলার দক্ষিণমুখো ঘরে দেওয়াল-জোড়া জানালার পাশে কুবেরের নরম বিছানায় দেবেন্দ্রলালের ঘুম ভেঙে গেল। সৃষ্টিধরের সঙ্গে ঘুরে ফিরে বেড়াতে বেলা হয়ে গিয়েছিল। খাওয়া-দাওয়া সেরে এ-ঘরে একটু গড়াতে এসেছিল দেবেন্দ্রলাল। অবেলায় শুয়ে গভীর ঘুমে সন্ধে কাবার করে দিয়ে তবে উঠেছে। বহুকাল এমন নির্জনে, এত খোলামেলায় দেবেন্দ্রলাল ঘুমোয়নি।

সামনের দেওয়ালেই কুবেরের মায়ের একখানা বড়ো ছবি। তাতে বাড়ির তোলা ফুলের মালা শুকিয়ে শক্ত হয়ে উঠেছে। যেদিক থেকেই তাকায়—দেবেন্দ্রলাল দেখল, তার দীর্ঘদিনের বিবাহিত স্ত্রী তারই দিকে তাকিয়ে আছে। নীচে বাঁধানো গোয়ালে বড়ো বড়ো গোরু পা ঠুকছে—ফোঁসফোঁস করে নিশ্বাস নিচ্ছে।

আর ক-টা দিন থাকলে সবই দেখে যেতে পারত। কপালে নেই। এসব দেখলে ওদের মা আরও দশটা বছর বেশি বাঁচত। বড়ো সাধ ছিল, নিজের একখানা ঘর হবে—নিজের একটা আলমারি থাকবে, তাতে পছন্দমত জিনিসপত্তর গুছিয়ে রাখবে, দরকারমতো খুলে দেখবে। আর ক-টা দিন থাকলে সবই হত।

শ্বশুরকে তাঁর ছেলের খাটে শোয়ানোর ব্যবস্থা করে বুলু নীচে নেমে গিয়েছিল। মাঝে দু-দুবার দেখে গেছে। মানুষটা পড়ে পড়ে ঘুমোচ্ছেন। জাগায়নি! এদিকে কোনোরকমের শব্দ হতে দেয়নি। নিজে কারও সঙ্গে কথা বলেনি। সৃষ্টিধর, কুসুম ধমক খেয়ে সেই যে ঠাকুরদালানের বারান্দায় গিয়ে বসেছে —একবারের জন্যেও একদিকটা মাড়ায়নি।

বুলু ঘরে ঢুকে দেখল দেবেন্দ্রলাল তার শাশুড়ির ফটোর দিকে তাকিয়ে—চোখে জল। বুলুকে দেখে সঙ্গে সঙ্গে মুছে ফেলল, 'বাচ্চারা কোথায়?'

বুলু বলছিল, 'নীচে আছে,' এমন সময় দুজনেই খুব ভয়ে ভয়ে সে ঘরে ঢুকে পড়ল। সৃষ্টিধর বলল, 'ডাকছিলে?'

দেবেন্দ্রলাল হেসে ফেলল। বুলুর ভেতরটা আগাগোড়া কেঁপে উঠল। বিয়েকরা বউ মরে গেলে মানুষের এমন হয়।

সৃষ্টিধর বলল, 'আমাকে বাবার কাছে নিয়ে যাবে?'

দেবেন্দ্রলাল কোনো উত্তর দিল না। ছেলেটার মুখের দিকে তাকিয়ে থাকল, শেষে হেসে বলল, 'আমাকে আমার ছেলের কাছে নিয়ে যাবে?'

কুসুম অতশত বোঝে না। সে নিজের মতো করে বলল, 'আমি বাবাকে নিয়ে আসব।'

এবারে বুলু আর চুপ করে থাকতে পারল না, 'কী করে আনবি?'

কুসুম ঘাবড়াল না, 'জোরে—খুব জোরে বাবা বলে ডাকব। ঠিক শুনতে পাবে। ছুটে চলে আসবে—'

এত নিশ্চিত আসরে দেবেন্দ্রলাল কোনোদিন বসেনি। আজ কুবেরকে দেখলে খুব আনন্দে থাকত। সব জিনিসই একটুর জন্যে খুঁত থেকে যায়—কানায় কানায় ভরে উঠতে পারে না। কোথায় গেল ছেলেটা? বুলুকে বলল, 'তোমার শাশুড়ি কোনোদিন ছেলেদের কোনো ব্যাপারে ত্রুটি রাখতেন না। কী বা মাইনে পেতাম! তার ভেতরেই যতদূর সম্ভব করতেন—'

একথা কুবেরের মুখেও শুনেছে বুলু। কুবের প্রায়ই বলত, 'জানো বুলু, আমার মা সারা জীবন শুধু কষ্ট করেই গেল।'

এবারে দেবেন্দ্রলাল যা নিয়ে কথা শুরু করল, বুলু জানে, শ্বশুরমশায়ের তা খুব প্রিয় জিনিস। স্টিমার কোম্পানিতে কাজ করার সময় মালবাবু বলেছিল, 'দেবেন্দ্রলাল, মুখে রক্ত তুলে কামানো পয়সা ছেলেদের পেছনে ঢালছ, ভালো। কিন্তু বুড়ো হলে কি ওরা তোমায় দেখবে?'

দেবেন্দ্রলাল বলল, 'বউমা, আমি তখন ছেলেদের দেখিয়ে বলেছি—ওরাই আমার মোবাইল ইনসিয়োরেন্স পলিসি। লোকে টাকা জমায়—ঘরদোর বানায়, আরাম করে—আমি ছেলে বানাই, ছেলে তৈরি করে তুলি।' এখানে থেমে বুলুর দিকে তাকিয়ে বলল, 'বলো, ঠকেছি আমি?'

বুলুর কাজ এখন সায় দিয়ে যাওয়া। উজ্জ্বল ঘর, ঝকঝকে ফার্নিচার, কোনো গোলমাল নেই চিন্তা, নেই—তার ভেতরে সাধুখাঁ পরিবারের এক নম্বর মানুষটা আনন্দে, সুখে, মুখে আর হাসি ধরে রাখতে পারছে না।

মনে আনন্দ থাকতে থাকতে দেবেন্দ্রলালকে বুলু কমলার রস, ছানা খাইয়ে রাতের খাওয়া-দাওয়ার পাট চুকিয়ে দিল। এমনিতেই রাতে খাবে না বলে দিয়েছিল। তারপর কোন কথায় আবার মন ভারী

হয়ে উঠবে—তার চেয়ে যা কিছু দিয়ে দেবেন্দ্রলালকে খেতে বসার বাজে ঝামেলা থেকে রেহাই দিল বুলু। এত ফাঁকা বাড়িতে খেতে বসার কাজটাকেও আজকাল তার ফালতু লাগে।

পরদিন খুব ভোরে উঠে অনেক কিছু খেতে হল দেবেন্দ্রলালের। সকালের ঝকঝকে রোদে এই বয়সেও মনে হল, জীবনটা বুঝি এইমাত্র শুরু হয়েছে। ডালপালা ফাটিয়ে লাল ফুল ফুটেছে মাদারগাছের সারা গায়ে। প্রথমে তা দেখেই এগোলো খালপাড়ে। একটা অল্পবয়সি ছেলে বসতে না বসতেই বড়ো একটা রুই বাঁধিয়ে ফেলেছে ছিপে। দেবেন্দ্রলালের মনে পড়ে গেল, এই বয়সে সবচেয়ে ইম্পরটেন্ট কাজ হল, হজম হচ্ছে কিনা লক্ষ্য রাখা। হজম না হলে বুকে গ্যাস হয়ে নিশ্বাস আটকে মরতে পারে। আর গুরুপাক চর্বিজাতীয় খাবার-দাবার রক্তচলাচলের গলিগুলোর ছাদে, গায়ে এমনভাবে জমে থাকবে যে, রক্তই যাতায়াতের পথ না পেয়ে আস্তে আস্তে সারা শরীরে লাল দই হয়ে উঠবে। তখন হরিও রাখতে পারবে না। বুকের ভেতরের রক্তের টিউবওয়েলটা বিকল হয়ে যাবে।

জোর কদমে হেঁটে কদমপুরে স্টেশনে চলে এল দেবেন্দ্রলাল। ট্রেন বোঝাই দিয়ে ডাব, টমেটো, ডিম, মাছ, তাড়ি কলকাতায় যাচ্ছে। কত খাবার জিনিস পৃথিবীতে। এখনও দেবেন্দ্রলাল সব কিছু চিবিয়ে খেতে পারে। কয়েকটা দাঁত নেই বলে মুখের ভেতরে কিছু জায়গায় খাওয়ার সময় ঘন ঘন জিভ বোলাতে হয় অবশ্য। তাতে খুব একটা অসুবিধে হয় না।

রেল-লাইনের দু-ধারে নতুন গজানো বসতি, মাঝে মাঝে ফাঁকা মাঠ, ছায়া-ছড়ানো বড়ো বড়ো বাবলাগাছের সারি। দেবেন্দ্রলাল হাঁটা ধরে দিল। এদিককার বাতাসে কেমন একটা খুশি ভরে আছে—দেবেন্দ্রলাল ঠিক ধরতে পারল না। হাঁটতে ভালোই লাপছিল। তিন-চার সনের নারকেলগাছগুলো বসতবাড়ির বেড়া ডিঙিয়ে পাতা মেলে দিয়েছে। ছায়া আছে, আলো আছে, রোদের তাত বড়ো একটা নেই। কলকাতার বড়ো বউমা ব্যাংক অ্যাকাউন্ট করে দিয়েছে দেবেন্দ্রলালের নামে। ছেলেরা হাতখরচের টাকা পাঠালে সেখানে রেখে দেয়। দেবেন্দ্রলাল উড়ে চলল।

এক জায়গায় এসে থামতে হল দেবেন্দ্রলালকে। সেখানে মজা-পিয়ালির বুকের ওপর রেলপুল দাঁড়িয়ে। নীচের শুকনো খটখটে মাটিতে রাখালরা গোরু ছেড়ে দিয়ে বসে আছে। ধানকাটার পর মাঠ ভরে খোঁচা খোঁচা খড়-নাড়া দাঁড়িয়ে আছে। তারই ভেতরে দেদার আকন্দ চারা। চারদিকে কত পাথর পড়ে আছে। বড়ো-বড়োগুলো মাটির মধ্যে গেঁথে বসে আছে। জায়গাটা নির্জন, শুধু ট্রেন এলেই গমগম করে ওঠে।

কী খেয়াল হল—দেবেন্দ্রলাল সাবধানে নামতে শুরু করল। স্টিমার কোম্পানির পুরোনো লোক। পুলের গোড়ায় জল মাপার রং-চটা গজটা পড়ে থাকতে দেখে বুঝল, এখান দিয়ে একদিন লঞ্চ চলত —সারেংরা গজে জলের দাগ বুঝে স্পিড নিত।

‘কে?’

পুলের নীচে ছায়ার আড়ালে এসে পড়েছিল দেবেন্দ্রলাল। খেয়াল করেনি। আলখাল্লা পরা লোকটা আচমকা ঘুরে দাঁড়িয়ে চেঁচিয়ে ওঠায় বুকের ভেতর অনেকখানি রক্ত একসঙ্গে ধড়াস করে চলকে পড়ে গিয়েছে। কোনো কথাই বলতে পারল না তাই। গোরুগুলো ঘাসের সবুজ মখমলের ওপর দিয়ে পাউডার পাফের চেয়েও আলগোছে মুখ বুলিয়ে নিয়ে এগিয়ে যাচ্ছে। খাচ্ছে কি খাচ্ছে না—বোঝাই যায় না।

'কী চাই এখানে?'

লাল আলখাল্লা, চোখও লাল, কপালের ঘামে বাবরির লম্বা লম্বা চুল লেপটে গেছে। দুখানা হাত দিয়ে এইমাত্র লোকটা বোধহয় একখানা পাথর টানাটানি করছিল। পাথরখানা মাটির ভেতরে ফলা হয়ে গেঁথে আছে।

'আমি দেবেন্দ্রলাল সাধুখাঁ—সালকে থাকি—'

'কুবেরের বাবা আপনি!' লোকটার মুখের চেহারা বিলকুল নরম হয়ে গেছে।

'আপনাকে চিনলুম না তো—'

'আস্তে আস্তে চিনবেন। এখানে এলেন কী করে?'

'লাইনের গায়ে পায়েচলা পথটা বেয়ে অনেকখানি হেঁটে বসে আছি—'

লোকটা জবাবের জন্যে জানতে চায়নি, 'কত গেছি আপনাদের বাড়ি—কুবের কলেজে পড়ত তখন, মা খেতে দিয়েছেন কতবার—'

'আপনার নাম?'

'আপনিই বলুব! দাড়িগোঁফ না থাকলে ঠিক চিনতেন।'

'তুমি ব্রজ?'

'আগে ফকির ছিলাম! এখন মোহান্ত!'

'তার আগে ম্যাজিক দেখাতে—একবার আমাদের বারান্দায় কোটের পকেট থেকে পায়রা বের করে উড়িয়েছিলে।'

ব্রজ কথা না বলে হাঁটছিল। পাশে দেবেন্দ্রলাল। কোনো মানে হয় না এমন সব হাওয়ায় এককালের নদীর বুকে বেঁটে বেঁটে গাছপালা হেলছে দুলছে। পাতলা মেঘে চুবোনো রোদ পড়ে পুলকে আলাদা চেহারা পেয়ে যাচ্ছে চারদিক। মাথার ওপরে রেললাইন, রেলপুল। হয়তো এখনই নিঃশব্দে ইলেকট্রিক ট্রেন এসে পড়েই ব্রিজের ওপর ঝনঝন করে বেজে উঠবে।

দেবেন্দ্রলাল ঘুরে দাঁড়াল,'আমার ছেলে কোথায়?'

ব্রজ হাঁটতে হাঁটতেই বলল, 'কেন আপনি জানেন না?'

‘তুমিই তাকে এ-তল্লাটে টেনে এনেছ। যেখানেই থাক—এখন তোমারই ফিরিয়ে আনতে হবে।’

ব্রজ থামল। বলতে যাচ্ছিল, সময় হলেই ফিরবে। সংসারে লোভের ঘটিটা ফুটো হলে জানা যায়, সময় জলের চেয়েও অস্থির। তার আগে নয়। জীবন আসলে চটি একখানা পাঁচালি। সেই হিসেবে লোভ গায়ে-গতরে পঞ্জিকা, নয়তো ডিকশনারি। কার কাছে এসব কথা বলবে? দেবেন্দ্রলাল তো চেনে ব্রজ দি ম্যাজিশিয়ানকে। এখন এসব কথা তার মুখে শুনলে—নির্ঘাত ভড়ং কি বুজরকি বলে ধরে নেবে।

‘কুবের তো অবুঝ নয়। যেখানেই যাক—ফিরে আসবে।’

‘তুমি ইচ্ছে করলেই ফিরিয়ে আনতে পারো। আমার এই ছেলেটা মহামূর্খ। ভীষণ আনাড়ি। কোন বিপদে পড়েছে কে জানে! তিন-তিনটে মাস কদমপুর মাড়ায় না। তোমার কথা শোনে খুব। একবার খবর দিয়ে ডেকে পাঠাও না। ক-দিনই আমার বাপের মন ভালো ঠেকছে না—’

দুজনে মুখোমুখি দাঁড়াল। মাঝখানে সাত-আট হাত জায়গা। দেবেন্দ্রলালের পেছনে মজা-পিয়ালির শুকনো গভীর খাত মোচড় দিয়ে দক্ষিণের জঙ্গল কেটে ছুটে চলে গেছে।

ব্রজ রাত থাকতে এখানে এসেছে। স্বপ্নাদিষ্ট মন্দিরে শিব বসানোর দিন এগিয়ে আসছে। ঘুম ছুটে গেছে তার। রেলেশ্বর শিবকে কোথাও পাওয়া যায়নি। এখানে যদি শিবের দোসর আর একখানা সাইজমতো পাথর পাওয়া যায়—তা হলেই মুশকিল আসান। ভোরের আলোয় সব পাথরই সমান লাপছিল। সব পাথরই চোখ ফুটিয়ে তার দিকে তাকিয়ে ছিল। এখানে এই নির্জনে হাওয়ার শব্দের ভেতরে কিছুতেই ঠিক করে উঠতে পারেনি—কোনখানাকে নতুন করে শিব বানাবে। শেষে একখানা গেঁথে বসে যাওয়া পাথর চোখ বুজে টানাটানি করছিল। ঠিক সেই সময় দেবেন্দ্রলাল এসে হাজির।

অবুঝ মানুষটাকে বোঝাবার চেষ্টা করল না ব্রজ। শুধু বলল, ‘আমিও সে জায়গা চিনিনে। শুনেছি লঞ্চে যেতে হয়। নদীপথে অজানা দ্বীপে জঙ্গল হাসিল করে চাষ-আবাদ করছে। ভালোই তো। আপনার একটা ছেলে না-হয় একটু অন্যদিকে সাহস করে এগোলোই—’

‘তুমি কোনোদিন ছেলে মানুষ করে দেখেছ?’

নদীর শুকনো গাঢ় খাতে দাঁড়িয়ে এমন একটা প্রশ্নের মুখোমুখি কোনোদিন পড়তে হবে—ব্রজ তা ভাবেনি। তারও ছেলে আছে। সরস্বতী দেখে। কোনো খবর জানে না। আগে যাও-বা একটু জানার জন্যে মনের ভেতরে চিড়িক খেত—এখন আর কিছুই হয় না। রেলেশ্বর শিবের স্নান, ভোগ, সজ্জা এসব নিয়েই দেখতে দেখতে দিন কাবার হয়ে যেত। মুখে বলল, ‘না।’

‘তা হলে তুমি বুঝবে না। একটাও যা—পাঁচটাও তাই।’

পাখিরা এখানে নির্ভয়ে দল বেঁধে নামে। আবার উড়ে আসে। ফিরে আসে। এককালে ঢেউয়ের কোমর ভেঙে দিয়ে রেলকোম্পানির সাহেবরা বড়ো বড়ো পাথর ফেলেছিল। সেগুলোর গায়ে কোথাও

জলের কোনো দাগ নেই। তবে জায়গায় জায়গায় স্রোত ঘুরে যাওয়ার মুখে পাথরে পাথরে চিহ্ন ফেলে গেছে। সে জায়গায় মনে হয়, পাথরেরও ছাল উঠে যায়।

দেবেন্দ্রলাল আজ ক-দিন হল কদমপুর এসেছে। এসে টের পেয়েছে, এখানকার সবকিছু বিরাট একটা বিশৃঙ্খলা। জটপাকানোর সুতোর কোন জায়গা থেকে গিঁট খুলতে হবে কেউ জানে না। পরিষ্কার মনে হল, ঠিক এখুনি একটা হেস্তনেস্ত না করলে এই ঘোলা কাটিয়ে ওঠা যাবে না। সময় বড়ো কম। নিজেকে খুব অসহায় লাগল দেবেন্দ্রলালের। অনেককাল একসঙ্গে এতটা হাঁটেনি। বাঁ পায়ের হাঁটুতে রীতিমতো ব্যথা করছে। তবু প্রায় শেষ চেষ্টার মতো বলে দিল 'তুমি কুবেরকে ফিরিয়ে আনো ব্রজ। আমি আর বেশিদিন বাঁচব না। একটু দেখে যাই ছেলেটাকে—'

কথার ধরতাইটুকু ব্রজর কানে পৌঁছেছিল। বাকিটা আর শোনা গেল না। রেলপুলের ওপর উঠে এসে একটা আটবগির ইলেকট্রিক ট্রেন সারাটা তল্লাট একসঙ্গে ঝনঝন করে বাজিয়ে দিল। গম্ভীর আওয়াজটা লেজে মাড়াতে মাড়াতে ট্রেনটা বেরিয়েও গেল। তখনও ওপরের আকাশ, গাছপালা, পাথরে পাথরে শব্দের শেষটুকু ছিটকে পড়ছিল।

দেবেন্দ্রলাল আবার একই কথা বলতে গিয়ে দেখল, মুখে কোনো শব্দ ফুটছে না। ছেলেদের মা বেঁচে নেই। দেবেন্দ্রলালকে যারা বুঝত—তারা অনেকেই আজ নেই। ইদানীং একই কথা তাই ফিরে ফিরে বলতে হয় তার। আবার চেষ্টা করল। হল না।

ব্রজ বলল, 'রোদ চড়ে যাচ্ছে। এগোই আসুন।' রেললাইনের ওধারে তার এক্কা দাঁড়ানো।

দেবেন্দ্রলাল শুনল—'চলুন যাই, কী করা যায় দেখি।' একটু আশা হল তার। ব্যথা ভুলে গিয়ে ওপরে উঠতে লাগল। সেখানে রেললাইন। সবকিছু চাকায় পিষে এইমাত্র ট্রেন চলে গেছে।

রোদে তাঁবু গরম হয়ে উঠতেই কুবেরের ঘুম ভেঙে গেল। বেলা হয়েছে। আভা নেই। কুবের বাইরে এসে দাঁড়াল। কাল রাতে জল অনেকটা উঠে এসেছিল। কিছু ফিরে গেছে—কিছু রয়ে গেছে। দিনের আলোয় কুবের এখন বুঝতে পারল—ঝড়ে-জলে যা হয়েছে, তা হল ভরাডুবি। যতদূর দেখা যায়—ধানগাছ শুয়ে পড়েছে—মাঝেমধ্যে কয়েকগুছি দাঁড়িয়ে। কী বেগে হাওয়া বয়ে গেছে! মাঠের নানান জায়গায় এক-একদল কামলা বসে।

থোড় ফেটে শিষ বেরিয়েছিল। ফুল ধরেছিল। বুড়ো মতো একজন কামলা তার একটা নিবেদন আছে জানিয়ে বলল, এখন খানিকটা জল মেরে দিতে পারলে—মোটা ধানটা ভালো ফলতে পারে। কেননা ধানগাছের সারা গা জলে থাকলেও শিষ যদি একটুখানি মাথা তুলে থাকতে পারে—তাহলে ধানের আর মার নেই।

গত ক-মাসের সব পরিশ্রম নষ্ট। কম টাকা ঢালেনি। প্যাকেটের পর প্যাকেট ব্লাইটক্স, লিটার লিটার এনড্রিন। সব গেল। বুড়ো কামলার কথা মতো দু-দুটো পাম্প চালু হল। শুয়ে পড়া ধানের গোছের পাশ দিয়ে নালা কেটে জলের রেখা সাকসন পাইপের মুখ অবদি টেনে নিয়ে যাচ্ছে কামলারা। এত বড়ো মাঠের জল যেদিক থেকে যতটা পারা যায় ছেঁচে ফেলতেই হবে। যদি কিছুটা বাঁচানো যায়।

মেদনমল্লর চত্বরে উঠতে গিয়ে কুবেরের মন আরও খারাপ হয়ে গেল। ভাঙাদুর্গের এখানে-ওখানে পাখিরা বাসা করেছিল। হাওয়ায় গুচ্ছের ডিম বাঁধানো চত্বরে পড়ে ফেটে গেছে। পালক বেরোয়নি—এমন অনেক ছানা জলে, ঠান্ডায় সিঁটিয়ে মরে পড়ে আছে। দিঘির পদ্মপাতা ডাঁটিসুদ্ধ জলের ওপর অনেকটা টেনে তুলেছে কে! ঝড়ের কোনো বাছবিচার নেই।

কুবের দাঁড়িয়ে থাকতে পারল না। হনহন করে বড়ো পাম্পটার দিকে ছুটে গেল। উঁচু বাঁধ দেওয়া জলাভূমির পাড়ে আভাকে পেল। মেদনমল্লর দুর্গের উঁচু দেওয়ালে রকমারি বুনোফুল ফুটে থাকত। সেগুলো কাল রাতে ঝরে পড়ে হাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে এতদূর ভেসে এসেছে। সকালের ঝকঝকে রোদে দাঁড়িয়ে আভা সেগুলো কুড়িয়ে কোঁচড়ে নিচ্ছিল, কয়েকটা খোঁপায় গুঁজেছে। কুবের দাঁড়াতে পারল না।

দশঘোড়ার পাম্পটা চালু করতে বিশেষ বেগ পেতে হয় না। তবে মাঝে মাঝে এয়ারহেডের স্ক্রুটা ঢিলে দিয়ে ফোঁটা ফোঁটা পেট্রোল ঢালতে হয়। তাই হচ্ছিল। কুবের এসে দাঁড়াল। তোড়ে জল টেনে নিয়ে বাইরে ফেলছে। কী মনে হল, সাকসন পাইপের ঝাঁঝরিতে কুচোমাছ নয়তো কাঠকুটো আটকে গিয়ে জলের তোড় কমে যাচ্ছে।

কুবের মাঠে নেমে গেল। তারপর মরিয়া হয়ে সাকসন পাইপের মুখের কাছে দু-হাতে মাটি আঁচড়ে

গভীর করে দিতে লাগল। ঘোলা জল পাক খেয়ে সোঁ-সোঁ করে পাইপে গিয়ে ঢুকছে।

কপাল বেয়ে ঘাম এসে ভ্রূতে আটকে যাচ্ছিল। মাথা তুলে চোখ ডলতে গিয়ে কুবের আভাকে দেখতে পেল। একেবারে সামনা-সামনি। রোদ বলে বেশিক্ষণ তাকাতে পারল না। একটা বেগুনি শাড়িতে আভা স্থির হয়ে দাঁড়ানো। মাথায় সেইসব ফুল—কোঁচড় হাতে চেপে আছে। মুখে কী একটা সুখ খুব স্থির হয়ে আভার সারা শরীর জুড়ে ভর করে আছে। খুব রাগ হলেও দাঁতে দাঁত চেপে বলল, 'কী দেখছ?'

'কিচ্ছু না। এমনি দাঁড়িয়ে আছি।'

কুবের বুঝল, এখন কিছু বলেই আভাকে ছোঁয়া যাবে না। সে এখন এমন কোনো জায়গায় আছে, সেখান থেকে সব কিছু সুখের লাগে। অথচ এত কষ্টের চাষবাস—কত বড়ো অঙ্কের লাভের স্বপ্ন রাতে ঝড়-জলে ধুয়ে গেছে।

কয়েক জায়গায় ধানাচারা কেটে ফেলে জলের পথ করে দিতে হল। কাটতে মায়া হচ্ছিল। শিষ ভর্তি হয়ে এসেছিল। টিপতেই দুধ বেরিয়ে যায়। সারা খেত জুড়ে জল-নিকাশের নালা তৈরি করছে কামলারা।

আভা নড়েনি। রোদে খালি গায়ে কুবেরকে এই প্রথম অনেকক্ষণ ধরে দেখল। গাঢ় কালচে দাগে সারা গা ভরে গেছে। অমন সুন্দর চকচকে কপালেও ছোপ ছোপ দাগ ধরেছে, চোখ বসে গেছে—টলে টলে কাদার মধ্যে ছপছপ করে এগোচ্ছে মানুষটা—এখন, জল কাদা দুইই গরম হয়ে উঠছে। কুবেরের সারাটা গা একরকমের কালচে শ্যাওলায় ঢাকা পড়ে যাচ্ছে।

থেমে দাঁড়াতেই কুবেরের মাথা দুলে উঠল। সামনের ঢালাও মাঠ চোখের সামনে চলকে গেল। দেখল,তার কিছুই মনে নেই। কেন এখানে দাঁড়িয়ে তাও জানে না। অনেক চেষ্টা করেও কোমর ভেঙে নিচু হতে পারছে না। হতে গেলেই খচখচ করে মেরুদণ্ডের ভেতরের হাড়ের চাকতিগুলো ছুঁচলো একটা ব্যথা তুলে তাকে সিধে করে দিচ্ছে।

পাম্পের আওয়াজের মধ্যেই আভা চেঁচাচ্ছিল, 'কুবের! কুবের—'

দুজন কামলা পাশেই কাজ করছিল। ছুটে এসে কুবেরকে ধরে ফেলল। তাদের গায়ে ভর দিয়ে পাড়ে ওঠবার মুখে আভাকে দেখেই খিঁচিয়ে উঠল, 'তুমি এখানে কেন?'

আভার মুখে সেই সুখ একটুও চিড় খেল না। কাল রাতে ঝড়ের পর ভোর হতেই কেউ এমন করে সাজে! কামলাদের সঙ্গে হাত লাগিয়ে আভাও কুবেরকে টেনে তুলল। ঝাঁকুনিতে খোঁপা ভেঙে পড়তেই কুবের দেখল বেণির খাঁজে খাঁজেও আভা লালচে কী একটা ছোটোমতো বুনো ফুল বসিয়ে নিয়েছে।

'তুমি এখানে কেন? যাও—'

আভা পেছোল না। বরং আরও শক্ত করেই কুবেরকে ধরল।

'চলে যাও আভা। এখান থেকে যাও। তাকিয়ে দ্যাখো—আমার আর কিছু নেই।'

'আবার হবে। আবার হবে—,' আভা কুবেরের কোমরে হাত দিয়ে মানুষটার মাথাসুদ্ধ অনেকখানি নিজের শরীরের ওপর নিতে গেল।

'তুমি যাও—'

আভা ধাক্কা খেয়ে ছিটকে পড়ে যাচ্ছিল। সামলে নিল। কামলারা মাঠে নেমে গেছে। কুবের টলতে টলতে তাঁবুর দিকেই এগোচ্ছিল। হঠাৎ ফিরে দাঁড়িয়ে জানতে চাইল, 'তুমি কে?'

'আমি? আভা! কেন?'

'উঁহু। আভা নও।'

'তবে কে?'

'জানি না। তোমাকে আমি চিনি না। আমার কিচ্ছু মনে পড়ছে না—,' কুবের চিৎকার করে উঠল, 'আমি সব ভুলে যাচ্ছি আভা—'

একদম না ঘাঁটিয়ে আভা কুবেরের পেছন পেছন তাঁবুতে গেল। বাইরে যেমন হাওয়া তেমন রোদ। এখানে-ওখানে নাবি জায়গায় জল দাঁড়িয়ে আছে। ধপ করে বিছানায় বসে পড়ল কুবের। আভা পায়ের গামবুট খুলে নিল। তারপর তাঁবুর একদিককার ক্যাম্বিসের পর্দা তুলে দিল। হাওয়া, আলোয় ভেতরটা ভরে গেল। তার মধ্যে, কুবের দেখল, দিঘির ধানের আস্ত একটা পরি ঠিক তারই সামনে দাঁড়ানো। একেবারে ঠিক আভা।

'আমাকেও ভুলে গেলে!'

'দয়া করে চুপ করে থাকো খানিকক্ষণ। তুমি যা পারতে তা তো করলে না—'

'আমাকে মুক্ত করে তোমার কী লাভ কুবের?'

'দয়া করে চুপ করে থাকো খানিকক্ষণ। ঘুমে চোখ ভেঙে আসছে আমার।'

'কিছু খাবে?' তারপর কোনো জবাব না পেয়ে আস্তে আস্তে আভা বলল, 'যদি চাও—আমি মুক্ত হয়ে যাই—' কোনো কথা নেই তাঁবুর ভেতরে। সাঁ সাঁ করে ঠান্ডা হাওয়া ঢুকছে। শেষে নিজেই বলল আভা, 'কিন্তু দেরি হয়ে গেছে কুবের। এখন বের করতে হলে ডাক্তাররা ছুরি চালিয়ে মেরে বের করবে—,' নিজের মতো করে একটু কেঁদে নিল আভা, 'সে আমি কিছুতেই পারব না কুবের। জেনেশুনে মেরে দিতে পারব না। সে হয় না—'

যেমন জবুথবু হয়ে বসে আছে, তাতে দেখেই বোঝা যায়—কুবের কিছুই শুনছে না। পা ছড়ানো, চোখ খোলা, হাত দুখানা বিছানায় ভেঙে পড়েছে—হাঁ করে নিশ্বাস নিচ্ছিল।

‘এখন যেন বড়ো হয়ে গেছে। ভেতরে নড়াচড়া করে। আগে তো এসব কোনোদিন হয়নি আমার—’

তখনও কুবের চুপ করে আছে। তার মাথার ভেতরে তখন বড়ো বড়ো দেওয়াল এলোপাতাড়ি ভেঙে পড়ছিল। হাওড়া স্টেশন পার হয়ে গেলাম। চুয়ান্ন নম্বর বাস। হরগঞ্জ বাজার। আস্তাবলে একটা ঘোড়া সারারাত পা ঠুকছে। দুপুরবেলা সালকের বাড়ির দরজা খুলল। মা দাঁড়িয়ে বাইরে। রিকশাওয়ালা ভাড়া গুনে নিচ্ছে। ঘচাং করে এইসব ছবি একটানে ছিঁড়ে তুলে নিল কে ফরফর করে।

আভা তখনও বলছিল,‘আমায় না হয় ডাঙায় কোথাও রাখলে—কলকাতায় কোনো ফ্ল্যাটে, মাঝে মাঝে যাবে—’

এবারও কোনো উত্তর পেল না আভা। দম নিয়ে বলল, ‘তোমার দাদার কাছেই ফিরে যাই। যদি চাও —মাঝে মাঝে দুজনে বাইরে কোথাও চলে যাব—আবার ফিরেও আসব।’

‘কার সঙ্গে থাকবে তাহলে?’

‘তোমার কাছেও থাকব—মোহান্তের কাছেও।’

কুবেরের মনে অনেক কিছু এসেছিল একসঙ্গে। শুধু বলল, ‘শেষে যদি ব্রজদাকেই ফিরে আবার ভালো লেগে যায়!’

আভার বিশ্বাস হচ্ছিল না। কুবের যে কোনোদিন আবার এমন হেসে কথা বলবে ভাবাই যায় না। দুখানা বুক খুলে ফেলে ভেতর থেকে কথা বলল আভা, ‘আর হয় না—’

‘আমার কাছেও থাকবে—ব্রজদার কাছেও, কোনো অসুবিধে লাগবে না?’

‘আহা! ন্যাকা! আমি কি ক্ষয়ে যাচ্ছি?’ আভা কুবেরের দ্বীপে এসে ঠিক এই ধারায় গোড়ায় গোড়ায় ফুঁসে উঠত।

‘তবু—’

‘তবু কী? তোমার কথাই ভেবে দ্যাখো কুবের। বুলুর কতদিনকার লোক তুমি—অথচ আমার কাছেও আছ—কোনো অসুবিধে লাগছে তোমার?’

কুবের চুপ করে গেল। কথাটা ফেলা যায় না।

‘আমাকে নিয়ে যাও কোথাও,’ থেমে গিয়েছিল আভা, পাম্পের আওয়াজ থেমে নেই, ফিরে বলল, ‘নয়তো এখানেই থেকে যাই না কেন আমরা—কী হবে আর ডাঙায় গিয়ে? বলো কুবের।’

কুবের চোখ খুলে তাকিয়েছিল। এইমাত্র যেসব জবাব তার মনে আসছিল ভেতরের ভাববার যন্ত্রপাতি কেমন ঢিলে হয়ে যাওয়ায় তা সাজিয়ে উঠতে পারছিল না। শুধুই ছড়িয়ে যাচ্ছে। খুব আস্তে আস্তে বলল, ‘তুমিই হয়তো ঠিক বলছ আভা। আমরা কেউ ক্ষয়ে যাই না। কিন্তু ধরো—,’ সব হারিয়ে গেল কুবেরের। এইমাত্র দিব্যি একটা ভালো কথা—বেশ জুতসই কথা মনে এসেছিল। শেষে একটু

সাবধানে মনে করে বলল, ‘ধরো যদি জং পড়ে যায় মনে?’

আভা হাসি ছিটকে দিয়ে বলল, ‘দিচ্ছে কে! পড়লেই হল!’ তারপর একেবারে অন্য জায়গা থেকে আভার গলা উঠে আসতে লাগল, ‘সবারই কুবের দুজন বউ থাকে—দুজন বর থাকে। একজনকে নিয়ে ঘর করে—অন্যজন ভাবনায় থাকে—লোকে সত্যি কথা বলতে ভয় পায় বলে এসব বলে না—’

কুবের খুব আস্তে বলল, ‘হবে—’

বাইরে খুব বাতাস। কাল রাতে ঢেউয়ের সঙ্গে অনেক চিংড়িমাছ ডাঙায় উঠে উঠে এসেছে। আভা গোটা দুই নোনাচিংড়ি তাঁবুর ধারেই ধরে ফেলল। দাঁড়া ধরে কুবেরের চোখের সামনে তুলে ধরে, ‘দেখেছ—কত বড়ো।’

কুবের চোখ তুলে তাকাল। দৃষ্টিতে কোনো আলো নেই। একেবারে ফাঁকা।

‘এগুলো কী হয়েছে তোমার—এই যে—,’ কাঁধে হাত রাখল আভা, ‘কালচে হয়ে গেছে একেবারে।’

কুবের হাসল, ‘তাই তো ভাবছিলাম। কীসের থেকে কী হয়ে গেল।’

‘ডাক্তার দেখিয়েছ কোনোদিন?’

‘কোনো লাভ নেই। আমি জানি কী অসুখ।’

‘সব জেনে বসে আছ!’

‘অনেকদিন জানি। একবার কদমপুর হেলথ সেন্টারের বিমল ডাক্তার বলেছিল—কোন জার্নালে পড়েছে, এ-রোগ পুরোনো হলে হাত-পায়ের গাঁটে কালচে ছোপ ধরতে শুরু করে—’

‘বলে দিল আর তুমি ধরে নিলে!’

‘আমি যে জানি আভা—’ অল্প একটু থেমে পড়ল কুবের, ‘আর জানত মা। তখন কম বয়স ছিল। কী বা বুঝতাম! আমার জীবনে এটা একটা স্যাড ঘটনা আভা—বলতে পারো এক্সপিরিয়েন্স। সেই অল্প বয়সে এমন ধাক্কা খেলাম মনে মনে—কী ভীষণ চাপা গুমোট—যারা জানত তাদের ঘেন্নায়—তাদের চোখ তুলে তাকানো আমি সেই বয়সেও সহ্য করতে পারতাম না। আমার ভেতরটা বিলকুল থেঁতলে গেল। অনেকগুলো লোক একসঙ্গে ধরাধরি করে একখানা ভারী পাথর এনে আমার বুকের ওপর চাপিয়ে দিল। সেই থেকে আমি আর নড়তে পারছি না—’

‘কীসব বলছ কুবের! আমি কিছুই বুঝতে পারছি নে—’

‘সেই থেকে আমি ভীষণ সরল, নিষ্পাপ হয়ে গেলাম। আমার মুখের দিকে তাকিয়ে দেখ আভা—আমি নিজেই জানি—এমন নিষ্পাপ মুখ শুধু শিশু নয়তো পাগলের হয়—’

‘কুবের—,’ আভা থামানোর চেষ্টা করল। বিন্দুবিসর্গও বুঝতে পারছে না। ছেলেটাকে গোড়ায় কেমন দেখেছিল—আর এখন কেমন হয়ে গেছে।

‘আমি সব সময় আমার নিজের মুখ দেখতে পাই। আয়না লাগে না আভা।’

‘চমৎকার! চুল আঁচড়াতে চিরুনি লাগে?’

কুবের রসিকতার ধার দিয়েও গেল না, ‘কখন করুণ—কখন মোলায়েম—কখন সরল, সাধু, নিষ্পাপ দেখায় আমার মুখ—আমি জানতে পারি আভা। এ-ভাবটা আমার ছিল না। এই মুখোশটা অভ্যেসে আমার মুখে একেবারে চেপে বসে মিশে গেছে!’

‘সেই থেকে কী ভুল বকছ। মাছ ভেজে দেব—খাবে?’

‘দাও। আমার পরের ভাই নগেন বলত—সেজদা তোমার মুখে সব সময় ভাবলেশহীন একটা বোভাইন লুক স্থির হয়ে আছে—’

স্টোভ ধরাতে ধরাতে আভা বলল, ‘আবার ইংরেজি বলছ—জানো আমি বুঝি নে—।’

‘গোরুর চোখ দেখেছ? তাই। আমার মুখে নাকি কোনো ভাবই ফোটে না। শুধুই সরল, শুধুই নিষ্পাপ—পাপের কোনো ছায়া নেই—’

‘ভালোই তো। তুমি খুন করে উঠে দাঁড়ালেও কেউ সন্দেহ করবে না—’

‘শুধু এক মুহূর্তের ভুলে আভা। তখন কিছুই বুঝতাম না।’

স্টোভের দশটা ঘোরানো পলতে একসঙ্গে আগুন পেয়ে শিখা হয়ে উঠল। আভা মুটমুট করে দাঁড়া ভেঙে ফেলল। মাছ ব্যথা পেলে শব্দ করে না। সেই অবস্থায় বাটিতে রেখে দিয়ে কুবেরের কাছে এল আভা, অনেকদিন পরে একেবারে গা ঘেঁষে পিঠে হাত রাখল, ‘কী হয়েছিল কুবের?’

‘ক্লাস এইটে একদিন শুক্কুরবারের দেড় ঘন্টার টিফিনে সনতের সঙ্গে ঘোলাডাঙার ফেরিঘাটে গিয়েছিলাম। ওর কাছে পৈতের ব্রতভিক্ষের টাকা ছিল অনেক।’

‘ঘোলাডাঙা?’

‘খারাপ পাড়া বলতে পারো—’

‘তুমি গিয়েছিলে?’

‘সেই একবারই—সেই শেষবার—’

‘কত বয়স ছিল?’

‘কত আর—বারো চোদ্দো—’

‘মোটে! তখনই!’

‘সেই ভুলেই তো আভা—’

‘বলো খুব অল্প বয়সেই পেকেছিলে। মেয়েটিকে দেখতে কেমন ছিল?’

'চেনা মেয়ে। শেফালি—তখন যা পাই তাই ভালো। এখন বুঝি—একেবারে পিয়োর ফ্যাকাসে একটা মেয়ে। তখন জানতামও না—একবারেই কত কী হয়ে যায়—তারপরেই অসুখ—'

'বাজে বোকো না। তোমার কোনো অসুখ নেই কুবের। তাই ধরে বসে আছ বুঝি। অমন তো লোকে কত যায়। আচ্ছা সেই সনৎ? দেখা হয়েছে পরে?'

'একবার। অনেকদিন পরে কলকাতায় এসপ্ল্যানেডের মোড়ে—'

'কিছু বলল?'

'একদম না। ভুলেই গিয়েছিল আভা। আমি মনে করিয়ে দিতে বলল, "এখনও প্রায়ই যাই—" অথচ আভা আমার যে কী হয়ে গেল! সেই একবারেই—অথচ—'

'কিচ্ছু হয়নি তোমার—দিব্যি ছেলেমেয়ের বাবা হয়েছ—আবার কী হবে?'

'তুমি জানো না আভা।'

'আমি সব জানি।'

স্টোভের আগুন নীল হয়ে জ্বলছিল। আভা মাছ চাপিয়ে দিল। আলোর দিকে চোখ তুলে তাকাতে পারছিল না কুবের, 'আমার তখন অসুখ হয়—খুব। জানাজানি হয়ে গেল। মা জানল। মা ওষুধ দিয়ে দিত। সে যে কী কষ্ট আভা—'

আভা স্টোভের পাশ থেকে নড়তে পারল না। পরিষ্কার দেখল,কুবেরের নাক, চোখ, মুখ পারলে এখুনি আলাদা আলাদা হয়ে ভেঙে পড়ে। কাছে এল। খুব আলগোছে মুখের কাছে মুখ নিল। ঠোঁটে চুমু রাখতে ভরসা হল না। গালে পাতলা করে একটু চুমু বসিয়ে দিল। চুলের ভেতরে আঙুল চালিয়ে হালকা করতে চাইল কুবেরকে, 'ওসব কথা এখন থাক।'

'পুঁজ পড়তে শুরু করল। সে যে কী বিপদ আভা! কী লজ্জা! নগেন হয়ত পরে বড়ো হয়ে আবছা আবছা বুঝেছে—'

'আমি আর শুনতে চাই না,' আভা উঠে গিয়ে খোঁচাখুঁচি করে মাছ নামাল, প্লেটে এগিয়ে দিল, 'খেয়ে নাও।'

'গরম।'

'চামচ দিচ্ছি—'

তাঁবুর বাইরে তাকিয়ে কুবের বলল, 'তাই বলছিলাম আভা—আমার রক্ত দোষে ধরেছে—খারাপ। পিঠের ব্রণ খুঁটলে পাতলা ফ্যাকাসে অনেক রক্ত বেরিয়ে আসে। হাঁটতে গেলে মেরুদণ্ডের হাড়ের চাকতিগুলো ছুঁচোলো ব্যথায় খচখচ করে ওঠে। সেখানে একটা সরু রেখা ধরে কী সব মাথার মধ্যে সিধে চলে যাচ্ছে। আভা আমি একে একে সব ভুলে যাচ্ছি। আবার খাপছাড়া ভাবে অনেকখানি এক

সঙ্গে খচাং করে মনে পড়ে যায়। গায়ের এই দাগগুলো দ্যাখো, কত কম ছিল আগে—এখন রোজ বেড়ে যাচ্ছে একটু একটু করে—রোজ—'

'চিকিৎসা হয়েছে। সেরেও গেছ তুমি।'

'ভয়ংকর চিকিৎসা হয়েছিল। বাড়ির মধ্যে আলাদা মশারিতে আলাদা ঘরে জায়গা হল। ডাক্তার চিকিৎসা ছাড়াও দরজা আটকে একা ঘরে দাবড়ি দিয়ে হাজারো কোশ্চেন করত। চিকিৎসার সঙ্গে সোশ্যাল ওয়ার্কও চালাত লোকটা—'

'সব ভুলে যাও কুবের। এবার বোধ হয় মাছ ঠান্ডা হয়েছে। শুধু হাতেই খেতে পারবে।'

কুবের খেতে খেতেই দাপাচ্ছিল, 'আমি একটু ঘুমোব।'

'চান করবে না? আচ্ছা ঘুমোও। আমি বেরিয়ে যাচ্ছি।' আভা তাড়াতাড়ি স্টোভ নিবিয়ে ফেলল। তাঁবুর বাইরে এসে দেখল, কাল রাতে যতদূর জল উঠেছিল—দ্বীপের ততটা জুড়েই যতদূর চোখ যায় সাদা কী একটা জিনিস রোদে চিকচিক করে জ্বলছে। জল ফিরে গেছে। এখন নানান মাছ পড়ে আছে। জল নেই আর—রোদ বাড়ছে, এরা আজ সকালেই মরেছে। কামলারা শিল কুড়োবার ধারায় মাথা নিচু করে কুড়োচ্ছে। এতক্ষণ কুবের বাইরে ছিল বলে পারেনি।

শরীরের কথা ভুলে গিয়ে আভা একছুটে তাঁবুর ভেতরে এল। কুবেরকে মাছ কুড়োতে ডাকবে। থামতে হল। কয়েক সেকেন্ডে মানুষটা গভীর ঘুমে তলিয়ে গেছে। মুখ হাঁ হয়ে আছে। বুকের ওপর থেকে বাঁ হাতখানা নামিয়ে দিল।

কুবেরের তখন খুব আনন্দে কাটছিল। অনেকদিন পরে নগেনের হাত ধরে একটা কালো পাথরের মন্দিরের সিঁড়ি বেয়ে নামছিল। নীচেই রাস্তায় বাস দাঁড়ানো। এমন নিশ্চিন্তে কতকাল কোনো জিনিস দেখে বেড়ায় না দু-ভাই। বাসস্টপে দেখল, বোঁচকা নিয়ে মা বসে আছে। কুবেরদের দেখে বলল, 'পরের বাসে যাবি। এখানে একটু বোসো।'

দু-ভাই একসঙ্গে বলে উঠল, 'তুমি বেঁচে আছ মা?'

'বারে! আমি আবার মরলাম কবে?'

নগেন কুবেরের দিকে তাকাল। সেজদা কাঁদছে। কুবের ভুলে যেতে যেতে মনে করার চেষ্টা করল, একদিন তবে কাকে আমরা পুড়িয়ে এলাম? কথাটা বলতেই মা বলল, 'ভুল হচ্ছে তোর। অন্য কারো সঙ্গে গুলিয়ে ফেলেছিস। তোর গৃহপ্রবেশে যাওয়া হয়নি। চল বাড়ি দেখাবি। ক-টা ঘর?'

কুবেরের মুখ হাঁ হয়ে গিয়ে হাসি বেরিয়ে আসছে গলগল করে। নগেন পুকুরের কথা বলছে, দোতলার ছাদের কথা বলছে। তিনজনে কী জোরে হেঁটে এগিয়ে যাচ্ছে। মোড় ঘুরে রাস্তাটা, সেখানে খানিক জায়গা কালো পাথরের। তার ওপর দিয়ে উঁচু কোনো জায়গা থেকে জল আসছে। তিনজনের পা ডুবে গেল সেখানে।

মা বলল, ‘সাবধানে এগোবি। এখানটা খুব পেছল।’

ছপছপ করে তিনজনে হাঁটছে তো হাঁটছেই। জলের ধারা নেমে আসার একটানা শব্দ। কুবের একবার পেছন ফিরে দেখল,জল কেটে অনেকটা এগিয়েছে দু-ভাই। কিন্তু মা বেশ পেছনে পড়ে গেছে। সেই দূর থেকেই মা বলল,‘তোরা এগিয়ে যা—আমার জন্য থামিস নে।’

‘মা তোমার কুটনো কুটতে বেশি জায়গা লাগে বলে একটা চওড়া বারান্দা বানিয়েছি। দেখবে চলো।’

এবার ফিরে দেখল, পেছনে মা নেই, পাশে নগেন নেই—শুধু জলের শব্দ—অনেক জল বয়ে যাচ্ছে, মাঝখানে ফেনার রেখা।

কুবের উঠে বসল। তখনও জল পড়ার একটানা শব্দটা শোনা যাচ্ছে। আশ্চর্য! এইমাত্র মা ছিল, আবার চলেও গেল। অথচ জল পড়ছে! আভা নেই। বিছানা থেকে একেবারে তড়াক করে উঠতে পারল না। তাঁবুর জানলা দিয়ে দেখল, দশঘোড়ার পাম্পটা খুব বেগে জল ছেঁচে বাঁধের ওপারে ফেলে দিচ্ছে। তারই ছ্যাঁচা থ্যাঁতলানো শব্দটা এখন বাতাস কম বলেই এমন সহজে তার ঘুমের মধ্যে চলে গিয়েছিল।

কুঁজো পড়িয়ে জল খেতে গিয়ে দেখল চন্দনে দাগানো পাথরখানা একপাশে পড়ে আছে। কুবেরের ভেতরটা ছ্যাঁত করে উঠল। ব্রজদার রেলেশ্বর শিব!

এখন কুবের বুঝতে পারল, তার মন এক এক জায়গায় আলাদা সব ঘরে ধরা পড়ে আছে। ঘুমের মধ্যে মাকে পেল, নগেনকে পেল। আভা তাঁবুতে থাকে। মেদনমল্লর পৌরাণিক তকতকে পরিষ্কার বাথান তার বড়ো চেনা। কদমপুরে জায়গা মাপার দিন যে-সাপটা আগাগোড়া মাথা তুলে তাদের দেখেছিল, সে কোথায় থাকে—কুবের জানে।

এই অবেলায় বাইরে আকাশ বোধ হয় অন্ধকার হচ্ছিল। ভেতরেও আলো কমে গেল। তাতে রেলেশ্বর শিব মিশে গেলও চন্দনের দাগ আরও স্পষ্ট হয়ে উঠল। অবিশ্বাস করার কোনো কারণ নেই, একটু আগেও এখানে মা ছিল, নগেন ছিল। বাইরে এসে দাঁড়াল কুবের।

লন্ডভন্ড মাঠ দেখে বোঝাই যায়, চাষ-আবাদে আগাগোড়াই কুবেরের ভরাডুবি। তবু ধানকাটা, আছড়ানো অবদি পরপর সব করে যেতে হবে। পুরোটা গচ্চা জেনেও থামা যাবে না। এর নাম ধান। নেশায় নেশায় জড়ানো। যদি শেষদিকে বাকি শিষের সবটুকু দুধে ভরে যায় তাহলে তো বাজিমাত। কিন্তু ফিরে কোমর বেঁধে ঝাঁপিয়ে পড়ার মতো ইচ্ছে বা জোর কুবের কিছুতেই পাচ্ছে না।

দু-চারদিন বাদেই পূর্ণিমা। জ্যোৎস্নার তেজ থাকতে থাকতে ‘ডাহুক’ খোঁড়াতে খোঁড়াতে লঞ্চঘাটায় যাবে। ঝড়ে কি সব ভেঙে বসে আছে? রাতে চললে ইঞ্জিন কম গরম হয়। ঝুঁকিও কম। খুব আস্তে আস্তে লঞ্চটা খাঁড়ি থেকে বেরিয়ে আসছে। মেদনমল্লর দুর্গ বরাবর নোঙর ফেলবে। বেলাবেলি মেঘে ঢাকা পড়ে সূর্য কিছু আলোর রেখা সোজাসুজি কুবেরের মাঠে পাঠিয়েছে। তাতে চারদিক এফোঁড়-ওফোঁড় হয়ে আলাদা চেহারা পেয়ে বসে আছে।

ঠিক এই সময়ে আভাকে দেখা গেল। বড়ো নদীর মাছমারারা বিদঘুটে মাছ পেলে যেখানটায় ছাল ছাড়িয়ে শুকোতে দিয়ে যায়—সেই দূরের তীর থেকে মেয়েমানুষটা উঠে আসছে। অদ্ভুত এক অভ্যেস। মুখ ফেরানোর জন্যে ভেসে আসা মাছের খোঁজে প্রায়ই দূর দূর জায়গায় চলে যায়। খানিক পরে কুবের দেখল—নদী, দুর্গের অতিকায় কাঠামোটা পেছনে ফেলে একখানা খুব সুখী মুখ নিয়ে আভা এগিয়ে আসছে। হাঁটাচলা, হাসিতে কোনো চিন্তা নেই।

অসুখ থেকে উঠলে লোকে ঠিক এমন খিটখিটে মেজাজ, নড়বড়ে পায়ে দাঁড়িয়ে থাকে—অপেক্ষা করে। রাগবার চেষ্টা করে দেখল, হচ্ছে না। তাই কুবের কোনো একটা কিছু ধরে বসবার চেষ্টা করল।

ছেঁচে ছেঁচে অনেকটা জল তুলে ফেলা গেল। দু-এক জায়গায় বাঁধ ফাটিয়ে দিতেই বেরিয়ে যাবার আর পথ পায় না। সারাক্ষণ জল সরে যাওয়ার শব্দে কুবেরের রক্ত ঝিম ধরে গেল দু-দিনে। দুধে ভরাট ধানের শিষ যা ছিল, একটু একটু মাথা তুলে লতিয়ে উঠেছে। বুড়ো মতো সেই কামলা বলল, 'ভাববেন না, যেটুকু আছে—আপনাকে চৌগুণ ধান দেবে।'

ভোর থেকে দু-বার তাঁবুর হাতায় দাঁড়িয়ে আভা গলা চিরে ফেলে ডেকেছে। কুবের যায়নি। একবার চা পাঠিয়েছিল। ফ্ল্যাস্কে। বুড়োর কথা বিশেষ কানে নিচ্ছিল না কুবের। দাগের পর দাগ ন্যাড়া—শুধু কয়েক জায়গায় চৌগুণ ধান উঠলেও কুবেরের লোকসান সামলানোর পথ নেই। তবু ধান আছড়ানো অবদি কুবেরকে সব কিছু বজায় রেখে যেতে হবে।

এতবড়ো লোকসান ঠেলে আবার মাথা তুলে উঠে দাঁড়ানো বড়ো কঠিন। আগে শুধু টাকা আসত। কিছুকাল শুধু যায়। মজুরি দিতে হয়, তেল কিনতে হয়। এখন আর টাকা আসে না। অথচ ডালপালা ছড়াতে ছড়াতে খরচের জাল অনেকদূর বিছিয়ে ফেলেছে। স্টেডিয়ামের ভিত ঢালাইয়ের খবর পেয়েছিল। সে যে টাকা খাওয়ার হাতি।

জায়গাজমি নাড়াচাড়া,বিক্রিবাটা বেশ কিছুদিন বন্ধ। ফিরে কী আর শুরু করা যাবে। ভাবতেই তার মাথা ঝিমঝিম করে। আগে কত বিশ্বাস ছিল—নিজেই বলেছে, আমার গা বেঁধে টাকা আসে।

নালা কেটে কামলাদের একজন ধানের গোছের ওপরে কোদাল ফেলে রেখে গেছে। সেখানা কাঁধে ফেলে কুবের উঠে এল। হাঁটতে হাঁটতে মনে পড়ল, নিজেকে কুবের যে-কোনো ব্যাংকবাড়ির ভারী গাঁথুনির জাবদা দেওয়াল বলে ভাবত। কিংবা স্ট্র্যান্ড রোডের সেইসব বাড়ি। পেল্লায় বিরাট। লিফটের পাশের দেওয়ালে পেতলের পাতে কোম্পানির নাম লেখা থাকে। পৃথিবীর জন্মদিন থেকে এরা আছে —ভাবখানা তাই। দূরে জাহাজে মাল চালাচালি হচ্ছে। ডাঙায় বসে সেইসব কোম্পানি কোটি কোটি টাকার বাণিজ্য করে যাচ্ছে। নিজের ওপর বিশ্বাসটা এতই বেড়ে যাচ্ছিল—এক-একসময় কুবের ভাবত, সে বুঝি একটা কোম্পানি। যারা অফিস সাজিয়ে খরচ-খরচা বাদ দিয়েও লাভ রাখে। স্ট্যান্ড রোডে সেইসব বাড়ির পাশ দিয়ে ইট-বাঁধানো রাস্তায় কুবের দ্য ভ্যাগাবন্ড একসময় কতবার হেঁটে গেছে। বিস্ময়ে, শ্রদ্ধায় তার মাথা তখন নুয়ে যেত।

সেই স্বপ্নটা, ছবিটা গোপনে গোপনে ভেতরে একটা কাজ করেছে—আগে কুবের তা একদম টেরই পায়নি। সেই চালে চলে-চলে খরচের হাত দারুণ লম্বা হয়ে পড়েছে। তাঁবুর পাশ দিয়ে যাওয়ার সময় দেখল, আভা পেছন ফিরে একমনে চুল বাঁধছে—দাঁতে ফিতে কামড়ানো—শরীরেরই কোনো ঢিলে টুকরোর কায়দায় ডুমোডুমো কালো পাথরের মালাটা গলায় একদিকে ঝুলে পড়েছে। পরিষ্কার

বোঝা গেল, আভার দুই কাঁধের ওপর দু-খানা ভারী পাথর চেপে বসে আছে। তাই নুয়ে পড়েছে। গালের পাশে খানিক অন্ধকার—না ছায়া, চিবুকে চাপা পড়ে আলো অমন কালচে হয়ে যায়।

অনেকদিন পরে আভার জন্যে কিছু মায়া হল। দাঁড়িয়ে পড়েছিল কুবের। সিঁথি ঘেঁষে ঘন কালো চুল খুব নিয়ম মেনে নেমে গেছে দু-ধারে। চিড় মেরে বেণির ডগা থেঁতলে নিচ্ছে আভা। ওই মাথা, জোরে ভার দিলে দুটো কাঁধই ভেঙে যাবে—এই নিয়ে একটা মেয়েলোক। অথচ চাষবাসে এই ভরাডুবির মাঝখানে একটুও চলকায়নি আভা। নিজের নতুন সুখে খুব আলতো করে পাখা মেলে দিয়ে বাতাস কাটছে। কোথাও ভার রাখতে চায় না। সে-কথা মনে পড়তেই কুবের আগাগোড়া জ্বলে উঠল। একটু আগে আভাকে বিপদ-আপদে ঘিরে রাখার ইচ্ছে হয়ে যাচ্ছিল। আর এক্ষুনি কুবের ভেতরে ভেতরে ধরে উঠল। বেলা তেমন নয়। বিকেল সেই বিকেলে আসবে। তার আগে নয়। এত আগে আগে চুল বাঁধতে বসেছে।

ইচ্ছে করলেই তুমি পারো। দয়া করো আভা।

এই পর্যন্ত। তারপর কুবের পরপর সাজিয়ে কিছুই মনে করে উঠতে পারল না। ঘচাং করে চেনা-জানা ছবিগুলো মাথার ভেতরে পরপর পড়ে গিয়েই সব গোলমাল। ভিতপুজোর দিন ট্রেনে বাবা বলেছিল, তোমার কত টাকা কুবের। আরেকবার দেবেন্দ্রলাল সাধুখাঁ কুবেরকে বলেছিল, একদিন যদি টাকা আসা বন্ধ হয়ে যায়—তখন কী করবে?

অবিশ্যি তেমন সময় এখনও আসেনি। কিন্তু কিছু আগেই যদি এসে পড়ে। ব্রজদা সেই কবে থেকে টাকার খোঁজে প্রতিষ্ঠার লোভে নানা ফন্দিফিকির করে ঘুরে বেড়াচ্ছে। তার অসাক্ষাতে কিছুকাল হল মোহান্ত হয়েছে। অথচ সাধন-ভজনের শিবঠাকুর এখন ওই তাঁবুতে চিৎপাত হয়ে পড়ে আছে। বাতাসে বিছানার চাদর গুটিয়ে যায়, কাগজপত্র ওড়ে—তাই হালকা জিনিসপত্তর রেলেশ্বর শিব দিয়ে আভা চাপা দিয়েছে।

আভা উঠে দাঁড়িয়ে জলের দিকে এগিয়ে গেল। পেছনে তাকালেই কুবেরকে দেখতে পেত। জট-ছাড়ানো মাথার চুলে থুথু দিয়ে এখন খাঁড়ির মুখে ফেলে দেবে। ভাসতে ভাসতে তা কতদূর যাবে ভাবাই যায় না। কুবের চত্বরে উঠে এল। চড়া রোদে পরিদের ফাটা ফাটা গাল স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। আজ দুর্গেই শোবে ঠিক করল। কোদালে কাদা ছিল, পায়েও কাদা। কুবের ধপ করে দিঘিতে নেমে গেল। পুরনো দাম সরানো একটুখানি জলে নিজের ছায়া ফুটে উঠতে কুবের সাবধান হয়ে গেল। ছায়ার আবছা জায়গাগুলো তার গায়ের কালচে শ্যাওলা ছাড়া কিছু নয়। কুবের একেবারে সিয়োর হয়ে গেল। সেই স্যাড ঘটনায়—এক্সপিরিয়েন্স-এ তার কী হয়ে গেল। সব ঢেকে যাচ্ছে। শ্যাওলায় ভরে যাচ্ছে কুবের। খুব সাবধানে একেবারে জলের গায়ে চোখ নিয়ে মুখের ছায়া চিনতে চাইল। কিছু দেখা যায় না। সব একাকার। চোখের মণির বাইরের সাদাটে জায়গাটুকু ছায়ায় খুঁজে বের করা কঠিন। জল স্থির করে নিয়ে বারবার দেখতে গিয়ে কুবেরের কোমরের ভেতরে মেরুদণ্ডের শুকবো হাড়ের চাকতিগুলো খচখচ করে উঠল। সঙ্গে সঙ্গে এতদিনের জীবনে যা কিছু জানা-চেনা ছিল,

কুবের যা-কিছু মনে রাখতে পেরেছিল—সব এক সঙ্গে মুছে গেল।

অথচ এখন তার সাহায্য চাই। কেউ তাকে দিঘির ধাপ থেকে টেনে তুলুক। গায়ে-পায়ে কোথাও কোনো জোর নেই। কাকে ডাকবে? আমি কার ছেলে? কে আছে আমার? দিঘির জমাট দামে ফোটা ফুল দেখে একটু একটু করে মাকে মনে পড়ল। সে নেই তাকে ডাকা যাবে না। অনেক কষ্টে আভাকে ডাকল। নিজেই নিজের গলার আওয়াজ পেল না। হাপরের ধারায় শুধু খানিক বাতাস বেরিয়ে এল মুখ দিয়ে। দিঘির গাঢ় গর্ত পেরিয়ে পাড়ের ওপরের পৃথিবীতে কোনো শব্দই যায় না। তবু চেঁচাতে লাগল কুবের। এক সময় থামতে হল। নগেন কাছে নেই। মা একদম নেই। বড়দা, বড়ো বউদি, বাবা,বীরেন ওরা একবার কদমপুরে আসেও না। তবে আমি এসব কেন করতে গেলাম! কী দরকার ছিল!

রোদ ঘুরে গিয়ে মেঘের আড়ালে পড়ল। কুবের কোদাল হাতে সোজা ওপরে উঠে এল। বুঝল, অনেকটা খাটুনির ভেতর দিয়ে একটানা যেতে পারলে কিছুই হারাবে না, সব মনে থাকবে। এই ভুলে যাওয়া যে কতখানি ভয়ের—সে কথা কাকে বলবে? কাছে-পিঠে কেউ নেই। আভা! বুঝবে না। বিয়েকরা বউ বুলু। সেও কি বুঝবে! ইদানীং মাঝরাতে ঘুম ভেঙে গিয়ে এই ভয়টাই সবচেয়ে আগে কুবেরের সামনে বড়ো হয়ে ওঠে। তখন বিছানায় আসন করে বসে। পরপর মনে করার চেষ্টা করে—কত পুরোনো কথা মনে আছে তাই নিজের কাছেই যাচাই করে নেওয়ার চেষ্টা করে কুবের। একবার বড়দার রাজা ফাউন্টেন পেন বেচে দিয়ে বন্ধুদের নিয়ে কুবের চড়কের মেলায় সাতটা তরমুজ কিনেছিল। বিচিতে-রসে মাখামাখি। তারপর ধরা পড়ে অপমানের একশেষ। সেই ফাইভ-সিক্সে কুবের একটা জিনিস ঠিক করে নিয়েছিল—মন যা চায় তাই করো, জিভ যা চাই তাই খাও—সেজন্যে এনি ডেঞ্জার ফেস করতেই হবে। তখনকার যুক্তি কুবের অনেকটা এভাবে সাজাত—বাড়ির দরকারি কলম, বইপত্র বেচে দিয়ে কাজ হাসিলের পর মার খেতে হবে, অপমান সইতে হবে ঠিকই—কিন্তু তা কতক্ষণ? বড়োজোর দু-তিন ঘন্টা—বেশি হলে একদিন। তারপর তুমি তো ফ্রি!

ক-দিন আগে দুর্গের ধাপে বসে কুবের এইভাবে একটু একটু করে মাঝরাতে পুরোনো দিনের কথা মনে করে ফেলছিল। এইসব হারানো আংটা ধরে কুবের যে-কোনো উপায়ে সব ভুলে যাওয়ার হাত থেকে বাঁচতে চায়। চেঁচিয়ে গলার আওয়াজ চালু রাখতেই হবে। কথা বলার জন্যে কোন ঢং-এ টাগরায় জিভ বুলোতে হয়, নিশ্বাসের জার্নি আটকে দিতে হয়—তা কিছুতেই ভুললে চলবে না। মনে রাখতেই হবে।

এই এখন—এখনকার লোকজন, টাইম, বিপদ-আপদ, ভাবনা-চিন্তার সঙ্গে নিজেকে যে-কোনো উপায়ে সেফটিপিন দিয়ে গেঁথে রাখতে হবে। তাই এখনকার কোনো কাজে মাথা অবদি ডুবে যেতে হবে, জড়িয়ে পড়তেই হবে। হাতের কাছে সেরকম কিছু না পেয়ে কুবের কোদাল কাঁধে মেদনমল্লর দুর্গে ঢুকে গেল। ছাদ নেই বলে ওপর থেকে যা কিছু আলো খসে পড়ছে। নীচে পড়ে তার ধার মোটা মোটা দেওয়ালের আড়ালে অনেকটাই ক্ষয়ে গিয়ে যে-কে সেই অন্ধকার।

বেগুনি রঙের ফুল না কুঁড়ি ধরে আজ ঝাঁকড়া আকন্দ গাছটা দাঁড়িয়েছিল। কুবের হোঁচট খেয়ে তার

ওপরেই পড়ে গেল। অন্ধকারে অন্ধ রাগে কোদাল হাতে উঠে দাঁড়াল। এখানে একদিন আভা তাকে পেয়েছিল। মেয়েমানুষটার গা ধরে ধরে কুবের সেদিন উঠে দাঁড়িয়েছিল। সেদিনও দুর্গের এত গভীরে তার আগে কোনোদিন তারা আসেনি। মেঝের ছালবাকলা উঠে গিয়ে এখানে-সেখানে নিচু। ঠিকমতো দাঁড়ানোই যায় না।

আবার সেই ভয়টা চেপে বসার মুখে মুখে, চেনা-জানা সব কিছু মুছে যাওয়ার ঠিক আগে গায়ের সবটুকু জোর দিয়ে কুবের আকন্দ গাছটায় কোদাল বসিয়ে দিল। যে-কোনো একটা একটানা খাটুনি দিয়ে এখনকার টাইমের সঙ্গে যে কোনো রকমে নিজেকে গেঁথে রাখতে হবে। নইলে সব ভুলে যাব। আর এক কোপ বসাল।

নরম ডালপালা নিয়ে নির্দোষ গাছটা ঢলে পড়ল। আকন্দকে বিশ্বাস নেই। একটুখানি গোড়া থাকলে তা থেকে পরে আবার পাতা বেরোয়,ডাল বেরোয়। মাটির কত গভীরে যে এরা শেকড় পাঠায়। এই অন্ধকার থেকে গাছটাকে একেবারে মুছে দিতেই কুবের আর কোদাল থামাল না। এক একবার শেকড়ে আটকে যায়। কোদাল ছানিয়ে নিয়ে দ্বিগুণ জোরে বসিয়ে দেয়। কোপাতে কোপাতে খানিকক্ষণের ভেতর বেশ বড়ো একটা গর্ত করে ফেলল। জায়গাটা ঠান্ডা। সদ্য সদ্য মাটি তোলা জায়গার গভীরে দাঁড়িয়ে কুবের বুঝল এ-জায়গা আরও ঠান্ডা। তার ভেতর প্রায় হাত পা ছড়িয়ে শুয়ে থাকা যায়। আগাগোড়া মাটির একখানা শীতল খাট। কোপাবো মাটি কী ঠান্ডা! কতকাল ওলটপালট হয়নি।

দূর-জলের জেলেদের বড়ো নদীর জায়গা ভাগ করে নেওয়া আছে। সীমানা বোঝাতে তেলের বড়ো বড়ো ফাঁপা ড্রাম ভাসানো। তার নীচে নীচে জালের সুতো আটকানো। লগ্গুঘাটা পেরিয়ে খানিক দূর অবদি এসব দেখা যায়। তারপর আর নেই। এদিকে শুধু নদী, জল দেখে দেখে আভার চোখ পচে যাওয়ার দাখিল। তবু আজকে একঠায় বসে এসব দেখতে দেখতে তার সামনেই পৃথিবী হরেক আলোতে ভরে যাচ্ছিল, মনে হচ্ছিল, এইমাত্র জীবন শুরু হল। কোত্থেকে সারা শরীর যে এত ভরাট হয়ে আছে, তা নিজেই জানে না আভা।

সামনের জলায় কতক পানা বাতাসের ধাক্কায় একপাশে পুরু হয়ে জমা হয়েছে। তার ওপরে একটা কালো বিরাট সাপকে মাথা তুলে দুলতে দেখল। অন্যদিন হলে চেঁচিয়ে উঠত। আজ চুপ করে গেল। এসব জিনিস,জলের ধারে ধারে কাঁকড়ার গর্ত, ইঁদুরের পথ, কালকেসুন্দির বেঁটে ঝাড়—সবই আজ আভা আলতো করে হাত বুলিয়ে দিতে চায়। এখানে ঝড়-বাতাস, আলো, শব্দ উঠলে—এইসব ছুঁয়েই একেবারে সোজা আকাশে উঠে যায়। এইখানে সে মা হবে।

কালাচ, নয়তো ক্ষয়ে গোখরো। বয়স হয়েছে। ফণাটা আরেকটু উঠতেই আভা পরিষ্কার দেখল, একটা বড়ো ঢোঁড়া সাপকে লেজে পেঁচিয়ে মরণ পাক দিচ্ছে। এবার গুঁড়িয়ে ফেলবে। ঢোঁড়াটা নেতিয়ে যেতেই তার কোমর কামড়ে ধরল মুখে—মাথাটা তুলে সাঁতরে এসে পাড়ে উঠে মরা সাপটা রাখল—তারপর সেখানে বসে বসেই হাঁপাতে লাগল গোখরোটা।

আভার মুখ দিয়ে বেরিয়ে গেল— 'আহা!' কার জন্যে বলল, নিজেই বুঝে উঠতে পারল না। মরা ঢোঁড়াটা—না, ক্লান্ত গোখরো—কার জন্যে। আজ এমনভাবে সব কিছুর জন্যে তার মন করুণার ভরে যাচ্ছে। অথচ এই সাক্ষাৎ যম তার তাঁবুর শ-খানেক গজের মধ্যে বাসা বেঁধেছে—একথাটা এখুনি কুবেরকে জানানো দরকার।

ঠিক তখনি তার নাম ধরে ডাক শুনল—'আভা।'

দুর্গের চত্বরে মানুষটা দাঁড়ানো। আভা সঙ্গে সঙ্গে উঠল না। আজ দুপুরে দুজনের কেউই খায়নি। শোয়নি। ভোর থেকে নানারকমে ডেকেছিল কুবেরকে। ধানের মাঝখানে দাঁড়িয়ে কুবের কোনো সাড়া দেয়নি। সকাল থেকে রান্না কম করেনি আভা। তারপর দেখল, কুবেরের চেয়েও বড়ো কিছু তার নিজের ভেতর থেকে উঠে তাকে ভারী, গম্ভীর করে দিচ্ছে।

সব ভুলে যাওয়ার ভয়ে কুবের শেকড়সুদ্ধ আকন্দগাছটা উপড়ে ফেলেছে। সেখানে এখন গর্ত। ভেতরে শুয়ে পড়া যায়। তারপর টলতে টলতে বাইরে বেরিয়ে এসে দেখে জলার সামনে আভা এক মনে বসে আছে। সব মনে রাখার জেদে আভাকেও ব্যস্ত রাখা চাই।

রোদ নিবে যাবে খানিক পরে। যে ক-গোছ ধান দাঁড়িয়ে ছিল, তাদের থোড় ফেটে বেরোনো শিষের ডগায় হলদে ছোপ ধরতে শুরু করেছিল। আলোও পালটাচ্ছিল। তার মধ্যে আভা ভীষণ আস্তে বেশ দুলে দুলে এগিয়ে আসছে। সুখে ভাসলে লোক এমন করে।

'কী বলছ?'

মোটেই তেরিয়া নয়। অন্য কোনো কথার ভাবনা আলগা হয়ে ঠোঁটে ঝুলে আছে। হঠাৎ দেখলে পাতলা একটুখানি হাসি বলেই মনে হবে। চোখ অন্যদিকে ফেরানো।

কুবেরের মনে পড়ল সে দাগি মানুষ—একথাটা নিজেই আভাকে বলে ফেলেছে। আলো সরে যাওয়ার সময় হয়েছিল। পরিষ্কার নীল আকাশে চাঁদের আগাম জলছাপ আবছামতো হয়ে ফুটে উঠল। 'এখানে একটু বসবে?'

কাল-পরশু পূর্ণিমা লাগবে। কারও অপেক্ষা না করে কুবের নিজে নিজেই পা ঝুলিয়ে চত্বরে বসে পড়ল। আজ এতখানি আদরেও বিশেষ সাড়া না দিয়ে আভা চুপচাপ কুবেরের পাশে বসে গেল।

আভা দ্বীপে থেকে যাওয়ার কথা বলছে না। কোথাও চলে যাওয়ার কথাও না। কুবের বুঝল, জীবনে অন্তত একবার—এই প্রথম, সে নিজে নিজেই তার মুখের ওপরকার নিষ্পাপ ছাপটা—মুখোশও বলা যায়—খানিকক্ষণের জন্যে একটানে তুলে ফেলতে পেরেছিল। খুব সত্যি—এই পাপহীন খোলসটা তার মুখের মাংসে ভিখারির গায়ের জামা হয়ে কেটে বসে গিয়েছিল। আলাদা করা যাচ্ছিল না।

'রেলেশ্বরকে আনতে গেলে কেন? বেশ ছিল ব্রজদার কাছে—'

'আর কী আবার ছিল।'

‘লোকটাকে তো পথে বসিয়ে দিয়ে এলে।’

‘সে মানুষ নয়। কোনো একটা পথ বের করে নেবেই। আমার আগে থেকেই তাকে চেনো তুমি।’

দুর্গের ভেতরে ঢুকে কতক্ষণ কোদাল কুপিয়েছে তার ঠিক নেই। দাঁড়াতে বসতে দম পাচ্ছিল না। এখন হাওয়া দিতে কুবেরের শরীর ঠান্ডা হয়ে এল।

কুবেরের প্রথমবারের চুমোয় আভার মনে হয়েছিল, বৃষ্টির পর সদ্য ফোটা ফুলে এমন গন্ধ থাকে। তাড়াতাড়িতে কত এলোমেলো করে তার মুখে ঠোঁট লাগিয়েছিল। বেরোবে বলে ব্রজ পুকুরে নেমেছে। সেই ফাঁকে। তখনও কুবেরকে নিয়ে আভা কিছুই ভাবেনি। কীসের থেকে কী হয়ে গেল। এখন এ মানুষকে ফেলে কোথাও যাওয়াও যায় না।

ছায়ায় ছায়ায় কামলারা টানটান হয়ে পড়ে আছে। বেশি বেলায় বেশি খেয়ে সর্বাঙ্গ অবশ।

টাকাপয়সা হওয়ার পরেও কুবেরের মুখে সেই গন্ধ পেত আভা। দ্বীপে এসেও পেয়েছে প্রথম প্রথম। কিছুদিন এমনভাবে তার মুখে চেয়ে থাকে কুবের—চেনা মানুষকেও তখন চিবে ওঠা যায় না। এখন কোথাও যদি সেই ছাপ খুঁজে নিতে হয় তবে তাঁবুর ভেতরে শোয়ানো পাথরের শিবেই শুধু তা পাওয়া যাবে। আজই সকালে খাবার করে কুবেরকে ডেকে ডেকে তাঁবুতে ফিরে গিয়ে ব্যাপারটা জানতে পেরেছে আভা।

কারখানা গাঁয়ের শিবতলায় বেলপাতার ডাঁই সরিয়ে রেলেশ্বরকে বিশেষ দেখা হয়নি কোনোদিন। তাঁবুর ভেতরে শুয়ে শুয়ে কালো পাথরখানার দিকে একমনে তাকিয়ে থাকলে সিধে একেবারে বুকে বিঁধে যায়।

ঘোলাডাঙার কথা শুনতে শুনতে কুবেরের জন্যে কষ্ট হয়েছিল আভার। কী বা বয়স ছিল! হঠাৎ মনে পড়ল, কুবেরকে এখুনি বলা দরকার একটা বিরাট গোখরো তাঁবুর গায়েই বাসা বেঁধেছে। শুরুও করে দিল ‘তাঁবুতে বুঝলে—’

‘আজ আর তাঁবুতে নয়। একটু পরেই জ্যোৎস্না বেরোলেই তোমার বিছানা এই চত্বরে এনে নেব।’ কতকাল পরে আভাকে জোরে চুমু খেল। এমন স্বাদ হয়েছে আভার—জানা ছিল না। আপশোস-আপশোস বলে চেঁচিয়ে উঠতে পারলে সবচেয়ে ভালো হত। সময় বুঝে বুনো দুধলি ফুলের গন্ধও উঠেছে। কুবের বলল, ‘আজ আর তোমায় ছাড়ছিনে।’

আভার বিশ্বাস হচ্ছিল না। কুবেরের দ্বীপে এসে গোড়ায় গোড়ায় গন্ধ ছড়ানো ওই দুধলি ফুল জ্যোৎস্না বেরোতেই বিছানায় ছড়িয়ে দিত। তখন নোঙর-করা লঞ্চের পাটাতনে বিছানা থাকত। এতদিন মনে হয়েছে সেসব দিন কি আর কোনোদিন ফিরে আসবে? যা যায়, আর আসে না। তাই জানত আভা।

‘আমি তখন বুঝতাম না বিশেষ। বিশ্বাস করবে না তুমি—একদম না বুঝেই আমি শেফালির ঘরে যাই। তখনকার দিনে এই বয়সে কী আর বুঝতে পারে একটা ছেলে।’

‘সেই থেকে তোমার মুখের ছাপ পালটে গেল। অন্য একটা মুখোশ এঁটে বসে গেল তোমার মুখে।’

‘আজও আমার মুখের সঙ্গে মিশে আছে। ভুলতে পারিনি। কেমন পাপহীন, নিষ্পাপ কোনো ভাব ফোটে না—’

‘তোমার ছোটো ভাই নগেন বলেছিল—’

‘গোরুর দৃষ্টি আমার চোখে—ভাবলেশ নেই কোনো।’

‘কাছে এসো তো—ভালো করে দেখি একটু,’ কুবেরকে প্রায় টেনে নিয়ে অনেকক্ষণ একটা চুমো চুপচাপ তার ঠোঁটে চেপে রাখল আভা, ছেড়ে দিতে দিতে বলল, ‘হাসালে তোমরা।’

ততক্ষণে গাঢ় লাল একখানা চাঁদ জায়গামতো ঠেলে উঠেছে। প্রায় গোল। সারাটা নদী সাদা কাগজের চেয়েও পরিষ্কার দেখা যাচ্ছে।

‘একটা কথা বলা হয়নি কুবের। আজ ঠিক তাঁবুর কাছেই বিরাট একটা—’

‘পরে বলবে। তোমার বালিশটা নিয়ে আসি শুধু।’

কুবের ছিটকে তাঁবুতে চলে গেল, বালিশ হাতে বেরিয়েও এল। বিকেল থেকেই আভার ডান চোখ লাফাচ্ছিল। গোখরোটার কথা কিছুতেই বলা হচ্ছে না। এখন ওরা রাতে বাতাস খেতে বেরোয়। আচমকা লেজে পা পড়লেই হল। দেখতে হবে না তাহলে। দিঘির পরিরা নিশ্চল। কামলারা খরগোশের মতো কোনো একটা নরম জীব আগুন ঘিরে বসে পোড়াচ্ছে। সব কিছু দেখে আভার স্থির বিশ্বাস হল, সুখ তাহলে কখনো-সখনো ফিরেও আসে।

এতদিন পরে কুবের যে তাকে নিয়ে কী করবে ঠিক করে উঠতে পারছিল না। কোনদিক দিয়ে এগোবে। আদর করতে করতে বলে ফেলল, ‘তোমার সবটুকুই মধু।’

ঘাড়ের ওপরের শক্ত চুমু থেকে নিজেকে অনেক কষ্টে খসিয়ে নিল আভা,‘তবে যে এতদিন মুখ ফিরিয়ে ছিলে বড়ো—’

‘কোথায়?’ কুবের কোনো তল পাচ্ছিল না। একদম কোথাও থামতে পারছিল না।

‘এমন কঠিন করে তাকাতে। আমিও যে একটা মানুষ তাও ভুলে বসে ছিলে।’ কুবেরের দু-হাতের খিল খুলে কোনোরকমে গলা বের করে নিল আভা, এসব বলে সুখ হচ্ছিল তার, ‘কী করে একা একা তাঁবুতে কাটালাম—খোঁজও নাওনি তুমি—’

কুবের আবছা কিছু কথা বলল। আমি নম্বরি লোক আভা। মেয়েলোকটি কিছু শুনতে পায়নি বোঝা গেল। তাহলে কি আমার গলায় কোনো কথা ফুটছে না! সে কীরে বাবা! এ রোগের তো নাম জানি না। বয়স, কষ্ট আসলে কোনো দাগই ফেলতে পারেনি আভার মুখে। কদমপুরে গোড়ার দিকে আভা বলেছিল, খালপাড়ে সন্ধেবেলা একা মাছ কিনতে গিয়ে দেখি—জ্যোৎস্নার মধ্যে ঝিরঝিরে বৃষ্টি পড়ছে —একটা লোকও নেই—পাকুড়তলায় দাঁড়ালাম। এতদিন জানতাম চাঁদ হলদে রঙের। তালগাছের

সারির মধ্যে চাঁদ নেমে এসেছে। দেখলাম—প্রায় হাত দিয়ে ধরা যায়। জানো কুবের, এতদিন জানতাম চাঁদ হলদে রঙের। কিন্তু দেখলাম তা হয়। দু-ইঞ্চি পুরু করে নীল মাখনে চাঁদ মাখানো। আঙুল ছোঁয়ালে ডেবে যাবে। এমন একটা কঠিন ভাবনা থেকে বাঁচানোর জন্যে কুবের সেদিনই প্রথম আভাকে শক্ত করে ধরে চুমো খেয়েছিল। ব্রজ দত্ত তখন সেপারেট কেলির পুকুরে চান করতে গেছে।

মেয়েলোক একবার ভালো লেগে গেলে পুব-পশ্চিম ঠিক থাকে না। কুবের তাই এদিক থেকে হামলে পড়ে বাঁধানো চত্বরে বেমক্কা গুঁতো খেয়ে দিক পালটে আরেক সাইড দিয়ে পিষে ফেলতে চাইল আভাকে। অচেনা সুখে ভেসে বেড়াতে বেড়াতে আভা একবার হারিয়ে ফেলেছিল। তাই এবার এসবে তার কিছুই হচ্ছিল না। কিছুতেই ভুলতে পারে না আভা, কত সন্ধে—কত বিকেল বিফলে গেছে। কুবের ফিরেও দেখেনি। সেই এক কথা শুধু—দয়া করো। তুমি ইচ্ছে করলেই পারো।

অথচ এই লোক প্রায় বালক বয়সে মেয়েমানুষের বাড়ি গিয়ে উঠেছিল। আভা বুঝে গেল, ঠিক এখনই পরিষ্কার হয়ে গেল তার কাছে—কুবেরের মুখে ভাব ফোটে না কোনো—কেননা, মানুষটার মনে কোনো ভাব নেই। একটা ভাব ঠিকই ছিল কোনোদিন। কিন্তু সেখানে নিজেই বা অন্য কেউ ধাঁই করে একখানা আধলা ইট তুলে মেরেছে—তাই ভাবের জায়গায় শুধু একটা থ্যাঁতলানো ব্যথা চুপ করে পড়ে আছে।

'আঃ! কী হচ্ছে! এখানে হাটের মধ্যে আমি পারি না—'

আসলে, আভার শরীর বইছিল না। তবু কেউ একজন তাকে আঁকড়ে ধরে উঠে আসতে চাইছে—নিজের শরীরটা ঢেলে দিলেই লোকটা আসতে পারে—এই বা কম কী! এ পাওনা সে কতদিন পায়নি। কিছু বুঝে ওঠার আগেই কুবের তাকে পাঁজাকোলে তুলে নিল।

দুর্গের ভেতরে যেতে যেতে আভা বুঝল, আজও জ্যোৎস্না আছে। লঞ্চের ডগা থেকে কুবের তাকে এমন জ্যোৎস্নার মধ্যেই পাঁজাকোলে তুলে এনেছিল একদিন।

এসব সময় পুরুষ লোক টলতে থাকে। আভার প্রায় কিছুই হচ্ছিল না। একবার বলা দরকার, কুবের আজ আমি দুর্গে তোমার কাছে থাকব। তাঁবুর কাছে সাপ বাসা করেছে। আজই বিকেলে দেখলাম। ভীষণ একটা দুশ্চিন্তা খরখর করে তার গায়ের ওপর দিয়ে চলে যাচ্ছে।

এখন যদি আমি সব ভুলে যাই—তবে কোথায় যাব? কোন জায়গা দিয়ে শুরু করব? যেসব কথা মুখে আনা যায় না—তাই কিছু আভাকে বলতে বলল। শুনলে বেগ হয়।

আভা বলল ঠিকই—কিন্তু কিছুতেই বুঝে উঠতে পারে না—এসবের কী দরকার? আমিই কি যথেষ্ট না? কুবের আবার বলতে বলল।

দূর থেকে লোকে এইভাবে সবটুকু জোর দিয়ে সদর দরজা আটকাতে যায়। তাতে যদি ব্যথা লাগে লাগুক—তবু খিল সবখানি জোর দিয়ে আটকাতেই হবে। আমার নাম কুবের সাধুখাঁ। এ ছাড়া এখন আমি আর কোনো রাস্তা পাচ্ছি না। আমি সব মনে রাখতে চাই।

তখন মেদনমল্লর দুর্গ একচাপ স্তব্ধ স্তূপ হয়ে আভা কুবেরকে ভেতরে নিয়ে স্থির হয়েছিল! কুবের জানে পৃথিবীর নিয়মে এখন তার ফুরোনো চলবে না। আগে আভা ফুরোক। তারপর। কিন্তু শরীরের নিয়মে তার এখনই শেষ হয়ে যাওয়ার কথা। পরে কার কখন শেষ হবে তা দেখার কথা না। সেইজন্য কুবের এসব জায়গায় মনে মনে ফার্নেস ডোরের ফাঁক দিয়ে গলন্ত ইস্পাত দেখে। চোখে নীল চশমা, হাঁ করলে মাড়িতে প্রচণ্ড আগুনের হলকা লাগে। মনটা ভুলিয়ে রেখে আভার জন্য অপেক্ষা করে। এইভাবে কোনো কোনোদিন বুলুর জন্যেও থেমে থাকতে হয়েছে তার।

কুবের তখনও নামেনি। ত্রিপলের ফাঁক দিয়ে এক চিলতে জ্যোৎস্না-ধোয়া আকাশ এই দুর্গের চত্বরে এসে পড়েছে। মেদনমল্লর ফাঁকা বাথানের গায়ে বাতাস পেয়ে ঝাঁকানো পেয়ারাগাছটা আনতাবড়ি দুলছে। তার পাতার খসখসানিতে এই নিঃশব্দ গাঁথুনিঘেরা শূন্য দুর্গ ভরে যাচ্ছে।

আভা বলল, ‘তুমি কিন্তু বুলুকে খুব ভালোবাস—

গায়ে গা লেগে যে আত্মীয়তা হয়—তা কত সামান্য। ভুলে যাওয়ার হাত থেকে বাঁচতে গিয়ে শ্যাওলা-পড়া কুবের এ পথে এগোচ্ছিল। থেমে গিয়ে বলল,‘ও কথা কেন আভা?’

কুবেরের ভারের বাইরে এসেও আভা শুয়ে থাকল কিছুক্ষণ, শুয়ে শুয়েই বলল, ‘তাতে কী হয়েছে? বুকে হাত দিয়ে বলো—তাকে তুমি ভালোবাস না?’ এইমাত্র পুরোপুরি ভরে এসেছে। কুবের যে কতরকমেই জানে। এমন ঝাঁ ঝাঁ করে ধরিয়ে দেয়। তাই একটু আগে আভা ফস করে ধরে উঠেছিল।

‘হ্যাঁ বাসি।’ আরও কিছু কথা কুবের বলতে পারত। কিন্তু আভার দিকে তাকিয়ে বুঝল, বলা না-বলা দুই-ই সমান। আমি তো তোমার মতো শুধু একজন পুরুষকে সম্বল করার জন্যে পৃথিবীতে নামিনি। আমার গায়ে শ্যাওলা ধরেছে ঠিকই। আমি ইনভাইট করিনি। আপনা-আপনি এসে গেছে। আমার কোনো হাত ছিল না তাতে। আমি অন্য রুটের লোক। তুমি এলেও যা—না এলেও তাই। আমার বাবা, আমার ভাইরা—এদের নিয়ে আমি দুপুরে ঘর অন্ধকার করে ভরাট ঘুম দিতে চাই। বিকেলে ঘুম থেকে উঠে সবাই আনন্দে থাকতে চাই, কিছু ভালো কাজ ইচ্ছে হলে করতে চাই। দেবেন্দ্রলাল সাধুখাঁ নিশ্চিন্ত দীর্ঘজীবন পাক—তাই আমার একমাত্র চেষ্টা। নগেন নির্ভাবনায় আনন্দ করুক—বীরেনের খুশিতে কাটুক—তাই আমার এইম্! সব গুছিয়ে আনছিলাম—তার মধ্যে মাকে রাখা গেল না। এইজন্যেই আমি টাকা আয় করতে নামি। এর ভেতরে ভালোবাসার জন্যে আমার টাইম কোথায়! বুলুই বোঝে না—আর তুমি তো আভা!

এমন করে শুয়েছে আভা, পেট বোধ হয় অল্প একটু ফুলেছে—তার একদিকে নরম একটা ভঙ্গি করে প্রায় প্রতিমার বুক, গলা, চ্যাটালো কাঁধ—অন্যদিকে আলাদা করা যায় এইভাবে বাতাসে এক জায়গায় শাড়ি কিছু ডেবে গেছে—দু-ধারে দুখানা পা। প্রায় এমন আলাদা আলাদা করেই কুসুম পুতুল দেখে—বিরক্ত হলে তাদের হাত,পা, মুন্ডু হ্যাঁচকা টানে খুলে ফেলে।

মেয়েলোক শুয়ে পড়লে তার মধ্যে কুবের কখনো কোনো মানে পায় না। এত পলকা লাগে।

‘তুমি তার কতটুকু জানো।’

দশ ঘোড়ার সাকসন পাইপ সোঁসোঁ করে জল টেনে নিয়ে বাঁধের বাইরে ক-দিন একটানা উগলে দিয়েছে। রবার, তারের জাল আর ফাইভার দিয়ে বানানো নামী কোম্পানির পাইপ সব সময় টেঁটিয়া ভঙ্গিতে জলে নামে। একেবারে অবাধ্য, ঘাড় মোচড়ানো ঢং।

‘আমি ছাড়া কে জানবে আভা—’, বলতে কুবের বুকে বুক রেখে আগাগোড়া জড়িয়ে ফেলল। বেকায়দায় শুয়েছে বলে কুবেরের যাতে চুমো খেতে অসুবিধে না হয়—সেজন্য আভা ঘাড় ঘুরিয়ে নিজের মুখ খানিক তুলেও ধরেছিল। ঠিক করেছিল, কুবেরের পাগলামি শেষ হলেই বলবে—তুমি কামলাদের দিয়ে কাল ভোরেই সাপটাকে খুঁজে বের করে মারবার ব্যবস্থা করবে।

তার বদলে নিজের ঠিক নাকের ওপরেই কুবেরের মুখখানা, লালচে চোখ একসঙ্গে দেখতে পেল। আভা পুরো ব্যাপারটা হালকা করে দিয়ে হাসতে যাচ্ছিল। বুকের ওপর লোক নিয়ে হাসাও কঠিন। ভেতরের পাইপগুলো তখন ঠিক ঠিক কাজ করে না।

‘তুমি বুলুর কী জানো?’

আভা এবার কিছু একটা বলতে যাচ্ছিল। গলা দিয়ে বেরিয়ে এল, ‘ছাড়োও—’

আর কোনো চান্স পেল না। তারের জাল, রবার, ফাইবার—কিছুই পেল না কুবের। একটু জোর দিয়ে চেপে ধরতে হল দু-হাতে। শেষদিকে আর একটু চাপ—দম ধরে যাওয়ার জোগাড়। সে কিছুই ভুলতে চায় না। কোনো একটা জিনিস ধরে তাকে উঠতেই হবে। হাতের আঙুলে মাংসের নীচে কয়েকখানা খুচরো, পাতলা হাড়ের জোড় একটু লাগছিল। ভারী মাল তোলার সময় কুলিরা চেঁচায়—আউর এক দফে, হেঁইয়ো। প্রায় তাই। শেষে একটা এক্সট্রা জোর লাগল, আভার মুখটা ফুলে গিয়ে দুটো চোখই ঠেলে বেরিয়ে পড়ল। বাঁ হাতখানা কুবেরের পিঠে নখসুদ্ধ বসে গিয়েছে। আলগোছে সেখানা নামিয়ে দিল। কানের একটা দুল রক্তে মাখামাখি। গলায় সেই টেঁটিয়া ভাবটা আর নেই। খোঁপার ফুল ক-টা বালিশে থেঁতলে গেছে।

কুবের উঠে দাঁড়িয়ে প্রথমেই একটা সিগারেট ধরাল। বাইরে বেরিয়ে দেখল ফিনিক ফোটা জ্যোৎস্নার পরিগুলো যে-কোনো সময়ে উড়ে যেতে পারে। ওজন বেশি বলেই পারছে না। দিঘির আগাগোড়া পরিষ্কার আলোয় ঝকঝকে হয়ে আছে। আভা শেষ খেয়েছে কাল রাতে। কুবেরও তাই। সারা গা কেমন তেতে আছে।

‘ডাহুক’-এর সারেং খুব সাবধানে লঞ্চটা ভেড়াবার চেষ্টা করছে। হেড-লাইট নেই। খাড়ির ভেতর নোঙর করেও রেহাই পায়নি। ঝড়ের দাপটে সেদিন রাতে হেডলাইটের কার্বন ঝরে গেছে কীভাবে। কাল বেলাবেলি লঞ্চঘাটায় পৌঁছোতেই হবে। তারপর কার্বন নিয়ে কলকাতায়।

সিগারেটটা প্রায় আগুন অবধি টানল কুবের। আজই জানল, সিগারেট বড়ো ছোটো। না হলে তার এখুনি উঠতে হত না। দুর্গে ঢুকে দেখল আভা সেইভাবেই শুয়ে আছে। একটুও ডিস্টার্ব করল না।

কুবেরের খুব খাটুনি গেলেও বসতে পারল না।

ছোটোবেলায় মোটাসোটা সুপুরি গাছের খসানো ডালের শক্ত চ্যাটানো খোসার ওপর নগেনকে বসিয়ে কত টেনেছ কুবের। চাকা লাগে না—অথচ গাড়ি। যুদ্ধের সময় মফস্সল শহরে গিয়ে খুব জিনিসটা পাওয়া যেত। সতরঞ্চি টাইপের শক্ত ছালে বসে নগেন মজা খেত—আর কুবের টানত।

একটুও ভাবতে হল না কুবেরের। কামলারা এখন আগুন ঘিরে গোল হয়ে খেতে বসেছে। এখানে যে কত জিনিস পোড়ানোর পায় ওরা। এক এক সময় কুবেরের অবাক লাগে।

চাদরসুদ্ধ আভাকে টানতে টানতে দুর্গের একেবারে ভেতরে নিয়ে এল। পেয়ারা গাছটা তখনও শব্দ থামায়নি। ফাঁকা বাথান সেই আওয়াজে ভরে আছে। আজ এমন জ্যোৎস্নারাতেও পাখিরা ডাকছে না। কুবের ফিরে গিয়ে দিঘির পাড় থেকে কোদালখানা নিয়ে এল।

বেলাবেলি কাটা গর্তের ভেতর নেমে কুবের খুব যত্ন করে আকন্দের টুকরো টুকরো শেকড় বেছে বেছে বাইরে ফেলে দিল। এখন ভেতরটা আরও ঠান্ডা। আভাকে চাদরসুদ্ধ পাঁজাকোলে নিতে হল। এই খানিক আগেও একবার নিয়েছিল। কতকাল এখানকার মাটি ওলটপালট হয় না। আভার মাথা কুবেরের হাতের বাইরে লটপট করে এদিক-ওদিক ঝুলে পড়ছিল। টাল সামলে নীচে শুইয়ে দিল। তারপর কোদালে টেনে পুরোনো মাটি আবার জায়গা মতো চেপে চেপে দিল। শেষে ফুলে ওঠা কাঁচা মাটির ওপর উঠে দাঁড়িয়ে পায়ে কিছুটা মাড়াতেও হল।

বেশি সময় লাগেনি। বাইরে এসে দেখল, যেমন রেখে গিয়েছিল—সারাটা তল্লাট ঠিক তাই আছে। শুধু সন্ধের লালচে ভাবটা কেটে গিয়ে চাঁদ এখন খুব স্পষ্ট।

জোয়ারের আগে আগে রওনা হওয়ার কথা। ঠিক ছিল, সারেং এসে ডাকবে। কতদিন লঞ্চঘাটা, কদমপুর, সালকে যায়নি। কুবের নিজে গিয়েই কাদা ভেঙে লঞ্চে উঠল। তারপর সারেংকে ডেকে সাবান চাইল।

লোকটা কুবেরকে ভক্তির ভাব দেখায় সব সময়। আজ ওসবে লক্ষ ছিল না কুবেরের। সারেং বলল,'তেল কালি ধোয়ার মেটে-সাবান আছে সাহেব—'

'তাই নিয়ে এসো।'

একটা গোল বাংলা গোলা সাবানের বল হাতের মধ্যে নিয়ে কুবের লঞ্চের ডগায় দাঁড়াল। এই জায়গাটা লোহার পাতে মোড়া—লোহার খুঁটি বসানো। এখানে নোঙরের শিকল বাঁধা হয়। এখান থেকে ঘুমন্ত আভাকে আরেকদিন পাঁজাকোলে তুলে আনতে হয়েছিল কুবেরের।

মাল্লাদের একজন জল ঢালছে। কুবের কিছুতেই সাবানের বলটা সামলাতে পারছে না। পিছলে যাচ্ছে। এরপর পা ধুতে হবে আবার, 'কী রাঁধলে আজ?'

সারেং, দুজন মাল্লা চুপ করে মাথায় হাত দিয়ে দাঁড়াল, 'আপনি খাবেন—'

‘থাকলে নিয়ে এসো। খেয়ে দেখি—’ খিদেয়, খাটুনিতে কুবেরের শরীর অবশ হয়ে পড়েছে।

হঠাৎ চোখ তুলে দেখল জলার পাশে বাঁধ বরাবর ফাঁকা তাঁবুর গায়ে টানানো দড়িতে শাড়ি শুকোচ্ছে। এই ক-মাসে আভা ওখানে একটা ছোট্ট গেরস্থালি পেতেছিল। জ্যোৎস্নায় জামাকাপড়ের রং ধরা যায় না। বাতাস পেয়ে দড়ি-আলগা শাড়ির বেশ খানিকটা দিগ্বিদিক হয়ে উড়ছে। লঞ্চে ওঠার আগে কুবের একবার সারাটা তাঁবু হাতড়ে এসেছে। কাঁধের ঝোলা ফেন্নার পথে কী ভারী লাগছিল!

চিটু দাস নিজেই তেতলা থেকে নেমে এল। ফটাস ফটাস চটির শব্দ তুলে নামার সময় এক এক তলায় এসে সিঁড়িঘরের আলোর সুইচ টিপছে। উলটোদিকের বাড়িটায় ঘন্টা পেটানো দেখে ভদ্রেশ্বর বুঝল, পুলিশের থানা। আর গাদাখানেক কুকুরের একসঙ্গে চিৎকার শুনে বুঝে নিল—এইটেই চিটু দাসের বাড়ি।

স্বয়ং চিটু দাস দরজা খুলে মোলায়েম করে সব জানতে চাইল। পরে ভদ্রেশ্বরকে ভেতরে নিয়ে বসাল। অত বড়ো সব কুকুর এর কথা শুনে ওঠবোস করে—এমন লোক এত ঠান্ডা করে কথা বলে কেন—ভদ্রেশ্বর বুঝতে পারল না। এর ভয় কী? সারা বাড়ি ঘেউ ঘেউ ডাকে গমগম করছে। চিটুর সঙ্গে তেতলার ছাদে যেতে হল।

সমঝদারির ভঙ্গিতে দাঁড়িয়েও ভদ্রেশ্বরের ভয় যায় না। এগারোটা কুকুর একসঙ্গে জিভ বের করে হ্যা হ্যা করে যাচ্ছে সব সময়। চিলেকোঠার কড়া আলো এসে পড়েছে। দুটো লোক মিলে কুকুরদের পাউডার মাখাচ্ছে—উকুন বাছার চিরুনি বুলোচ্ছে গায়ে। জায়গাটা প্রায় কুকুরপাড়া। বড়ো বড়ো আয়নায় নিজেদের চেহারা দেখে চেনে বাঁধা কুকুররা রোখ করে চেঁচিয়ে উঠছে—আয়নার ওপরে ঝাঁপ দিতে চাইছে।

বাড়িতে আর অন্য প্রাণী আছে কি না বোঝা গেল না। চিটু দাসকে সব বলল ভদ্রেশ্বর। বাঘার বয়স,গলার আওয়াজ, পছন্দ-অপছন্দ সব জানাল। চিটু দাস বলল,'ছাদে দাঁড়িয়ে প্রায়ই ওই বৈকুণ্ঠপুরের দিক থেকে একটা কুকুরের ডাক শুনতে পাই। এমন চেঁচাবে—বোঝাই যায় মনে সুখ নেই। ওখানে একবার খোঁজ করে দেখতে পারেন—'

সারাদিন ঘোরাঘুরি, খাওয়া হয়নি, ভদ্রেশ্বরের শরীর আর চলছিল না। দিনের দিন কাজও হয়নি আলিপুর কোর্টে। সরু পিয়াসলে স্টেশন থেকে বৈকুণ্ঠপুর তা মাইল দুই হবে। স্টেশনে ফিরে এসে কদমপুরের গাড়ি ধরল। আশা ছিল, আজ কোনোক্রমে যদি বাঘাকে ফিরে পায়—তবে কুকুরসুদ্ধ সাধুখাঁমশায়ের বাড়ি যাবে। তাহলে কিছুটা নুনও শোধ হবে আর মিষ্টি খাওয়ার টাকা চাই বলে খয়রাতি চাওয়ার লজ্জা থেকে বেঁচে যাবে।

পরদিন খুব ভোরে বৈকুণ্ঠপুরে গিয়ে হাজির হল। খড়ের গাদার গায়ে লাউমাচার নীচেই বাঘা শুয়ে। গালে সেই তিল। একটা গোঁফ সাদা হয়ে গেছে। নাম ধরে ভদ্রেশ্বর ডাকতেই কুকুরটা উঠে দাঁড়াল। আর কী কান্না!

বাড়ির কর্তা অমৃত ঘোষ বেরিয়ে এল। ভদ্রেশ্বর নমস্কার করে সব বলল। লোকটা গেরস্থ মানুষ। রেশনের দোকান আছে। সাইকেলে বাড়িতে কী একটা মেমো বই নিতে এসেছিল। সব শুনে

ঘোষমশাই বলল,'থানায় ডাইরি করা আছে—ছেলেদের কাউকে থানায় নিয়ে গিয়ে ডাইরি কেটে দিয়ে কুকুরটা নিয়ে যান।'

কিন্তু ছেলেরা বাদ সাধল। দিন ভালো নয়, ভোরবেলা কুকুর দিলে বাড়ির অকল্যাণ হবে—এইসব বলে তাকে প্রায় ফিরিয়ে দেয়। ভদ্রেশ্বর তখন বলল, 'আজ্ঞে আমি কুকুর পোষার লোক নই। কুকুরটি কদমপুরের কুবের সাধুখাঁমশাইয়ের। বাঘাকে ফিরে পেলে সাধুখাঁমশাই খুশি হবেন।'

এ তল্লাটে কুবের এখন একটা নাম। ঘোষমশাইয়ের এক ভাইপো কিছু বেগড়বাই করছিল। নাম শুনে সিধে হয়ে এল। বাঘা তখন ছাড়া পেয়ে ভদ্রেশ্বরকে একনাগাড়ে আদর করে যাচ্ছে।

সারা বাড়িতে ষাট-সত্তরজন লোক। ছেলে-মেয়ে-বউ অনেক। জানা গেল, এই সরু পিয়াসলেতেই ঘোষেদের সাতখানা দোকান। রেশন, কাটা কাপড়, মুদির দোকান তো আছেই—তাছাড়া স্কুলের বই আর কয়লার দোকানও আছে। আরও জানা গেল, এবাড়িতে এসে বাঘা ফ্যান খাওয়া ধরেছে, রাতে দুধের সঙ্গে রুটি খায় ন-খানা।

অমৃত ঘোষের ভাইপোটি অনেক কথা বলে শেষে বলল,'আমায় একটা চাকরি দিন—যদি ক্ষমতা থাকে সাধুখাঁমশাইকে বলে কোনো একটা কাজে লাগিয়ে দিন। কুকুর এসেছে স্টেশন থেকে আমাদের পিছু পিছু—অবলা জীব—যত্ন করেছি। তার বদলি কিছু চাইনে। আমি ইয়ং ম্যান—আমাকে খাটিয়ে কিছু পয়সা দেওয়ার ব্যবস্থা করতে বলুন।'

ভদ্রেশ্বর ছেলেটার দিকে তাকিয়ে কোনো কথা বলতে পারল না। কালই কলকাতায় ট্রাম পুড়তে দেখেছে। তার চেনা দুনিয়া অনেকদিনই চেহারা পালটাচ্ছে।

ছেলেটা আবার বলল, 'আমায় যে-কাজ দেবেন—ফাসক্লাস করে দেব, খুঁত পাবেন না। শুধু গোড়ায় গোড়ায় একটু দেখিয়ে দিতে হবে।'

ছেলেটা আগ বাড়িয়ে কুকুর দেবার ব্যবস্থা করল। থানায় নিয়ে গেল ভদ্রেশ্বরকে। সেখানে অমৃত ঘোষের ভাইপো বেশ পরিচিত। দু-চারবার অ্যারেস্টও হয়েছে। এখানকার লোক দারোগার সঙ্গে কেমন হেসে হেসে কথা বলে। দারোগাও হাসে। ডাইরি কেটে রসিদ তৈরি হল।

ভদ্রেশ্বর মুখের ওপর ঘোষমশাইয়ের ভাইপোকে বলতে পারল না, বাবা এ-বাজারে চাকরি দেবার কথা কেউ বলতে পারে না। কিন্তু সেকথা বললে, ছেলেটা আঘাত পাবে। বড়ো আশা করে কথাটা পেড়েছে। কাজ যিনি দেবে সেই কুবেরবাবুও এখানে নেই।

ঠিক হল পূর্ণিমার দিন কী একটা ছুটি আছে। রেশনের দোকান বন্ধ থাকবে। সেদিন বিকেলে সবাই বাড়িও থাকবে। তখন ভদ্রেশ্বর বাঘাকে নিয়ে যাবে। যাবার আগে ভদ্রেশ্বর খানিকক্ষণ হাত বোলাল গায়ে, 'কীরে ব্যাটা ধম্মরাজের সঙ্গী!

পেটের মধ্যে এত খিদে কোথায় ছিল কুবের বুঝতে পারেনি। লঞ্চ ছেড়ে দেওয়ার পর সাহেব খেতে

বসেছে। সারেং মাল্লাদের একজনকে তার সিটে বসতে বলে নিজে দু-বার সাধুখাঁ সাহেবের পাতে প্রায় হাঁড়ি উলটে ভাত ঢেলে দিয়েছে। কুবের খেয়েই যাচ্ছিল। সারেং থামাল, 'কাল ভোরে বড়ো নদীতে পড়েই আপনার জন্যে মাছ কেনাব—'

কুবের মাথা নিচু করে খাচ্ছিল। ভাত না অমৃত। সারেং-এর কথায় মাথা তুলে তাকাল, 'বড়ো নদীতে পৌঁছোতে পারব আমরা?'

'না পারলে তো ভাটায় পড়ে যাব সাহেব—'

'ভাটায়—' খাওয়া থামিয়ে কুবের কী ভাবতে বসছিল।

সারেং নিজে আঁচানোর জলের বালতি, মগ এনে পাটাতনে রাখল, 'হাত ধুয়ে ফেলুন।'

এঁটো তোলার নাম করে মাল্লাদেরই একজন অন্যমনস্ক কুবেরের সামনে থেকে কলাই থালা আর গ্লাস সরিয়ে নিল। কুবের পেছনে তাকিয়ে দেখল, কোথায় মেদনমল্লর দুর্গ! সব মিলিয়ে গেছে! সেখানে আকন্দর কাটা শেকড়ের ওপর আভা আছে। হাজার বিঘের ওপর মাঠে বোরো ধান শুয়ে। জ্যোৎস্নায় নদীপথ থানধুতির মত লম্বালম্বি দেখায়। আজই বিকেলে আভা বলছিল, তাঁবুর কাছে কী একটা...আর বলা হয়নি। তখন বিকেল ছিল একটু। কিংবা সন্ধে শুরু হয়ে গিয়ে থাকতে পারে। এখন সেসব, নদীর কয়েক বাঁক পেছনে। সামনে জলের ওপর ফ্যাকাশে ধোঁয়ার লম্বা লম্বা লাইন জ্যোৎস্নার মধ্যে ঝুলে আছে। সেগুলো ছিঁড়ে দিয়ে 'ডাহুক' এগোচ্ছে। এমন আলোয় হেডলাইট লাগে না। কার্বন পালটে কাল-পরশু লঞ্চ ফিরে যাওয়ার কথা।

আঁচিয়ে সিগারেট ধরিয়ে বিছানায় বসল কুবের। মাথার কাছে বালিশের পাশেই ঝোলাটা। তার ভেতরে হরেক জিনিস। ঝোলার একদিক ট্যাম হয়ে ফুলে উঠেছে। কুবেরের এখনই সব পরপর মনে পড়ে গেল। আজ সকাল থেকে কীসব হয়ে গেল। এখন ভুলে ফেললে সবচেয়ে ভালো। এতবড়ো একটা দ্বীপ, তাঁবু, দুর্গ এসব দেখার ইচ্ছা না থাকলেও মনে পড়লেই ঠিক চোখের সামনে ভেসে উঠবে। এতবড়ো একটা জিনিস—ভাঁজ করে পকেটে রাখারও উপায় নেই। কতদিকে চোখ বুজে থাকবে। লঞ্চের ডগায় আলো পেয়ে নোঙর বাঁধার লোহার খুঁটি, পাত—সবই চিকচিক করে উঠছে। ওখান থেকে ঘুমন্ত আভাকে একদিন এমন রাতে কুবের পাঁজাকোলে তুলে নিয়েছিল। তখন 'ডাহুক' দ্বীপে যাচ্ছিল। কুবেরের স্পষ্ট মনে পড়ল আভা বলত, 'তোমার দ্বীপ।' মেদনমল্ল লোকটাই ফাউ। সেই দ্বীপে তার কত টাকা আটকে গেল। যাকে বলে হার্ড ক্যাশ—করকরে নগদ।

শেষরাতে ঠান্ডা হাওয়া দিতেই কুবেরের ঘুম ভেঙে গেল। তখন আর পুরোনো কিছু মনে নেই তার। জ্যোৎস্নায় পরিষ্কার সব দেখা যায়। সামনেই মৈসিনির চর। ওখানে খাবার জলের কুয়ো আছে। ওই বাঁকটা পেরোলেই লঞ্চঘাটা আর দু-তিন ঘন্টা। লঞ্চ জোরে জল কাটছে। এখান থেকে বেরিয়ে যেতেই হবে। না হলে ভাটা।

জলের নীচে কত বেওয়ারিশ জায়গা। ভাটায় তারা গা তুলে দেখা দেয়। জল নেমে গেলেই কাঁকড়ার

ছানার রাজত্ব। কোটি কোটি। ভোররাতে ভাঙা ঘুমের মধ্যে কুবের সাধুখাঁ ফোলা মুখ নিয়ে বসেছিল। সেই মুখে হাসি ফুটে উঠল। একা একাই হেসে নিল। ভাটায় ফাঁকা নদীর বুক পারলে আমি একদিন বায়না করে নিতাম।

তারপরেই কুবের ফট করে শুয়ে পড়ল। বালিশের বদলে ঝোলার খানিকটাও মাথার নীচে পড়েছে। সে-জায়গাটা একেবারে পাথর। ভীষণ শক্ত। মাথা সরিয়ে নিয়ে বালিশেই রাখল। ভাটায় পড়ার ভয়ে লঞ্চ তখন ঊর্ধ্বশ্বাসে ছুটছে। একবারও মনে পড়ল না,এবার পৃথিবী কাদা করে কতটা জায়গায় ধান রুয়েছে। সে কিছুতেই বুঝে উঠতে পারে না, আভা কাল কী একটা কথা বলতে চেয়েছিল। শেষ অবদি বলতে পারেনি। তাঁবুর ধারে কী একটা—

নিজের নামের রাস্তায় পা দিয়েই কুবের বুঝল, কদমপুরে তার কাজ অনেক বাকি। পাকা রাস্তা হবে বলে দু-ধারে ইটের গাছি, খোয়ার চৌকো সাজানো রয়েছে। অনেককাল পরে এদিকে এসে একেবারে গোড়ার দিককার নতুন নতুন লাগছে। একটু এগিয়েই স্টেডিয়ামের গোল ঢালাইটা চোখে পড়ল। তারই দিকে দাঁত বের করে আছে। এস কে বোসের দোতলায় সামিয়ানা খাটানো। লোকজন। বোধ হয়,গৃহপ্রবেশ।

বড়ো মুলতানি গাইটা দূর থেকে কুবেরকে দেখেই চিনল। কদমতলায় দাঁড়িয়ে মেছলা থেকে মুখ তুলে তাকিয়ে আছে। গম্ভীর গলায় ডেকে উঠল। গোরুটা কুবেরের কাছে কৃতজ্ঞ। তিন-তিনবার পাল ঝেড়ে ফেলার পর বড়ো ডাক্তার বাড়িতে আনিয়ে গাইটাকে ইঞ্জেকশনে গাভিন করেছে কুবের। খারাপ ষাঁড়ের পাল্লায় পড়ে জরায়ুতে আলসার হয়ে গিয়েছিল। জার্সি বুলের বীজ দেওয়ার আগে সেখানে ডাক্তার আগে পাঁচ সিসি-স্টেপটোমাইসিন দিয়ে নিয়েছিল। নইলে যতবারই বীজ দাও—ঘা থেকে পোকা উঠে শুক্র মেরে ফেলবে। এসব করার আগে ডাক্তার গাইটার চারপায়ে প্রণাম করে বলে নিয়েছিল 'কোনো দোষ নিস না মা'—

বাড়ির সামনের সবুজ লনে গার্ডেন পার্টির পেল্লায় এক ছাতা বসানো। তারই ছায়ায় দুই প্রাণী বসে বসে কী করছে। কাঁধের ঝোলাটা সামনে নিয়ে কুবের গেট খুলে ভেতরে ঢুকল।

দেবেন্দ্রলালের হাত থেকে সকালের কাগজ পড়ে গেল। উঠে দাঁড়িয়ে সোজা কুবেরের দিকে তাকিয়ে আছে। কুবের কিছু বলতে পারল না। সৃষ্টিধর পেছন ফিরে ছবি আঁকছিল। সেও ঘুরে বসল। সঙ্গে সঙ্গে চেয়ার উলটে দিয়ে ছুটে এল, 'বাবা।'

কুবের সামলে নেওয়ার চেষ্টা করে ছেলেটাকে টেনে নিল। তারপর দেবেন্দ্রলালের দিকে তাকিয়ে বলল,'বাবা,তুমি? এতদিন পরে—'

কোনো কথা এল না দেবেন্দ্রলালের মুখে। ছেলেকে চেনা যায় না। গায়ের রং জ্বলে গেছে—না, সারা গায়ে কালে কীসের ছোপ। তার ছেলেই মনে হয় না। 'বোসো এখানে!'

সৃষ্টিধর টেনে আনছিল। কুবের ধপ করে বেতের চেয়ারে বসে পড়ল। নিজের ঢাকা দেওয়া দুধের

গ্লাস দেবেন্দ্রলাল এগিয়ে দিল। কুবের বলল, 'আমি দুধ খাইনে—'

'কেন?'

'বমি আসে—'

'তাহলে এতগুলো গোরু পুষলে?'

অনেক কষ্টে কুবের বলল, 'তোমরা সবাই আসবে ভেবেছিলাম।'

সৃষ্টিধর দেবেন্দ্রলালকে বলল, 'দেখেছ—আমি বলেছিলাম, বাবা আসবে।'

দেবেন্দ্রলাল ধমকে উঠল,'গায়ের ওপর উঠছ কেন? বাবাকে জিরোতে দাও।'

এমন সময় কুসুম এসে হাজির। ছাতার নীচে একটা নতুন লোককে বসে থাকতে দেখে পায়ে পায়ে কাছে এল, তারপর খুব আস্তে জানতে চাইল,'তুমি বাবা?'

কুবেরের চোখ জলে ডুবে যাচ্ছিল। লঞ্চঘাটায় নেমেই দৌড়ে এসে ট্রেন ধরেছে। কাল এইসময় মাঠে দাঁড়িয়ে আভার ডাকে সাড়া দেয়নি। অনেক কষ্টে বলল, 'হ্যাঁ।'

মেয়েটার তবু বিশ্বাস হয় না, 'সত্যি!' কুবের কোলে তুলে নিল। কোলে বসে তার মুখের দিকে তাকিয়ে কুসুম একটু একটু করে মিলিয়ে নিতে লাগল। কুবেরের দুখানা হাত তাকে শক্ত করে ধরে আছে।

একজন এইসব দেখে চুপ হয়ে গিয়েছিল। সে দেবেন্দ্রলাল। কুবেরকে তার বলার ছিল অনেক। ভাবেইনি ছেলেকে এমন আচমকা দেখতে পাবে।

ঘাসের নরম মখমলে সৃষ্টিধর পা ডুবিয়ে দাঁড়ানো। পেল্লায় ছাতার ছায়া অনেকদূর ছড়িয়ে পড়েছে। এমন একটা ছাতা নিয়ে একজন লোক পূর্ণিয়ায় পালিয়ে গিয়েছিল। কুবেরের পরিষ্কার মনে পড়ল, আমি তখন এরকম একটা ছাতা মাথায় দিয়ে ব্রজদার সঙ্গে এসপ্ল্যানেডে হেঁটেছিলাম। বসেও ঘুম পাচ্ছিল। পারলে সেখানেই চোখ বুজে ঘুমিয়ে পড়ত। কিন্তু তিন প্রাণী তার দিকে তাকিয়ে আছে। তারা দেবেন্দ্রলাল, সৃষ্টিধর,কুসুম।

'তুমি এখানে?'

'তোমার বড়দার প্রোমোশন হয়েছে। তাই নারায়ণকে সোনার বেড় পরাতে এসে কিছুদিন এখানে আছি। কেন?'

'কিছু না। তোমরা তো এদিক মাড়াও না—'

'কোনো খবর নেই, এতদিন তুমি বাইরে ছিলে কী করে? তুমি এ বাড়ির কর্তা। বউ ছেলেমেয়ে হয়েছে। এখনও কি আগের মতো ঘোরা যায়—'

কুবের দেবেন্দ্রলালের মুখের ওপর মানানসই একটা জবাব দিতে পারত। আজ চার-পাঁচবছর আমি

মুখে রক্ত তুলে টাকা কামালাম। ঘরবাড়ি করলাম। তোমরা এলে না। এই ফাঁকা তল্লাট, গোরুবাছুর,ধান, বিচুলি, কুকুর, পুকুর—আমরা একা একা আগলাই। আজ নতুন করে কী আর দুশ্চিন্তা দেখাচ্ছ! কুবেরের সেই ব্যথার জায়গাটা সে আর আজকাল খুঁজে পায় না। জায়গা মতো ঘা পড়লে তবে মনে পড়ে।

'বাবা। বাঘা নেই।'

সৃষ্টিধরের সঙ্গে সঙ্গে কুসুমও বলল, 'নেই।'

দেবেন্দ্রলাল ছেলেমেয়েকে ধমকে উঠল, 'আগে তোদের বাপকে জিরোতে দে একটু। এবার পালাচ্ছে না।' কুসুমকেও নামিয়ে দিল বুড়ো, তারপর নিজেই বলল, 'তোমরা কে কেমন থাক—'

সৃষ্টিধর ঝোলাটা নিয়ে বাড়িতে ঢুকছিল। কুবের দৌড়ে গিয়ে একরকম কেড়ে নিল,'আমিই রেখে দেব।'

দু-বর্ষা আগে বসানো নারকেল চারা, কলমের বাতাবি, আম, জামরুল মাথায় বেড়েছে। এখনও এদিকে পাখি আসে। গরমকালের পানকৌড়ি ভুস করে জলে পড়ছে আবার ছুঁচোলো হয়ে আকাশেও উঠে যাচ্ছে। বাড়ির ভেতরে ঘণ্টা বাজিয়ে ঠাকুর পুজো হচ্ছে। কুবের এসেছে—এ খবর এখনও ভেতরে পৌঁছোয়নি।

কালই বিকেলে বোধ হয় কিংবা তার আগের দিন বিকেলে—দেবেন্দ্রলাল দশ টাকার খুচরো করে নিয়ে প্ল্যাটফর্মে বসেছিল। ভিখিরি দেখে ডেকে ডেকে পয়সা দিয়েছে। মনে মনে বলেছে,আমার ছেলেটা যেন ফিরে আসে। কুবেরের কিছু হয়ে থাকলে আমি সারিয়ে ফেলব।

গাভিন গোরুর দুধ খুব ঘন বলে খানিক জল মিশিয়ে কড়ায় চাপাতে হয়। নতুন রাঁধুনি ব্যাপারটা জানত না। জল দেয়নি। দুধ ধরে গিয়েছিল। কড়া মাজতে দেওয়ার আগে নখ দিয়ে চেঁছে চেঁছে পোড়া দুধ খেয়েছিল। বুলুন ধমকে সব স্বীকার করেছে। সে জানত না, গেরস্থবাড়ি এভাবে পোড়া দুধ খেলে গরুর বাঁট ফেটে যায়। দোহালকে কাল থেকে হাত দিতে দিচ্ছে না বাঁটে। কাছে গেলেই পা ছুঁড়ছে। কুবেরের ডাইরি খুলে দেখছিল বুলু। ওষুধটার নাম লেখা আছে। কয়েক পাতা উলটেই পেল বোরোফ্যাক্স।

ওষুধটা আনতে দিতে হবে। অনেক কাজ বুলুন হাতে। সাহেব মিত্তির অনেক দিন তার দেখা পায় না। বুলু বলেছিল, 'অত অস্থির কেন? শিব প্রতিষ্ঠার দিন শ্বশুরমশাইয়ের সঙ্গে বাচ্চাদের নিয়ে যাচ্ছি। তখনই তো দেখতে পাবে।'

'অত ভিড়ে কিছু কথা হয় না।'

সাহেবকে ধমকে থামিয়ে দিতে পারেনি বুলু, আস্তে বলেছে, 'তোমার সঙ্গে আমার এমন কী কথা থাকতে পারে সাহেব?' শেষে নিজেই নিজেকে শুনিয়ে বলেছে, 'কোনো কথা থাকতে পারে না।'

‘সে আমি জানি না। দুপুরে কোথাও বেরোবো না। কোয়ার্টারে তোমার জন্যে বসে থাকব। আসবে কিন্তু।’

সবাইকে খাইয়ে-দাইয়ে বুলু বেলা পড়তে না পড়তে গাড়ি নিয়ে বেরোত। ঘুম থেকে উঠে একটু বসতে পারে না। অনেক কাজ। লবিতে প্রমাণ সাইজের আয়নায় নিজেকে দেখে চমকে উঠেছিল। কোথাও একটু টাল খায়নি। একেবারে পুরন্ত পাটালি। দোষের মধ্যে হাত দুখানা ভারী হয়ে গিয়ে বয়সটা ধরিয়ে দেয়। মাথা নিচু করে বুকের ওপর ব্লাউজের ঘের দেখছিল। তার জন্ম পৌষ মাসে।

‘কে?’ আয়নায় একটা লোককে দেখে চমকে উঠেছিল বুলু। বাবা থাকলে বাইরের কেউ সোজা ওপরে উঠে আসতে পারে না।

‘চিনতে পারলে!’

বুলুর মাথার মধ্যে সারাটা দোতলা দুলে গেল, ‘ওমা তুমি—’ আনন্দর মতো একটা জিনিস বেশ চেষ্টা করে গিলে ফেলল বুলু। অনেকদিন পরে নীচে দেবেন্দ্রলালের হাঁকডাক শোনা যাচ্ছে। শেষে বুলুই বলল, ‘এত দেরি হল ফিরতে? ধান কেমন হল?’

কুবের একটা চেয়ার টেনে বসে পড়ল,ঝোলাটা কোলের ওপর—‘ভালোই।’

‘পোকা লাগেনি?’ চটি এনে কুবেরের গায়ের সামনে রাখল।

‘একদম না।’

‘জল ছিল?’

‘খুব!’

‘কাটবে কবে?’

‘দেরি নেই আর—! এক গ্লাস জল দেবে?’

জল, সঙ্গে এক গ্লাস দুধ নিয়ে ছুটে এল বুলু, ‘জায়গাটা কেমন? খুব ফাঁকা শুনেছি—’

ঢকঢক করে জল, দুধ দুই-ই ফিনিশ করে ফেলল কুবের, ‘চমৎকার!’

‘তোমার গা একদম জ্বলে গেছে। কী কালো হয়েছ বাবা!’

কুবের আর কোনো জবাব দিতে পারল না। বুলু কাছে এসে মাথায় আঙুল চালিয়ে তার চুলে বিলি কেটে দিচ্ছিল। অনেক পরে আস্তে আস্তে বলল,‘স্টেডিয়ামের কাজ বন্ধ। সিমেন্ট আসছে না। আশি লরি ইট এসেছে। চালানগুলো সই করে রেখেছি তোমার দেরাজে—’

‘ওসব পরে শুনব বুলু।’

‘তোমার ঘাড়ে, গলায় এসব কীসের দাগ! আগে তো ছিল না।’ বুলু খানিক পিছিয়ে গেল। তারপর

কুবেরের শার্ট উলটে পিঠটা দেখে চমকে উঠল, ‘কী হয়েছে তোমার?’

‘আমি জানতাম বুলু! তুমি একদিন ঠিক জানতে চাইনে—’

‘মানে—’

‘তোমায় আমি বলতে চেয়েছিলাম। ক-বার বলতে চেষ্টা করেছি। হয় তুমি থামিয়ে দিয়েছ বুলু—নয়তো, কেন যেন থেমে গেছি। আমি জানতাম বুলু—’

হঠাৎ দুজনেই এক সঙ্গে দেখল একতলার সিঁড়ির মাথায় সৃষ্টিধর আর কুসুম চুপ করে দাঁড়িয়ে। তারা মা বাবাকে এভাবে কোনোদিন দেখেনি। কুসুম প্রায় এই প্রথম দেখছে—বাবা কেমন হয়।

ওদের দিকে তাকিয়েই কুবের বলল, ‘আমি মোটেই ঘুমোইনি কাল। একটু ঘর অন্ধকার করে দাও। শোব।’

সৃষ্টিধর, কুসুম খুব মন দিয়ে বাবা দেখছিল। ঘুমজড়ানো চোখে কুবেরও ওদের দেখছিল। বুলু দক্ষিণের বড়ো ঘরের জানলায় জানলায় পেলমেটে গোটানো পর্দা নামিয়ে দিচ্ছে। সৃষ্টিধরের মাথাটা কিছু বড়ো। কুসুমের ব্রহ্মতালু এখনও নিশ্চয়ই নরম। ভেতরটা সব সময় দপদপ করে। হাত রাখলে বুঝতে পারত কুবের। সঙ্গে সঙ্গে মনে পড়ল, ওদের দুজনেরই মাথার ঘিলু এখন নরম—মুদির দোকানে ওই সাইজের মাখনের দলা জল থেকে তুলে ছুরিতে পুচিয়ে কাটে,কাগজে মুড়ে খদ্দেরদের ভাগ করে দেয়। ওখান দিয়ে আমার রক্ত পাস করে।

ঠিক তখন কুবেরের মাথার ভেতর চেনা ছবিগুলো খুলে খুলে পড়তে লাগল। এইভাবে শখের থিয়েটারে নাটকের পর ডেকরেটারের লোকজন উইংস খুলে নিয়ে যায়। সারা আসর তখন পালক খসানো। চোখের সামনে নিজের ছেলেমেয়ে দাঁড়ানো। কুবের তাদের মনে করতে পারল না। ছোটো দুই প্রাণী তখনও দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে বাবা দেখছে। কুবের তখন নিজের মাথার মধ্যে নেমে লন্ডভন্ড—প্রায় ন্যাড়া একটা জায়গার ভেতর দিয়ে জোরে হেঁটে যাচ্ছিল। চেনা কিছুই দেখতে পাচ্ছে না। কাকে দেখে মনে রাখবে—তার নিজের নাম কুবের। নাম ভোলার চেয়ে বড়ো দুঃখ আর নেই। তখন সে কী কষ্ট। যে কোনো একটা কিছু উঠে ধরে দাঁড়ানো দরকার।

কখন কুসুম পায়ে পায়ে কাছে এগিয়ে এসেছে, পা উঁচু করে কুবেরের কোলের মাঝখানে জায়গা করে নিয়ে বসে পড়েছে—বাবা হয়েও কুবের তার এতটুকুও টের পায়নি। সব কিছু মনে রাখার জন্যে নিজের কোলের মধ্যে নরম মতো একটা জিনিস পেয়ে সেটাকে এমন জোরে চেপে ধরেছিল, কুবের নিজেই তার চিৎকার চমকে উঠল। এ যে কুসুম!

সব কিছু অচেনার মধ্যে প্রথমবারে কিন্তু মনে হয়েছিল, একটা হাঁসকে আচ্ছাসে চটকাতেই সরু পাইপ মার্কা গলা চিরে ফেলে বাতাসের অভাবে প্যাঁক করে উঠল হাঁসটা। আরেকটু চেপে ধরতেই কুসুমের গলার ফাটা আওয়াজ—মেয়ের জলে-ভরা দুই চোখ—এসব দেখে শুনে কুবের খচ করে সব মনে করে ফেলল। আর ভয় নেই।

কুবের খুব সাবধানে খসখসে আঙুল বুলিয়ে কুসুমের চোখের জল মুছে দিল। এতখানি ব্যথার পর আদর পেয়ে মেয়েটা সব ভুলে যাচ্ছে। হাসি ঠিকরে পড়ল মুখে। কুবের পরিষ্কার বুঝল, এই ধারার মেয়ের পাকাপাকি কিছু মনে থাকে না, এরা জানে না, কেন এখানে আসে। মাথা তুলে দ্যাখে, বুলু অবাক হয়ে তার দিকে তাকিয়ে আছে—মায়ের হাত ধরে সৃষ্টিধর। সিঁড়ির মাথায় দেবেন্দ্রলাল।

যেমন উঠেছিল, কোল থেকে তেমন নেমে গেল কুসুম।

'আমি শুয়ে পড়িগে—'

সিঁড়ির মুখ থেকেই দেবেন্দ্রলাল বলল, 'চান খাওয়া-দাওয়া কখন করবে?' বুলুন দিক থেকে কোনো সায় না পেয়ে চুপ করে গেল। কুবের উঠে যাচ্ছিল—ফিরে এসে চেয়ারের পায়ার কাছ থেকে ঝোলাটা তুলে নিয়ে গেল।

বুলু একটা কথাও বলেনি। এই সময়টুকু সে তার অনেক দিনের চেনাশোনা বিয়ে করা স্বামীর কেমন অচেনা হাঁটাচলা খুব মন দিয়ে দেখল,কুবের ঘরে ঢুকতেই বাইরে থেকে দু-ইঞ্চি পুরু কাঠের দরজা আস্তে আবজে দিল।

কুবের প্রায় অন্ধকার ঘরে ঢুকে দেখল, বিছানায়, মেঝেতে,জানলার তাকে—সব জায়গায় ধান হয়ে আছে। ভালো করে তাকালে বোঝা যায় দানা শক্ত হয়ে হলদে হতে শুরু করেছে। কোনো দিকে মন না দিয়ে কুবের ধপাস করে বিছানায় পড়ল।

বেলায় খেতে বসে দেবেন্দ্রলাল দু-বার জানতে চাইল, 'কুবের উঠবে না?'

ফ্রিজের মাথায় বসানো সুরেলা ঘড়ির ভেতর থেকে পাখি বেরিয়ে এসে ডাকছে।

সৃষ্টিধর চুপ। শুধু কুসুম দু-একটা কথা বলে যাচ্ছে। বুলুন গম্ভীর মুখ দেখে দেবেন্দ্রলালের বিশেষ ভরসা হল না। আজই সকালে অনেক দিন পরে কুবেরকে ফিরে পেয়ে এত আনন্দ হচ্ছিল। সব জোড়া লেগে যাচ্ছিল। শেষে এ কী হয়ে গেল! অল্পক্ষণে এমন হতে পারত না, 'তুমি বসবে না বউমা?'

বুলু শুধু মাথা নেড়ে পার পেল না, বলতে হল, 'আমি একটু শিবতলায় যাচ্ছি—', সাহেবের ওখানে যাওয়ার কথা আছে, শেষবারের মতো যাওয়ার জন্যে তাকে দিয়ে দিব্যি পালিয়ে নিয়ে গেছে লোকটা—তা আর ভেঙে বলতে পারল না। তবু একটা অপরাধের খোঁচা লেগে থাকল কোথাও। মাথা নিচু করেই বুলু বলল,'আমি ফিরে এসেই ওঁর সঙ্গে খেতে বসব—'

দেবেন্দ্রলালের মনে হল, হয়তো কোনো মানত আছে। তবু বলল, 'কাল তো সবাই যাচ্ছি। শিব প্রতিষ্ঠা সন্ধে সন্ধে। আজকের কাজ তখন হয় না—' দেবেন্দ্রলালের মন বলছিল, আজ কুবেরের কাছাকাছি থাকা দরকার। কুবেরকে খুব করে ঘিরে রাখা চাই।

'না ঘুরে আসি।'

বুলুর মন পড়ে ছিল এখানে। কিন্তু অন্য জায়গায় জটপাকানো একটা সুতো খুলে ফেলে দিয়ে তবে সুস্থির হয়ে বসা যায়। শাড়ি পালটে আজ আর নিজেকে দেখতে পেল না বুলু। ঘরের আয়নাগুলো ফল্স লাগে তার। সিঁড়ির মুখে লম্বা আয়নায় নিজেকে পেয়ে গেল।

সৃষ্টিধর,কুসুম নীচের বড়ো ঘরে আজ দেবেন্দ্রলালের সঙ্গে শুয়েছে। 'গারো' আর 'ফ্লোরিকান' স্টিমারে চানের জল কত মোটা নল দিয়ে পড়ত—সেই গল্পটা দেবেন্দ্রলাল বলছে। বুলুর শ্বশুর বলে জাহাজ। 'বালুচ' জাহাজে একবার মেঘনা পার হওয়ার সময় একটা কাক খুব বিপদে পড়েছিল। ডাঙায় থাকতে নোঙর করা জাহাজে কাকটা এসে পাটাতনে বসেছিল। খেয়াল করেনি—জাহাজ কখন বড়ো নদীতে পড়েছে। চারদিকে ঘোলা জল। দশ মাইলের মধ্যেই তীর দেখা যায় না। কাকটার পাখায় অত জোর থাকবে কোত্থেকে? এতটা পথ না জিরিয়ে একা একা উড়ে পার হওয়া যায় না। 'গারো','ফ্লোরিকান'-এর পর দেবেন্দ্রলাল 'বালুচ' জাহাজের গল্প বলবে। বুলু জানে। সিঁড়ি দিয়ে নামতে নামতে সেই কাকটাকে আয়নায় পরিষ্কার দেখতে পেল। কাকটা আজ ভর-দুপুরের সঙ্গে মানিয়ে হালকা রঙের শাড়ি পরেছে—সরু সিঁথিতে অনেকদিন পরে খানিক সিঁদুরও ডলেছে। কতকাল আমি কোথাও বসে একটু জিরিয়ে নিতে পারিনি। শুধু ফেনা কাটার আওয়াজ—জল ভেঙে যাওয়ার ঘোলা ছবি।

দেবেন্দ্রলাল গল্প থামিয়ে গাড়ি বেরিয়ে যাওয়ার আওয়াজ শুনল চুপচাপ। সৃষ্টিধর ঘুমিয়ে পড়ছে। অনেক কষ্টে চোখ খোলা রাখল। মেয়েটা ঘুমিয়ে পড়তেই পা টিপে টিপে দোতলায় এসে কুবেরের ঘরের দরজা একটু ফাঁক করে ভেতরে উঁকি দিল।

হাঁ করে ঘুমোচ্ছে। দুই চোখের নীচেই অনেকখানি করে গর্ত। কুবেরের একখানা পা খাটের বাইরে ঝুলে পড়তে পারে। খুব আলগোছে সেখানা জায়গামতো রাখতে গিয়ে দেবেন্দ্রলালের খুব ভারী লাগল। ঘরের অন্ধকার সয়ে এসেছিল চোখে। মুখের কাছে মুখ নিয়ে বহুকাল পরে তার একটা পুরোনো ইচ্ছে উঠে এল। কুবেরের মাথার কিছু চুল কপালে এসে পড়েছে। ব্রহ্মতালু কত ফাঁকা। দেবেন্দ্রলাল মুখ নামিয়ে কুবেরের কপালে একটা চুমো রাখতে গেল। পারল না। ওদের মা বলেছিল,ঘুমন্ত শিশুকে চুমো দিতে নেই—বড়ো রাগি, জেদি হয়। তার উনচল্লিশ, চল্লিশে কুবের হয়।

'কে? কে—'

চোর পড়লে এমন চেঁচায় লোকে। কুবের উঠে বসেছে। দেবেন্দ্রলাল কিছু থতমত খেয়ে গেল,'কেউ না। আমি—তোমার বাবা।'

'এখানে কেন? এখানে?'

'তুমি ঘুমের ঘোরে খাট থেকে পড়ে যেতে—ঠিক করে দিয়ে গেলাম।'

'দাঁড়াও। যেয়ো না। কিছু খাবার আছে? বড়ো খিদে পেয়েছে বাবা—'

'পাবেই তো—,' বলে আর দাঁড়াল না দেবেন্দ্রলাল। কাজের লোকজন শুয়ে পড়েছে। ফ্রিজে কিছু রান্না

জিনিসপত্র পাওয়া গেল। সেগুলো গরম করে দেওয়া চাই। ও পথে না গিয়ে পাথরবাটিতে তোলা ছানা চিনি মিশিয়ে নিয়ে এল দেবেন্দ্রলাল।

'বুলুকে বললে পারতে—'

কুবেরের হাতে বাটি তুলে দিয়ে পুবের জানলা খুলে দিল দেবেন্দ্রলাল। খাওয়া হয়ে গেলে ফ্রিজ থেকে ঘাম-মাখানো একটা বোতল ছেলের হাতে তুলে দিল। কুবের মাথাটা পেছনে ঢেলে দিয়ে ঢকঢক করে এক বোতল জল খেয়ে ফেলল, 'বুলু কোথায় বাবা?'

'ও বুঝি শিবতলায় গেছে। খেয়ে যায়নি। ফিরে এসে তোমার সঙ্গে খেতে বসবে বলে গেছে।'

কুবের এবার পাথরবাটি, বোতল নিজে উঠে গিয়ে রেখে এল।

'তুমি এখানে পাকাপাকি থাকলে পারো বাবা।'

দেবেন্দ্রলাল মুখ খুলল না। হাসল একটু।

'এখানে তোমার খারাপ লাগে?'

'তা কেন? তবে, আমি বলি কী—এটা তোমার সংসার, যা-কিছু ডিসিশন তোমারই। সব সময় থাকা দরকার তোমার।' কী আর একটা কথা মনে পড়ল দেবেন্দ্রলালের, 'তোমার তুলনায় কত অল্প টাকায় সংসার করেছি আমরা।'

'শুধু টাকাটাই দেখলে বাবা! তোমার কাছাকাছি আমরা ছিলাম। আমার কাছাকাছি কেউ নেই—'

'বয়স হলে সব লোক আলাদা হয়ে যায়। ছোটোবেলায় একরকম থাকে। বিয়ের পর তার নতুন শেকড় বেরোয়—'

'তাহলে তুমি ফিরে ফিরে আসো কেন?'

'বাঃ! আমি তোমাদের বাবা। তোমার এত দুঃখ কীসের কুবের?' কথাটা শুনেই কুবেরের মাথার ভেতর দিয়ে ফুলস্পিডে একটা ইলেকট্রিক ট্রেন চলে গেল। আর ভেতরে মা, বড়ো বউদি, বুলু, বাবার সঙ্গে কুবের একটা কামরায় বসে আছে। ভিতপুজোর পর সবাই কদমপুর থেকে ফিরছে। সেদিন দেবেন্দ্রলাল বলেছিল,তোমার কত টাকা কুবের? ট্রেনটা ভীষণ দুলছিল। কুবের শক্ত করে খাটের ছত্রি চেপে ধরল। এই তো সব মনে আছে তার। দেবেন্দ্রলাল ইজিচেয়ারে শুয়েছিল এতক্ষণ। এবারে উঠে বসে বলল, 'তোমাদের গর্ভধারিণী থাকলে তিনি এসেই দেখে যেতেন। না দেখে থাকতে পারতেন না—'

তারপর নিজেই আবার দেবেন্দ্রলাল বলল,'আমার স্ত্রী বলে নয়—ওরকম মহিলা আর দেখিনি আমি কুবের। কতই বা মাইনে পেতাম। তোমাদের কতজনের পড়াশুনো ওই টাকায় চলেছে। কিছু বন্ধ থাকেনি। রোজ স্টিমারঘাটায় বসে বসে নোঙর করা জাহাজের বয়লারে স্টোকারদের কয়লা দিতে দেখতাম—'

কুবের দেবেন্দ্রলালকে থামতে দিল না। উৎসাহে চোখ বড়ো করে তাকাল।

'তোমাদের মা তার নিজের কাজ ঠিক করে নিয়েছিল। সংসারটা চালু রাখার জন্য যেনতেন প্রকারে আমাকে খাইয়ে-দাইয়ে স্টিমারঘাটায় পাঠিয়ে দিত। আমার ইঞ্জিনে কোনোদিন কয়লার-জ্বালানির অভাব পড়েনি। সে ধরেই নিয়েছিল—আমি চালু থাকলেই সংসার চালু।'

'মা না থাকলে আমরা উঠতে পারতাম না বাবা।'

'কেমন মোক্ষম সময়ে চলে গেছে দ্যাখো!'

'কিছুই দেখে যেতে পারেনি মা।'

'ধান কেমন হল?'

কুবের আকাশ থেকে পড়ল, 'কোথায়?'

'কেন! তোমার সেই দ্বীপে। মাটি কেমন?'

কুবেরের সব মনে পড়ে গেল। তার এইমাত্র মনে হচ্ছিল, মা ছিল বলেই সে নিজে কঠিন, অসম্ভবের তোয়াক্কা না রেখেই কদমপুরের মাঠে ড্রিম মারচেন্ট হয়ে বসেছিল। এ শুধু মায়ের ছেলে বলেই সম্ভব হয়েছে। মায়ের কাছে আমরা ছিলাম এক একটা ক্যানাডিয়ান ইঞ্জিন। কুবের একদিন নগেনকে বলেছিল, জানিস—মা হল ইটারনাল স্টোকার। আমাদের ইঞ্জিনে ফুয়েল জোগানোই তার কাজ। শুধু সেইটুকু জেনে বসে আছে এ-জীবনে। আজ অনেক দিন পরে দেবেন্দ্রলালের কথায় মায়ের সে-ছবি ভেসে উঠতেই কুবের ভরে যাচ্ছিল।

'মাটি ভালোই। তবে কিনা—অনেক দিনের পোড়া জায়গা তো—আগাছা, বিশেষ করে আকন্দ আর কীসব বুনো গাছ মাটির এক হাত নীচেই শেকড়ের জাল ছড়িয়ে রেখেছে—,' কুবের হাঁপাতে লাগল।

'বলো তাহলে সেসব কেটে আবাদ করতে খুব কষ্ট গেছে!'

'তা কিছুটা—'

'ধান হল কেমন?'

'খুব। গোছে গোছে মাঠ এঁটে গেছে।'

'এত ধান আনবে কী করে কুবের?'

'সেই তো সমস্যা। খরো থাকতে থাকতে লঞ্চ বোঝাই দিতে হবে। তারপর ডাঙায় উঠে লরি—না হলে অগত্যা গোরুর গাড়ি।'

'কোথায় রাখবে এত ধান? গোলা কোথায়? একটা ভালো স্টোর হাউস আগে চাই। আমি নিজে থেকে দাঁড়িয়ে সব দেখাশুনো করব। সালকের বাড়িতে থাকতে তোমরা রেশনের লাইন দিতে! এসব তোমাদের মা দেখল না।'

কুবের অবাক হয়ে দেবেন্দ্রলালকে দেখছিল। ধানের নেশা বড়ো নেশা। পাকে পাকে জড়ানো। অথচ আমার গেরো খুলে গেল।

'তোমার সামনে অনেক কাজ কুবের।'

কুবের আরও অবাক হয়ে দেবেন্দ্রলালকে দেখল।

'স্টেডিয়াম বানাতে হবে। খালের ওপরে ওখানে একটি ব্রিজ চাই।'

'আমার আর ভালো লাগে না বাবা।' কুবের গুছিয়ে বলতে পারল না। জমা হতে হতে অনেক জঞ্জাল স্তূপ হয়ে উঠেছে। তার মধ্যে স্টেডিয়ামটা মাথা তুলে দাঁড়ানো। চোখ খুললেই চোখে পড়বে। কিছুতেই তাড়ানো যাবে না।

'আশ্চর্য! বুলু এখনও ফিরল না।'

'তাড়া কীসের!'

'না কুবের। তা ভালো না। অবেলায় খেলে নির্ঘাত অজীর্ণ। অবাক কাণ্ড! তুমি এসেছ—আর আজই এত কাজ পড়ল বউমার?'

'কাজ হয়ে গেলেই চলে আসবে বাবা। এত ব্যস্ত কেন?'

'আমরা এসব বুঝি না।'

যা কোনোদিন করেনি, তাই করল দেবেন্দ্রলাল। পরিষ্কার বলল,'আমি সোজাসুজি একটা কথা বলতে চাই তোমাদের—নগেন ওদের বলতে পারিনি—কিন্তু তোমাকে আজ বলছি—তোমরা আরও বড়ো হতে, অনেক বড়ো হতে—'

কুবের উঠে বসে দেবেন্দ্রলালের দিকে তাকাল।

'তোমাদের বউরা যদি অল্প অল্প করেও তোমাদের গর্ভধারিণীর গুণের ছিটেফোঁটাও পেত!'

'তা তুমি কী করে আশা করো বাবা!'

'লোকে দেখে শেখে, ঠেকে শেখে। বিয়ের পর থেকে আমার ছেলেরা সবাই পায়ে পাথর বেঁধে পড়ে আছে।'

'তুমি মানুষের কতটুকু জানো বাবা? আমি আপত্তি করছিনে। কিন্তু—'

'তুমি বুলুর কতটুকু জানো? নগেন রেখার কতটুকু জানে?'

'কী বললে?'

'তুমি বুলুর কী জানো?' দেবেন্দ্রলাল আর বলতে পারল না। কুবেরের চোখের কোণে ভীষণ সরু সব রেখায় হঠাৎ রক্ত থানা দিয়ে উঠছে। হাঁটুমুড়ে আধখানা কুবের বিছানায় ঠেলে উঠল,'আবার বলো—,'

দেবেন্দ্রলাল কিছু বুঝতে পারছিল না। এমন সময় সৃষ্টিধরের পেছন পেছন কুসুম ঘরে ঢুকল। মেয়েটাই আগে কথা বলল,'বাবা আমি একটা নাচ করি?'

থপ করে বিছানায় বসে পড়ল কুবের। দেবেন্দ্রলালের দিকে চোখ তুলে তাকাতে পারল না।

সৃষ্টিধর বোনকে থামিয়ে দিয়ে বলল,'বেড়াতে চলো না বাবা—'

দেবেন্দ্রলাল, কুবের একসঙ্গে বাইরে তাকাল। সামান্য বাবলা গাছও হাওয়া পেয়ে খুশির ভঙ্গিতে দুলছে। সারি সারি বসানো গাছ কিছু ডাগর হয়েছে গত বর্ষার পর। তাদের গা বেয়ে কুবের রোড। বিকেলে কদমপুরের লোকজন এদিকটায় বেড়াতে আসে—হাওয়া খায়। আজ অনেক আগে পরিষ্কার আকাশে চাঁদের জলছাপ পড়েছে। ঘনরাম চাটুজ্যের ইটখোলায় জোড়া চিমনি দিয়ে রাশি রাশি ধোঁয়া বেরিয়েও ঝুলন্ত সূর্য ঢাকতে পারেনি। দেখতে পাওয়ার এই চেনা সীমানা কুবেরকে সাহস দেয়। খাট থেকে নেমে বলল, 'বাবা চলো না, সবাই মিলে বেড়িয়ে আসি।'

সৃষ্টিধর বলল, 'চলো। খুব মজা হবে।'

দেবেন্দ্রলাল মাথা নাড়ল,'তোমাদের বাবা খায়নি। মা ফেরেনি—'

কুসুম খুব গম্ভীর হয়ে বলল, 'বাবার অত খিদে পায় না তোমার মতো—বুঝলে—'

সৃষ্টিধর,কুসুম, দেবেন্দ্রলালের সঙ্গে বারান্দায় বসেও কম মজা হচ্ছিল না কুবেরের। নিজের লোকজনের মধ্যে মন কত ফ্রি থাকে। কুবের এখন ভালো পার্টনার পেলে নেট টানিয়ে বিপদ নিয়ে ব্যাডমিন্টন খেলতে পারে। বাইরে হাওয়া দিচ্ছিল। গ্যারেজের সামনে দাঁড়িয়ে কুবেরের একবারও মনে পড়ল না, বেশ পরিশ্রম করে একজন মেয়েছেলেকে তার মাটি চাপা দিয়ে আসতে হয়েছে। ভালো ঘুম, বিশ্রাম হওয়ায় কুবেরের মাথার মধ্যে যেসব দেওয়াল এলোপাতাড়ি পড়েছিল—সেগুলো সরানোর চেষ্টাই তার মধ্যে কাজ করেনি। কুসুম কোলে বসল, পাশে সৃষ্টিধর। সামনের সিটে দেবেন্দ্রলাল। গাড়ি স্টার্ট নেবার আগে কুবেরই বেঁকে বসল, 'সন্ধে হয়ে গেল। এখন আর কোথায় যাব?'

কুসুম কিছুতেই রাজি নয়। দেবেন্দ্রলাল তাকে বোঝাল, 'বাবার শরীর খারাপ। চলো আমরা দিঘির শানে গিয়ে বসি।'

সৃষ্টিধর রাজি হয়ে গেল। পুকুরে সব সময় তার একখানা হাতছিপ ভেজানো থাকে। একবার ছোটো একটা মৃগেল আপনাআপনি ধরা দিয়েছিল।

চারজনে গিয়ে দিঘির ধারে বসল।

তখন সেখান থেকে বেশ দূরে, তেলখোঁড়ার আড্ডাকে অনেক পেছনে ফেলে, লোকালয়ের একেবারে বাইরে একটা মাঠের মধ্যে সাহেব বসেছিল। উঠে দাঁড়াতে পারছে না। ঝড় উঠে প্রকাণ্ড মাঠের খড়কুটো চুমুক দিয়ে শূন্যে তুলে দিচ্ছে। বুলু দেখল,দূরে হাইওয়ের ওপর দাঁড় করানো গাড়িটা ধুলোর আড়ালে পড়ে গেল।

'চলো তোমাকে নামিয়ে দিয়ে আমি ফিরে যাব।'

'এই কথা বলার জন্যে আমায় এতদূরে নিয়ে আসার কী দরকার ছিল! কোয়ার্টারেই বললে পারতে।'

'শেষবারের মতো আসতে বলেছিলে। তাই এলাম। আমার সঙ্গে থাকতে পেলে তুমি নাকি বর্তে যাও। তাই এতটা পথ আগাগোড়া তোমাকে সঙ্গ দিলাম সাহেব। এর পরে আর তোমার কিছু বলার থাকে না—'

'তা সত্যি! তুমি যাও। আমি ঠিক যেতে পারব।'

'পাগল হয়েছ। এতটা পথ এই ঝড়ের মধ্যে দিয়ে যাবে কী করে?'

'এতদিন তুমি ছিলে না। একা একা এগোলাম কী করে! তুমি যাও। এতদিন পরে কুবেরবাবু ফিরেছেন—'

কথাগুলো বলতে সাহেবের একটুও কষ্ট হচ্ছিল না। এমন একটা পরিণতির জন্যে সে শুরু থেকেই তৈরি ছিল। সামনে দাঁড়ানো বুলুর দু-পায়ের নখ পরিষ্কার গোল করে কাটা। স্থির, ধবধব সাদা—দাগ পড়েনি কোথাও। ম্যাগাজিনে দেব-দেবীর এরকম ছবি থাকে। বুলু তার মাথায় হাত রাখল।

সাহেব জানে তার এই অঙ্কের কোনো ভাগফল ভাগশেষ নেই।

বুলুর আঁচল উড়ে উড়ে দু-একবার তার মুখে, মাথায় পড়ছিল। সাহেব পড়তে দিচ্ছিল। এই শেষ স্পর্শ। বাতাসে সিগারেট ধরানো অসম্ভব। এখন সে খানিকক্ষণ একা থাকতে চায়। মাথার ওপরে আকাশ, নীচে এতবড়ো একটা প্রান্তর—মাঝখানে শুধু সে একা—এসব জায়গাতেই নিজেকে পরিষ্কার দেখা যায়, চেনা যায়।

বুলু হাইওয়েের দিকে এগোচ্ছে একা একা। সাহেব বসে বসেই দেখল,এই যাওয়াটা কত দীর্ঘ। এতদূর থেকে কোনো শব্দ পাওয়া যায় না। একসময় গাড়িটা স্টার্ট নিয়ে ছিটকে বেরিয়ে গেল।

প্রতিপদের চাঁদ একটু লাল হয়ে ওঠে। পরে আসল রং বেরোয়। ঘাটের ঢালাই বেঞ্চে বসে কুবের সৃষ্টিধর আর কুসুমকে দেখছিল। কুসুমের নানা নালিশ আছে। সৃষ্টিধরের কোনো নালিশ নেই। এই মাঠঘাট সে নিজের করে নিয়েছে। কদমগাছ দুটো নতুন পাতা ছেড়েছে। এবার বর্ষা পেলে হয়তো ফুল দিতে পারে।

দেবেন্দ্রলাল বলল, ‘তোদের বাবাকে দুটি খেয়ে নিতে দে।’

কুবের দেখল, তার বাবা নিজেই খানিক ছানার জল নিয়ে এসেছে। কাটা পেঁপে ছিল ফ্রিজে। প্লেটে ঢেলে তাতে চামচ গুঁজে দিয়ে তাও নিয়ে এসেছে। অনেকদিন পরে ছেলেমানুষ হয়ে গিয়ে কুবেরের কাঁদতে ইচ্ছে হল।

খেয়ে প্লেট নিজেই রাখতে গিয়েছিল কুবের। ফেরার সময় দেখল, তার নামের রাস্তা দিয়ে একটা মোটর হেডলাইট জ্বালিয়ে টলতে টলতে ফিরে আসছে। বেচাল হলেই গাড়িটা খালে গিয়ে পড়তে পারে। ব্রেক কষে গাড়িটা থামতেই হেডলাইট নিবে গেল।

সঙ্গে সঙ্গে কুবেরের মনে পড়ল, কালই ‘ডাহুক’-এর সার্চলাইটের কার্বন পালটে সারেং কলকাতা থেকে ফিরবে। তাকে ডাকতে আসবে। মেদনমল্ল দ্বীপে তার যে কত কাজ পড়ে আছে! কামলারা আভাকে দেখতে না পেয়ে খোঁজ শুরু করেনি তো! কুবের ঘাটে যেতে পারল না। সেখানেই দাঁড়িয়ে গেল। সৃষ্টিধর, কুসুম ঘাটে খেলছে। দেবেন্দ্রলাল বাঁধানো বেঞ্চে আরামে ঠেস দিল। গাড়ির দরজা খুলে বুলু অনেকটা এগিয়ে এসেছে। গোয়ালে গোরুদের পা ঠোকার শব্দ। এই ভরাট সংসারের মাঝে সে কেউ না। সে আসলে দাগি নম্বরি লোক। আবার ক্লাস থ্রি থেকে জীবন শুরু হয় না? কুবের রোডের পাতলা ধুলো-মাখানো জ্যোৎস্নায় জগৎসংসার নতুন হয়ে গেল। শুধু তারই আর পালটাবার কোনো রাস্তা নেই। এর চেয়ে দ্বীপে থেকে গেলে ভালো হত। আভা বলেছিল, আমরা ডাঙায় থেকে যাই না কেন। তখন সেসব কথায় একদম কান দেয়নি কুবের। আজ যদি ভদ্রেশ্বরও কাছে থাকত।

এখন কেউ আভার খোঁজ নিলে কী বলব?

'সবাই ঘাটে বসে। তুমি এখানে? খেয়েছ?'

খুব খানিক হেসে ফেলল কুবের, 'তোমার জন্যে বসে আছি—'

বক্স-বসানো বারান্দার এই সরু পথে আলো কিছু কম। বুলু সেখানে কুবেরের মুখোমুখি কিছুতেই দাঁড়াতে পারল না।

কুবেরকে নিয়ে একসময় দেবেন্দ্রলালের খুব চিন্তা ছিল। কী করে ছেলেটা শেষ পর্যন্ত? তারপর আস্তে আস্তে নিশ্চিন্ত হয়ে উঠেছিল। ছেলের চারদিকে ভরভরাটি অবস্থা। এই কথাটি ভেবে বাবা হয়ে দেবেন্দ্রলাল মশগুল ছিল। কিন্তু কদমপুরে এসে ইস্তক কুবেরের জন্যে তার চিন্তা-ভাবনা ডবল বেড়েছে। সব কিছু এখানে অগোছালো। এত যে ধান উঠবে তার গোলা কোথায়? গোরুদের গুড়ের বস্তায় সব সময় পিঁপড়ের সারি। কুবের ফিরে আসতে মন নেচে উঠেছিল। আবার গভীর দুশ্চিন্তায় ডুবে গেছে দেবেন্দ্রলাল। এতদিন পরে ছেলে ফিরল। বুলু সারা দিন উধাও!

কুবেরের পাশ দিয়ে বুলু ওপরে উঠে গেল। ফিতে-জড়ানো লম্বা বেণিটা হালকা করা দরকার।

কুবের জামাকাপড় না ছেড়েই পুকুরে ঝাঁপিয়ে পড়ল। তারপর সারা দিনের ঘুমোনো হালকা শরীর নিয়ে জল কেটে বেরিয়ে যেতে গেল। দোতলার ঘরে আয়নায় দাঁড়িয়ে বুলুর বেণি ভাঙা হল না। ঝুলবারান্দায় এসে চুপ করে পুকুরে কুবেরের দাপাদাপি দেখতে লাগল।

পাঞ্জাবির পকেট, পেটে জল নিয়ে কুবের একটা ধাপে বসে গেল। এক পাটি পাম্পসু পা থেকে তলিয়ে গেছে। ধুতির কোঁচা জড়িয়ে এই কাণ্ড!

কুসুম মানুষটি ছোটো। কিন্তু কাজ পেলে তাকে থামানো কঠিন। নিঃশব্দে ওপরে এসে বাবার আলনা থেকে তোয়ালে, পাজামা নিয়ে নীচে নেমে গেল। সিঁড়ি দিয়ে নামছিল। তখন বুলু দেখতে পেল। আজই এই মেয়েটাকে কোলে পেয়ে বেলুন-ফাটানোর কায়দায় কুবের চেপে ধরেছিল। অনেক ভেবেও এসবের কোনো মানে পেল না বুলু।

খাবার টেবিলে বুলু একখানা মাজাঘষা কুবেরকে পেল। ঘুমিয়ে চোখ দুটো কিছু ফোলা ফোলা। আর কপালের খানিক জায়গা কালচে দাগে ঢাকা পড়েছে। এসব কোত্থেকে পেল লোকটা?

এতদিন তাড়াতাড়িতে সব কিছু সেরে ফেলার অভ্যেস হয়ে গেছে কুবেরের। তাই দেবেন্দ্রলাল যখন মাঝামাঝি, কুবেরের খাওয়া শেষ। কুসুম অনেকদিন পরে বাবাকে দিয়ে মাছ বেছে নিচ্ছিল। পুরো ব্যাপারটাই ছবি তুলে রাখার মতো।

'অবেলায় চান করলে? গা ব্যথা হবে না?'

কুবের জবাব দিতে গিয়ে আনাড়ি হয়ে গেল। ঠোঁট ফাঁক হয়ে গিয়ে গাড়লের হাসিতে তার মুখ ভরে গেল। আয়না নেই। তবু এসব দেখতে পায় কুবের, 'এই পরিষ্কার হয়ে নিলাম। তুমিও চান করলে

পারতে—'

'আমি চান করেই বেরিয়েছি।'

'মাথাটা এমন শুকনো?'

'বাইরের বাতাসে, ধুলোয়—'

খাওয়া-দাওয়ার পর সবাই মিলে বসল। এই আসরে একজন আজ অ্যাবসেন্ট—বাঘা। রোজ এই সময় সে এসে মেঝেতে শুয়ে পড়ত। আগাগোড়া একটা কৃতজ্ঞতার ছবি! জিভ বের করে হাঁপাত।

বাঘার কথায় ছেলে-বউকে ডুবে যেতে দেখে, দেবেন্দ্রলাল উঠল। পেছনে পেছনে সৃষ্টিধর, কুসুম। 'বালুচ' জাহাজের কাকের সমুদ্রযাত্রা শুনতে শুনতে দুপুরে ঘুমিয়ে পড়েছিল দুজন। দেবেন্দ্রলালকে এখন সেই গল্প শেষ করতে হবে।

খেতে বসার লবি থেকে এই বারান্দাটুকু বেরিয়ে গিয়ে একেবারে আকাশের নীচে ঝুলছে। প্ল্যানে ছিল না। বাড়ি তৈরির সময় ফালি বারান্দাটুকু বুলুর মাথা দিয়ে বেরোয়। এখানে দাঁড়ালে কুবের বুঝতে পারে সারা বাড়ির জায়গানটিক স্ট্রাকচারের মাঝে এই জায়গাটুকুই রিলিফ। কথাটা বোধ হয় কোনো ইঞ্জিনিয়ার বন্ধুই বলেছিল। কত লোকের কথা আজকাল নিজের বলে মনে হয় কুবেরের।

বহুকাল পরে একেবারে পায়ের কাছে বুলু পানের বাটা নিয়ে বসল। একটু বেশি রাতের জ্যোৎস্নায় কোনো ছায়া পাওয়া যায় না। মাথার ওপরের চাঁদকে ঘিরে চন্দ্রসভার লালচে গোল। মাথার ঘোমটা টেনে কুবেরের খুব ফেবারিট পোজে বুলু পান এগিয়ে দিল। পান মুখে দিয়ে কুবের বুলুর হাত চেপে ধরল, 'মোটা হয়ে গেছ!'

'তুমিও বদলে যাচ্ছ। কী সব দাগে দাগে একেবারে কালচে হয়ে গেছ।'

'ও হবেই জানতাম। আমার কোনো হাত নেই বুলু। আমি থামাতে পারিনি।'

কুবেরের সব কথার মানে পায় না বুলু। তবু আন্দাজে বলল, 'তাই বলে এমন দাগে ভরে যাবে?'

কুবের কেঁপে উঠল। ফস করে মুখ দিয়ে বেরিয়ে গেল, 'আমি দাগি লোক বুলু। নম্বরি মানুষ!' এইবার কুবের দম নিয়ে বলতে যাচ্ছিল, একটা স্যাড ঘটনায়—এক্সপিরিয়েন্স বলতে পারো বুলু—বলা হল না। বুলু খুব কাছে মুখ এনে তারই কাঁধে চিবুকসুদ্ধ মাথার ভার রাখল। একেবারে একটা জ্যান্ত লোক বুকের ওঠানামাসুদ্ধ তার গায়ে লেপটে গেল। কুবের আর নড়তে পারল না।

'আমি অত সব বুঝিনে। তোমার কী হয়েছে কুবের?'

বিয়ের কতকাল পরে নাম ধরে ডাকল বুলু। কুবের তখন আন্দাজ নিচ্ছিল, কত হিসেব করে মেয়েলোকের শরীরে হাড়-মাংস বসানো থাকে। এই হল সময়—এখনই সেই ঘটনা—স্যাড এক্সপিরিয়েন্সের কথা বলে দেবে।

‘কী হয়েছে তোমার? আমাকে বলো ওগো।’

‘আমি নিজেই ধরতে পারিনে বুলু—। ভালো কথা! কী মানত ছিল তোমার?’

‘মানত?’

‘তা-ই হল! মানসিক! ভগবানকে কী বললে আমার জন্যে—’

বুলু সাবধান হয়ে গেল। আজই দুপুরে শিবতলায় যাবার নামে বেরিয়েছিল। সব মনে পড়ে গেল একসঙ্গে। তারপর খুব আস্তে বলল, ‘শিব কোথায় যে মানত করব!’

‘কীরকম?’

‘রেলেশ্বর শিব তো অনেক দিন উধাও। বাইরের কেউ জানে না সে কথা। তোমার ব্রজদা একেবারে কেঁচো হয়ে গিয়ে একবার এসেছিল—’

কুবের বসে বসেই জুড়িয়ে গেল। আর কিছু জানতে চাওয়ার ভরসা নেই তার। বুলু তখন নিজে নিজেই বলছে, ‘অথচ দেখো কালই স্বপ্নাদিষ্ট মন্দিরে শিব প্রতিষ্ঠা। দুধ ঢেলে চামর দুলিয়ে রেলেশ্বরের অভিষেক হবে। কী সাহস ব্রজদার! একটুও ভাঙেনি। তুমি তো এদিককার কোনো খবরই রাখো না। আরেকটা খবর শুনবে?’

কুবের মুখ তুলে তাকাতে পারল না। যেমন ছিল বসে থাকল।

‘তোমার আভা বউদি কবে কেটে পড়েছে—’

কুবের অনেক কষ্টে বলল, ‘তাই নাকি?’

‘একবার খোঁজও নিল না মানুষটার। মোহান্ত বনে গিয়ে তোমার ব্রজদা বলে—ফেরার সময় হলেই ফিরবে। লোকটা শিব শিব করেই গেল।’

কাঁধের হাড়ে চিবুকের ছুঁচোলো জায়গাটুকু বসে গিয়ে রীতিমতো ব্যথা করছিল। তবু কিছু বলতে পারল না কুবের। সামনের নতুন বাড়িদুটোর চিলেকোঠাতেই আলো জ্বলছে। রেডিয়ো থেমে গেছে কতক্ষণ। দিনের বেলার অর্ডিনারি গাছপালা এখন দিব্যি সেজেগুজে দাঁড়ানো।

বাঁধের ওপরে পাঁচ ঘোড়ার পাম্প কেউ সরাতে পারবে না। ভীষণ ওজন। কামলারা এতক্ষণে অসাড়ে ঘুমোচ্ছে। তাঁবুর দড়িতে টানানো শাড়িটা কেউ কি আর তোলেনি! হাওয়ায় পেয়ারাপাতার শব্দে বাগান ভরে যাচ্ছে।

বুলু নিজে থেকেই মাথাটা তুলল। নিজের একটা ফিক্সড বউ থাকলে কত সুবিধে। মাথার ঘোমটা বুলু বড়ো একটা পাপড়ি করে খসিয়ে ফেলেছে। মুখখানা প্রায় ফুল হয়ে গন্ধ দিচ্ছিল। এই আস্ত মানুষটা তো তার—ভাবতেই কুবেরের সারা গা কাঁটা দিয়ে উঠল। এমন করে একজন আরেকজনের মালিকানা চায় কেন? কোনো মানে হয়!

‘তুমি কী বলে অমন ফুল ড্রেসে জলে ঝাঁপিয়ে পড়লে! পায়ের পাম্পসুও খোলোনি—’

‘এক পাটি ডুবে গেল। ড্রেস রিহার্সেল দিচ্ছিলাম—’

‘কীসের কুবের?’

‘আজ এতদিন পরে ঘনঘন নাম ধরে ডাকছ যে—’

সামনে আর কেউ নেই যে লজ্জা পাবে বুলু। কুবেরের চোখে লালচে রঙের তলানি এক দিকে কাত হয়ে ঠেলে উঠল। নীচে দেবেন্দ্রলালের গল্পের গলা অনেকক্ষণ থেমে গেছে।

‘আপত্তি আছে?’

‘তা কেন!’

‘তবে?’

পানের রসে গলা ভিজে ছিল। তাই খুব সহজেই কুবের বলল, ‘এত দিন ডাকোনি কেন! সে-ই ডাকলে! এত পরে!’

‘কোনো জিনিস বসে থাকে না বুলু। আমাদের জন্যে কিছুই বসে থাকবে না—’

বুলু শক্ত করে কুবেরকে গোড়া থেকে ধরল, ‘কীসের মহলা দিচ্ছিলে? পায়ে কাপড় জড়িয়ে মাঝ-পুকুরে ডুবে যাবার!’

‘যদি মনে কনো—তাই। কিন্তু ইচ্ছে থাকলেও সব সময় হয়ে ওঠে না বুলু।’

‘তেমন করে ইচ্ছে করোনি বলো—।’ আজই বিকেলে ঝড়ের মধ্যে মাঠের মধ্যে একটা লোককে ফেলে রেখে এসেছে বুলু। কুবের অবাক হয়ে গেল, একটু আগেও ঘোমটাঘসানো বুলুর মাথা, মুখ আস্ত একটা ফুল হয়ে গন্ধ দিচ্ছিল। খুব দেখা যায় না—তেমন একটা সাদা ঘুঘু এসে লনে নেমেছে। ভেবেছে রাত শেষ হয়ে গেল বুঝি।

‘জানো বুলু—আমাদের এই বাড়ি তৈরি হয়েছে কদমপুর মৌজার হাল দু-হাজার তেইশ দাগে। জমি আছে চব্বিশ শতক। বোধহয় চৌদ্দো পনেরো কাঠা হবে। আজ এখানে এমন নতুন টাউনশিপের চেহারা দেখে আমারই অবাক লাগে। এই জায়গাটুকু ছিল কোটিরাম সরদারের। বুড়ো কাশীবাসী হওয়ার আগে নিজের চাকরের কাছে ষোলো টাকায় জায়গাটুকু লিখে দেয়। সেখানে এখন আমরা—’

বুলু কিছু বুঝতে পারেনি। তার কাছে এসবের কোনো উনিশ-বিশ নেই।

তোমার অবাক লাগে না? লোক কতবার হাতবদল করে একই জায়গায় ঘর বানায়, ধান করে। আবার টাইমের নীচে তলিয়ে যায়—চাপা পড়ে—’

‘ওসব আমার মাথায় আসে না। যা উচিত না—আমি চোখ বুজে তা ছেঁটে ফেলি। একটুও আটকায় না আমার। আমি বুঝি এ-জায়গাটা তোমার বানানো। তোমার হাতে তৈরি।’

‘তুমিও কম খাটোনি আমার সঙ্গে সঙ্গে। আমরা ক-বছর আগেও কত সিয়োর অ্যান্ড সিম্পিল ছিলাম। এখন আর সেভাবে ঝাঁপিয়ে পড়তে ভয় হয়।’

‘আজ তো দিব্যি জলে ঝাঁপ দিলে।’

‘সে তো সোজা!’

‘এবার এত ধান এনে রাখবে কোথায়? আমি বলি কি লঞ্চঘাটায় বেচে দিয়ে হালকা হও। আমাদের আর এত কীসের দরকার? এবার কিছুদিন চুপচাপ থাকো। খাও দাও ঘুমোও।’ বুলু মেঝেতে বসে কুবেরের দুখানা পা কোলে তুলে নিল।

‘অনেক হয়ে গেছে—তাই না।’

‘খাবে কে? তোমার বাড়ি এটা। এখানে এসে পাকাপাকি থাকো তুমি। কুসুম তো তোমাকে চেনেই না প্রায়—’

‘রোজ কত জিনিস জমে যাচ্ছে দ্যাখো। চোখের সামনে থেকে স্টেডিয়ামের গোল ঢালাই ভিতটা উপড়ে ফেলতে পারো? একদিন আমরা যে কোথায় চাপা পড়ে যাব!’

‘ও কী অলক্ষুণে কথা! তুমি আরও কত জিনিস বানাবে—’

‘এসব কিছুই যদি আর না থাকে? তুমি তখনও পারবে?’ কুবেরের গলার আওয়াজ কিছু বেশি ভারী হয়ে ওঠায় ঘুঘুটা উড়ে গেল। জ্যোৎস্না ফুঁড়ে একটা কালো দলা আবছা জায়গায় চলে গেল।

‘তুমি কী বলছ? আমি কিছুই বুঝে উঠতে পারছিনে—’

‘আমি ডুবেছি বুলু। চাষবাসে ডুবেছি আমি। ভরাডুবি!’

‘এই যে আজই বললে একদম পোকা লাগেনি। আগাগোড়া জল ছিল। তুমি কী বলছ! ঠাট্টা করছ বলো!’ আবার বুলুর শুকনো মুখে হাসি ফিরে এল।

এখন আর উপায় নেই। কুবেরের একেবারে নিজের ভেতরসুদ্ধ ভয়ে কেঁপে উঠল। আমি কুবের সাধুখাঁ, আজ চার-পাঁচ বছর শুধুই জিতে আসছি। আমার গা বেয়ে টাকা আসে। ভোরবেলা দরজা খুলে শেষরাতে ঝরে-পড়া নোটের গোছা সরিয়ে দিয়ে রাস্তা করে নিতে হয়—তারপর আমি কাজে বেরোই। এই ছবিটাই বুলু জানে। এই ব্যাপারটাই ওর কাছে নর্মাল। যা আমি অসুখ বলে জানি—ওর কাছে তা সুখ। আমি সেরে উঠছি সবে। ঠিক তখনই এই ক-বছরের জানা ছবিটা বুলুর চোখের সামনে দুলে উঠল।

কুবের দেখল, আর পিছোনো যায় না, ‘না বুলু। ঠাট্টা নয়। ঝড় উঠে ধানে দুধ আসার মুখে হাজার বিঘের ওপর মাঠে সব ফুল ঝরে গেছে—’

‘তুমি দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখলে?’

‘কী করব? জল হচ্ছিল। একনাগাড়ে। অন্ধকার। আটকাতে পারিনি বুলু।’

পা টিপতে টিপতে বুলুর হাত এক জায়গায় এসে থেমে আছে।

‘শুধু এই জন্যে তুমি এতদিন হাড় কালি করে খাটলে?’

‘কী করব? একা একটা দ্বীপে—শুধু আমি—,’ তারপরেই কুবের বলল, ‘কেন? আগের মতো তুমি আবার চালিয়ে নিতে পারবে না? বেশ ছিলাম তখন—’

‘বাড়ি ফিরেই নিজের বউকে আসল কথাটা বলতে পারলে না?’

‘তুমি কীভাবে নেবে আমি জানতাম না। ভয় ছিল—’

‘নিজের লোককে জানো না। বউকে জানো না।’ গলা-কাটা ঘোমটাটা বুলুর পিঠের ওপর একদম খসে পড়ল। কুবের তড়াক করে উঠে দাঁড়াল। যে-কোনো একরকমের হাওয়ার জন্যে বসে থেকে থেকে গাছপালাগুলো স্থির। একটু পরেই আচমকা দুলে উঠবে, ‘তোমার কী জানি না আমি বুলু? কোনটুকু জানি না? সত্যি করে বলো। দ্যাখো আমি হেরে গেছি—’

মাথার ওপর থেকে কোনো মূর্তি এইমাত্র কথা বলে উঠল। কেননা, বাইরের জ্যোৎস্না এত দূরে এসে পা বেয়ে বেয়ে কুবেরের বুক ছাড়িয়ে আর উঠতে পারেনি। সেখানকার অন্ধকার থেকে কেউ কথা বললেই বোঝা যায়—কবন্ধ গলার স্বর ফিরে পেল। বুলু তাই মন দিয়ে কুবেরের পায়ের পাতা, হাঁটু দেখছিল। বসে থাকতে থাকতেই ওপরের ছন্ন দেওয়া আবছা মানুষটাকেও দেখল। একদিন কালো স্যান্ডেলে এই ফরসা পা-দুখানা কত ঝকঝকে ছিল। পরিষ্কার দেখা যায়—কালচে সব ছোপ ছোপ দাগ পা বেয়ে ওপরে উঠে গেছে। একেবারে আস্তরণ—চেঁছে তুলে ফেলতে যাওয়াও ভুল হবে।

কুবের দু-হাতে হ্যাঁচকা টানে বুলুকে সিধে দাঁড় করিয়ে দিল, ‘তুমিই বলো—আমি কী জানি না তোমার?’

এমন কঠিন করে কেউ টানে! ব্যথা পেলে বুলু চুপ করে কাঁদতে শিখেছে অনেক দিন।

‘আমি কোনোদিক তাকাইনি বুলু। আরও কত নিরাপদে রাখা যায় তোমাদের—শুধু তাই দেখে গেছি। বাইরে সময়টা কত খারাপ—তোমাদের একদম জানতে দিইনি। গত ক-বছর শুধু রিস্কের মধ্যে ঝাঁপ দিয়ে পড়ে হাত-পা ছুঁড়তে ছুঁড়তে জল খেয়ে কোনোরকমে পাড়ে এসে উঠেছি। একা একা আড়াল বানাচ্ছিলাম। তার পেছনে তোমাদের, নগেন-বীরেন ওদের সবাইকে আনতে চেয়েছি। আসলে এত দিনেও কেউ আসেনি। সত্যি বলো—তাই না! আসলে এত করেও, ভালো করে দ্যাখো—আমার মাথার ওপরেও কোন সেড নেই!’

কান্না কোথায়! এই মানুষটার সামনে বুলুর চোখে জল, মুখে হাসি এক এক সময় এমন শুকিয়ে যায়! চলন্ত ট্রেনের জানলাতেও দূরের পাহাড়কে এতটা আবছা লাগে না তখন।

‘শুধু মা কোনো লুকোচুরি করেনি বুলু। তোমার যদি তাঁকে কোনোদিনও খারাপ লেগে থাকে—অন্তত

আজ আর সে কথা তুলো না। মাই আরনেস্ট রিকোয়েস্ট। একেবারে অঙ্ক কষে হিসেব করে টাইম ঠিক করে চলে গেছে ভদ্রমহিলা। পালম বুনবে বলে এক কাঠা জায়গা চেয়েছিল আমার কাছে! ড্রিম মারচেন্ট কুবের সাধুখাঁর কাছে!'

'তুমি এত খেটে ধান করলে—অথচ ধান পাবে না। এ ক-মাসে কত কালো হয়ে গেলে—'

'একদম কালোয় ঢেকে যাব। কিছু বাকি থাকবে না। আর'—এখানে একদম থেমে গেল কুবের, তারপর বুলুর দুখানা কাঁধ ধরে ফেলে মুখোমুখি দাঁড়াল, 'আমার দিকে তাকাও—আমার শুধু একটা কথাই তুমি জানো না। অনেকবার বলতে চেয়েছি—বলা হয়নি—'

বুলু টের পেল সায়ার দড়ির নীচে নাইকুণ্ডলী থেকে শিষ তুলে তার মাথা অবধি এক চুমুকে কে ফাঁকা করে দিল। কুবের তার কোনটুকু—কোন জায়গাটুকু জানতে চায়। আমি আগাগোড়াই তোমার—সাহেব মিত্তির একটা অজানা লোক ঠিকই—এবং কিন্তু তাকে ভালোই লাগে। কত একাগ্র—শুধু কাছে থাকতে চায়।

'আমার পায়ের রক্ত ভালো না। দোষে ধরেছে অনেকদিন। রোজ শ্যাওলা পড়ছে—শ্যাওলায় ঢেকে যাচ্ছি। আর বিশেষ বাকি নেই—আর কোনো নিস্তার নেই বুলু।'

সারাটা সন্ধে ধরেই হাসিটা যেন গলার এক জায়গায় রাখা ছিল। একটু হাঁ করে এই মাঝরাতে বুলু তা শুধু গড়িয়ে দিল। ব্রিজে ট্রেন উঠলেও সারাটা তল্লাট এমন কেঁপে উঠত না। নিজের হাসি—বুলু তবু থামাতেই পারছে না। ঝুলবারান্দা উপচে তা মাঠে পড়ল। তখন তা প্রায় হাত দিয়ে ধরা যায়। হাসির দমকে কাশতে কাশতেই বুলু বলল 'ওঃ! এই কথা! ভেবেছিলাম না-জানি কী নতুন কথা বলবে! এ তো আমি কবেই জানি—'

'একটা স্যাড ঘটনায়—এক্সপিরিয়েন্স বলতে পারো বুলু—কতই বা বয়স আমার তখন—'

'হয়েছে, হয়েছে—থামো এবারে—'

'আমাকে বলতে দাও বুলু—', নিজের গলার আওয়াজ সারাটা লবি গমগম করে উঠতেই কুবের মিইয়ে গেল, 'তুমি জানতে?'

বুলু মাথা নাড়ল।

'কী জানতে?

'সব জানি।' তারপর থেমে গিয়ে বলল, 'অ্যাকচুয়াল ফ্যাক্ট কী হয়েছিল জানি না। তবে কোনোদিন ওরকম কিছু একটা দারুণ বিপদে যে পড়েছিলে—তা আমি কবে জানি!'

কুবের আবার দুখানা হাতই বুলুর কাঁধে রাখল। বরং বলা ভালো—দুখানা থাবা।

'কী হয়েছিল বলো তো—'

‘বাঃ! কী করে বলব। তবে মেয়েঘটিত কিছু একটা নিশ্চয়—’ কুবেরের দিকে তাকিয়ে বুলু শেষে সায় পাবার জন্যে বলল, ‘কী? ঠিক বলেছি—?’

এত সুন্দর মুখ, এমন ভরাট জ্যোৎস্না—তার মধ্যে অনেকদিন পরে কুবের বুলুর মুখে একটা অশ্লীল কথা শুনল—মেয়েঘটিত।

‘শেষ অবধি ট্রিটমেন্ট করিয়েছিলে—’

কুবের একেবারে চুপ করে থাকল। ট্রিটমেন্টের বদলে বুলু ভাগ্যিস ‘চিকিচ্ছে’ বলেনি।

‘তুমি এত সব জানলে কোত্থেকে?’ বলতে বলতে কুবের পরিষ্কার দেখল, আগের ঘুঘুটা একটা সঙ্গী জুটিয়ে নিয়ে ফিরল। শুধু ভরদুপুর বেলাই এমন পরিষ্কার আর নির্জন লাগে এখানে।

‘চিলেকোঠার তাকে দেখে এসো। তোমার পুরোনো কাগজপত্তর গুছিয়ে ওখানে রেখে দিয়েছি। ক্লিনিকে গুচ্ছের ব্লাড রিপোর্ট পড়ে আছে। অন্তত দশখানা পুরোনো খামের ওপর তোমার নাম লেখা। আচ্ছা, কত টাকা দিয়েছ ডাক্তারদের শুধু বলো তো? মেয়েমানুষ হয়ে আমি যা বুঝি, তা তোমার মাথায় আসে না।’

কুবের এইমাত্র তার নামের ওপর একটা ঘুষি খেলেও এতটা হকচকিয়ে যেত না। রিপোর্টগুলো বুলুর হাতে পড়েছিল বলে চমকায়নি। এমন কিছু একটা কুবেরের হয়েছিল—অনেক দিন জানে বুলু—জেনে চুপ করে ছিল—তাতেও কিছু না। কিন্তু এমন একটা অসুখকে আমলেই আনেনি? এ তো ম্যালেরিয়া না।

‘আমার পুঁজ পড়ত—’

‘ভালো কথা। আর তো পড়ে না?’

কুবের ধপ করে চেয়ারে বসে পড়ল, ‘নাঃ!’

‘একটা জিনিস মাথায় আসেনি তোমার! এমন ফুটফুটে দুটো ছেলেমেয়ে যার—তার আবার অসুখ কীসের?’

কুবেরের মাথাটা ঘাড়ের কাছে ভাঁজ করে খুলে দিয়ে বুকের ওপর ঝুলে পড়ল—তখন বিড়বিড় করে যা বলল, তা বুলু ছাড়া আর কেউ শুনতে পেত না।

‘আমি রোজ কালচে শ্যাওলায় ঢাকা পড়ে যাচ্ছি।’

‘স্কিন ডিজিজ হয়ে থাকবে। ডাক্তার দেখাও। ট্যাবলেট খাও।’

কুবের আর ঘাঁটাল না বুলুকে। লাভ নেই কোনো। শুধু বলল, ‘অনেক সময় পুরোনো অসুখ ব্লাড রিপোর্টেও ধরা পড়ে না।’

আর যা বলল না, তা হল—কদমপুরে গোড়ার দিকে হেলথ সেন্টারের বিমল ডাক্তার বলেছিল—অসুখ

পুরোনো হলে গাঁটে গাঁটে কালচে ছোপ ধরতে থাকে।

তুমি নিশ্চিন্ত থাকতে ভালোবাস বুলু। তাই থাকো। আমার অসুখের সময় ভালো ওষুধ বেরোয়নি। মফস্সলের এলএমএফ কোন গোঁজামিল দিয়ে রেখেছে—কেউ বলতে পারে না। যতদিন বাঁচব, এই ভয়ে ভয়েই আমাকে থাকতে হবে। কুবের চিৎকার করে উঠে দাঁড়াল, 'আমি সব ভুলে যাচ্ছি। কিছু মনে রাখা যাচ্ছে না।'

বুলু খুব আস্তে বলল, 'তুমি নীরোগ।'

কুবের ততক্ষণে লবি পেরিয়ে নীচে নামার সিঁড়ি ধরে ফেলেছে।

'কোথায় যাচ্ছ?'

কুবের ঘুরে দাঁড়াল। কোন জন্মে এই মেয়েলোকটির সঙ্গে জানাচেনা ছিল? নিশ্চয়ই কোথাও ছিল। বুলু এগিয়ে আসছে, মাথায় ঘোমটা তুলে নিয়েছে, 'এই রাতে এমন আনতাবড়ি ছুটে কোথায় যাচ্ছ? দাঁড়াও। কুবের—'

তখনই কুবেরের মাথার মধ্যে সবচেয়ে আগে এই ঘোরানো সিঁড়িটাই ভাঁজ খুলে ফেলে এলোপাতাড়ি পড়ে গেল। চোখের সামনের মেয়েলোকটি কাত হয়ে গেল। ভীষণ চেনা মুখ। দারুণ সুখে টলমলে মুখের ওপর ভরাট একখানা হাসি পড়ে আছে। এত ভাঙাচোরা দেওয়ালের এদিক ওদিক ছড়াছড়ি, সাতটা ধাপসুদ্ধ এক প্যাঁচ সিঁড়ি সিধে আকাশে উঠে গেছে—তার মধ্যে মেয়েলোকটির মোটা ভাঙা বেণির খাঁজে খাঁজে বুনো লাল ফুল একটাও নষ্ট হয়নি, একটুও থেঁতলে যায়নি—শুধু বেণিটাই ফুলে ফেঁপে বেশ ঢোল হয়ে গেছে।

যতটা নেমেছিল, প্রায় ততটা উঠে এসেই কুবের লবির গোড়ায় জ্যোৎস্নার সীমানায় দাঁড়ানো মেয়েলোকটির মুখোমুখি গিয়ে একেবারে রুখে দাঁড়াল, 'আকন্দর শেকড় খুব কুটকুট করে?'

বাইরের ফাঁকা চৌবাচ্চার চেয়েও এখন নিঃশব্দ।

'এসব কী বলছ ওগো? শোনো—'

'আমি আর পারব না। সব ভুলে যাচ্ছি—'

বুলু এবার আর কুবেরকে ফেরাতে পারল না। তখন সিঁড়ি শেষ করে ফেলেছে কুবের। নিজের বাড়ি। কিন্তু এখন কোনো দিক দিয়ে হাওয়া নয়তো জলের ধারায় বয়ে গিয়ে একেবারে সিধে বাইরের মাঠে জ্যোৎস্নার আলোয় গিয়ে পড়া যায়। তখনই দেখল, কুবের এ বাড়ির দেওয়াল, দরজা কিছুই চেনে না। সামনের বড়ো ঘরের খোলা দরজার সামনে থমকে দাঁড়িয়ে পড়ল। মাঠের দিকে ঘরের খোলা জানলার বাইরে এক চৌকো জ্যোৎস্না ঝকমক করে জ্বলছে। তার ওপর গ্রিলের তারা-ফোটানো নকশার কয়েকটা কালো লাইন। ঘরের ভেতরে তিন প্রাণী শুয়ে। তার মধ্যে একজন খুব লম্বা—বয়স অনেক, খুব নিশ্চিন্তে ঘুমোচ্ছে। তার পাশে প্রায় দুধের বোতলের সাইজের মানুষের দুটো বাচ্চা

পরপর শোয়ানো। কাউকে মনে করতে পারল না কুবের।

ততক্ষণে বুলু তাকে ধরে ফেলল, 'এভাবে কোথায় যাচ্ছ? নাম ডোবাবে সবার! তুমি কুবের সাধুখাঁ। চিনতে পারলে কী বলবে লোকে—,' দেবেন্দ্রলালের ঘুম যাতে না ভাঙে, সেজন্য বুলুর চেপে চেপে বলতে হচ্ছিল। এরকম কুবেরকে সে দেখেনি কোনোদিন। কান্নায় কোনো শব্দ নেই বলে একটুও চাপতে হয়নি, সেই একটা সুবিধে বুলুর।

কুবের ফিনকি দিয়ে মাঠে গিয়ে পড়ল। প্রথম চোটেই আছাড়। অথচ একটুও ব্যথা লাগল না। সারাটা শরীর একেবারে ফুরফুরে হয়ে আছে। বেশি দূর দৌড়োতে পারল না। নিশুতি রাতে পাতলা বাতাসে গাছপালা দুলতে শুরু করেছে সবে। গয়লাদের একটা মোষ এমন পরিষ্কার আলোয় একেবারে একা মাঠের দিক থেকে মসমস করে ঘাস খেতে খেতে এগিয়ে আসছে। কুবেরের কাছে পৌঁছোতে রাত কাবার হয়ে যাবে।

একেবারে সামনেই তালগাছের সারির মধ্যে দেড়তলা অবধি নেমে পড়ে চাঁদটা ঝুলে আছে। কয়েক পা এগিয়ে চাঁদের ঠিক নীচে গিয়ে দাঁড়াল কুবের। সত্যি, এতদিনকার হলদে চাঁদ আগাগোড়া নীল মাখনে মাখানো। এদিক-ওদিক তাকাল কুবের। হাতের কাছে দমকলের একটা মই থাকলে তরতর করে বেয়ে ওপরে উঠে যেত। আঙুল বসিয়ে দেখত চাঁদের গায়ে কতটা পুরু করে মাখনের কোটিং। চাঁদ হলদে! কী ভুলই না জানতাম এতদিন!

কুবেরের পায়ের ওপর দিয়ে একটা ভিজে রুপোলি দড়ি খুব আস্তে আস্তে পার হচ্ছিল তখন। নীচে তাকিয়ে নিশ্বাস বন্ধ করে ফেলল।

তারপর সাপটা কয়েক হাত এগিয়ে যেতেই কুবের বুক ফাটিয়ে চিৎকার করে ডাকল 'নগেন—আয় —।'

এদিকে বিশেষ ঘরবাড়ি নেই। কোথাও কোনো ধাক্কা খেতে না পেরে মাঠের মাঝামাঝি শব্দটা ফুরিয়ে গেল।

এখান থেকে ডাকলে নগেন কিছুতেই শুনতে পাবে না। দূরে নিজের বাড়ির বারান্দায় বুলু দাঁড়িয়ে—না, একখানা শাড়ি ঝুলছে বোঝার উপায় নেই। পরিষ্কার জ্যোৎস্নার সঙ্গে সব সময় কিছুটা করে ধোঁয়া মেশানো থাকে। কুবের মাথা নিচু করে রুপোলি দড়িটা ফিরে দেখতে গেল। সাপটা বেশিদূর যায়নি। আহারে বেরিয়েছে। এই নিশুতি রাতে কিছু ব্যাং, বে-আক্কেলে পোকামাকড় বেরোবেই। ধরা দিতে হবেই বুঝে ওগুলো আর একদম নড়ে না।

কুবের অবাক হয়ে গেল। সাপটা তাকে চিনতে পেরেছে। একটু মাথা তুলে নমস্কারও করল। কুবেরও চিনেছে। জায়গা মাপার দিন দিব্যি আলে আলে ঘুরে কুবেরের ওপর নজর রেখেছিল। সেদিন সারভেয়ার রায়মশায়ের কী আপশোস—লোহার গজ কাঠিখানা সঙ্গে আনেনি।

'আমি ভালো আছি। আপনি?'

সাপটা কোনো জবাবই দিল না। তরতর করে চলে গেল। এস কে বোসের তেতলা বাড়ির ছায়া পেরোতেই রুপোলি একটা রেখাকে কুবের তিরবেগে যেতে দেখল। ওর বাসা কুবের চেনে। কোণের খেজুরতলার বাঁ হাতে। সেখানে মাটি কিছু ঢিবি হয়ে আছে। বর্ষাকালে ইঁদুররা ওই তল্লাটে গর্ত করে চোরাই ধান এনে জমা করে। তারপর একদিন সাপরা সেইসব বানানো বাসার দখল নেয়।

গেছে বেশ বেগে। কিন্তু লেজের ঘষায় সারা তল্লাটের জ্যোৎস্না সোনালি আলোর গুঁড়ো হয়ে ভেঙে পড়েছে। কুবের আর চোখ তুলে তাকাতে পারছিল না। যেদিকে দেখে—শুধু রাশি রাশি হলদে আলোর ধান। ইচ্ছে করলেই সেইসব আলোর গুঁড়ো দু-হাতের আঁজলায় ভরে তুলে নিয়ে খুশিমতো ছড়িয়ে দেওয়া যায়—ছিটিয়ে পড়বার সময় তা নির্ঘাত ধান হয়ে ছিটকে পড়বে।

'নগেন—',

ভোরে সৃষ্টিধর, কুসুমকে ওদের বাবা দেখাতে না পেরে বুলু কিছু অস্বস্তিতে পড়ল। দেবেন্দ্রলালকে ছেলে দেখাতে না পেরে লজ্জায়, অপমানে বুলুর চোখে জল আসছিল। সকাল-সকাল পুকুরে নামল দেবেন্দ্রলাল। কাল সারারাত জ্যোৎস্নায়, ঘুমে, শান্তিতে কেটেছে। জাহাজের গল্প শুনে সৃষ্টিধর সব সময় ইঞ্জিনঘর, বয়লার নয়তো ডেক এইসব নিয়ে আছে। পুকুরে অল্প জলে দাঁড়িয়ে পা দাপাল, তারপর জানতে চাইল, 'দাদু জাহাজ চলে যাওয়ার পর নদীতে খুব ঢেউ হয়—'

'চারদিকের নৌকোগুলো দুলতে থাকে—', দেবেন্দ্রলাল আর কিছু মনে করতে পারল না। একটা ছবি অনেকদিন তার মনে ছিল—সন্ধের অন্ধকারে 'ফ্লোরিকান' স্টার্ট নিয়ে বেরিয়ে গেল—মাইলখানেক চলে গেছে—ঠিক তখন কোত্থেকে মানুষ-প্রমাণ সব ঢেউ এসে জেলখানার ঘাটে ভাসানো জেটি এলোপাতাড়ি কাঁপাতে লাগল।

কুসুমের জলে খুব ভয়। একবার তার বাবার হাতে সাঁতার শিখতে গিয়ে ভরপেট জল খেয়েছিল। সেই থেকে বাথরুমে চান করে। পরিপাটি সিঁথি কেটে কপালে সিঁদুরের টিপ পরে ঠানদিদি হয়ে ঘাটে বসে আছে। দেবেন্দ্রলাল কথা দিয়েছে, আজ ওদের শিবতলায় নিয়ে যাবে। কত মজা হবে—অনেক লোক আসবে। সৃষ্টিধর, কুসুম এমন অন্যমনস্ক হয়ে এই পেল্লায় বাড়ি, খালপাড়ে একা একা ঘোরে—দেখেই ছ্যাঁৎ করে উঠেছিল দেবেন্দ্রলালের মন। একেবারে অনাথ শিশু।

একেবারে দুপুর পার করে দিয়ে কুবের ফিরল। সারাদিনের জ্বালাধরা রোদ সোজাসুজি মুখে নিয়েছে, চোখে নিয়েছে—উশকোখুশকো চুল, হাঁটু অবদি কাদা, চোখ লাল।

ছেলেমেয়ে ঘুমোচ্ছে। বসার ঘরে ইজিচেয়ারে শুয়ে দেবেন্দ্রলাল খবরের কাগজ ওলটাচ্ছিল। কুবেরকে দেখেও উঠল না।

বুলু নিঃশব্দে তোয়ালে, সাবান রেখে এল বাথরুমে। কুবের তারপর সাওয়ারের নীচে জামাকাপড়সুদ্ধ গিয়ে দাঁড়াল। বাথরুমের দরজা খোলা। বুলু টেবিলে প্লেট দিচ্ছিল। হঠাৎ দেখল, খোলা বাথরুমে জলের ধারার নীচে চোখ বুজে কুবের দাঁড়িয়ে। ঘুমিয়ে পড়েছে কিনা বোঝা যাচ্ছে না।

একবার নীচে উঁকি দিয়ে দেখল বুলু। দেবেন্দ্রলাল এখন ওপরে উঠবে না। বাথরুমে ঢুকে দরজা বন্ধ করে দিল। তারপর একটানে কুবেরের গা থেকে শার্ট খুলে নিল। নাভি থেকে বুকের বাঁ দিকের অনেকটা জুড়ে কালচে শ্যাওলা পুরু হয়ে পড়েছে। ডলে দেখল, ওঠে না। কুবের ঝিমধরা গলায় খুব আস্তে বললে, 'উঃ! লাগে—'

কিছু না বলে বুলু সাবান ঘষতে লাগল, 'কতদিন চান করোনি বলো তো—'

'সাঁইত্রিশ বছর—'

'পুরো সাঁইত্রিশ?'

'একজাক্টলি ছত্রিশ বছর একুশ দিন। তেরোশো উনচল্লিশের চৈত্রে এই ওয়ার্ল্ডে পা দিয়েছিলাম—'

'বেশ পুরোনো মডেল তো! তোমার ব্রজদার ওখানে আজ গাড়িগুলো যাবে কিন্তু! নাও জ্বালিয়ো না। ধুতিটা ছেড়ে ফেলো। হাঁটুতে কতকাল সাবান দাওনি?'

'লাভ নেই বুলু! ও দাগ ওঠার নয়।' হঠাৎ খুব জোরে মুডের মাথায় কুবের বলল, 'আচ্ছা—যদি খুব ভালো ডাক্তার দেখাই—তাহলে ফুল কিয়োর হয়ে যাব?'

'কী হয়েছে তোমার? এত ঘাবড়াচ্ছ কেন?'

'কী হয়নি বুলু! আর কী বাকি আছে! এখন এত জায়গাজমি, ঘরবাড়ি, ব্যাংকের তাড়া তাড়া চেকবই—সব দেখলে আমার বমি আসে, না এলে গলায় আঙুল দিয়ে বমি করতে ইচ্ছে করে।'

'চান করে খেয়ে নাও। ঘুমোবার আগে এক গ্লাস জলে দশ ফোঁটা জোয়ানের আরক দেব। খেয়ে

নিয়ো।'

'ইনকরিজিবল্!' কুবের এখন একদম ল্যাংটো। বুলু সাবান মাখাচ্ছিল। একেবারে পাম্প করে ফোলানো উরুর উপর থেকে বউকে একরকম ঠেলে সরিয়ে দিল। বাথরুমের বাইরে বের করে দিতে দিতে ফেনায় পেছল কুবের যতখানি পারে মুখ ফাঁক করে হাসল, 'আমার বাঁ পা-খানা একবারে কোমর থেকে এক কোপে খসিয়ে দিয়ে ফ্রিজে রেখে দিলে মাসভর খাওয়া যায়! তাই না! আমাদের ফ্যামিলি তো ছোটো।'

চোখ বুজে এসেছে, কণ্ঠমণি হাসির দমকে কেঁপে উঠছে, সাবানের ফেনা কুবেরের চোয়ালে শুকিয়ে গিয়ে খড়ি মাখানো হয়ে আছে—সব নিয়ে মানুষটাকে চেনাই যায় না। কিছু একটা ঘটে গেছে বলে সন্দেহ হয়। জানতে গিয়ে ভীষণ খারাপ কিছু শুনতে হবে এই ভয়ে আর কিছু বলতে পারে না বুলু। এই মানুষ যে একদিন এইভাবে আসবে কে জানত!

কোনো কোনো সময় ঘেন্না চাবুকের চেহারা পায়। চোখ থাকলে দেখা যায়। কুবেরের সে চোখ অনেকদিন নেই।

বুলু বলল, 'আমরা মানুষ। শুনেছি, বাঘ পুরুষছানা হলে খেয়ে ফেলে—'

হাট করে খোলা বাথরুমের চৌকাঠের ফ্রেমের মাঝখানে ফেনায় তেলতেলে কুবের দাঁড়িয়ে পড়ল, গায়ে কিছু নেই, 'আমরাও খাব। রোজ কত লোক হচ্ছে—একদিন দাঁড়াবার জায়গাও থাকবে না বুলু।'

'তা কেন হবে?' তারপর কুবেরের বুকে হাত রেখে খুব অনুনয় মাখিয়ে বলল, 'লক্ষ্মীটি দরজা আটকে ভেতরে যাও। চান করে এসো—একসঙ্গে খেতে বসব।'

বুলু চোখ ফেরাতে পারছিল না। টান টান প্রায় দশাশই শরীরে খানিক জায়গা জুড়ে কালচে কিছু ছোপ বুক বেয়ে উঠেছে।

বুলুর গোড়ার কথা ধরে বসে ছিল কুবের, 'তাই হবে। কে কোথায় বাড়ি করল—কোন জায়গার দলিল কার—এ সব ইনসিগনিফিকেন্ট হয়ে যাবে। তখন হয়তো আমরা থাকব না। সৃষ্টিধর ওদের কেড়ে খেতে হবে। অর্ডার অব দি ডে—তাই দাঁড়াবে একদিন?'

'আমরা বাঘ সিংহ নই!'

'বাঘকে হেলাফেলা কোরো না। বাঘ খুব জিয়োমেট্রিক। সাঁতরে নদী পেরোনোর সময় ঢেউয়ে ভেসে যেতে যেতে রেগে ডাঙায় ফিরে আসে। ফিরে শুরু করে। স্ট্রেট লাইন ধরে সাঁতরে ওপারে ওঠার জেদ চেপে যায় ওদের—'

'হয়েছে! আর পাগলামি কোরো না লক্ষ্মীটি। যাও চান করে নাও।'

'বাঘকে আন্ডার এস্টিমেট করাও ঠিক নয়, বুলু। অনেকদিন আহার না পেলে ওরা শেষরাতে নদীর পারে চলে যায়। তারপর ব্রাহ্মমুহূর্তে পেছনের দু-পায়ের ওপর বসে সামনের দু-পায়ে কাদার বল

বানিয়ে লুফতে থাকে। একসময় শূন্যে ছুঁড়ে দিয়ে হাঁ করে গিলে নেয়—'

'কেমন?'

'পেটে খিদের গর্তটা বুজিয়ে দেয় আর কি—'

'এসব বলছ কেন?'

'আমরা—আমি না থাকলে সৃষ্টিধর, কুসুম—ওদের কী হবে? ওরা তো এসব কিছুই জানে না। কে শিখিয়ে দেবে ওদের? আমি পোড় খেয়ে খেয়ে তৈরি—ওরা তো কিছুই শিখল না—শেখাবার সময়ই পেলাম না!'

'এত ভেবে লাভ নেই।'

'কিন্তু তুমি বলো—কোথায় ওদের রেখে যাচ্ছি—কোন ওয়ার্ল্ডে! আমাদের দুনিয়া সেই তুলনায় কত ইজি ছিল। আমাকে দ্যাখো। আন্দাজে কোথায় উঠেছি।'

'তুমি খেটেছ তাই পেরেছ।'

'বাজে কথা। কত লোক তো খাটে। ক-জনের হয়—'

বুলু জোর করে কুবেরের মুখের ওপর বাথরুমের দরজা আটকে দিল। তাও কি পারা যায়! দরজা চেপে ধরতে গিয়ে জলে সাবানে মাখানো কুবের, গায়ে কোথাও কিছু নেই, হাতে লেগে পিছলে যাচ্ছিল। এখনও একটু সাবান দিতেই কেমন চাপা গন্ধ দেয় লোকটার গা দিয়ে।

বুলু কুবেরের পছন্দমতো অনেক কিছু রেঁধেছে। সেগুলো সাজাতে সাজাতে অনেকদিন পরে একরকমের আনন্দ হচ্ছিল তার।

বাথরুমের ভেতরে কুবের তখন ধারাস্নানে অনেক টাটকা হয়ে যাচ্ছিল। এমন সময় ঠিক মেরুদণ্ডের ওখানে শুকনো একখানা হাড়ের চাকতি প্রথমে খচ করে উঠল। তারপর সব ক-খানা একসঙ্গে মিলে সেই ছুঁচোলো ব্যথা সিধে ওপরে পাঠিয়ে দিল। কুবের ফেনা করে গোড়ালি ঘষতে গিয়ে এই বিপদ ডেকে আনল। সঙ্গে সঙ্গে যতটা মনে করা যায়—এই চেষ্টায় খট করে দাঁড়াতে গেল। সাওয়ারের মাঝামাঝি আর একটা কল গলা বাড়িয়ে ছিল। একেবারে কুবেরের কাঁধের নরম মাংসে তা বিঁধে গেল। খাপছাড়াভাবে যা কিছু মাথার মধ্যে পরপর পড়ে যাচ্ছিল, স্মৃতি বলতে যা কিছু বাকি ছিল—সেই ব্যথা তা একদম ঘোলা করে দিয়ে কুবেরকে সোজা দক্ষিণের শোবার ঘরে পাঠিয়ে দিল।

সারা গা বেয়ে জলের ফোঁটা গড়াচ্ছিল। তোয়ালে কাঁধে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে মাথার বালিশটা তুলল। নাঃ! আছে। টিপে দেখল। তারপর নিজের পানের গলার ওপর চরম নিশ্বাস এনে গাইতে লাগল—'তুমি যে গিয়াছ বকুল-ও বিছানো পথে-এ-এ'।

টেবিল সাজিয়ে বুলু দাঁড়িয়ে পড়েছিল। এমন সিন বেশি দেখা যায় না। গায়ে একটুও জল নেই কুবেরের। মাথায় ঝাঁকুনি দিয়ে জল মুছছে। সঙ্গে সেই 'বকুল-ও বিছা-আনো পথে-এ!'

লবি থেকে পাটভাঙা ধুতি গায়ের ওপর ছুঁড়ে দিল বুলু।

মাথা তুলে তাকিয়েই হেসে ফেলল কুবের, 'সরি!' তারপর সতেজ, ডাঁটালো যে-কোনো গাছের ধারায় একেবারে ঝুঁকে পড়ে মেঝে থেকে ধুতিটা তুলল। গায়ে কোনো ছালবাকল নেই। বুলু দেখবে না দেখবে না করেও পষ্টাপষ্টি তাকিয়ে থাকল। তার বুক ঠেলে শুকনো বাতাস উঠে গলার ভালব্ বন্ধ করে দিচ্ছিল। এমন জিনিস বেশি দেখা যায় না। গর্বও হচ্ছিল একটু। চাষবাসে এত বড়ো একটা মার খেয়েও লোকটা গান গায়।

বিকেল পড়তেই মুশকিল হল। দেবেন্দ্রলাল ঘুমন্ত কুবেরকে কিছুতেই তুলতে দিল না। বুলু ভেবেছিল, শিব প্রতিষ্ঠার উৎসবে সবাই একসঙ্গে যাবে। কিন্তু কুবের যে ঘুমে কাদা হয়ে আছে। একখানা রেখে সব গাড়ি শিবতলায় পাঠানো হয়েছে। অগত্যা শ্বশুরের সঙ্গে সৃষ্টিধর, কুসুমকে নিয়ে বুলুকে যেতে হল।

কুবেরের ঘুম ভাঙল আলোর মধ্যে। পূর্ণিমা বলে চাঁদ বেশ কিছুটা নেমে এসে লাইট দিচ্ছিল। বারান্দায় দাঁড়াতেই বুঝল বাড়িতে কেউ নেই। ঠিক তখন দক্ষিণ থেকে একটানা হাওয়া এসে আছড়ে পড়তে লাগল। একেবারে ঢেউ। মেদনমল্লর দুর্গের চত্বরে দাঁড়িয়ে ভোর ভোর দেখা যেত—জল আসছে—না, কতকগুলো ঢেউ ফেনাসুদ্ধ কে চরিয়ে নিয়ে ফিরছে। হাওয়ার পেছনেও তেমন রাখালি। কুবের রোডের গায়ে পড়েই সেই সব অদৃশ্য তরঙ্গ বাড়ির সামনের লনে এসে গড়িয়ে যাচ্ছে—দু-একটা ফণা মেলে কুবেরকে ছুঁয়ে ফেলল। তার সারা শরীর এখন হালকা। ওপর থেকে ফেলে দিলে সে এখন ভাসতে ভাসতে নামবে।

সাহেব খুব একটা রঙিন জামা চড়িয়েছে গায়ে। ভিড়ের মধ্যে কুবেরের বাবা বলে দেবেন্দ্রলাল ভালো জায়গাই পেয়েছে। বাইরে জ্যোৎস্না—মন্দিরের ভেতরে নিয়ন—আর মধ্যে বেলপাতার ডাঁই মাথা ঠেলে উঠেছে। ব্রজ মোহান্ত যেদিকেই ঘোরে লোকের চোখ সেদিকেই ফেরে। আলখাল্লার বোতাম আছে কি না বোঝা যায় না। দাড়ি বুক বেয়ে অনেকদূর নেমেছে। চন্দনে, তিলকে কপালের আর কিছুই নেই। এখানকার ফাঁকা ধুধু প্রান্তর জুড়ে বাবা রেলেশ্বরের কত যে ভক্ত, আজ না এলে তা বোঝা যেত না। তারা সব মন্দির চত্বরের বাইরে সামিয়ানার নীচে সারি দিয়ে বসে। এসব ঠেলে তেলের কুয়ো খোঁড়ার পেল্লায় তুরপুন টেনে তোলার ক্রেনের ডগা আকাশের অনেকখানি ভেতরে উঠে আছে। দূরে হাইওয়ের ওপর বড়ো বড়ো লরি—মাঝে মাঝে তাদের ইলেকট্রিক হর্ন বেজে উঠছে। লাল নীল কাগজের নিশান আর পতাকা বাতাস পেয়ে কাঁপছে।

সাহেবের সঙ্গে কোনো কথা বলতে পারল না বুলু। দুজন দু-জায়গায় দাঁড়ানো। বুলু একবার লোকটাকে দেখল। তারপর মনে পড়ে গেল, রেলেশ্বর তো উধাও—তবে ব্রজ মোহান্ত এত ঢাকঢোল বাজিয়ে কী করছে? ভেবেই বুলু ঘেমে উঠল।

নানান সভায় কিছু লোক চেয়ার আলো করে বসে। মাইক আঁকড়ে ধরে ভগবানের ইতিহাস বলে।

দেবতাদের ঠিকুজি কুষ্ঠি বিশদে বলতে বলতে সংস্কৃত শ্লোক গুঁজে দেয় তার ভেতর। তেমন একজনকেও জোগাড় করেছে ব্রজ দত্ত। সেই লোকটাই মাইকে গাঁক গাঁক করে আসর ভরাট করে দিল। কেউ কিছু বুঝল কি না দেখার দরকার নেই। সবার গলা ছাপিয়ে মাইকের গলা সব কান কালা করে দিতে পারল কিনা সেটাই আসল।

ব্রজ মোহান্ত আসনে বসেছে। এবারে রেলেশ্বরের অভিষেক হবে। বেলপাতা সরিয়ে তাঁকে রুপোর আসনে চড়িয়ে মন্দিরে নিয়ে পাকাপাকি থিতু করতে হবে। আসনখানা এসেছে তাড়দার হাটের ইজারাদার বিশ্বাসদের বাড়ি থেকে। মোহান্তর বড়ো ভক্ত ওরা।

একজন লোক এসে ব্রজর কানের কাছে মুখ নিল। কী শুনল কে জানে। ব্রজ উঠে দাঁড়াল। বাইরে তখন ডায়াসের ওপর মাইকের গলা ফুলস্পিডে চেঁচাচ্ছে।

ভিড়ের বাইরে এসে দেখল দূরে প্রায় মাঠের মধ্যে একখানা রিকশা সাইকেল দাঁড়িয়ে। রিকশাওয়ালা বলল, 'আরেকটু আসুন। বাবু বসে আছেন—'

যাবে কি যাবে না—ঠিক করতে পারল না ব্রজ। পেছনে একটা মস্ত ভিড়। সামনে স্তব্ধ জ্যোৎস্নায় একখানা রিকশা সাইকেল—ঘোমটা তোলা।

'তুই? চল বসবি।'

কুবের রিকশা থেকে নামল না, 'হেঁটেই আসছিলাম। অনেকদিন অভ্যেস নেই। পা ধরে গেছে। মোড় থেকে রিকশাটা নিলাম।'

'বুলু বলছিল—তুই ফিরেছিস। পরে আসবি। তা ভেতরে চল—'

'নাঃ! আর যাব না। তোমার জিনিস বুঝে নাও।'

'কী ব্যাপার?'

ঝোলাটা পড়ে যাচ্ছিল। ব্রজ দত্ত ধরে ফেলল। ভেতরে হাত ঢুকিয়ে বাইরে আলোয় তুলে ধরে অবাক। ব্রজর গলা দিয়ে কথা বেরোচ্ছিল না। চোখ জলে মেখে যাচ্ছে, জ্যোৎস্না বলে সবই ধোঁয়াটে দেখায় তাই রক্ষা। সেই চন্দনে দাগানো। একেবারে তিনটি চোখ তুলে সেবায়েতকে দেখছে।

'কুবের!' অনেকক্ষণ চুপ করে থেকে ব্রজ মোহান্ত বলল, 'তোর বউদি কেমন আছে রে—'

ভিড়ের মধ্যে তারই নাম ধরে ডাকাডাকি হচ্ছে। কে যেন খুঁজতে এগিয়ে আসছে। ব্রজ দত্ত আর দাঁড়াতে পারছিল না। তবু যাওয়াও যায় না। এতদিন পরে—

'ফাইন!'

'যাক! তোর কাছে গিয়ে যখন একবার পড়েছে—তখন আমি নিশ্চিন্ত!' তারপর খুব লজ্জা করেই বলল, 'সময়মতো শয়ান দিতিস তো—'

‘রোজ। রেলেশ্বরের শয়ান, স্নান—কিছুই বন্ধ থাকেনি।’

‘আভা এমনিতে কনসিডারেট খুব। নিয়ে এলে পারতিস।’

‘এবারে ফিরে গিয়েই নিয়ে আসব।’

‘আমি জানতাম! তোর কাছে আছে—’, ব্রজর কথাই যেন ফুরোচ্ছে না। কুবের বুঝতে পারল না, কে তার কাছে আছে? ছিল? রেলেশ্বর—না, আভা। কার কথা জানত ব্রজদা!

‘বুলু তো আর এসব কিছু বলেনি আমায়? কী কালো হয়ে গেছিস—’

এমন সময় বেশ জোর গোলমাল উঠল ভিড়ের ভেতর থেকে। কার কথা বলবে বুলু। রেলেশ্বর? আভার? কুবের বলল, ‘তুমি যাও। আজই রেলেশ্বরের প্রতিষ্ঠা শুনে ছুটে ছুটে এলাম এদ্দুর। কাজ সেরে নাও ব্রজদা। পরে কথা হবে।’

ব্রজ ফিরে যেতে যেতেও দু-বার ফিরে দাঁড়াল। কুবের রিকশা থেকে নেমে হাত দিয়ে চলে যেতে বলল। ব্রজ ভিড়ে ঢোকার আগে বলল, ‘থাকিস কিন্তু। প্রসাদ পাবি সবার সঙ্গে। তোর জন্যে আমি রেলেশ্বরকে ডাকব। সব বিপদ কেটে যাবে।’

কুবের আর হাত নাড়তে পারল না। জ্যোৎস্নায়, শব্দে, হাওয়ায় চুপ করে গেল। সামনেই পেছন-ফেরা একটা কবন্ধ ভিড়। ব্রজদা বেশ গুছিয়ে বসেছে। আহা! কতদিনের ব্রজদা! তুমি নোবেল প্রাইজ পাবে বলে উপন্যাস লিখতে। আমি ডিকটেশন নিতাম।

বড়োলোকের বউ বুলুর মাথায় লাল শাড়ির ঘোমটার ডগা এতদূর থেকেও পরিষ্কার দেখতে পেল কুবের। সোঁদালিয়ার চেহারাই পালটে গেছে। বড়ো বড়ো রাস্তা—লরির আড্ডা, পথের দু-ধারে হরেক কারখানা। কী ছিল। কী হয়ে গেল! আভা সেদিন শেষরাতে ‘ডাহুক’-এ উঠে না বসলে এখানেই থাকতে পারত।

বাতাস কেটে রিকশা ফিরছিল। সারা গায়ে পেয়ারার গন্ধ মেখে আভা তার পাশে পাশে হেঁটেই হাইওয়ে কাবার করে দিতে পারত। কোনো রিকশা লাগত না। আজই ভোররাতে ‘ডাহুক’ ফিরবে হয়তো। সারেং এসে কদমপুরের বাড়িতে বসে থাকতে পারে। আবার কয়েক ঘণ্টা পেছনে ফেলে মেদনমল্লর দ্বীপ। আভা বলত, ‘তোমার দ্বীপ।’ মেয়েলোক জিনিসটা যে কী! কুবের কোনো তল পায় না।

কদমপুরে ফেরার পথ আর ফুরোয় না। যতদূর চোখ যায় জায়গার পর জায়গা। এরা জ্যোৎস্নার আলোয় এমন মরে পড়ে থাকে। জ্বালানি করবে বলে গরিব-দুঃখীরা খড়-নাড়া মুছে নিয়ে গেছে।

এমন ঠান্ডা ঝিরঝিরে আলোতেও রিকশাওয়ালা ঘেমে নেয়ে উঠেছে। লোকটা গলার নুন ঘষতে ঘষতে তিন টাকা চাইল। কুবের পাঁচ টাকার একখানা নোট দিয়ে চেঞ্জ না নিয়েই কুবের রোডে নেমে পড়ল।

'বাবু বাড়ি অবদি দিয়ে আসি?'

'থাক।'

খুব কৃতার্থ হয়ে লোকটা রিকশা ঘুরিয়ে নিল!

এই সেই রাস্তা। লোকে আগে বলত খালপাড়। কুবের প্রথম এসে দেখেছিল, খাল কেটে যাওয়ার সময় এলোপাতাড়ি মাটি ফেলে ফেলে ঠিকাদারের লোকরা রাস্তার এক-এক জায়গায় ঢেউ রেখে গেছে। এখন তা কুবেরের হাতে পড়ে আগাগোড়া প্লেন। কদমপুরের মৌজা ম্যাপে এই খালপাড়েরও একটা হাল দাগ আছে। সাবেক দাগও আছে। মোট জমি একুশ বিঘে চার কাঠা। এই পোড়া জমি জুড়ে লোকে একসময় কড়াই চাষ করত। সাপখোপের ভয়ে রাখালরাও এ-পথে গোরু চরাতে যেত না। কলকাতার এক বাবু মাছ ধরতে এসে পাম্পসু পায়ে মরে পড়েছিল। সাপে কাটা মড়া লোকে খালে ভাসিয়ে দেয়। জায়গাটার নাম সারভেয়ার রায়মশায়ের মুখে—এনব্যাংকমেন্ট। এখান থেকেই জগতের সব মেঘ আকাশে ওঠে। এখানেই চাঁদ পূর্ণিমা করে—জ্যোৎস্না দেয়।

বাড়ির কাছাকাছি এসে কুবের দেখল, বড়ো মুলতানি গাইটা জোড়া খেজুরতলায় বসে জাবর কাটছে। এই গাছ দুটো বেঁটে—রস কাটাও সোজা। পাখিরা এদের জন্মদাতা। তাই আজও মালিকানা ঠিক হয়নি। মোড়ের চুনি মাতাল কুবেরকে তুচ্ছ করে ওই দুটো গাছে তাড়ি কাটে। কতদিন ইচ্ছে হয়েছে, পিষে মারে লোকটাকে। মারা হয়নি। তেড়েল বলেই কুবের কী দরের লোক তা বুঝে উঠতে পারেনি।

গোরুটাকে গলায় গিয়ে হাত বোলাল কুবের। কী করে চেন খুলে গোয়াল থেকে বেরিয়ে এসেছে। এদের গোরু সারাদিন বসে থাকলে বাত হতে পারে—তাই, একটু আধটু হাঁটাচলাও করা দরকার। গোরুটা কুবেরকে পেয়ে উঠে দাঁড়াল। গা চাটল। গলার তারের কারে বিপদনাশিনী গিলের বিচি।

কুবেরের সঙ্গে হেঁটে হেঁটে গোয়ালে এল। কুবের খুব সাবধানে গোরুটা বাঁধল। অন্য গোরুদের গলায় হাত বোলাল। তারপর দোকায় দোকায় কাটাখড়, মুগচুনি দু-হাত ভরে তুলে নিল। অন্ধকারে কান নেড়ে গোরুরা খুব তৃপ্তিতে খাচ্ছে। আরামেরও একটা শব্দ আছে। কুবের ওদের পা থেকে মশা তাড়াতে লাগল। ওরা কুবেরের গায়ে আদর করে লেজের চামর বুলিয়ে দিল। শান্তি কখনও কখনও অন্ধকারেও চেনা যায়। কান লটপট করে ওরা বড়ো বড়ো চোখে কুবেরকে দেখছিল। সে-চোখে আশীর্বাদ।

বাইরে বেরিয়ে কালকের মতোই আজই কুবের প্রায় ফিনকি দিয়ে জ্যোৎস্নায় গিয়ে পড়ল। সামনেই তার সাজানো বাড়ি। পেছনে বেঞ্চ লাগানো পুকুরঘাট। গায়ের নীচে লনের মখমল ঘাস। ভেতরে অন্ধকার গোয়ালে গোরুরা খাচ্ছে।

আমাকে আর নগেনকে মা এক থালায় ভাত মেখে খেতে বসাত। তখন গল্প বলত মা।

ছোটোবেলা জুড়িয়ে গিয়েও যায় না। কবে কাকে কতখানি ব্যথা দিয়েছি মনে—আলাদা করে তার কিছুই মনে রাখতে পারিনি। জানাশোনা ছাড়াও যাদের অবস্থা দু-একবার দেখেছে—তাদের জন্যে

আজ কুবেরের চোখ ফেটে জল আসছিল। কেন—তা জানি না। হরগঞ্জ বাজারের বাইরে এক বুড়ো রাস্তায় বসে পুরোনো শাড়ি রং করে বেচত। ইস্কুলে এক বন্ধুর বাবাকে সেখান থেকে দর করে শাড়ি কিনতে দেখেছিল। যতবার মনে পড়ে—ততবারই কুবেরের খুব কষ্ট হয় সেই লোকটির জন্য। একবার বহুকাল আগে ফুটপাতে উবু হয়ে বসে সৃষ্টিধরের জন্যে দর করে ইজের কিনেছিল কুবের।

অনেকটা এসে গেছে। কাল রাতে এদিকেই গিয়েছিল সাপটা। কুবের খুব পরিষ্কার গলায় ডাক দিল। কোনো সাড়াশব্দ নেই। দক্ষিণে সমুদ্র থেকে হাওয়া উঠে এখানে রোজ আসে। জল নয়, তাই ঢেউ দেখা যায় না। গায়ে লাগতেই বোঝা যাচ্ছিল।

জায়গাটা কুবেরের চেনা। খানিক তোলা মাটি এক জায়গায় বাতাসার মঠ হয়ে ঠেলে উঠেছে। কাছাকাছিই থাকবে। খুব চাপা গলায় ডাকল। এবারও কোনো শব্দ পেল না কুবের। বাসায় থাকলে যদি ভুলেও একবার বেরিয়ে আসে। এখনও ওদের আহারে যাওয়ার সময় হয়নি। যদি আসে। এখনও রাত নিশুতি হতে দেরি আছে।

কুবের নিজের গলা শুনেই ভয়টা পেল। পরিষ্কার শুনল, সে নিজে—কুবের সাধুখাঁ গর্তের সামনে খুব অনুনয় করে ডাকছে—'আভা! আভা—' মোটা পিচবোর্ড করাতে কাটলে এমন আওয়াজ বেরোয়—সেই শব্দে গলা ভর্তি।

সামনেই খালপাড়। ওখানে ওই পাকুড়তলায় একদিন জ্যোৎস্নায় মাছ কিনতে এসে একা একা গলা শুকিয়ে কাঠ হয়ে গিয়েছিল আভার। তখন বৃষ্টি হচ্ছিল ঝিরঝির করে। তখন হলদের বদলে নীলচে মাখন মাখানো চাঁদ দেখে খুব মুশকিলে পড়েছিল আভা।

সারাদিন কাঠফাটা রোদে বেরোতে না পেরে সন্ধেরাতে খালপাড় পেরিয়ে সাপটা জলের ধারে গিয়েছিল একটু। অমাবস্যা ঘুরে দাঁত উঠেছে ফিরে। ফণার দু-ধারে বিষ জমে জমে মাথাটা ভার ভার ঠেকছিল বিকেল থেকেই। মাথার দু-ধারে তেলতেল হয়ে গেছে। তাই জলের ধারে ভিজে মাটিতে গা মেলে দিয়ে মাথাটা খালের জলে ঝুলিয়ে ডুবিয়ে রেখেছিল খানিক। লোক চলাচলের কামাই নেই। ননী বোসের ফকরে ছেলে বিকাশ বোসের লোকজন টর্চ নিয়ে ঘোরে সব সময়। মাছ পাহারা দেয়। সাপটা তাই পড়িমরি করে ফিরে আসছিল।

কুবের আরেকবার 'আভা' বলে ডেকে উঠেই পিছিয়ে গেল। ফিরতে হবে। হিসেবে ভুল ছিল। বাঁ গায়ের গোড়ালির নরম জায়গায় ফণাসুদ্ধ একবার মুখ থুবড়ে পড়ল সাপটা। বাসায় ফেরার পথে এই কাণ্ড! এ সময়টা মাথার ঠিক থাকে না। জাত গোখরো। কুবের ভুল জায়গায় পা ফেলেছে।

কুবের সব ভুলতে বসেছিল। গায়ের কাছে খুব চিনচিনে কী একটা হয়ে গেল। আর কিছু ভুলতে হল না। মন দিয়ে ডাকলে সব পাওয়া যায়। সাপটা এই ঠাসা জ্যোৎস্নার ভেতর দিয়ে খুব ঢিলে চালে একটু একটু করে গর্তে গিয়ে ঢুকে গেল। যাবার সময় লেজে সারাটা আলোর পরত নেড়ে দিল। সঙ্গে সঙ্গে কুবের পরিষ্কার দেখল, হলদে গুঁড়িগুঁড়ি রাজ্যের ধান ছড়িয়ে এই মাঠ ভরে গেল। আঁজলা ভরে

তোলা যায় প্রায়। দুধ এসে দানা ভরে শক্ত হয়ে গেছে—আলে আলে কামলারা কাস্তে হাতে দাঁড়ানো। এখন একদল কাটবে—আরেকদল আঁটি বেঁধে বেঁধে এগোবে।

কুবের গলা ফাটিয়ে ডাকল, 'নগেন—'। নিজেই পরিষ্কার শুনতে পেল না। এইমাত্র কাশিতে গলা ঘড়ঘড়ে হয়ে গেছে।

তখন খালপাড়ের গোড়া থেকে একটা কুকুরের ঘেউ ঘেউ শোনা গেল। কুবের শার্টের একটা হাতা ছিঁড়ে ফেলল। কোনো হেল্পার নেই ধারে কাছে। তবু যতটা পারে শক্ত করে বাঁ গায়ের গোড়ালির একটু ওপরে বাঁধন দিল একটা।

ভদ্রেশ্বরের আজ কম ধকল যায়নি। চিটু দাশ বৈকুণ্ঠপুর থেকে সরু পিয়াসলে স্টেশন অবদি আগাগোড়া সঙ্গে ছিল। অমৃত ঘোষের সেই ভাইপো বাঘাকে ভুলিয়ে ভালিয়ে ট্রেনে তুলে দিয়ে বলেছে, 'আমার কথাটা মনে থাকে যেন স্যার। সাধুখাঁ মশাইকে একটু বলবেন কিন্তু।'

ভদ্রেশ্বরের গায়ে আর জোর ছিল না। ট্রেনে বসে মাথা নেড়েছে শুধু। এতটা ঝক্কি যেত না—যদি ঘোষমশাইয়ের বাড়ি থেকে স্টেশন অবদি বাঘা রিকশায় আসতে রাজি হত। দু-বার তোলার চেষ্টা হয়েছিল। বেঁকে বসেছে।

তাই আড়াই মাইল রাস্তা ওর মর্জি মতো হাঁটতে হয়েছে ভদ্রেশ্বরের। বাঘা এ-কুকুর সে-কুকুরের সঙ্গে ঘেউঘেউ করে, পথের ধারের আঁস্তাকুড় শুঁকতে শুঁকতে ভদ্রেশ্বরকে সারাটা রাস্তা হাঁটিয়ে স্টেশনে এসেছে। গাড়িতে উঠে একটা ভালো করল অবশ্য। ট্রেন ছাড়তেই সামনের দু-পা জানালায় তুলে দিয়ে জিভ ঝুলিয়ে বাঘা বাইরের হাওয়া খেতে লাগল।

বিকেল থাকতে বেরিয়ে সেই সোয়া ন-টার ট্রেনে এসে কদমপুরে নেমেই ভদ্রেশ্বর সোজা সাধুখাঁমশাইয়ের বাড়ির পথ ধরেছে।

কুবের শার্টের আরেকটা হাতাও ছিঁড়ে ফেলল। আগের বাঁধবের আরেকটু ওপরে গায়ের সবটুকু জোর দিয়ে বাঁধল। নিজের দিকে তাকিয়েই ছ্যাঁৎ করে উঠল বুকটা। জগন্নাথদেবের জামাও এত হাতকাটা হয় না। তাই খুব জোরে ডাকল, 'নগেন—।'

এবার গলার আওয়াজ পেল ঠিকই—তবে কিছু ভাঙা। নাকে হাত দিল। আগের চেয়ে কিছু বসে গেছে—আর ছোটোও লাগল। আরও জোরে ডাকল, 'নগেন—।' পরিষ্কার বুঝল গলা খোনা হতে শুরু করেছে। অথচ সামনে তারই বাড়ির দোতলার লবিতে আলো জ্বলছে। সেখানে কেউ নেই। এখন তার যে-কোনোভাবে জেগে থাকা দরকার।

বাতাস থেমে যাওয়ায় তাঁবুর গায়ে লটকানো শাড়িটা কুবের দেখতে পেল। বুড়ো কামলার কথাই খেটেছে। শেষ দিকে জল মেরে দেওয়াতে মোটা ধানটা প্রাণপণ ফলেছে। গাছ শুকিয়ে পাটখড়ি হয়ে আছে। হলদে শিষগুলো ভারে মাটিতে মিশে যাচ্ছে।

সামনেই তালগাছের সারির মাঝখানে চাঁদ কালকের চেয়েও আরও নীচে নেমে এসেছে। আভা যা বলেছিল, ঠিক তাই। একেবারে নীল। কুবের চাঁদের বাইরে আর কিছু দেখতে পেল না। কেননা চাঁদ কালকের চেয়ে অনেক বড়ো। আকাশের এ-মোড় ও-মোড় জুড়ে একখানা নীলচে থালা। একথা কাউকে যে বলবে—একটা লোকও কাছে নেই। দু-চোখ যতদূর দেখা যায়—তার সবটা জুড়েই শুধু চাঁদ। অথচ কোনো জ্বালা নেই সে-আলোয়। নীল। নরম। এত বড়ো একটা আবিষ্কার চেঁচিয়েও বলা যাচ্ছে না।

এস কে বোসের বাড়ি তৈরির গোডাউন এখনও ভাঙা হয়নি। কোণে একটা মই মাথা ঠেলে দাঁড়িয়ে ছিল। কুবের সেটাকে টেনে টেনে সামনের তালগাছে এনে লাগাল। ঘুমে চোখ জড়িয়ে যাচ্ছে। পায়ে বাবলা কাঁটা ফুটল বোধ হয়। ব্যথা লাগল না। ঝিমুনিও কাটল না। ছাদ ঢালাইয়ের রং বাইন্ডিং সেন্টারিং-এর খাড়া উঁচু মই। দম নিয়ে নিয়ে অর্ধেক উঠে কুবের দেখল ফলন্ত ধানে সারাটা দ্বীপ ঢাকা পড়ে আছে। শুধু অতিরিক্ত আলোয় দুর্গ কিছু আবছা ঠেকছে।

মইয়ের প্রায় শেষ কাঠিতে পা রেখে কুবের চাঁদ পেয়ে গেল। মাথার ওপরে হাওয়ায় ঝুপসি তালপাতাসুদ্ধ কাঁটাতোলা ডালগুলো নড়ছে। নীচে তাকালেই মাঠভর্তি ধান, আধখানা দিঘি জুড়ে জ্যোৎস্নায় পদ্ম ফুটে আছে—সারি দিয়ে দাঁড়ানো পরিদের যে কেউ এক্ষুনি উড়ে যেতে পারে। দুর্গের চত্বরের ওপাশে বলে বাথান, ডালপালা ছড়ানো লাগোয়া পেয়ারা গাছটা কুবের দেখতে পেল না।

হাতের একটা আঙুল চাঁদের এক কোণে লাগাতেই ডেবে গেল। আভা ঠিক বলেছিল। আঙুলটা এনে চোখের সামনে তুলে ধরল। ঘিয়ের গন্ধ দিচ্ছে। এর চেয়ে ভালো করে দেখা গেল না। কিছুতেই চোখ খুলে রাখা যাচ্ছে না। একদম নীল। গন্ধ দিয়ে বাকিটুকু বুঝে নিতে হল।

খুব সাবধানে আরেক কাঠি উঠে কুবের ডান হাতখানা চাঁদের ওপর চেপে ধরল। সঙ্গে সঙ্গে কনুই অবদি গেঁথে গেল। অনেক কষ্টে টাল সামলে নিল কুবের। এত বড়ো একটা জিনিস। তার সবটা জুড়েই নীল মাখনের কোটিং। তার ওপর দিয়ে নীলচে আলো গলে গলে পড়ছে। এখান থেকেই জ্যোৎস্না হয়। এই হল গিয়ে অরিজিন। মাখনের নীচে ডান হাত দিয়ে কুবের চাঁদের গায়ের শক্ত কিছু ধরতে চাইল। ভেতরে এবড়ো-খেবড়ো গা মাখনে পিছলে যাচ্ছে।

এদিকে মই সামলানো কঠিন। নীচেই রাজ্যের ধান ফলে আছে। চোখ একদম জড়িয়ে গেছে। এমন সময় বাঘা তার চেনা বাড়ি দেখেই ঘেউ ঘেউ করে উঠল। গলাটা কুবেরের খুব চেনা। কিন্তু কিছুতেই নাম ধরে ডাকতে পারল না।

বিকেল থেকেই দোটানায় ভুগেছে বাঘা। বৈকুণ্ঠপুরে সারা বাড়ির পাতকুড়োনো খেয়ে তার মন একরকম বসে গিয়েছিল সেখানে। তার মাঝখানে কদমপুরের লোক গিয়েই তার মন গুলিয়ে দিয়েছে। সারাটা পথ খুব ভালো বোধ হয়নি। এইমাত্র চেনা জায়গা দেখে আর স্থির থাকতে পারল না।

বাঘা হাত থেকে চেনসুদ্ধ ছিটকে বেরিয়ে গেল। হ্যাঁচকা টান পড়তে পড়তে ভদ্রেশ্বর সামলে নিল,

‘কোথায় যায় দ্যাখো—’

এত কষ্ট করে ফিরিয়ে আনা কুকুর এখন মাঠে নেমে ছুট দিলে কেমন লাগে। একরকম খোঁড়াতে খোঁড়াতেই ভদ্রেশ্বর নীচে নামল। বাঘা খানিকদূর গিয়ে একজায়গায় থেমে দারুণ চেঁচাচ্ছে।

এইমাত্র কুবের মইসুদ্ধ কাত হয়ে নীচে পড়েছে। টাল রাখতে পারেনি। চাঁদ বড়ো স্লিপারি। পরিষ্কার শুনেছে, বাঘা ডাকছে। ছুটতে ছুটতে কানের কাছে এসে ঘেউঘেউ করছে। কুবেরের কিছুই করার নেই। চোখ আকন্দের আঠায় লেপটে গেল। খানিক আগে চাঁদের গা থেকে ডান হাতখানা হড়কে গিয়ে এই কাণ্ড। তখনও কনুই অবদি নীল মাখনে হাতখানা ডেবে ছিল। একথা আভাই প্রথম বলেছিল। এত বড়ো একটা আবিষ্কার কাউকে বলা হল না। নাক একদম বসে গেছে। অথচ এতকাল ধরে সবাই জানে চাঁদ হলদে।

মাঠের চুচকো ঘাস কাবে ফুটে যাচ্ছে। বাঘা না থাকলে কখন ঘুমিয়ে পড়ত কুবের। সমানে ডাকছে —আগের চেয়েও জোরে। কাবে কিন্তু কষ্ট হচ্ছে না কোনো। কুসুম এই হাসে, এই কাঁদে। কেন যে এখানে এসেছে তাই জানে না মেয়েটা। ধান কাটা চলছে। এবার গাদা দিয়ে ঝাড়াই-মাড়াইয়ের জন্য তৈরি হতে হবে। কালই বাবা বলছিল, গোলা কোথায়? ঠিক শোনা যাচ্ছে না।

টুকরো টুকরো আকন্দের শেকড়ে জায়গাটা ভর্তি।

কুবের অবছা মতো বুঝল, একজন লোক এদিকেই জোরে হেঁটে আসছে। গায়ের শব্দ তার মাথার কাছে থামল। তারপর একটা থ্যাঁতলানো চিৎকার। তাকে দেখেই চেঁচিয়ে উঠেছে।